।। পূর্ণ পরমাত্মনে নমঃ।।

জ্ঞান গঙ্গা

-ঃ প্রচার প্রসার সমিতি ঃ-

সৎলোক আশ্রম, হিসার-টোহানা রোড, বরবালা,
জেলা-হিসার (হরিয়ানা)।

প্রার্থনা : বাঙালি ভক্ত সমাজের সরল ভাষাতে বোধগম্য হওয়ার জন্য সন্ত রামপালজী মহারাজের দ্বারা লিখিত "জ্ঞান গঙ্গা" পুস্তক, যা সমস্ত ধার্মিক গ্রন্থের আধারে লেখা হয়েছে। এই পুস্তকটি হিন্দি "জ্ঞান গঙ্গা" থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, এই পুস্তকে লেখা সমস্ত প্রমাণ, বিবরণ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা হিন্দি ধার্মিক শাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

অবশ্যই দেখুন

সন্ত রামপাল জি মহারাজের মঙ্গল প্রবচন

প্রতিদিন রাত 07:30 থেকে 08:30
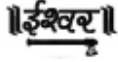
প্রতিদিন রাত 08:30 থেকে 09:30

প্রতিদিন সকাল 06:00 থেকে 07:00

প্রতিদিন সকাল 05:55 থেকে 06:55

প্রতিদিন দুপুর 02:00 থেকে 03:00

প্রকাশক :- প্রচার প্রসার সমিতি ও সর্ব সংগত

সতলোক আশ্রম, হিসার - টোহানা রোড বরবালা

জেলা - হিসার (প্রান্ত - হরিয়াণা) ভারত।

মুদ্রক :- কবীর প্রিন্টার্স

C-117, সৈক্টর-3, ববানা ইন্ডস্ট্রিয়ল এরিয়া নিউ দিল্লী

ধর্মার্থ মূল্য :- ২০ টাকা /-

সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ (মন্ত্র দীক্ষা) প্রাপ্ত করার জন্য এবং অধিক তথ্য জানার জন্য এই নম্বর গুলিতে যোগাযোগ করুন :-

সম্পর্ক সূত্র (বাংলা) :- +91 8882914911, +91 8450030878, +91 8373002290, +91 6295917636

সম্পর্ক সূত্র (আশ্রম) :- +91 8222880541, +91 8222880542, +91 8222880543, +91 8222880544, +91 8222880545

Visit us at : www.jagatgugurampalji.org

E-mail : jagatgugurampalji@yahoo.com

-: বিষয় সূচী :-

❑❑❑

ভূমিকা

অনাদি কাল থেকেই মানুষ পরম শান্তি, সুখ আর অমৃতের খোঁজে লেগে আছে। সে নিজের সামর্থ্য অনুসারে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করে আসছে, কিন্তু তার সেই গগনচুম্বী চাহিদা কখনোই পূর্ণ হচ্ছে না। আর এটা এই জন্যই যে, তার চাহিদা পূরণ করার মার্গটার পুরোপুরি জ্ঞান নেই। সকল প্রাণীই চায় যে, তাকে যেন কোন কাজ না করতে হয়, খাওয়ার জন্য সুস্বাদু ভোজন পায়, লজ্জা নিবারন ও অঙ্গের শোভা বর্ধন কারী সুন্দর পোশাক পায়। আশ্রয়ের জন্য অত্যাধুনিক সর্ব সুবিধা যুক্ত প্রাসাদোপম অট্টালিকা থাকে, বেড়াবার জন্য সুন্দর পার্ক থাকে, মনোরঞ্জনের জন্য মধুর মধুর সংগীত বাজে, নাচ, গান, খেলাধূলা করে, আনন্দফুর্তি করে সারাজীবন কাটুক। আর কখনো যেন তার শরীর খারাপ না হয়, কখনো যেন সে বৃদ্ধ না হয়ে যায়, আর কখনো যেন মৃত্যু না হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু যে সংসারে আমরা রয়েছি, সেখানে এমনটি তো কিছু চোখে পড়ে না, আর না তো এটা সম্ভব। কারণ, এই লোক বা জগৎ ক্ষেত্র হল নশ্বর! এই লোকের সকল বস্তুই হল নশ্বর! আর এই লোকের রাজা হলেন কাল ব্রহ্ম! যিনি এক লক্ষ মানুষের সূক্ষ্ম শরীর প্রতিদিন ভোজন করেন। উনি সমস্ত প্রাণীদেরকে কর্ম-বিভ্রম আর পাপ-পূণ্য রূপী জালে বিভ্রান্ত করে তিন লোকের খাঁচায় (পিঞ্জরে) বন্দী করে রেখেছেন। কবীর দেব বলেন যে,

কবীর, তীন লোক পিঞ্জরা ভয়া, পাপ পূণ্য দো জাল।
সভী জীব ভোজন ভয়ে, এক খানে বালা কাল॥
গরীব, এক পাপী এক পুন্যী আয়া, এক হৈ সূম দলেল রে।
বিনা ভজন কোঈ কাম নহীঁ আবৈ, সব হৈ জম কী জেল রে॥

{কর্ম-ভ্রম*-কর্ম = সিদ্ধান্ত-যেমন করবেন তেমনই প্রাপ্ত হবে (পূর্ণ হবে)। ভ্রম-সংশয়যুক্ত জ্ঞান যা বেদ এবং গীতাতে কাল ব্রহ্ম প্রদান করছেন।

উদাহরণ স্বরূপ (For Example) :- গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১-৪ তে এবং অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩১-৩২, ৩৪, অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম বলেছেন যে, ইহা সংসার রূপী বৃক্ষ। ইহার মূল (Roots) উপরে আছে এবং তিনগুন রূপী শাখা নিচে আছে। যিনি এই সংসাররূপী বৃক্ষের বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য বলবেন, তিনি হলেন পূর্ণ সন্ত অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত। যেমন কান্ড কোন প্রভু। ডাল কোন প্রভু এবং তিন শাখা কোন প্রভু এখানে বিচার কালে অর্থাৎ যে গীতা জ্ঞান আমি তোমাকে বলছি, আমার এই সংসারের রচনার জ্ঞান নেই। কারণ আমার এর আদি (প্রারম্ভ) এবং অন্তের (অন্তিম স্থিতির) জ্ঞান নেই। এই জন্য কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করো। ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের বলা ভক্তি মার্গ (Way of worship) অনুসারে সাধনা করে ঐ পরম পদ এবং পরমেশ্বররে খোঁজ করা উচিত। যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে আর ফিরে আসেনা অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে। যে পূর্ণ পরমাত্মা থেকে এই সংসার রূপী বৃক্ষের বিস্তার হয়েছে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর এই সৃষ্টির রচনা করেছেন, কেবল তারই পূজা করা উচিৎ। আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) ও ঐ পরমেশ্বরের শরণে আছি। গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩১-৩২ তে বলেছেন যে, গীতাতে যে জ্ঞান দিয়েছি তা আমার মত (বিচার) যদিও এটি পূর্ণ নয় তবুও অন্য সাধনা যা শাস্ত্রবিধি রহিত, তা থেকে শ্রেষ্ঠ। যে আমার মত অনুসারে সাধনা করেনা, সে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছে। পূর্ণ পরমাত্মার সাধনা হতে প্রাপ্ত লাভের তুলনায় গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ গীতা জ্ঞান দাতা নিজের সাধনা থেকে প্রাপ্ত হওয়া লাভকে অনুত্তম বলেছেন। এই ভাবে কাল ব্রহ্মের দ্বারা বলা জ্ঞান ভ্রমযুক্ত।}

কাল ব্রহ্ম চায় না যে, কোনো প্রাণী এই পিঞ্জর রূপী জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে যাক। তিনি এটাও চান না যে, জীবাত্মা নিজের আপন ঘর সতলোকের ঠিকানাটা জানতে পেরে যাক। আর এই জন্য তিনি নিজের তিন গুণ রূপী মায়ার দ্বারা, প্রত্যেক জীবকে ভ্রমিত করে রেখেছেন। তাহলে আবার মানুষের ঐ উপরোক্ত চাহিদাগুলো কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? এখানে এমনটি তো কিছুই নেই। এখানে আমাদের সবাইকেই মরতে হবে, সবাইকেই দুঃখী আর অশান্ত হয়ে আছি। যে স্থিতিটাকে আমরা এখানে প্রাপ্ত করতে চাইছি, এই রকম স্থিতিতে আমরা নিজেদের আপন ঘর সতলোকে থাকতাম! এখন এখানে কাল ব্রহ্মের লোকে বা ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় এসে গিয়ে ফেঁসে গিয়েছি, আর নিজের আপন ঘরের রাস্তাটা ভুলে গিয়েছি। কবীর দেব তাঁর বাণীতে বলেন :-

ইচ্ছা রূপী খেলন আয়া, তাতেঁ সুখ সাগর নহীঁ পায়া।

এই কাল ব্রহ্মের লোকে শান্তি আর সুখের নামগন্ধও নেই। তিন গুণের মায়া থেকে উৎপন্ন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, লাভ-ক্ষতি, মান-অভিমান, এইসব বদগুণগুলি সমস্ত জীবকে দুঃখী আর হয়রান করে রেখেছে। এখানে একটা জীব অন্য জীবকে মেরে খেয়ে ফেলে, শোষণ করে, ইজ্জত লুটে নেয়, ধন লুটে নেয়, শান্তি ছিনিয়ে নেয়। এখানে চারিদিকে আগুন লেগে রয়েছে। এখানে যদি আপনি শান্তিতে থাকতে চান তো অন্যরা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। আপনি না চাইলেও চোর চুরি করে নিয়ে যায়, ডাকাত ডাকাতি করে নিয়ে যায়, দুর্ঘটনা ঘটে যায়, কৃষকের ফসল খারাপ হয়ে যায়, ব্যবসায়ীর ব্যবসা লাটে ওঠে, রাজার রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সুস্থ শরীরে রোগ ধরে যায়, অর্থাৎ এখানে কোনো বস্তুই সুরক্ষিত নয়! রাজাদের রাজ্য, সম্মানী ব্যক্তিদের সম্মান, ধনবান ব্যক্তিদের ধন, বলশালী ব্যক্তিদের বল আর এমন কি আমাদের শরীরও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। মা বাবার সামনে জোয়ান ছেলে মেয়ে মারা যায়, দুধ খাওয়া বাচ্ছাদের ক্রন্দনরত বিহ্বল অবস্থাতে ছেড়ে তাদের মা বাবা মারা যায়, যুবতী বোন বিধবা হয়ে যায় আর পাহাড় প্রমাণ দুঃখ ভুগতে বাধ্য হয়। বিচার করুন এই জায়গাটা কি বসবাসের যোগ্য? কিন্তু আমরা নিরূপায় হয়ে এখানে থাকছি, কারণ এই কালের খাঁচা থেকে বাইরে বের হবার জন্য কোনো রাস্তা চোখে পড়ে না, তাছাড়া অন্যজনকে দুঃখী করা আর নিজের দুঃখ সহ্য করাটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যদি আপনাকে এই কালের লোকে ঘটতে থাকা সমস্ত দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পেতে হয়, তাহলে এখানকার প্রভু কালের থেকেও পরম উচ্চ শক্তিযুক্ত পরমেশ্বরের (পরম অক্ষর ব্রহ্মের) শরণ নিতে হবে, যে পরমেশ্বরকে কাল প্রভুও ভীষণ ভয় পায়! তাঁরই ভয়ে কাল উপরোক্ত দুঃখ কষ্ট সেই সকল জীবকে দিতে পারে না, যারা পূর্ণ সন্তের বলা মার্গ আর বিধি অনুসারে পূর্ণ পরমাত্মার অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের (সত্য পুরুষের) শরণ গ্রহণ করে। সেই জীবেরা যতদিন এই সংসারে ভক্তি করবে, ততদিন আজীবন তাদের এইসব কোনো কষ্ট হবে না। যে ব্যক্তি এই "জ্ঞান গঙ্গা" বইটি পড়বে তার জ্ঞান হয়ে যাবে যে, আমরা নিজেদের আপন ঘরটাকে ভুলে গেছি। সেই পরম শান্তি আর সুখ এখানে নেই, আপন ঘর সতলোকে রয়েছে, যেখানে না তো জন্ম আছে, না মৃত্যু আছে, না বার্ধক্য, না দুঃখ, না কোনো ঝগড়া মারামারি আছে, না কোনো রোগ আছে, না পয়সার কোনো লেনদেন আছে, না তো মনোরঞ্জনের জিনিষপত্র দাম দিয়ে কিনতে হয়। ওখানে পরমাত্মার দ্বারা সবকিছু নিঃশুল্ক এবং নিরন্তর পাওয়া যায়। বন্দীছোড় গরীব দাস মহারাজের বাণীতে প্রমাণ রয়েছে যে:-

বিন হী মুখ সারঙ্গ রাগ সুন, বিন হী তন্তী তার। বিনা সুর অলগোজে বজেঁ, নগর নাঁচ ঘুমার ॥
ঘণ্টা বাজে তাল নগ, মঞ্জীরে ডফ ঝাঁঝ। মূরলী মধুর সুহাবনী, নিসবাসর ঔর সাঁঝ ॥
বীন বিহঙ্গম বাজহিঁ, তরক তম্বূরে তীর। রাগ খণ্ড নহীঁ হোত হৈ, বন্ধ্যা রহত সমীর ॥
তরক নহীঁ তোরা নহীঁ, নাঁহী কশীস কবাব। অমৃত প্যালে মধ পীবৈঁ, জ্যোঁ ভাটী চবৈঁ শরাব ॥
মতবালে মস্তানপুর, গলী-গলী গুলজার। সঙ্খ শরাবী ফিরত হ্যাঁয়, চলো তাস বজার ॥
সঙ্খ-সঙ্খ পত্নী নাচেঁ, গাবৈঁ শব্দ সুভান। চন্দ্র বদন সূরজমুখী, নাঁহী মান গুমান ॥
সঙ্খ্ হিঁডোলে নূর নগ, ঝূলৈঁ সন্ত হজূর। তখত ধনী কে পাস কর, এস্যা মুলক জহূর ॥
নদী নাব নালে বগেঁ, ছূটেঁ ফুহারে সুন্ন। ভরে হোদ সরবর সদা, নহীঁ পাপ নহীঁ পূণ্য ॥
না কোঈ ভিক্ষুক দান দে, না কোঈ হার ব্যবহার। না কোঈ জন্মে মরে, এস্যা দেশ হমার ॥
জহাঁ সঙ্খ লহর মেহর কী উপজেঁ, কহর জহাঁ নহীঁ কোঈ।
দাস গরীব অচল অবিনাশী, সুখ কা সাগর সোঈ ॥

সতলোকে কেবল শুদ্ধ সমরূপ (একরস্) পরম শান্তি আর সুখ বিরাজমান। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সতলোকে না পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরম শান্তি, সুখ আর অমরত্বকে প্রাপ্ত করতে পারবো না। সতলোকে যাওয়া তখনি সম্ভব হয়, যখন আমরা পূর্ণ সন্তের কাছ থেকে নাম 'দীক্ষা নিয়ে' পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি আজীবন করতে থাকি। এই পুস্তক 'জ্ঞান গঙ্গা'র মাধ্যমে যে বার্তাটি আমি দিতে চাই, তাতে কোনো দেবী দেবতা বা ধর্মের নিন্দা করা হয়নি, কেবল সব ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গূঢ় রহস্য কে উন্মোচন করে যথার্থ ভক্তির মার্গ বলতে চেয়েছি, যেটা বর্তমানের সমস্ত সন্ত, মহন্ত আর আচার্য গুরু মহাশয়রা শাস্ত্রে গোপন থাকা গূঢ় রহস্যকে বুঝতে পারেনি। পরম পূজ্য কবীর সাহেব নিজের বাণীতে বলেন যে :-

বেদ কতেব ঝুঠে না ভাঈ, ঝূঠে হৈঁ সো সমঝে নাঁহী।

যার কারণে ভক্ত সমাজের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন হচ্ছে। সকলে নিজেদের আন্দাজমতো আর নকল গুরুদের দ্বারা কথিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করতে থাকে! যাতে না তো মানসিক শান্তি পাওয়া যায়, আর নাই বা শারীরিক সুখ পাওয়া যায়, না তো সংসার আর ব্যবসায় লাভ হয় আর নাই বা পরমেশ্বরের দর্শন হয়, আর কখনোই পূর্ণ মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হয় না। তাহলে এই সব সুখ সুবিধা কেমন করে পাওয়া যাবে? এর সঙ্গে এটাও জানতে হবে যে আমি কে? কোথা থেকে এসেছি, কেন জন্ম নিই, কেন মৃত্যু হয়, আর কেন দুঃখ ভোগ করি? আসলে এখানে এই সব কর্ম কে করাচ্ছেন? আর পরমেশ্বর কে? কেমন দেখতে? কোথায় থাকেন বা কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মাতা পিতা কে? আর কিভাবে কাল ব্রহ্মের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের আপন ঘরে (সতলোকে) ফিরে যেতে পারি? এই সব প্রশ্নের উত্তর এই পুস্তকের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে যাতে পুরো বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সম্ভবপর হতে পারে। এই পুস্তকটি সদগুরু রামপাল জী মহারাজের প্রবচনগুলির একটি সংকলন, যেটা সদগ্রন্থ্ গুলিতে লিখিত তথ্যের উপর আধারিত। আমাদের সম্পূর্ন বিশ্বাস আছে যে, যদি পাঠকজন রুচি নিয়ে আর নিরপেক্ষ ভাবে পড়েন আর তারপর কেউ যদি এখানে নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলেন, তবে তার কল্যাণ অবশ্যই সম্ভবপর হবে।

"আত্ম প্রাণ উদ্ধার হী, এস্যা ধর্ম নহীঁ ঔর। কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ, সকল সমানা ভৌর ॥"
জীব উদ্ধার পরম পুণ্য, এস্যা কর্ম নহীঁ ঔর। মরূস্থল কে মৃগ জ্যোঁ, সব মর গয়ে দৌর-দৌর ॥

ভাবার্থ :- যদি একজন জীবাত্মাকে সত ভক্তি মার্গে নিযুক্ত করে দিয়ে তার আত্মকল্যাণ করিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়, আর তার সমান অন্য কোন কর্ম বা ধর্ম নেই। জীবাত্মার উদ্ধারের জন্য করা কাজ বা

জীবের আসল কল্যাণের জন্য এই সেবার কাজের থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য আর কোন কাজ বা সেবা নেই। নিজের উদর পূর্তির জন্য তো পশু পাখীরাও সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। সেই রকমই ঐ ব্যক্তি যে পরমার্থের কার্য করে না, জীবের কল্যাণের জন্য যে কর্ম করা হয়, তার মধ্যে পরমার্থ কর্ম হল সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা। পরমার্থ কার্য বা জীবের আসল কল্যানের কার্য না ক'রে সকল মানুষ, মরুভূমিতে মরিচীকার পিছনে জল প্রাপ্তির আশায় হরিণের মতো দৌড়ে দৌড়ে মরে যায়, যেখানে সে কিছু দূরে খালি জল আর জল দেখতে পায়, আর দৌড়ে কাছে যেতেই ওখানে খালি স্থলই দেখতে পায়। আবার কিছু দূরে স্থলের জায়গায় জল দেখতে পায়, এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে শেষমেষ জলের অভাবে পিপাশায় গলা শুকিয়ে হাঁপিয়ে গিয়ে ঐ হরিণটার মৃত্যু হয়ে যায়! ঠিক একই ভাবে, যে প্রাণী এই কাল লোকে, যেখানে আমরা রয়েছি এখানে, ঐ হরিণটার মত সুখের আশা করে, যেমন নি:সন্তান দম্পতি ভাবে সন্তান হলে তবেই তারা সুখী হতে পারবে, আর যাদের সন্তান আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদেরও অনেক রকমের সমস্যার কথা শুনতে পাওয়া যাবে। নির্ধন ব্যক্তি ভাবে যে, যদি আমি ধন পেয়ে যাই তাহলে সুখী হয়ে যাব। আর যখন ধনী ব্যক্তি দের কুশল জিজ্ঞাসা করবেন তখন তাদের কাছ থেকে অনেক রকমের দুর্ভোগের কথা শুনতে পাবেন। কেউ কেউ রাজ্য প্রাপ্তিকে সুখ মনে করে, এটা তাদের মস্ত বড় ভুল ধারণা, রাজা (মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি) স্বপ্নেও সুখ পায় না। যেমন চার পাঁচজন সদস্য যুক্ত একটি পরিবারের মুখ্য ব্যক্তি (কর্তা বা মুখিয়া) , নিজের পরিবারের ভরন-পোষনের ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে কত হয়রান হয়ে যায়, সেখানে রাজা তো একটা দেশের মালিক, সেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে তার স্বপ্নেও সুখ হয় না। রাজা ব্যক্তিগণ মদ খেয়ে কিছুটা দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করে, ধন-ভান্ডার বাড়াবার জন্য জনতার উপর জোর করে কর (tax) চাপিয়ে দেয়, তারপর সদভক্তি না করা রাজারা পরের জন্মে পশু যোনী প্রাপ্ত করে, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া কর তাদের ঘরে পশু হয়ে জন্ম নিয়ে শোধ দিতে হয়। যে ব্যক্তি মনের কল্পিত পদ্ধতিতে এবং নকল গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি ধর্ম করে আর ভাবে যে, ভবিষ্যতে তার সুখ হবে, সে কিন্তু উল্টে দুঃখই পায়। কবীর সাহেব বলেন যে, আমার এই জ্ঞান এমন ধরনের জ্ঞান, যদি জ্ঞানী পুরুষ শোনে তো হৃদয়ে বসিয়ে নেবে, আর যদি মূর্খ হয় তো এটা তার বোধগম্য হবে না।

"কবীর, জ্ঞানী হো তো হৃদয় লগাঈ, মুর্খ হো তো গম না পাঈ।"

অধিক তথ্য জানার জন্য কৃপা করে এই "জ্ঞান গঙ্গা" পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করুন। এই পুস্তকটি পড়ে সুপ্রিম কোর্টের বয়ঃজ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শ্রী সুরেশ চন্দ্র বলেন, এই পুস্তকের নাম তো 'জ্ঞান সাগর' হওয়া উচিত ছিল।

"কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগ"

(সন্ত রামপাল দাস মহারাজের সৎসঙ্গ প্রবচন থেকে উদ্ধৃত)

সত্যযুগ সেই সময়কে বলা হয়, যে যুগে অধর্ম হয় না, শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ থাকে, পিতার আগে পুত্রের মৃত্যু হয় না, স্ত্রী বিধবা হয় না, বিকার রহিত শরীর হয়, সকল মানব ভক্তি করতে থাকে। সকলেরই পরমাত্মার প্রতি ভয় থাকে, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকার ফলে সমস্ত কর্ম এবং কর্মফলের ব্যাপারে সচেতন থাকে। মন, কর্ম, বচন দিয়ে কাউকে উৎপীড়ন করে না, তথা দুরাচার করে না। যতি-সতী পবিত্র স্ত্রী পুরুষ হয়ে থাকে। পৃথিবী ঘন সবুজ গাছ পালায় ফুলে ফলে ভরে থাকে, সকল মানুষজন বেদের আধারে ভক্তি করে। বর্তমানে কলিযুগ চলছে। এই সময়ে অধর্ম বেড়ে গেছে। কলি যুগে মানুষের ভগবানের ভক্তির প্রতি বিশ্বাস কম হয়ে যায়, হয় তারা ভক্তি

করেই না, বা যদিও বা করে তাও শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মন গড়া পদ্ধতিতে ভক্তি করে, যেটা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬-এর শ্লোক ২৩ আর ২৪ অনুযায়ী বর্জিত। যে কারণে পরমাত্মার কাছ থেকে যে লাভটা নিশ্চিত রূপে পাওয়ার ছিল সেটা প্রাপ্ত করতে পারি না। এইজন্য বেশীর ভাগ মানুষ নাস্তিক হয়ে যায়। ধনী হবার জন্য ঘুষ নেয়, চুরি ডাকাতির উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ধন লাভের জন্য এই উপায়গুলি সঠিক না হওয়ার কারণে পরমাত্মার কাছে অপরাধী হয়ে যায় আর স্বাভাবিক ভাবেই নানা প্রকারের কষ্টে ভুগতে বাধ্য হয়। পরমেশ্বরের বিধানকে মানুষ ভুলে যায় যে, তার ভাগ্যে যা প্রাপ্য তার থেকে বেশি লাভ করা যায় না। যদি অন্যভাবে অবৈধ উপায়ে ধন সংগ্রহ করে নেওয়া হয়, তাহলে সেটা বেশি দিন থাকবে না! যেমন করে এক ব্যক্তি নিজের পুত্রকে সুখী দেখবার জন্য অবৈধ বিধিতে ধন প্রাপ্ত করতো, আর কিছুদিন পরে তার পুত্রের দুটো কিডনীই খারাপ হয়ে যায়। যেমন করে হোক তার কিডনী বদলে দেওয়া হয়, তাতে তিন লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়। যে ধন অবৈধ বিধিতে সংগ্রহ করেছিল সেটা সবই খরচ হয়ে যায়, আর তার উপরে আরো কিছু টাকা ঋণ হয়ে যায়, তারপর সে ঐ পুত্রের বিয়ে দিয়ে দেয়, আর ছয় মাস পরে বাস দুর্ঘটনাতে ঐ একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটে। এখন না তো পুত্র রইলো, না অবৈধ বিধিতে সংগ্রহীত ধন, তাহলে তার আর কি বেঁচে থাকলো? অবৈধ বিধিতে ধন সংগ্রহ করার জন্য পাপ, যা এখনও হাতে রইলো, এবার সেই পাপের ফল ভোগ করার জন্য যার যার কাছ থেকে পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছিল তাদের ঘরে পশু (গাধা, বলদ, গাই) হয়ে শোধ দিতে হবে। কিন্তু পরম অক্ষর ব্রহ্মের শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি করতে থাকা ভক্তের ভাগ্য পরমেশ্বর বদলে দেন। কারণ পরমেশ্বরের গুণে এটাই লেখা আছে যে, পরমাত্মা নির্ধনকে ধনী করে দেন। সত্যযুগে কোনও প্রাণী মাংস, তাম্বাখুঁ (তামাক), মদ ইত্যাদি খেতো না। কারণ তারা এই সব উপভোগ বা উপসেবনের ফলে হওয়া পাপের সঙ্গে পরিচিত ছিল।

❒ **মাংস খাওয়া পাপদায়ক** :- এক সময়ে এক সন্ত নিজের শিষ্যের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। ওখানে এক জেলে পুকুরে মাছ ধরছিল। মাছগুলো জল থেকে বাইরে এসে ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করছিল। শিষ্য জিজ্ঞাসা করলো হে গুরুদেব! এই অপরাধী প্রাণী কি সাজা পাবে? গুরুদেব বললেন, পুত্র, সময় এলে তখন এর উত্তর দেবো। চার পাঁচ বছর পরে ঐ দুজন গুরু শিষ্য মিলে কোথাও যাবার জন্য জঙ্গলের রাস্তায় হাঁটছিলেন, তো ওখানে একটি হাতির বাচ্চা চিৎকার করছিল, লাফ ঝাঁপ করার সময় ঐ বাচ্চাটা দুটো পাশাপাশি থাকা গাছের গুঁড়ির মাঝখানে ফেঁসে যায়, তারপর বেরিয়েও যায় কিন্তু বেরিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করার সময় পুরো শরীরটা ঘষা খেয়ে ছাল উঠে যায়, তারপর তার শরীরে ঘা হয়ে গিয়েছিল। তার পুরো শরীরে পোকা কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল, যারা ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল, সেই হাতির বাচ্ছাটা বিকট আওয়াজ করে চিৎকার করছিল। তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদেবকে, হে গুরুদেব! এই প্রাণী কোন পাপের শাস্তি ভোগ করছে? গুরুদেব তখন বললেন, হে পুত্র! এই হল সেই জেলে যে ঐ শহরের বাইরে জলাশয়ে মাছ ধরছিল।

❒ **মদ্যপান করলে কতখানি পাপ হয়?**

মদ খেলে, ৭০ বার ধরে কুকুরের জন্ম প্রাপ্ত করে কষ্ট ভোগ করতে হয়, মল মুত্র খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্য আরো অনেক কষ্টও তাকে ভোগ করতে হয়, তাছাড়া মদ শরীরের অনেক ক্ষতি করে দেয়, শরীরে চারটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ফুসফুস, যকৃৎ, কিডনী এবং হৃদয়, মদ এই চারটি অঙ্গেরই ক্ষতি করে। মদ খেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুর মত আচরণ করতে লাগে। কাদায় পড়ে যাওয়া, কাপড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে দেওয়া, বমি করা,ধন হানি, মানহানি, সংসারে অশান্তি ইত্যাদি মদ্য পান করার ফলস্বরূপ

হয়ে থাকে। সত্যযুগে মদের ব্যবহার হতো না। সত্যযুগে সমস্ত মানুষ পরমাত্মার বিধানের সঙ্গে পরিচিত থাকে, আর সেজন্য মানুষ সুখী জীবন-যাপন করতে থাকে।

গরীব, মদিরা পীবৈ কড়বা পানী সত্তর জন্ম স্বান কে জানী।

❒ **দুরাচার করলে কতখানি পাপ হয়?**

পরদ্বারা স্ত্রী কা খোলৈ, সত্তর জন্ম অন্ধা হো ডোলৈ।

পূজনীয় কবীর পরমেশ্বর বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পরস্ত্রীর সঙ্গে দুষ্কর্ম করে, তো সে ৭০ জন্ম ধরে অন্ধের জীবন ব্যতীত করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন বিপদ কখনোই ডেকে আনবে না। বোকারাই এমন কাজ করে থাকে। যেমন আগুনে হাত ঢোকানোর মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসা। যেমন কেউ যদি অন্যজনের জমিতে বীজ বুনে আসে তো সে হল মহামূর্খ ব্যক্তি। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনও এমন কাজ করতে পারে না। বেশ্যা গমনকে তো এমনটাই জানুন! যেমন আবর্জনার মধ্যে মূল্যবান গমের বীজ ভরা বস্তা ফেলে দিয়ে আসা। এমন কাজ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও করতে পারে না। হয়-তো সে মহা মূর্খ, নইলে মাতাল, বেহায়া অর্থাৎ নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই এসব কাজ করে। বিবেচনার বিষয় হল, যে পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে আনন্দ অনুভব হয়, যদি সেটা শরীরের ভিতর সুরক্ষিত রাখা যায় তো কত আনন্দ দিতে পারে? দীর্ঘায়ু, সুস্থ শরীর, সুস্থ মস্তিষ্ক, পরাক্রম, তথা স্ফুর্তি প্রদান করতে পারে। যে পদার্থ থেকে অমূল্য বাচ্ছার জন্ম হয়, তার নাশ করা বাচ্ছার হত্যার সমান। সেইজন্য দুরাচার তথা অপ্রয়োজনীয় ভোগবিলাস নিষিদ্ধ।

❒ **তাম্বাকু (তামাক) খাওয়া কতখানি পাপদায়ক?**

পরমেশ্বের কবীর দেব বলেছেন:-

সুরাপান মদ্য মাঁসাহারী, গমন করৈ ভোগৈ পর নারী।
সত্তর জন্ম কটত হৈ শীশম্, সাক্ষী সাহিব হৈ জগদীশম॥
পর দ্বারা স্ত্রী কা খোলৈ, সত্তর জন্ম অন্ধা হো ডোলৈ।
সৌ নারী জারী করৈ, সুরাপান সৌ বার। এক চিলম হুক্কা ভরে, ডূবৈ কালী ধার॥

যেমন উপরোক্ত বর্ণনাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, একবার মদ্যপান করা ব্যক্তি ৭০ বার কুকুরের জন্ম ভোগ করে, তারপর মলমূত্র খেয়ে ঘুরে বেড়ায়, পরস্ত্রী গমন কারী সত্তর জন্ম ধরে অন্ধত্ব ভোগ করে, মাছ-মাংস ভক্ষণ কারী মহা কষ্টের ভাগীদার হয়। উপরোক্ত সর্ব পাপ শত শত বার করা ব্যক্তির উপর সর্বমোট যে পাপ হয়, তা একবার হুক্কাপানকারী অর্থাৎ তাম্বাকু (তামাক) সেবনকারী তথা তার সহযোগকারীর হয়ে থাকে। তাম্বাকু সেবনকারী যেমন হুঁকো, সিগারেট, বিড়ি বা অন্য বিধিতে তাম্বাকু সেবনকারীর কি পাপ লাগবে? ঘোর পাপের ভাগী হবে। এক ব্যক্তি যে তাম্বাকু সেবন করে, যখন সে হুঁকো বা বিড়ি সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়, তখন সেই ধোঁয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শরীরে প্রবেশ করে অনেক ক্ষতিসাধন করে। ঐ ছেলেমেয়েরা তারপরে শীঘ্রই খারাপ জিনিস গুলোকে গ্রহণ করে নেয় আর তাদের শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

"অবতারের পরিভাষা"

'অবতার' অবতরণের অর্থ হল উঁচু স্থান থেকে নীচু স্থানে নেমে আসা, বিশেষ করে এই শুভ শব্দ ঐ উত্তম আত্মাদের জন্য ব্যবহার করা হয়, যাঁরা পৃথিবীতে কিছু অদ্ভুত কার্য করেন। যাদের পরমাত্মার তরফ থেকে পাঠানো বলে মনে করা হয় অথবা স্বয়ং পরমাত্মা এসেছেন বলে মনে করা হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ এর শ্লোক নং ১ থেকে ৪ তথা শ্লোক নং ১৬, ১৭-তে

তিন পুরুষের জ্ঞান দেওয়া আছে।

❒ **১. ক্ষর পুরুষ** :- যাঁকে ব্রহ্মও বলা হয়। যাঁর ওম্ নাম জপ করে সাধনা করতে হয়। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩-তে আছে।

❒ **২. অক্ষর পুরুষ**:- যাঁকে পরব্রহ্মও বলা হয়। যাঁর সাধনার মন্ত্র হল তৎ, যেটা সাংকেতিক মন্ত্র। প্রমাণ স্বরূপ গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ -এ আছে।

❒ **৩. উত্তম পুরুষ তু: অন্য:** = শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা তো উপরোক্ত দুজন পুরুষ (ক্ষর এবং অক্ষর) থেকে ভিন্ন। তিনি হলেন পরম অক্ষর পুরুষ। যাকে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ এর উত্তরে, অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ বলা হয়েছে যে, উনি হলেন পরম অক্ষর ব্রহ্ম, এনার জপ হল সৎ, যেটা সাংকেতিক মন্ত্র। এই পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে সাধকের পরম শান্তি তথা সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হবে। প্রমাণ স্বরূপ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলা হয়েছে এই পরমেশ্বর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) গীতা জ্ঞান দাতা থেকে আলাদা। অধিক জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কৃপা করে "ধরতী পর অবতার" পুস্তকটি সতলোক আশ্রম বরবালা থেকে প্রাপ্ত করুন। অবতার দুই প্রকারের হয়, যেমন উপরে বলা হয়েছে। এখন আপনি জানতে পেরে গেছেন যে, মুখ্যতঃ তিন পুরুষ (প্রভু) আছেন। যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। আমাদের জন্য মূলত দুজন প্রভুর মুখ্য ভূমিকা থেকে যায়।

১. ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) :- যিনি গীতা অধ্যায় ১১ এর ৩২ নং শ্লোকে, নিজেই নিজেকে কাল বলেছেন।

২. পরম অক্ষর পুরুষ (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) :- যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ এর ৩ নম্বর শ্লোকে, তথা ৮, ৯, ১০ নং শ্লোকে তথা গীতা অধ্যায় ৪ এর শ্লোক ১৭-তে গীতা অধ্যায় ১৫ এর শ্লোক ১ এবং গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলা আছে।

"ব্রহ্মের (কালের) অবতারদের পরিচয়"

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৭

যদা যদা হি ধর্মস্য, গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাআত্মানম সৃজাম্যহম্ ॥ ৭॥

যদা, যদা, হি, ধর্মস্য, গ্লানি:, ভবতি, ভারত,
অভ্যুত্থানম্, অধর্মস্য, তদা, আত্মানম্, সৃজামি, অহম্ ॥ ৭॥

অনুবাদ:- (ভারত) হে ভারত! (যদা, যদা) যখন যখন (ধর্মস্য) ধর্মের (গ্লানি) হানি এবং (অধর্মস্য) অধর্মের (অভ্যুত্থানম) বৃদ্ধি (ভবতি) হয়ে যায় (তদা) তখন তখন (হি) ই (অহম) আমি (আত্মনম) নিজের অংশ অবতার (সৃজামি) রচনা করি তথা উৎপন্ন করি। (৭) ।

যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৭ এ গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন, যখন যখন ধর্মের প্রতি মানুষের ঘৃনা উৎপন্ন হয়, ধর্মের হানি হয়, তথা অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি (কাল = ব্রহ্ম = ক্ষর পুরুষ) নিজের অংশ অবতার সৃষ্টি করি বা উৎপন্ন করি।

যেমন শ্রীরামচন্দ্র তথা শ্রীকৃষ্ণ কে কাল ব্রহ্মই পৃথিবীতে উৎপন্ন করেছিলেন। যাঁদেরকে স্বয়ং শ্রী বিষ্ণু বলে মানা হয়।

এনারা ছাড়া আরো আট অবতারের কথা বলা হয়ে থাকে। সেখানে স্বয়ং বিষ্ণু আসেন না কিন্তু নিজের লোক থেকে নিজের কৃপাপাত্র পবিত্র আত্মাদেরকে পাঠান। ওনাদেরকেও অবতার বলা হয়।পুরাণে কোথাও কোথাও ২৫ অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাল ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ) পাঠানো অবতারগণ পৃথিবীতে গণহত্যার দ্বারা অর্থাৎ সংহার করে বড় অধর্মের নাশ করেন।

উদাহরণ স্বরূপ:- শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, পরশুরাম এবং শ্রীকল্কি অবতার (যার আসা এখনও বাকি রয়ে গেছে, কলি যুগের শেষে যিনি আসবেন) , এই সব অবতারগণ নৃশংস গণহত্যার মাধ্যমেই অধার্মিক ব্যক্তিদের নাশ করে থাকেন। তাদের মেরে কেটে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে শান্তির জায়গায় অশান্তিই বৃদ্ধি পায়। যেমন শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে মারার জন্য যুদ্ধ করলেন, যুদ্ধতে কোটি কোটি পুরুষের হত্যা করা হয়েছিল, যাতে ধার্মিক এবং অধার্মিক সবরকম লোকেদের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর তাদের স্ত্রীরা এবং ছোট বড়ো বাচ্ছারা, যারা বেঁচে ছিল, তাদের জীবন নরকের সমান হয়ে গিয়েছিল। বিধবাদেরকে অন্য ব্যক্তিরা নিজেদের কামনা বাসনার শিকার বানায়। তাদের জীবিকা নির্বাহের অসুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয়ে যায়। এই বিধি শ্রীকৃষ্ণও অবলম্বন করেছিলেন, পরশুরাম অবলম্বন করেছিলেন। এই বিধিতেই দশম অবতারকে কাল ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) দ্বারা উৎপন্ন করা হবে। তার নাম কল্কি (নি:কলঙ্ক) হবে। ওনাকে কলিযুগের শেষকালে উৎপন্ন করা হবে। তিনি রাজা হরিশ চন্দ্রের আত্মা হবেন। সম্ভল নগরে শ্রী বিষ্ণু দত্ত শর্মার ঘরে জন্ম নেবেন। ঐ সময়ে সমস্ত মানব সম্প্রদায় অন্যায়কারী, অত্যাচারী হয়ে যাবে। উনি এসে তাদের সবাইকে মারবেন। ঐ সময় যাদের যাদের মনে পরমাত্মার ভয় থাকবে, তাদের মধ্যে কিছু লোক যারা সদাচারী থাকবে, তাদেরকে বাদ দিয়ে বাকিদের সবাইকে হত্যা করে দেবেন! অধর্মের নাশ করার জন্য, আর শান্তি স্থাপন করার জন্য এই (কাল-ক্ষর পুরুষের) অবতারেরা এই ধরনের বিধি অবলম্বন করেন।

“পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্যপুরুষের অবতারদের পরিচয়”

❒ ১. পরম অক্ষর ব্রহ্ম পৃথিবীতে স্বয়ং প্রকট হয়ে যান। উনি সশরীরে আসেন। সশরীরে ফিরে যান। এই লীলা উনি দুই প্রকারে করেন।

❒ ক = প্রত্যেক যুগে শিশু রূপে কোনো সরোবরে পদ্মের বনে পদ্ম ফুলের উপর প্রকট হন। ওখান থেকে নিঃসন্তান দম্পতি ওনাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তারপর লীলা করতে করতে উনি বড়ো হন, আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচার করে অধর্মের নাশ করতে থাকেন। সরোবরের জলে পদ্ম ফুলের উপর অবতরিত হবার কারণে পরমেশ্বরকে নারায়ণ বলা হয় (নার = জল, আয়ন = আসেন যিনি অর্থাৎ জলের উপর বাস করেন যিনি, তাঁকে নারায়ণ বলা হয়)

❒ খ = তিনি যখন চান, তখনই সাধু-সন্ত বা জিন্দা বাবার রূপে, নিজের সত্য লোক থেকে পৃথিবীতে আসেন, আর ভালো আত্মাদের জ্ঞান দেন। তারপর সেই পুন্যাত্মাগণও প্রচার করে অধর্মের নাশ করতে থাকেন। ওনারাও পরমেশ্বরের পাঠানো অবতার হন।

কলিযুগে ১৩৯৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় (বি: স: ১৪৫৫) কবীর পরমেশ্বর সত্যলোক থেকে গমন করে এখানে আসেন, আর কাশীর লহরতারা নামক সরোবরে পদ্মের ফুলের উপর শিশুরূপে বিরাজমান হন। ওখান থেকে নীরু আর নীমা নামের যে জোলা (ধানক) দম্পতি ছিলেন, ওনাকে তুলে নিয়ে আসেন, শিশু রূপধারী পরমেশ্বর কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) ২৫ দিন পর্যন্ত কিছু আহার করেন নি। নীরু আর নীমা ঐ জন্মেই প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, শ্রী শিবের পূজারী ছিলেন, মুসলমানদের দ্বারা বলপূর্বক মুসলমান বানানোর কারণে, তাঁতির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাচ্চার পরিস্থিতি খারাপ মনে করে নীমা নিজের ইষ্ট দেব শিবকে স্মরণ করলেন, শিব সাধু বেশে ওখানে এলেন আর বালক রূপে বিরাজমান কবীর পরমেশ্বরকে দেখলেন। বালক রূপে কবীর দেব বললেন, হে শিব, এদের বলুন একটি কুমারী গাই আনুক, যে

আপনার আশীর্বাদে দুধ দেবে। এই রকমই করা হয়েছিল কবীর পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে, ভগবান শিব কুমারী গাইয়ের কোমরের উপর হাত দিয়ে চাপড়ালেন, তৎক্ষণাৎ বাছুরটির স্তন থেকে দুধের ধারা বইতে লাগলো। ঠিক তখনই একটি নতুন মাটির ছোট ঘড়া বাছুরটির স্তনের নিচে রাখলো, পাত্র ভরে যেতেই দুধ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর প্রতিদিন পাত্রটি স্তনের নীচে রাখতেই, বাছুরের স্তন থেকে দুধ বের হতে লাগলো। সেই দুধ'ই পরমেশ্বর কবীরজী পান করতেন। জোলার/তাঁতির ঘরে পালন পোষন হওয়ার কারণে বড় হয়ে পরমেশ্বর কবীর জীও জোলার কার্য করতে লাগলেন, আর নিজেরই প্রিয় উৎকৃষ্ট আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, ওনাদের তত্ত্বজ্ঞান বোঝান, আর স্বয়ংও তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করে অধর্মের নাশ করতেন, আর যাদের যাদের পরমেশ্বর জিন্দা বাবার রূপে সাক্ষাৎ করেন ওনাদের সচখণ্ড (সত্যলোক) নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে রেখে যান। ওনাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেন আর নিজের সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় দেন। ওনারা ঐ পরমেশ্বরের (সত্যপুরুষ) অবতার ছিলেন। ওনারাও পরমেশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের আধারে অধর্মের নাশ করেছিলেন। ঐ রকম কারা কারা অবতার নিয়েছিলেন?

(১.) আদরণীয় ধর্মদাস মহারাজ (২.)আদরণীয় মলুকদাস মহারাজ (৩.) আদরণীয় নানক দেব (৪.) আদরণীয় দাদু মহারাজ (৫.) আদরণীয় গরীবদাস মহারাজ, গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর (হরিয়াণা) নিবাসী এবং (৬.) আদরণীয় ঘীসা দাস মহারাজ, গ্রাম ক্ষেখড়া, জেলা মেরট, (উত্তর প্রদেশ) নিবাসী। উপরে উল্লেখিত অবতারগণ পরম অক্ষর ব্রহ্মের (সত্য পুরুষের) ছিলেন। নিজের নিজের কাজ করে সবাই চলে গেছেন। অধর্মের নাশ করেছিলেন। যে কারণে বহুদিন ধরে মন্দ প্রবণতা আর প্রবৃত্তিগুলি মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারেনি। বর্তমান সমাজে তথাকথিত সাধু সন্তের অভাব তো নেই কিন্তু শান্তির নামগন্ধ নেইW। কারণ হল এটা যে, এই সমস্ত সাধু সন্তদের সাধনার পদ্ধতি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। যে কারণে সমাজে অধর্ম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই সব পন্থ আর সাধু-সন্তদের হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেলো জ্ঞান প্রচার করতে করতে, কিন্তু অধর্ম লাগামহীন ভাবে বেড়েই চলেছে।

"সত্য পুরুষের বর্তমান অবতার"

আগে বলা পরমেশ্বরের অবতার সন্তরা সত্য সাধনা এবং তত্ত্ব জ্ঞানের প্রচার করতেন, যার কারণে পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা, একে অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া, অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করা, এসব স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী, সেই একই শাস্ত্র বিধি অনুসারে সাধনা এবং যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ কে প্রদান করেছেন।

আবার তিনি জিন্দা মহাত্মার রূপ ধারণ করে সতলোক থেকে এসে, ইং- ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে বাংলায় ১৪০৩ সালের ফাল্গুনের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে, বেলা দশটার সময় এসে সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজকে সতনাম আর সারনাম প্রদান করার আদেশ দিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যান।

সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজও হলেন পরমেশ্বরের (পরম অক্ষর ব্রহ্মের) সেই অবতারদের মধ্যে একজন, যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা অধর্মের নাশ করছেন। এইবার সমগ্র বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্ব ধর্ম এবং পন্থের ব্যক্তিরা এক হয়ে গিয়ে পারস্পরিক প্রেম এবং সৌহার্দের সহিত থাকতে শুরু করবেন। রাজনেতাগণও অভিমান শূন্য হয়ে ন্যায়কারী হবে এবং পরমাত্মাকে ভয় পেয়ে কাজ করবে, জনতার সেবক হয়ে, নিরপেক্ষ হয়ে কার্য করবে। পৃথিবীতে পুনরায় সত্যযুগের মতো সময়

আসবে। বর্তমানে পৃথিবীতে সেই অবতার হলেন পরম সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ। এবার ঘরে ঘরে, পরমেশ্বরের জ্ঞানের চর্চা হবে। যেখানে গ্রামে, শহরে এবং পার্কে কেউ বসে জুয়া তাস খেলে বেড়ায়, কেউ রাজনৈতিক কথাবার্তা বলে, কেউ নিজের পুত্র অথবা নিজের পুত্রবধূর প্রশংসা, সমালোচনা করে অথবা নিষ্কর্মা (অকেজো) হওয়ার জন্য নিন্দা করে, সেখানে পরমেশ্বরের মহিমার চর্চা হবে এবং "জ্ঞান গঙ্গা" পুস্তকে লেখা জ্ঞানের উপর বিচার বিবেচনা করতে থাকবে। পরমাত্মার জ্ঞানের চর্চা করার ফলে মনুষ্য জীব মাত্রই পুণ্যের অংশীদার হয়ে যায়, তাই সমস্ত মনুষ্যরূপী জীব পুনরায় শাস্ত্র বিধি অনুসারে ভক্তি সাধনা করে নিজেদের জীবন সুখী করবে এবং আত্মকল্যাণ করাবে। পৃথিবীতে কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগের মতো পরিস্থিতি আসবে, সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজই বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র অবতার। অধিক তথ্য সংবাদ পাওয়ার জন্য কৃপা করে পড়ুন পুস্তক "ধরতী পর অবতার" (সম্পূর্ণ)।

"আমেরিকার মহিলা ভবিষ্যৎ বক্তা ফ্লোরেন্সের ভবিষ্যৎ বাণী"

আমেরিকার বিশ্ব বিখ্যাত ভবিষ্যৎ বক্তা ফ্লোরেন্স নিজের ভবিষ্যৎবাণীতে অনেকবার ভারতের কথা তুলেছেন। "The fall of sensasional culture" নামক নিজের পুস্তকে উনি লিখেছেন, সাল ২০০০ আসতে না আসতেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভয়ঙ্কর রূপে বিগড়ে যাবে। জনতার মধ্যে আক্রোশের ভাবনা প্রবল হবে, দুরাচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, পশ্চিমী দেশগুলিতে বিলাসিতা পূর্ণ জীবন-যাপন কারীদের মধ্যে প্রচন্ড নিরাশা, অস্থিরতা আর অশান্তি দেখা দেবে। মনের অতৃপ্ত সুপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি বা অভিলাষগুলি আরো জোরে জড়িয়ে ধরবে। যার কারণে, ওদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা আরো বাড়বে, চারিদিকে হিংসা আর বর্বরতার পরিস্থিতি তৈরি হবে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে যে চারিদিকে হাহাকার রব উঠবে। কিন্তু ভারত থেকে উঠে আসা একটি নতুন বিচারধারা ঐ মারাত্মক পরিস্থিতিকে বদলে দিয়ে সমাপ্ত করে দেবে। সেই বিচার ধারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্য আর সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ বোধের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দেবে, আর এটাও বোঝাবে যে, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা কোন বিরোধ নেই। আধ্যাত্মিকতাবাদের উচ্চমান আর জড়বাদের (ভৌতিকবাদের বা বস্তুতন্ত্রবাদের) শূন্যগর্ভতা সবার সামনে উজার (প্রকাশ) করবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ঐ বিচারধারায় অনেক বেশি প্রভাবিত হবে। শ্রেণীবদ্ধ সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরা উন্নত সমাজ নির্মাণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হবে। এই বিচারধারা পুরো বিশ্বে অলৌকিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

তিনি আরো বললেন যে, আমার ষষ্ঠ সূক্ষ্মম ইন্দ্রিয় দিয়ে, আমি অনুভব করতে পারছি যে, এই বিচারধারার জন্ম দেবেন যিনি, সেই মহান সন্ত ভারতবর্ষে জন্ম নিয়ে নিয়েছেন। ঐ সন্তের তেজস্বী ব্যক্তিত্বের প্রভাব, সবাইকে আশ্চর্য্যান্বিত করে অলৌকিক পরিবর্তন এনে দেবে। ওনার অভিনব বিচার ধারা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্রম হ্রাসমান প্রভাবকে, পুনরায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করে জাগিয়ে তুলবে। এই বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র আধ্যাত্মিক ভাবের পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে।

ঐ সন্তের বিচার ধারায় প্রভাবিত লোকজন বিশ্বের কল্যাণের জন্য পশ্চিমের দিকে ধাবমান হবে। ধীরে ধীরে এশিয়া, ইউরোপে আর আমেরিকায় পুরো ছেয়ে যাবে। ঐ সন্তের বিচার ধারাতে পুরো বিশ্ব প্রভাবিত হবে আর ওনার পদচিহ্ন বা দেখানো পথকে অনুসরণ করবে। পশ্চিমের দেশ ওনাকে যীশু খ্রীষ্ট বা ঈশা, মুসলমানরা ওনাকে একটি সাচ্চা রেহনুমা বা সত্য পথপ্রদর্শক (বাখবর বা আল হাকিমু বা তত্ত্বদর্শী সন্ত), আর এশিয়ার লোক ওনাকে ভগবানের অবতার বলে মানবে।

ঐ সুমহান সন্তের বিচারধারায় মানুষের বৌদ্ধিক ক্রান্তি নিয়ে আসবে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বদলাবে আর তাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাসের নতুন কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হবে।

ফ্লোরেন্সের মত অনুসারে সেই সন্ত ইতি মধ্যেই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহন করেছেন। তিনি ঐ সন্তের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। নিজের লেখা অন্য এক পুস্তক "গোল্ডেন লাইট অফ নিউ এরা" তে উনি লিখেছেন, "যখন আমি ধ্যান লাগাই তখন প্রায়ই একজন সন্তকে দেখতে পাই, গৌর বর্ণের, মাথায় সাদা চুল, মুখে দাড়ি ও গোঁফ নেই। ঐ সন্তের কপালে অদ্ভুত বিস্ময়কর তেজ থাকে, আর কপালের উপর আকাশ থেকে একটি নক্ষত্রের জ্যোতির কিরণ অনবরত বর্ষিত হতে থাকে। আমি দেখি যে ঐ সন্ত নিজের কল্যাণ কারী বিচার ধারা এবং নিজের সত চরিত্রবান, শক্তিশালী অনুযায়ীদের শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বতে নবীন জ্ঞানের প্রকাশ বিস্তারিত করছেন।

ঐ সন্ত নিজের শক্তি অনবরত বাড়াচ্ছেন। ওনার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে উনি প্রাকৃতিক পরিবর্তনও ঘটাতে পারেন। উনি নিজের কাজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে করবেন। ওনার কৃপা আর সম্যক প্রয়াসে মানব সভ্যতার নব জাগরণ ঘটবে। সারা বিশ্বের সমস্ত জনসমুদায়ের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার হবে। জন শক্তির এক নতুন রূপের উত্থান হবে, যা শাসক বর্গের সত্ত্বাধিকারীদের স্বেচ্ছাচারিতা আর মনমর্জি কার্যকলাপকে দমন করবে।"

মনোচিকিৎসক সুপ্রসিদ্ধ সম্মোহন কলা বিশারদ ডক্টর মোরে বর্সটিনের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের ভালো বন্ধুত্ব ছিল। একবার ফ্লোরেন্স ওনাকে বলেছিলেন, "ডক্টর! ঐ সময়টা অতি দ্রুত সন্নিকটে আসছে, যখন সমাজে সত্তা আর প্রতিপত্তি লোলুপ রাজনেতাদের অপেক্ষা আপনার মতো সমাজ সেবকদের কথা লোক বেশি মনোযোগ সহকারে শুনবে। একবিংশ শতাব্দী শুরু হতেই একটা নতুন বিচারধারা পুরো বিশ্বকে প্রভাবিত করবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সৎচরিত্র যুক্ত ধার্মিক সংগঠনের লোকেদের মনে বসে থাকা ভুল মান্যতা গুলিকে বদলে দেবে। ঐ বিচারধারা ভারত থেকে প্রস্ফুটিত হবে, আর ওখান থেকেই সমগ্র বিশ্বে, সব দেশে, ছড়িয়ে পড়বে। আমি ঐ পবিত্র স্থানে একজন প্রচন্ড তপস্বীকে দেখছি। যাঁর তেজ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা দেবত্বকে জাগাতে তথা ধরিত্রীকে স্বর্গ সমান বানাতে ঐ সন্ত দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন।"

একজন সাংবাদিক ১৯৬৪ সালে ফ্লোরেন্সকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, উনি কি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বলতে পারবেন? ফ্লোরেন্স এটার জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ১৯৭০ সালের ব্যাপক উথাল পাতালের সঙ্গে শুরু হবে ১৯৭৯-৮০ সালের পরে এমন এমন ভূমিকম্প হবে যে নিউ জার্সির কিছুটা অংশ এবং ইউরোপের আর এশিয়ার অনেক দেশের অনেক স্থান ভূমিকম্পের ফলে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। কিছু জলমগ্নও হয়ে যাবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক সবার মাথায় ঢুকে যাবে। তারা এই যুদ্ধের জন্য তৈরিও হবে। কিন্তু ভারতীয় রাজ নেতারা নিজেদের প্রভাব আর বুদ্ধি দিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে সফল হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ভারতের শাসনের লাগাম আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির লোকজনের হাতে এসে যাবে। এইজন্য তাদের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রুখে যাবে। ঐ শাসকগণ একটি মহান সন্তের তেজস্বী এবং যুগান্তরকারী অভিনব বিচারধারা দ্বারা প্রভাবিত হবে। তারা ঐ সন্তের প্রতি সেই রকম সমর্পিত হবে যেমন ওয়াশিংটন স্বতন্ত্রতা এবং মানবতার প্রতি সমর্পিত ছিল।

আমেরিকার শহর, নিউ জার্সি নিবাসী ফ্লোরেন্স সত্য সত্যই এক বিলক্ষণ মহিলা

ছিলেন। একবার নেবেল নামক এক ব্যক্তি টিভি প্রোগ্রামের সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ভারতে জন্ম নেওয়া এমন এক সন্তের ব্যাপারে তো প্রায়'ই বলতেই থাকেন, আমি নিজের ব্যাপারে কিছু জানতে চাই দয়া করে বলুন।"

ফ্লোরেন্স ওনার ডান হাতটা ধরেন আর বলেন, "আপনি খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো রাজ্য থেকে সম্প্রসারণের কার্য করবেন।" নেবেল এক সম্প্রসারণ সেবার কর্মচারী ছিলেন। ফ্লোরেন্সের এই কথা শুনে উনি হাসতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পরে বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে তো বেশ মজা করলেন! যদি আমাদের কোম্পানির অধিকারী এই কার্যক্রমটা এখন দেখেন তাহলে, আমি অন্য রাজ্যে যাব কি না সে তো পরের ব্যাপার, এক্ষুনি কোম্পানি থেকে অবশ্যই বরখাস্ত করে দেবেন।"

কয়েক মিনিট পরে টিভির কন্ট্রোল রুমের ফোন ট্রিং-ট্রিং করে বেজে উঠলো, ফোনটা নেবেলের জন্যই ছিল, ওনার কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ওনার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। নেবেল যখন ফোন ওঠালো তখন উনি বললেন আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে সম্পসারণের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওখানে তোমাকেই পাঠানো হবে।এখন এই কথাটা নিজের মধ্যেই রাখো, এর ঘোষণা কাল করা হবে। আমি টিভিতে ফ্লোরেন্সের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা শুনছিলাম। ফ্লোরেন্স তোমার ব্যাপারে যা বলছিলেন ওটা সম্পূর্ণ রূপে সত্য। আশ্চর্যের কথা যে উনি কিভাবে এটা জানতে পারলেন! নেবেল ফ্লোরেন্সের মুখের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

কিছু সাংবাদিক ওনাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, উনি ভবিষ্যতকে কি করে দেখে নেন আর হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের বা বস্তুগুলোর খোঁজ কি করে দেন? তখন ফ্লোরেন্স বললেন, "আমি নিজেই জানি না যে কি করে এমন সম্ভব হয়ে যায়। আমি ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ কথা বলছি। বিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষ থেকে একটি জ্ঞানের প্রকাশ উন্মোচিত হবে। এই প্রকাশ পুরো বিশ্বকে ঐ দৈবিক শক্তির বিষয়ে বিশদ বৃত্তান্ত দেবে, যা এখনও পর্যন্ত আমাদের সকলের কাছে রহস্যময়ী হয়ে আছে। (দৈবিক শক্তির বিষয়ে বিশদ বৃত্তান্ত যা সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ দ্বারা বলা হয়েছে, কৃপা করে পড়ুন, এই পুস্তকের 21 নং পৃষ্ঠায়, সৃষ্টি রচনা)। একজন দিব্য মহাপুরুষ দ্বারা এই প্রকাশ পুরো বিশ্ব তে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি সবাইকে সত্য মার্গের পথে চলার প্রেরণা দেবেন। সমস্ত জগতে এক নতুন চিন্তাধারার জ্যোতি ছড়িয়ে যাবে। যখন আমি ধ্যানমগ্ন হই তখন প্রায়ই ঐ দিব্য মহাপুরুষকে দেখতে পাই।"

ফ্লোরেন্স বারবার ঐ সন্ত বা মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে এটাও বলেছেন যে, ভারতবর্ষের উত্তর দিকের এক পবিত্র স্থানে উনি উপস্থিত রয়েছেন।

হে সাধুসজ্জন ব্যক্তিগণ! উপরোক্ত ভবিষৎ বাণী এবং অন্যান্য আরো যেসব বর্তমান বাণী রয়েছে, সেগুলো পরম সন্ত রামপাল জী মহারাজ জীর সঙ্গে সঠিকভাবে মানানসই হয়ে যায়। এবং অন্য ভবিষ্যৎ বাণী গুলিও, আগে যেগুলো লেখা হয়েছে এটারই সমর্থন করে।

"ভাইবালে ওয়ালী জনম সাখীতে প্রমাণ"

"একজনমহাপুরুষেরবিষয়েভাইবালেওয়ালীজনমসাখীতেপ্রহ্লাদভক্তেরভবিষ্যৎবাণী"

ভাইবালে ওয়ালী জনম সাখীতে লেখা বিবরণ এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজই হলেন সেই অবতার যিনি পরমেশ্বর কবীরজী এবং সন্ত নানকজীর পরে পাঞ্জাবের মাটিতে অবতীর্ণ হওয়ার ছিলেন। সন্ত রামপাল দাস মহারাজ ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে ১৯৫১ সালের ৮-ই সেপ্টেম্বর হরিয়াণা রাজ্যে (ঐ সময়ের পাঞ্জাব রাজ্যে) সোনীপত জেলার ধনানা গ্রামে শ্রী নন্দরাম জাটের

পরিবারে জাট বর্ণে শ্রীমতী ইন্দ্রা দেবীর গর্ভে জন্ম নেন।

এই বিষয়ে 'জন্ম সাখী ভাইবালে ওয়ালী' জন্ম সাখী হিন্দি সংস্করণে, যেটার প্রকাশক হলেন ভাই জওহর সিং, কৃপাল সিং এন্ড কোম্পানি পুস্তক ওয়ালে, বাজার মাই সেবা, অমৃতসর, (পাঞ্জাব) এবং পাঞ্জাবী সংস্করণের প্রকাশক ভাই জওহর সিং কৃপাল সিং এন্ড কোম্পানি পুস্তক ওয়ালে , গলি ৮ বাগ রামানন্দ অমৃতসর (পাঞ্জাব)।

এতে লেখা অমর লেখনীতে এইরকম লেখা আছে যে :-

এক সময় ভাইবালা এবং মরদানাকে সাথে নিয়ে সদগুরু নানক দেব ভক্ত প্রহ্লাদের লোকে গেলেন, যেটা পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ ক্রোশ দূরে অন্তরীক্ষে অবস্থিত রয়েছে। প্রহ্লাদ বললেন, হে নানক দেব! আপনাকে পরমাত্মা দিব্য দৃষ্টি দিয়েছেন, এবং কলিযুগের বড়ো ভক্ত বানিয়েছেন, কলিযুগে আপনার অনেক মহিমা হবে। এখানে (প্রহ্লাদের লোকে) প্রথমে কবীর দেব এসেছিলেন, আপনি আজ এলেন, আরো একজন আসবেন, যিনি আপনাদের দুজনের মতোই মহাপুরুষ হবেন। এই তিন জন ছাড়া এখানে আমার লোকে কেউ আসতে পারে না। অতীতে অনেক ভক্ত হয়ে গিয়েছেন, আর পরেও অনেক হবেন, কিন্তু এখানে আমার লোকে, কেবল তিনিই পৌঁছাতে পারেন, যিনি এনাদের মতোই মহিমান্বিত হবেন, আর অন্য কেউ না। এই জন্য এই তিন জন ছাড়া আর কেউ এখানে আসতে পারবেন না। মরদানা জিজ্ঞ্যেস করলো, হে প্রহ্লাদ ! কবীর দেব জোলা ছিলেন, নানকদেব ক্ষত্রিয়। সেই তৃতীয় জন মহাপুরুষ কোন বর্ণের (জাতির) হবেন এবং কোন ক্ষেত্রে অবতরণ করবেন?

প্রহ্লাদ ভক্ত বললেন ভাই শোনো :-

নানক দেবের সচখন্ড যাওয়ার শত শত বৎসর পর পাঞ্জাবের মাটিতে জাট বর্ণে তিনি জন্ম নেবেন এবং তাঁর প্রচার ক্ষেত্র শহর বারবালা হবে। (লেখনী সমাপ্ত)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- সন্ত রামপাল দাস মহারাজ হলেন সেই অবতার যাঁর উপর অন্য প্রমাণগুলির সাথে সাথে জনম সাখী তে লেখা বর্ণনাও যথাযোগ্য ভাবে মানানসই হয়ে যায়। জনম সাখীর বর্ণনাতে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার সময় একশো সাল পরে লেখা হয়েছে। ওখানে শত শত বৎসর পরে বলা হয়েছিল, যেটাকে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখার সময় শত বৎসরই লিখে দিয়েছে। কেননা মর্দানা জিজ্ঞাসা করেছিল উনি কোন যুগের কাছাকাছি আসবেন? তখন ভক্ত প্রহ্লাদ বলেছিলেন যে শ্রী নানক দেবের শত শত বৎসর পর কলিযুগেই ঐ সন্ত জাট বর্ণে তিনি জন্ম নেবেন। এইজন্য এখানে শত বৎসরের জায়গায় শত শত বৎসর বলাটাই উচিৎ হয় এবং প্রচার ক্ষেত্র বরবালার জায়গায় বটালা লেখা হয়েছে। এর দুটো কারণ হতে পারে যে, একটি তো হিসার জেলার শহর বরবালা নামকরা ছিল না, এবং পাঞ্জাবের বটালা শহর নামকরা ছিল, লেখক এই কারণে বরবালার জায়গায় বটালা লিখে দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে প্রিন্ট করার সময় বরবালার জায়গায় বটালা প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে।

আরো একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হল, পাঞ্জাবের বটালা শহরে কোন জাট সন্ত হননি, যিনি এই মহাপুরুষদের (পরমেশ্বর কবীর দেব জী, শ্রী নানকদেব) সমান মহিমা যুক্ত এবং এনাদের সমান জ্ঞানী হয়েছিলেন। এই আধারে এবং অন্য প্রমাণের আধারে আর জনম সাখীর আধারে স্পষ্ট হয় যে ঐ তৃতীয় মহাপুরুষ হলেন সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ, এবং এনার আধ্যাত্মিক জ্ঞানও ঐ মহাপুরুষদের (পরমেশ্বর কবীরদেবের এবং শ্রী নানক দেবের) জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি যুক্ত। আপনারা দুটো ফটোকপি দেখবেন যেটা জনম সাখী ভাইবালে ওয়ালী, একটা পাঞ্জাবী ভাষাতে এবং অন্যটা হিন্দি ভাষাতে রয়েছে, যেটা পাঞ্জাবী ভাষা থেকেই অনুবাদিত। কিন্তু ওটাতে কিছুটা পর্ব ঠিক করে

লেখা নাই। যেমন পাঞ্জাবী ভাষাতে লেখা আছে যে, “জো ইস জীহা কোঈ হোবেগা তাঁ এথে পহুঁচেগা হোর দা এথে পহুঁচণ দা কম নহী” কিন্তু এটার হিন্দি সংস্করণে, এই বিবরণটা নাই, যেটা অনেক মহত্ত্বপূর্ণ, এর থেকে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, লেখার সময় কিছু লেখা বদলে যায়। তবুও এই পুস্তকে অন্য মহাপুরুষদের দ্বারা সন্ত রামপাল দাস জীর বিষয়ে ঢের ঢের প্রমাণ বলা হয়েছে, সেগুলোও এটাই প্রমাণিত করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- যদি কেউ এটা বলে যে জনম সাখীতে লেখা ব্যাখ্যা গ্রাম ছুড়ানী নিবাসী সন্ত গরীব দাস মহারাজের জন্য, কেননা উনিও জাট জাতিতে ছিলেন তথা ছুড়ানী গ্রামও আগে পাঞ্জাব প্রান্তের মধ্যেই ছিল। এটাও উচিত মনে হয় না, কেননা সন্ত গরীবদাস জী নিজের অসুর নিকন্দন রমৈনী তে বলেছেন, “সদগুরু দিল্লী মণ্ডল আইসী সুতী ধরণী সুম জাগায়সি “ভাবার্থ হল এটা যে সন্ত গরীব দাস মহারাজের সদগুরু পূজনীয় কবীর দেব ছিলেন। পুরাতন রোহতক জেলা (আগে সোনীপত, রোহতক এবং ঝজ্জরকে নিয়ে একটাই জেলা রোহতক ছিল) দিল্লী মন্ডলের অন্তর্গত ছিল। এটা কোন রাজার অধীনে পড়তো না। ব্রিটিশ শাসন কালে এটা দিল্লির অধীনেই ছিল। সন্ত গরীব দাস মহারাজ এটা স্পষ্ট করেছেন সদগুরু (পরমেশ্বর কবীর দেব) দিল্লী মণ্ডলে আসবেন, ভক্তিহীন প্রাণীদের জাগাবেন, সত্য ভক্তি করাবেন।

(মনে রাখবেন কবীর সাগরে কালের দূতেরা সত্য না জেনে, নিজেদের কলা কৌশল দ্বারা ভুলভাল কথা মিশিয়ে দিয়ে, মিথ্যা প্রমাণ দিয়েছেন। এটা নাশ করার জন্য পরমেশ্বর কবীর দেব নিজের অংশ অবতার সন্ত গরীব দাসের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান প্রচার করিয়েছেন। যেগুলো সন্ত গরীবদাস মহারাজের অমৃতবাণী রূপে রয়েছে। এই কথাটার সমর্থন কবীর সাগরের সম্পাদক কবীর পন্থী শ্রী যুগলা নন্দ বিহারীর এই টিপ্পনী থেকে হয়ে যায়, যেটা উনি অনুরাগ সাগর তথা জ্ঞান সাগরের ভূমিকাতে বলেছেন যে কবীর পন্থীরাই কবীর পন্থের গ্রন্থকে নাশ করে রেখেছে। আপন আপন মত অনুযায়ী ফের-বদল করে নিজেদের মতগুলো জুড়ে দিয়েছে। আমার কাছে অনুরাগ সাগর তথা জ্ঞান সাগরের অনেকগুলি প্রতিলিপি রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে একটার সঙ্গে অন্যটা মিল খায় না।)

সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ ১৯৫১ সালের ৮-ই সেপ্টেম্বর হরিয়াণা রাজ্যে সোনীপত জেলার (ঐ সময় ওটা রোহতক জেলা ছিল) ধনানা গ্রামে শ্রী নন্দরাম জাটের পরিবারে জন্ম নেন। বর্তমানের হরিয়াণা রাজ্য এবং বর্তমানের পাঞ্জাব রাজ্য মিলিয়ে ঐ সময়ে একটাই পাঞ্জাব রাজ্য ছিল। পরমেশ্বর কবীর দেবও বলেছিলেন, যে সময় কলিযুগের ৫৫০০ বৎসর ব্যতীত হয়ে যাবে, তখন আমি গরীব দাসের দ্বাদশ পন্থে স্বয়ং আসবো। সন্ত গরীব দাস দ্বারা আমার (কবীর পরমেশ্বরের) মহিমার বাণী প্রকট হবে। গরীব দাসের দ্বাদশ পন্থের সাধকগণ আমাকেই আধার বানিয়ে বাণী গুলো বোঝবার চেষ্টা করবে, কিন্তু বাণী গুলো বুঝতে না পারায় আর সতনাম এবং সারনাম না পাওয়ার ফলে অসংখ্য জন্ম পর্যন্ত সতলোক প্রাপ্তি করতে পারবে না। ঐ দ্বাদশ পন্থের মধ্যে (গরীব দাসের পন্থে) আমিই (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং সতলোক থেকে এখানে আগমন করবো। তখন সন্ত গরীব দাস দ্বারা প্রকট করা বাণীগুলিকে আমি (কবীর পরমেশ্বর) প্রকট হয়ে বোঝাবো। এর থেকে প্রমাণিত হয়ে গেলো জনম সাখীতে যে জাট সন্তের বিষয়ে বলা হয়েছে, উনিই হলেন অবিসংবাদিত রূপে সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ। তবুও আমরা সন্ত গরীব দাস মহারাজ কে বিশেষ আদর সম্মান করি, কেননা উনি পরমেশ্বর কবীর দেবের অমর বার্তা শুনিয়েছেন।

যদি কেউ বিভ্রম তৈরী করে যে, দশ জন গুরুসাহেবদের মধ্যেই কারোর বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখানে মনে রাখবেন, দশজন শিখ গুরুসাহেবদের মধ্যে কেউই

জাট বর্ণের ছিলেন না। দ্বিতীয় শিখ গুরু শ্রী অঙ্গদ দেব ক্ষত্রিয় ছিলেন, তৃতীয় গুরু শ্রী অমর দাস ক্ষত্রিয় ছিলেন। চতুর্থ গুরু শ্রী রামদাস ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পঞ্চম গুরু শ্রী অর্জুন দেব থেকে দশম বা অন্তিম গুরু শ্রী গোবিন্দ সিং জী পর্যন্ত শ্রী গুরু রামদাস জীর সন্তানও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তবুও আমরা সব শিখ গুরু সাহেবদের বিশেষ আদর করি।

সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ বলেন,

জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের ভাই। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই পৃথক কোন ধর্ম নাই॥

পরমেশ্বর কবীর দেব বলেছেন:-

জাতি না পুছো সন্ত কি, পুছ লিজিয়ে জ্ঞান। মোল করো তলবার কা, পড়ী রহন দো ম্যান॥

প্রমাণের জন্য কৃপা করে দেখুন "**ভাইবালা ওয়ালী জনম সাখী**" পাঞ্জাবী গুরুমুখী সংস্করণ (পাঞ্জাবী ভাষা) এবং হিন্দি সংস্করণের ফটোকপি, দুটোতেই আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন যে প্রকৃত সত্যটা কি। জনম সাখী দুটোর প্রকাশক হল ভাই জওহর সিং কৃপাল সিং, অমৃতসর।

কৃপা করে দেখুন পাঞ্জাবী ভাষায় "ভাইবালে ওয়ালী জনম সাখী" পৃষ্ঠা 272 এর ফটোকপি দেখুন :-

(੨੭੨) ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ

ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ॥੪॥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕਹਿਆ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵਡਾ ਭਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸੰਜੋਗ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵਡੀ ਨਦਰ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਅਗੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਏਥੇ ਆਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਕੋ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਵਡੇ ਭਗਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਡਾ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵਡੀ ਨਦਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਏਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਲੈ ਹੋਰ ਭੀ ਆਵਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਵਸੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਹਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇ ਭਗਤ ਹੋ ਅਗਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿ ਜੁਗ ਥੀਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹਿਆ ਸੁਣ ਭਾਈ ਇਸ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੋਰਸ ਦਾ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੰਮ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹੈਨ ਅਤੇ ਹੋਵਨਗੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁਛਿਆ ਜੀ ਓਹ ਕਦ ਹੋਸੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਹੋਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕਹਿਆ ਸੁਣ ਭਾਈ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਟ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਸਚਖੰਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਸੀ ਅਤੇ ਏਹਨਾਂ ਤਿਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁਛਿਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਕੇਹੜੇ ਹੈਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕਹਿਆ ਭਾਈ ਅਗੇ ਕਬੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ

কৃপা করে পাঞ্জাবী ভাষায় "ভাইবালে ওয়ালী জনম সাখী" পৃষ্ঠা 273 এর ফটোকপি দেখুন:-

ਸਾਖੀ ਇਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚਲੀ (੨੭੩)

ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੂਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁਛਿਆ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋਯਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਖਤਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਸੀ ਕੇਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਨ ਜਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਟਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਗੁਰੂ

কৃপা করে দেখুন পুস্তক "ভাইবালে ওয়ালী গুরু নানক জীর জনম সাখী" (হিন্দি ভাষা) এর অধ্যায় "কাগ ভুশুন্ডি কী সাখী"র পৃষ্ঠা 306-307 এর ফটোকপি :-

जन्म साखी (३०५) भाई बाले वाली

तब भक्त प्रहलाद् ने कहा–हे नानक देव ! आप को इस कलियुग में बड़ा भक्त बनाया है। आप की ही संगति से अनेको प्राणियों का भला होगा । और आप का अनंत प्रताप होगा । तब मरदाने ने कहा–हे प्रहलाद जी ! आप भी तो परम भक्त हैं तथा भगवान ने आप के लिये ही अवतार धारन किया था। प्रहलाद जी ने कहा–हे भाई मरदाना ! इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है, और या यह गुरू नानक आया है। यहां आना कोई सुगम कार्य नहीं है । एक और महा पुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। मरदाने ने कहा–हे भक्त वर ! वह पुरुष कौन और कब होगा । प्रहलाद ने उत्तर दिया, कि जब गुरू नानक देव यहां आयेंगे तो इन के सौ वर्ष पश्चात आयेगा। अर्थात यहां केवल तीन आदमी ही आने हैं । एक तो भक्त कबीर और दूसरे श्री गुरू नानक देव जी इन के पश्चात वह तीसरा आयेगा। तब मर्दाने ने कहा हे प्रहलाद जी ! कबीर तो जुलाहा था, और नानक देव–क्षत्री है । परंतु वह तीसरा किस जाती का होगा, उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा–हे मर्दाना ! पंजाब की धरती और वर्ण उस का जाट होगा । तथा नगर बटाला में होगा। उस समय मर्दाना गुरू जी के चर्णों

প্রশ্ন:- একজন সংস্কৃতের বিদ্বান শাস্ত্রী বলেছেন, আপনার গুরু সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ সংস্কৃত পড়েন নি। আপনি বলছেন যে উনি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার যথার্থ অনুবাদ করে ভক্তদের বলেন, এটা কখনোই হতে পারে না।

উত্তর:- সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজের ভক্তরা এর উত্তর দিয়েছেন, শাস্ত্রী মহাশয়! ওনাকেই পরমেশ্বরের অবতার বলা হয়, যিনি ভাষার জ্ঞান না থাকতেও যথার্থ অনুবাদ করে দেন। কারণ পরমেশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ। ওনার পাঠানো অবতারও ঐ একই রকম গুণ যুক্ত হন। ঐ অবতার হলেন সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ। আপনি তো কেবল বেদগুলির আর গীতার অনুবাদ দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন। সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ তো বাইবেল এবং কোরানকেও যথার্থ রূপে বলেছেন। যা খ্রীষ্টান ধর্মের বর্তমান ফাদাররা বা পাদ্রীরা এবং মুসলমান ধর্মের মোল্লারা বা কাজীরাও বুঝতে পারেননি।

❑❑❑

ভক্তির মর্যাদা

"জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের ভাই।
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই পৃথক কোন ধর্ম নাই"

প্রিয় ভক্তগণ!

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে অন্য কোনো ধর্ম বা অন্য সম্প্রদায় ছিল না। না হিন্দু, না মুসলিম, না শিখ আর না তো খ্রীস্টান (ইসাই) ধর্ম ছিল। কেবলমাত্র মানবধর্ম ছিল। সবার একটাই মানবধর্ম ছিল এবং আছে। কিন্তু কলিযুগের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে মতভেদও বেড়ে চলেছে। এর একমাত্র কারণ হল ধার্মিক কুলগুরুরা শাস্ত্রে লেখা সত্য জ্ঞানকে চেপে রেখে গিয়েছেন। সেটা স্বার্থের কারণেই হোক বা বাহ্যিক লোক দেখানো আড়ম্বরের কারণেই হোক। যার পরিণাম স্বরূপ আজ মানবধর্ম চার ধর্ম আর অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর ফলে একে অপরের সঙ্গে মতভেদ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সবার প্রভু/ভগবান/রাম/রব/ গড/খুদা/পরমেশ্বর একজনই। এগুলি ভাষা ভেদে ব্যবহারকারী ভিন্ন নাম। সবাই জানেন যে সবার মালিক এক, তবুও এই আলাদা আলাদা ধর্ম সম্প্রদায় কেন ?

একথা একদম ঠিক যে সবার মালিক/ রাম/ আল্লাহ/ রব/ গড/ খুদা/ পরমেশ্বর একজনই, তাঁর বাস্তবিক নাম কবীর, আর তিনি সতলোকে/ সত্ধামে/ সচ্চখণ্ডে মানব সদৃশ্য স্বরূপে বা আকারে থাকেন। কিন্তু এখন হিন্দুরা তো বলছেন আমাদের রাম বড়, মুসলিমরা বলছেন আমাদের আল্লাহ বড়, খ্রিশ্চানরা বলছে আমাদের ঈসা মসীহ বড় আর শিখরা বলছেন আমাদের গুরু নানক সাহেব বড়। ঠিক যেমন চারটি অবোধ শিশুর একজন বলে এটা আমার বাবা, তো অন্য জন বলে না এটা তোর বাবা নয় আমার পাপা, তখন তৃতীয় শিশুটি বলে, না এটা তো আমার পিতাজী সব্বার থেকে বড় আর চতুর্থটি বলে আরে বুদ্ধু উনি আমার ড্যাডি, তোমাদের নয়। যেখানে ঐ চারজনের বাবা একজনই। ঠিক এই রকম নির্বোধ বালকদের মতো আজকের মানবসমাজ ধর্ম ও ভগবানকে নিয়ে লড়াই করছে।

"কোঈ কহৈ হমারা রাম বড়া হৈ, কোঈ কহৈ খুদাঈ রে।
কোঈ কহে হমারা ইসামসীহ বড়া, য়ে বাটা রহে লগাঈ রে॥ "

আমাদের সমস্ত ধার্মিক শাস্ত্রে এবং গ্রন্থেঐ এক প্রভু/মালিক/রব/খুদা/আল্লাহ/ রাম/ সাহেব/গড/পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ (সরাসরি) নাম লিখে মহিমা (গুন) গান গাওয়া হয়েছে যে, একমাত্র মালিক/প্রভু হলেন কবীর সাহেব, যিনি সতলোকে মানব সদৃশ্য নিজের রূপে সাকারে থাকেন।

বেদ, গীতা, কুরান, বাইবেল ও গুরুগ্রন্থ সাহেব সব গ্রন্থগুলির মধ্যে, একটার সাথে অন্যটার অনেক মিল আছে। যজুর্বেদের ৫ নং অধ্যায়ের ৩২ নং শ্লোকে সামবেদের ১৪০০, ৮২২ নং সংখ্যায়, অর্থববেদের কান্ড নং-৪ এর অনুবাক নং ১ এর শ্লোক নং ৭, ঋগ্বেদ এর মণ্ডল নং ১ এর অধ্যায় নং ১ এর সুক্ত নং ১১ এর শ্লোক নং ৪ এ কবীর নাম লিখে বলা হয়েছে যে, পূর্ণ ব্রহ্ম হলেন কবীর যিনি সতলোকে সাকারে থাকেন। শ্রী গীতা হলো চার বেদের সংক্ষিপ্ত সার, সেই শ্রী গীতাও সত্পুরুষ, পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর-এরদিকে ইঙ্গিত করছে। গীতা অধ্যায় ১৫ এর শ্লোক নং ১৬-১৭ , অধ্যায় ১৮ এর শ্লোক নং ৪৬, ৬১, ৬২, অধ্যায় নং ৮ এর শ্লোক নং ৩, ৮ থেকে ১০ ও ২২, অধ্যায় নং ১৫ এর শ্লোক ১, ২, ৩, ৪-তে ঐ পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করার জন্যই ইঙ্গিত করা

আছে। শ্রী গুরু গ্রন্থসাহেবের পৃষ্ঠা নং-২৪ এবং পৃষ্ঠা নং- ৭২১ এ নাম উল্লেখ করে কবীর সাহেবের গুনগান (মহিমা) করা হয়েছে। কোরান ও বাইবেল একই শাস্ত্র মনে করুন, এই দুই সদ গ্রন্থ প্রায় একই বার্তা দিচ্ছে যে, ঐ কবীর আল্লাহর গুন গান (মহিমা গান) করো, যার শক্তিতে এই সকল সৃষ্টি চলমান। কোরান শরীফে সুরত ফুর্কানি নং-২৫ আয়াত নং-৫২ থেকে ৫৯ এ কবীরন, খবীরা, কবীরু ইত্যাদি শব্দ লিখে ঐ একমাত্র কবীর আল্লাহর পবিত্র গুনগান (মহিমা গান) করা হয়েছে যে,হে! পয়গম্বর (মুহম্মদ) ঐ কবীর আল্লার পবিত্র মহিমা গান করো, যিনি ছয় দিনে নিজের শক্তিতে সমস্ত সৃষ্টির রচনা করে সপ্তম দিনে তখতের (সিংহাসনের) উপর বিরাজমান হয়েছেন অর্থাৎ সতলোকে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। সেই আল্লাহ (প্রভু) হলেন কবীর। এর প্রমাণ বাইবেলের মধ্যে প্রথম দিকেই উৎপত্তি গ্রন্থ (genesis) নামক অংশে সৃষ্টি ক্রমে, সাত দিনের রচনায়, ১:২০-২:৫ তে আছে।

সকল সন্তদের ও গ্রন্থগুলির মূল সার কথা হলো এই যে, পূর্ণ গুরু, যাঁর কাছে তিন নাম আছে এবং নাম দান দেওয়ার অধিকার আছে, সেই গুরুর কাছে নাম উপদেশ নিয়ে জন্ম-মৃত্যু-রূপী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। কেন না আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, নিজেদেরকে কালের জেল (কারাগার) থেকে মুক্ত করে মূল মালিক কর্বিদেবের (কবীর সাহেবের) সতলোককে প্রাপ্ত করানো। কবীরদেব নিজ বাণীতে বলেছেন যে, এক জীবকে কাল সাধনা থেকে মুক্ত করে পূর্ণ গুরুর কাছে এনে সত্ উপদেশ দেওয়ানোয় এতটা পূণ্য হয় যে, কোটি কোটি গরু ছাগল ইত্যাদিকে কসাইয়ের হাত থেকে মুক্ত করালে যতটা পূণ্য হয় ঠিক ততটা পুণ্য হয়। কারণ এই অবোধ মানব শরীরধারী প্রাণীগণ নকল গুরুদের দ্বারা বলা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে, কালের জালে ফেঁসে,না জানি কত কত দুঃখ দায়ক চুরাশী লাখ যোনীতে কষ্ট ভোগ করতে থাকে। যখন ঐ জীবাত্মা পূর্ণ (সদগুরু) গুরুর মাধ্যমে কবির্দেবের (কবীর সাহেবের) শরণে এসে যায়, নামের মাধ্যমে জুড়ে যায় তখন তার জন্ম – মৃত্যুর কষ্ট চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায় আর সতলোকে (অমর লোকে) বাস্তবিক (সত্যিকার) পরম শান্তি প্রাপ্ত করে।

এখন প্রশ্ন উঠে আসে, আজকাল গুরুরা অধিক শিষ্য বানিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়। অর্থাৎ সবাই দুই-চার কথা শিখেনেয় আর বলতে শুরু করে যে আমিও নাম দীক্ষা দিই আর পাঠও করি। আর সাদা সিধে আত্মাদের কালের জালে ফাঁসিয়ে দেয়। কেননা শাস্ত্রের (বিরুদ্ধে) বিপরীত জ্ঞান বলা বা নাম জপ দেওয়া এবং নেওয়া ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে নরকের অধিকারী হবে, আর তাদেরকে নরকে উল্টে ঝোলানো হবে। এই কথা গীতা, বেদ এবং সমস্ত গ্রন্থই বলছে। এই কথা প্রমাণ করার জন্য একটা সংক্ষিপ্ত কথা বর্ণনা করছি।

সেই সময়ের কথা, যখন সবাই জানতে পারল যে রাজা পরীক্ষিতকে সাত দিনের দিন সর্প দংশন করবে আর তার মৃত্যু হবে। এই কথা জানার পরেই সবাই ভাবলো কি, সাত দিন ধরে রাজা পরীক্ষিতকে ভাগবত কথা শোনানো হোক। যাতে তার মন থেকে এখানকার মোহ দূর হয়ে যায়। আর প্রভুর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। কেননা মরার সময় যার যে ভাবনা হয় সে তাকেই প্রাপ্ত করে। সবাই বললো এটা অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এখন ভাগবত কথা শোনাবে কে? এই প্রশ্নের প্রশ্ন বাচক চিহ্ন থেকেই যায়। সেই সময় সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহর্ষিগণ এমনকি শ্রীমদ্ভাগবত সুধা সাগরের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসও নিজেকে কথা শোনানোর যোগ্য মনে করলেন না। কেননা তিনি জানতেন

যে, তার ভিতরে সে সামর্থ্য নেই। তাহলে কেন একটা জীবের জীবন নষ্ট করে পাপের ভাগীদার হবো! কেননা সপ্তম দিনেই পরিণাম উপস্থিত হবে। এই জন্য সাত দিন পর্যন্ত কথা শোনানোর জন্য,ওনার কোনো সাহস হলো না। কারণ সবার নিজের সামর্থ্য জানা আছে। স্বর্গ থেকে সুখদেবকে ভাগবত কথা শোনানোর জন্য ডেকে আনা হলো। আর তারপর রাজা পরীক্ষিতের মোহ এখান থেকে দূর হয়ে স্বর্গ প্রাপ্তি হলো। স্বর্গের সুখ ভোগ করার পর সে পুনরায় নরকে যাবে,তারপর আবার ৮৪ লক্ষ প্রাণীর শরীরে চক্কর কাটবে। এটাই এখানকার হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল অর্থাৎ অটল নিয়ম।এই উপলব্ধি টুকুও তিন লোকের পূর্ণ গুরু ছাড়া প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়।

ঠিক একইভাবে যখন কোন স্থানে প্রধানমন্ত্রীর আসার কথা থাকে তো সেখানে তার আসার আগে দু তিনজন খুব ভালো ভালো বক্তা, গায়ক বা তবলা বাজনাদার হাজির থাকে। যারা খুব সুন্দর মধুর আকর্ষণীয় কথা বা সুর দ্বারা দর্শকদের প্রভাবিত করতে থাকে। কিন্তু তারা যা বলছে তাতে কিন্তু একটা কাজও সম্ভবপর হবে না। কিন্তু যখন প্রধানমন্ত্রী আসেন, তখন সব থেকে কম মাত্রায়, গুটিকয়েক কথায় বলেন যেমন আগ্রাতে ইন্টারন্যাশনাল কলেজ বানিয়ে দাও, ছত্রিশগড়ে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বানিয়ে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। মাত্র এতটুকু বলেই প্রধানমন্ত্রী মহোদয় চলে যান। উনি বলতেই পরের দিন থেকে সেই কাজ শুরু হয়ে যায়। কেননা ওনার কথার মধ্যে শক্তি আছে, আর যদি এই কথা আপনি বা আমার মত সাধারণ ব্যক্তি বলে তাহলে আমাদের মহা মূর্খতা হবে। কেননা আমাদের কথায় এতখানি শক্তি নেই, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

এই তথ্যকে প্রমাণিত করার জন্য নিম্নলিখিত বাণীগুলি অবশ্যই পড়ুন আর গভীর ভাবে বিচার করুন তথা অতি শীঘ্র গুরু মন্ত্র প্রাপ্ত করুন।

কবীর, পন্ডিত ঔর মশালচী, দোনোঁ সূঝেঁ নাহীঁ। ঔরোঁ নে করেঁ চাঁদনা, আপ অন্ধেরে মাহীঁ॥
কবীর, করণী তজ কথনী কথেঁ, অজ্ঞানী দিন রাত। কূকর জ্যো ভৌকত ফিরেঁ, সুনী সুনাঈ বাত॥
গরীব, বীজক কী বাতাঁ কহেঁ, বীজক নাহীঁ হাথ। পৃথিবী ডোবন উতরে, কহৈ কহৈ মীঠী বাত॥
গরীব, বীজক কী বাতাঁ কহেঁ, বীজক নাহীঁ পাস। ঔরোঁ কো প্রমোধে হীঁ, আপন চলে নিরাশ॥
গরীব, কথনী কে শূরে ঘনে, কথেঁ অটম্বর জ্ঞান। বাহর জবাব আবৈ নহীঁ, লীদ করেঁ মৈদান॥

কথা পাঠ করা বা নাম উপদেশ দেওয়া কোন বাচ্চার খেলা নয় যে, কাঁধে পুঁথি-পত্র নিয়ে বলবে চলো আমিও কথা পাঠ করি, চলো আমি রামায়ণ পাঠ করে দিচ্ছি, গীতা পাঠ করে দিচ্ছি, গ্রন্থ সাহেব পাঠ করে দিচ্ছি অর্থাৎ সৎসঙ্গ করে দিচ্ছি। আর নামও দিয়ে দিই ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন পূর্ণ সন্তেরই কেবল অধিকার আছে কথা পাঠ করার এবং উপদেশ দেওয়ার। আর সেই পাঠ সমাপনও কেবল তিনিই করতে পারেন। কেননা পূর্ণ সন্তের বলা শব্দের মধ্যে শক্তি থাকে। যেমন সুখদেবের বলা শব্দের মধ্যে ছিল। যেমন ধরুন কেউ সৎসঙ্গ করছে আর ওখানে আমের মহিমা গান করা হচ্ছে যে, আম খেতে ভীষণ মিষ্টি, ফলের রাজা হল আম, এর রং হলুদ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, আর সেই সময় যদি কেউ এসে বলে ভাই তাহলে আম দাও। আর সেই সৎসঙ্গ করা ব্যক্তি যদি বলেন যে আমার কাছে তো আম নেই, তখন যিনি আম চাইছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, কোথায় পাওয়া যাবে? আর তার জবাবে যদি উত্তর মেলে যে জানিনা, আম তো নিরাকার ওকে কি কখনো চোখে দেখা যায়! তখন সেই ব্যক্তি যিনি আম চাইছিলেন বলবেন আরে মূর্খ! যখন তোর কাছে আম নেই, আর না

তোর কাছে খবর আছে যে আম কোথায় পাওয়া যাবে, আবার এদিকে বলছিস যে আম তো নিরাকার, তাহলে বৃথা এত গলা ফাটিয়ে বেড়াবার দরকার কি? এই কথাটা বলবার মানে হলো যে, তত্ত্ব জ্ঞানহীন এবং অধিকারী বিনা কথা পাঠ করা ব্যক্তিগণ এবং তাদের মুখ থেকে শোনা ব্যক্তিগণ নরকের ভাগী হয়।

যদি কোন ব্যক্তি নিজে নিজেই গুরু সেজে শিষ্য বানাতে থাকে তাহলে বুঝে নিন যে সে নিজের মাথায় অন্যের বোঝা চাপিয়ে নেয়। কেননা পরমেশ্বরের নিয়ম আছে যে, যতদিন না শিষ্য পার হবে ততদিন গুরুকে বারবার জন্ম নিতে হবে। পূর্ণ গুরু অসমর্থ্য শিষ্যের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এমন লীলা করেন যাতে অজ্ঞানী শিষ্যরা গুরু কে ঘৃণা করতে শুরু করে। যেমন কবীর সাহেব যখন কাশীতে প্রকট হয়েছিলেন ঐ সময় কবীর সাহেবের ৬৪ লক্ষ শিষ্য হয়ে গিয়েছিল। তাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কবীর সাহেব কাশী শহরের এক প্রসিদ্ধ বেশ্যাকে সৎসঙ্গের জ্ঞান বুঝিয়ে তার ঘরে যাতায়াত শুরু করেন। যা দেখে এবং শুনে চেলাদের/শিষ্যদের মনে গুরুর প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর সবার নিজের গুরুর প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র দুজন বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত শিষ্যরা গুরু হীন হয়ে গিয়েছিল।

সদগুরু গরীবদাস জী মহারাজের বাণীতে তার প্রমাণ রয়েছে:-

গরীব, চন্ডালী কে চৌঁক মেঁ, সতগুরু বৈঠে জায়।
চৌসঠ লাখ গারত গয়ে, দো রহে সতগুরু পায়॥
ভড়বা ভড়বা সব কহেঁ, জানত নাহিঁ খোজ।
দাস গরীব কবীর করম সে, বাটত সির কা বোঝ॥

আমি আপনাদের কাছে এটাই প্রার্থণা করতে চাইছি যে, ভালোভাবে বিচার করে তবেই কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন।

সামবেদের শ্লোক নম্বর ৮২২ তে বলা হয়েছে যে, জীবের মুক্তি তিন নামে হবে, প্রথম হলো ওম্ মন্ত্র। দ্বিতীয় সতনাম মানে (তত্) আর তৃতীয় হল সারনাম মানে (সত্)।পবিত্র গীতাও এটাই প্রমাণ করছে যে :-ওম্-তত্-সত্ আর শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেবেও এই সতনাম জপ করার ইঙ্গিত/ইশারা করা রয়েছে। সতনাম-সতনাম এইরকম এটা জপ করার নাম নয়। এটা তো ঐ নামের দিকে ইশারা/ইঙ্গিত করছে যেটা একটা সত্য নাম। ঠিক একইভাবে সার নাম রয়েছে। একা ওম্ মন্ত্র কোন কাজে আসবে না। এই তিন নাম এবং এই নাম দেওয়ার আদেশ আমাকে আমার গুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দ জী মহারাজ বকশিশ দিয়েছেন, যা কবীর সাহেব থেকে শুরু করে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। প্রথমে আপনি সৎসঙ্গ শুনুন, সেবা করুন যাতে আপনার ভক্তিরূপী জমি উর্বর হবে।

কবীর, মানুষ জন্ম পায় কর, নহীঁ রটেঁ হরি নাম।
জৈসে কুআঁ জল বিনা, খুদবায়া কিস কাম॥
কবীর, এক হরি কে নাম বিনা, য়ে রাজা ঋষভ হো।
মাটি ঢোবৈ কুম্হার কী, ঘাস ন ডালে কোয় ॥

এরপর নিজের উর্বর জমিতে বীজ বুনতে হবে। শাস্ত্রগুলি (কবীর সাহেবের বাণী, বেদ, গীতা, পুরাণ, কুরান, ধর্মদাস সাহেব এবং অন্যান্য সন্তদের বাণী) অধ্যায়ন করলেই মুক্তি হবে না। এই সমস্ত শাস্ত্রের একটাই সার কথা রয়েছে যে, পূর্ণ মুক্তির জন্য কবীর সাহেবের প্রতিনিধি সন্ত (যিনি নিজের গুরুর কাছে থেকে নাম দীক্ষা প্রদান

করার আদেশ পেয়েছেন) তাঁর কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে আত্মকল্যাণ করাতে হবে। যদি নাম দীক্ষা না গ্রহণ করো তাহলে :-

নাম বিনা সূনা নগর, পড়য়া সকল মেঁ শোর।
লূট ন লূটী বন্দগী, হো গয়া হংসা ভোর॥
অদলী আরতী অদল অজূনী, নাম বিনা হৈ কায়া সূনী।
ঝূঠী কায়া খাল লুহারা, ইঙ্গলা পিঙ্গলা সুষমন দ্বারা॥
কৃতঘ্নী ভূলে নর লোঈ, জা ঘট নিশ্চয় নাম ন হোঈ।
সো নর কীট পতঙ্গ ভূজঙ্গা, চৌরাসী মেঁ ধর হৈ অংগা।

যদি বীজ না বপন করো তাহলে এই আত্মা রূপী জমিতে হাল চালিয়ে উর্বর করা অর্থাৎ তৈরি করা বৃথা গেল। কথাটা বলার অভিপ্রায় হলো এই যে, এর থেকে আপনার আবশ্যকীয় জ্ঞান হয়ে যাবে কিন্তু পূর্ণ গুরুর কাছ থেকে নাম উপদেশ নেওয়া অর্থাৎ বীজ বোনা অতি আবশ্যক। আর নামও সেই নাম হবে যেটা গুরু নানক সাহেব জপ করতেন, গরীব দাস সাহেব জপ করতেন, ধর্মদাস সাহেব ইত্যাদি সন্তগণ জপ করতেন। এটা ছাড়া যে অন্য নাম রয়েছে তাতে জীবের মুক্তি হবে না। আপনাদের সকলের উচিত নাম উপদেশ নিয়ে নিজের ভক্তি রূপী ধন সংগ্রহ শুরু করা, আর অন্য সবাইকেও সেই কথা জানানো উচিত। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ততো তাড়াতাড়ি এই কাজ করা উচিত। কেন না, আমাদের জানা নেই কখন কার এই শরীরের সময় পূর্ণ হয়ে যাবে। গুরু নানক দেবও বলতেন যে :-

না জানে য়ে কাল কী কর ডারৈ, কিস বিধি ঢল জা পাসা বে।
জিন্হাদে সির তে মৌত খুড়গদী, উনহানূঁ কেড়া হাঁসা বে॥

কবীর সাহেবজী বলেন :-

কবীর, শ্বাস-উশ্বাস মেঁ নাম জপো, ব্যর্থা শ্বাস মত খোয়।
না জানে ইস শ্বাস কা, আবন হো কে না হোয়॥
সতগুরু সোঈ জো সারনাম দৃড়াবৈ, ঔর গুরু কোঈ কাম ন আবৈ।
“সারনাম বিন পুরুষ (ভগবান) দ্রোহী”

অর্থাৎ যে গুরু সার নাম এবং সার শব্দ প্রদান করেন না বা উনি ওনার গুরুর কাছ থেকে নাম দেওয়ার অধিকার (আদেশ) পাননি অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যদি কেউ নিজের মনের ইচ্ছায় গুরু হয়ে যান বা নাম দিতে শুরু করে দেন তাহলে সেই গুরু আর ওনার শিষ্যরা নরকে পতিত হন। ঐ গুরু ভগবানের শত্রু, বিদ্রোহী। তাকে ভগবানের দরবারে উল্টে ঝোলানো হবে। যখন ভক্ত সমাজে নকল গুরুদের (সন্তদের) দ্বারা এক ভুল ধারণা প্রচারিত হয়ে থাকে যে, একবার গুরু ধারণ করার পর দ্বিতীয়বার গুরু বদল করা উচিত নয়। তখন একটু ভেবে দেখুন যে, গুরু হলেন আমাদের জন্ম মৃত্যু রূপী ভয়ংকর রোগ নাশ করার ডাক্তার। যদি একজন ডাক্তারের কাছে আমাদের রোগ ভালো না হয় তাহলে আমরা অন্য ভালো ডাক্তারের কাছে যাব, যার কাছে আমাদের এই জীবন ধ্বংসকারী রোগ ঠিক হতে পারে। যেমন ধর্মদাস সাহেবের প্রথম গুরু ছিলেন রূপ দাস। কিন্তু যখন ধর্মদাস জানতে পারলেন যে এই গুরু পূর্ণ মুক্তিদাতা নন তখন অতি শীঘ্র সেই গুরু ত্যাগ করে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর সতপুরুষ কবীর সাহেবকে নিজেরগুরু বানালেন আর পূর্ণ মোক্ষ সত্যলোক প্রাপ্ত করলেন। ঠিক এইভাবে অসমর্থ্য গুরুকে অতি শীঘ্র ত্যাগ করে দেওয়া উচিত।

‘ঝূঠে গুরু কে পক্ষ কো, তজত ন কীজৈ বারি’

॥ গুরু এবং নামের (জপের) মহিমার বাণী ॥

গরীব, বিন উপদেশ অচম্ভ হৈ, ক্যোঁ জীবত হৈঁ প্রাণ।
বিন ভক্তি কহাঁ ঠৌর হৈ, নর নাহীঁ পাষাণ ॥ ১ ॥
গরীব, এক হরি কে নাম বিনা, নারী কুতিয়া হোয়।
গলী-গলী ভৌঁকত ফিরে, টুক না ডালে কোয় ॥ ২ ॥
গরীব, বিবি পড়দে রহৈঁ থী, ডয়োটী লগতী বার।
গাত উধাড়ে ফিরতী হৈঁ, বন কুতিয়া বাজার ॥ ৩
গরীব, নকবেসর নক সে বনী, পহরত হার হমেল।
সুন্দরী সে সুনহী (কুতিয়া) বনী, সুন সাহেবকে খেল ॥ ৪ ॥
কবীর, হরি কে নাম বিনা, রাজা ঋষভ হোয়।
মাটী লদৈ কুমহার কৈ, ঘাস না ডালে কোয় ॥ ৫ ॥
কবীর, রাম কৃষ্ণ সে কোন বড়া, উন্হোঁ ভী গুরু কীন্হ।
তীন লোক কে বে ধনী, গুরু আগে আধীন ॥ ৬ ॥
কবীর, গর্ভ যোগেশ্বর গুরু বিনা, লাগা হরি কী সেব।
কহৈ কবীর স্বর্গ সে, ফের দিয়া সুখদেব ॥ ৭ ॥
কবীর, রাজা জনক সে নাম লে, কিন্হী হরি কী সেব (পূজা)।
কহৈ কবীর বৈকুন্ঠ মেঁ, উল্ট মিলে সুখদেব ॥ ৮ ॥
কবীর,সতগুরু কে উপদেশ কা, লায়া এক বিচার।
জৈ সদগুরু মিলতে নহীঁ, জাতা নরক দ্বার ॥ ৯ ॥
কবীর, নরক দ্বার মেঁ দূত সব, করতে খৈঁচাতান।
উনতেঁ কবহূ না ছূটতা, ফির ফিরতা চারোঁ খান ॥ ১০ ॥
কবীর, চার খানী মেঁ ভ্রমতা, কবহূ না লাগতা পার।
সো ফেরা সব মিট গয়া, সতগুরু কে উপকার ॥ ১১ ॥
কবীর, সাত সমুদ্র মসি করুঁ, লেখনী করুঁ বনরায়।
ধরতী কা কাগজ করুঁ, গুরু গুন লিখা ন জায় ॥ ১২ ॥
কবীর,গুরু বড়ে গোবিন্দ সে, মন মেঁ দেখ বিচার।
হরি সুমরে সো রহ গয়ে, গুরু ভজে হুয়ে পার ॥ ১৩ ॥
কবীর, গুরু গোবিন্দ দোঊঁ খড়ে, কাকে লাগূঁ পায়।
বলিহারী গুরু আপনে, জিন গোবিন্দ দিয়া মিলায় ॥ ১৪ ॥
কবীর, হরি কে রূঠতাঁ, গুরু কী শরণ মেঁ জায়।
কবীর গুরু জৈ রুঠ জাঁ, হসরি নহীঁ হোতে সহায় ॥ ১৫ ॥

কোন রামের নাম জপ করতে হবে?

শ্রী গীতার অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১৬ :-

দ্বৌ,ইমৌ,পুরুষৌ,লোকে,ক্ষরঃচ,অক্ষরঃএব,চ,ক্ষরঃ,সর্বাণি,ভূতানিকূটস্থঃ,অক্ষরঃ,উচ্যতে॥

অনুবাদ :- এই সংসারে দুই প্রকারের ভগবান আছেন, একজন নাশবান আর একজন অবিনাশী, সম্পূর্ণ ভূত/প্রাণীর শরীর তো নশ্বর আর জীবাত্মাকে অবিনশ্বর বলা হয়।

শ্রী গীতার অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১৭ :-

উতমঃ,পুরুষঃ,তু,অন্যঃপরমাত্মা,ইতি,উদাহৃতঃ,য়ঃ,লোকত্রয়ম,আবিশ্য,বিভর্তি,অব্যয়ঃ,ঈশ্বরঃ।

অনুবাদ :- উত্তম ভগবান তো অন্য কেউ আছেন, যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ-পোষণ করেন এবং তিনি অবিনাশী পরমেশ্বর পরমাত্মা এই রকমই বলা হয়েছে।

কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হৈ, নিরঞ্জন বাকী ডার।
ত্রিদেবা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) শাখা ভয়ে, পাত ভয়া সংসার॥
কবীর, তীন দেব কো সব কোঈ ধ্যাবৈ, চৌথা দেব কা মর্ম ন পাবৈ।
চৌথা ছাড় পঞ্চম ধ্যাবৈ, কহৈ কবীর সো হমরে আবৈ॥
কবীর, গুণ তীন গুণন কী ভক্তি মেঁ, ভুল পড়য়া সংসার।
কহৈ কবীর নিজ নাম বিন, কৈসে উতরৈ পার॥
কহে কবীর, ওঙ্কার নাম ব্রহ্ম (কাল) কা, য়হ কর্তা মত জান।
সাচা শব্দ কবীর কা, পরদা মাহীঁ পহচান॥
কবীর, তীন লোক সব রাম জপত হৈ, জান মুক্তি কো ধাম।
রামচন্দ্র বশিষ্ঠ গুরু কিয়া, তিন কহি সুনায়ো নাম॥
কবীর, রাম কৃষ্ণ অবতার হৈ, ইনকা নাহীঁ সংসার।
জিন সাহব সংসার কিয়া, সো কিনহুঁ ন জন্ম্যাঁ নারি॥
কবীর, চার ভূজাকে ভজন মেঁ, ভূল পড়ে সব সন্ত।
কবীরা সুমিরৈ তাসু কো, জাকৈ ভুজা অনন্ত॥
কবীর, বশিষ্ঠ মুনি সে তত্ত্বেতা জ্ঞানী, শোধ কর লগ্ন ধরৈ।
সীতা হরণ মরণ দশরথ কা, বন বন রাম ফিরৈ॥
কবীর, সমুদ্র পাটি লঙ্কা গয়ে, সীতা কো ভরতার।
তাহি অগস্ত মুনি পীয়ে গয়ো, ইনমেঁ কৌন করতার॥
কবীর, গোবর্ধন কৃষ্ণ জী উঠায়া, দ্রোণাগিরি হনুমন্ত।
শেষ নাগ সব সৃষ্টি উঠাঈ, ইনমেঁ কৌন ভগবন্ত॥
গরীব, দুর্বাসা কোপে তহাঁ, সমঝ না আঈ নীচ।
ছপ্পন কোটি যাদব কটে, মচী রুধির কী কীচ॥
কবীর, কাটে বন্ধন বিপত্তি মেঁ, কঠিন কিয়া সংগ্রাম।
চীন্হোঁ রে নর প্রাণীয়াঁ, গরুড় বড়ো কে রাম॥
কবীর, কহ কবীর চিত চেতহূ শব্দ করৌ নিরুবার।
শ্রী রামচন্দ্র কো কর্তা কহত হৈঁ, ভূলি পরয়ো সংসার॥
কবীর, জিন রাম কৃষ্ণ নিরঞ্জন কিয়া, সো তো করতা ন্যার।
অন্ধা জ্ঞান ন বুঝঈ, কহৈ কবীর বিচার॥
কবীর, তীন গুণন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) কী ভক্তি মেঁ, ভূল পড়য়ো সংসার।
হৈ কবীর নিজ নাম বিনা, কৈসে উতরো পার॥

॥ শব্দ॥ (সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ দ্বারা রচিত)

যুদ্ধ জীত কর পাণ্ডব, খুশী হুয়ে অপার। ইন্দ্র প্রস্থ কী গদ্দীপর, যুধিষ্ঠির কী সরকার॥ ১॥
এক দিন অর্জুন পুছতা, সুন কৃষ্ণ ভগবান। একবার ফির সুনা দিয়ো, বো নির্মল গীতা জ্ঞান॥ ২॥
ঘমাশানযুদ্ধকেকারণ,ভূলপড়িহৈমোহে।জ্যোঁকাত্যোঁকহনাভগবান,তনিকনঅন্তরহোয়ে॥৩॥
ঋষিমুনিঔরদেবতা,সবকোরহেতুমখায়।ইনকোভীনহরীছোড়াআপনে,রহেতুম্হারাহীগুনগায়॥৪॥

কৃষ্ণ বলে অর্জুন সে, য়হ গলতী ক্যোঁ কীন্হ। ঐসে নির্মল জ্ঞান কো, ভূল গয়া বুদ্ধিহীন॥ ৫॥
অব মুঝে ভী কুছ য়্যাদ নহীঁ, ভূল পড়ি নিদান।
জ্যোঁ কা ত্যোঁ গীতা কা, মৈঁ নহীঁ কর সকতা গুণগান॥ ৬॥
স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ কো য়্যাদ নহীঁ ঔর অর্জুনকো ধমকাবে।
বুদ্ধিকাল কে হাত হৈ, চাহে ত্রিলোকী নাথ কহলাবে॥ ৭॥
জ্ঞানহীন প্রচার কা, জ্ঞান কথেঁ দিন রাত। জো সর্বকো খানে বালা, কহেঁ উসী কী বাত॥ ৮॥
সব কহেঁ ভগবান কৃপালু হৈ, কৃপা করেঁ দয়াল। জিসকী সব পূজা করেঁ, বহ স্বয়ং কহৈ মৈঁ কাল॥ ৯॥
মারৈ খাবৈ সব কো, বহ কৈসা কৃপাল। কুত্তে গধে সুওর বনাবৈ হৈ, ফির ভী দীন দয়াল॥ ১০॥
বাইবেল বেদ কুরান হৈ, জৈসে চাঁদ প্রকাশ। সূরজ জ্ঞান কবীর কা, করৈ তিমির কা নাশ॥ ১১॥
রামপাল সাচী কহে, করো বিবেক বিচার। সতনাম ব সারনাম, য়হী মন্ত্র হৈ সার॥ ১২॥
কবীর হমারা রাম হৈ, বো হৈ দীনদয়াল, সঙ্কটমোচন কষ্ট হরণ, গুন গাবৈ রাম পাল॥ ১৩॥

॥ শব্দ ॥ (সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজ দ্বারা রচিত)

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, হৈঁ তীন লোক প্রধান। অষ্টঙ্গী ইনকী মাতা হৈ, ঔর পিতা কাল ভগবান॥ ১॥
এক লাখ কো কাল, নিত খাবৈ সীনা তাণ। ব্রহ্মা বনাবৈ বিষ্ণু পালৈ, শিব কর দে কল্যাণ॥ ২॥
অর্জুন ডরকর পূছতা হৈ, য়হ কৌন রূপ ভগবান। কহৈ নিরাঞ্জন মৈঁ কাল হূঁ, সব কো আয়া খান॥ ৩॥
ব্রহ্ম নাম ইসী কা হৈ, বেদ করেঁ গুণগান। জনম মরণ চৌরাসী, য়হ ইসকা সংবিধান॥ ৪॥
চার রাম কী ভক্তি মেঁ, লগ রহা সংসার। পাঁচবে রাম কা জ্ঞান নহীঁ, জো পার উতারনহার॥ ৫॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তীনোঁ গুণ হৈঁ, দূসরা প্রকৃতি কা জাল।
লাখ জীব নিত ভক্ষণ করেঁ, রাম তীসরা কাল॥ ৬॥
অক্ষর পুরুষ হৈ রাম চৌথা, জৈসে চন্দ্রমা জান। পাঁচবা রাম কবীর হৈ, জৈসে উদয় হুআ ভান॥ ৭॥
রাম দেবানন্দ গুরু জী, কর গয়ে নজর নিহাল। সতনাম কা দিয়া খজানা, বরতৈ রামপাল॥ ৮॥

"নাম (দীক্ষা) গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য"

পূর্ণ গুরুর পরিচয় :- দীক্ষা গ্রহন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য প্রথম দরকার গুরুর পরিচয় জানা, তারপর দীক্ষা গ্রহন করা উচিত। আজকের কলিযুগে, পূর্ণ গুরুকে কিভাবে চিনে নেওয়া যায়, সেটাই ভক্ত সমাজের কাছে সবথেকে জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এর এক খুবই সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর রয়েছে যে, যে গুরু শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি করেন আর নিজের অনুগামীদের অর্থাৎ শিষ্যদেরও করান, তিনিই পূর্ণ সন্ত। কেননা ভক্তিমার্গের সংবিধান হল ধার্মিক শাস্ত্রগুলি। যেমন কবীর সাহেবের বাণী, নানক সাহেবের বাণী, সন্ত গরীব দাস মহারাজের বাণী, সন্ত ধর্মদাস সাহেবের বাণী, বেদ, গীতা, পুরাণ, কুরান, পবিত্র বাইবেল ইত্যাদি। যেসব সন্ত শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি সাধনা বলেন আর ভক্ত সমাজকে মার্গ দর্শন করান তিনিই পূর্ণ সন্ত অন্যথায় তিনি ভক্ত সমাজের শত্রু যিনি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধনা করাচ্ছেন। এই অমূল্য মানব জন্মের সাথে ছেলেখেলা করছেন। এই ধরনের গুরুদের বা সন্তদের ভগবানের দরবারে গিয়ে ঘোর নরকে উল্টো করে ঝোলানো হবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, যদি কোনো অধ্যাপক সিলেবাসের বাইরে শিক্ষা দেন তাহলে তিনি বিদ্যার্থীদের শত্রু।

পবিত্র গীতার অধ্যায় নম্বর ৭ এর শ্লোক নম্বর ১৫

ন, মাম্, দুষ্কৃতিনঃ, মূঢাঃ, প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ,
মায়য়া, অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরম্, ভাবম্ আশ্রিতাঃ॥

অনুবাদ:- মায়ার দ্বারা যার জ্ঞান হারিয়ে গেছে, সে অসুর স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ দূষিত কর্ম করা মূর্খ, আমাকে ভজে না অর্থাৎ তীন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) এর সাধনা করতে থাকে।

যজুর্বেদ অধ্যায় নং ৪০ শ্লোক নং-১০ (সন্ত রামপাল দাস জী দ্বারা অনুবাদিত)।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাত্, ইতি শুশ্রুম ধীরানাম যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০॥

বাংলা অনুবাদ:- পরমাত্মার বিষয়ে নিরাকার অর্থ কখনো জন্ম না নেওয়া (মায়ের পেটে জন্ম গ্রহন করে না) বলা হয়। অন্য আকারে অর্থাৎ জন্ম নিয়ে অবতার রূপে আসা বলা হয়। যা স্থায়ী অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানী সমরূপ অর্থাৎ যথার্থ রূপে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান করায়।

গীতা অধ্যায় নং ৪ শ্লোক নং ৩৪

তত্, বিদ্ধি, প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া,
উপদেক্ষ্যন্তি, তে, জ্ঞানম্ জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অনুবাদ:- ঐ পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান ও সাধনকে জানা সন্তকে ভালো ভাবে দন্ডবৎ প্রণাম ক'রে তাঁর সেবা করলে এবং ছল-কপট ছেড়ে সরলতা পূর্বক প্রশ্ন করলে পরমাত্ম তত্ত্বকে সঠিক ভাবে জানা জ্ঞানী মহাত্মা তোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

"দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আবশ্যক কর্তব্য"

১. নেশা জাতীয় বস্তুর সেবন করা নিষেধ:- হুঁকো, মদ, বিয়ার তামাক, বিড়ি, সিগারেট, নস্যি শোঁকা, গুটকা, মাংস, ডিম, সুলফা, আফিং, গাঁজা আরো অন্য নেশা জাতীয় বস্তুর সেবন করা তো দূরের কথা, কাউকে নেশা জাতীয় বস্তু এনেও দিতে পারবে না। বন্দীছোড় গরীব দাস মহারাজ এই সমস্ত নেশা জাতীয় বস্তুকে ভীষণ খারাপ বলে প্রতিপন্ন করে নিজের বাণীতে বলেছেন :-

সুরাপান মদ্য মাংসাহারী, গমন করৈ ভোগৈ পর নারী। সত্তর জনম কটত হৈঁ শীশম্,সাক্ষী সাহিব হৈ জগদীশম্॥
পরদ্বারা স্ত্রী কা খেলৈ, সত্তর জনম অন্ধা হোয় ডোলৈ। মদিরা পীবৈ কড়বা পানী, সত্তরজনম শ্বান কে জানী॥
গরীব, হুক্কা হরদম পীবতে, লাল মিলাবৈঁ ধূর। ইসমেঁ সংশয় হৈ নহীঁ, জন্ম পিছলে সুর॥ 1॥
গরীব, সো নারী জারী করৈ, সুরা পান সৌ বার। এক চিলম্ হুক্কা ভরৈ, ডুবৈ কালী ধার॥ 2॥
গরীব, সূর গউ কূঁ খাত হৈঁ, ভক্তি বিহুনেঁ রাড। ভাঙ্গ তম্বাখূ খা গয়ে, সৌ চাবত হৈঁ হাড়॥ 3॥
গরীব, ভাঙ তম্বাখূ পীব হীঁ, সুরা পান সে হেত। গোস্ত মট্টি খায় কর, জঙ্গলী বনেঁ প্রেত॥ 4॥
গরীব,পানতম্বাখুচাবহীঁ,নাসনাকমেঁদেত।সোতোইরানৈগয়ে,জ্যোঁভড়ভুজেকারেত॥5॥
গরীব, ভাঙ তম্বাখু পীবহীঁ, গোস্ত গলা কবাব। মোর মৃগ কূঁ ভখত হৈঁ, দেঙ্গে কহাঁ জবাব॥ 6॥

২. তীর্থস্থানে যাওয়া নিষেধ :- কোন প্রকারের কোন ব্রত করবে না। কোন তীর্থযাত্রা করবে না। না গঙ্গা স্নান করবে, না অন্য কোনো ধার্মিক স্থানে স্নান বা দর্শনের উদ্দেশ্যে যাবে। কোনো মন্দির বা ইষ্টধামে পূজা বা ভক্তি এরকম ভাব নিয়ে যাবে না যে, এখানে ভগবান আছেন। ভগবান কোন পশু তো নন যে পূজারী তাকে মন্দিরে বেঁধে রেখেছেন। ভগবান তো প্রত্যেক জায়গায় কোণে কোণে ব্যপ্ত হয়ে আছেন। ঐ সমস্ত সাধনা গুলো শাস্ত্র বিরুদ্ধ ছিল।

একটু ভালোভাবে বিচার করে দেখুন যে, এই সমস্ত তীর্থস্থান (যেমন জগন্নাথ মন্দির, বদ্রিনাথ, হরিদ্বার, মক্কা-মদিনা, অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী, বৃন্দাবন, মথুরা, বরসানা, অযোধ্যা রাম মন্দির, কাশীধাম, ছুড়ানীধাম ইত্যাদি) মন্দির, মসজিদ গুরুদ্বার, চার্চ বা ইষ্ট ধাম ইত্যাদি জায়গা গুলোতে কোনো না কোনো সন্ত থাকতেন। তিনি সেখানে

নিজের ভক্তি সাধনা করে, নিজের ভক্তি রূপী ধন সঞ্চয় করে, শরীর ছেড়ে নিজের ইষ্ট দেবের লোকে চলে গেছেন। তারপর তার স্মৃতি সৌধকে সেই ঘটনার প্রমাণ হিসেবে ধরে রাখার জন্য সেখানে কেউ মন্দির, কেউ মসজিদ, কেউ গুরুদ্বার কেউ চার্চ বা কেউ ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়ে দিয়েছে। যাতে তাঁর স্মৃতি থেকে যায়। আর আমাদের মত তুচ্ছ প্রাণীদের সেই প্রমাণ মেলে যে আমাদেরও ঐরকম কর্ম করা উচিত। যেমন এই মহান আত্মারা করেছিলেন। এই সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি আমাদেরকে এই বার্তা দেয় যে কি, যেমন ভক্তি সাধনা এই বিখ্যাত সন্তরা করেছিলেন এইরকমই তোমরা করো। এর জন্য তোমরা এই ধরনের সাধনাকারী বা এই ধরনের ভক্তি প্রদান করেন যে সন্ত তার খোঁজ করো আর তারপর তিনি যেমন বলেন সেই রকম করো। কিন্তু পরে এই স্থান গুলিরই পূজা শুরু হয়ে গেল। যেটা একদম ব্যর্থ এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধেও।

এই সমস্ত স্থানগুলো তো আসলে ঠিক সেই রকম, যেমন ধরুন কোন এক হালুইকর কোনো এক জায়গায় উনুন বানিয়ে জিলিপি লাড্ডু ইত্যাদি বানিয়ে স্বয়ং নিজে খেয়ে আর নিজের সঙ্গী সাথীদেরকে খাইয়ে চলে গেল। তারপর তো ঐ স্থানে না রইলো হালুই কর আর না রইলো মিঠাই।পড়ে থাকলো শুধু উনুন,তো না সেটা আমাদেরকে মিঠাই বানানোশেখাতে পারবে আর না আমাদের পেট ভরাতে পারবে। এখন যদি কেউ বলে যে,আসুন ভাই আপনাকে ঐ ভাট্টি/উনুন দেখিয়ে নিয়ে আসছি, যেখানে এক হালুইকর মিঠাই বানিয়েছিল। চলো যাই। আর ওখানে গিয়ে আপনি ঐ উনুন গুলো দেখে নিলেন, আর সাতবার চককর কেটে নিলেন,তাহলেই কি আপনি মিঠাই পেয়ে গেলেন? নাকি আপনি মিঠাই বানানোর পদ্ধতি বলা হালুইকর পেয়ে গেলেন? এর জন্য আপনাকে এই রকমই হালুইকর খুঁজতে হবে যে প্রথমে আপনাকে মিঠাই খাওয়াবে আর বানানোর পদ্ধতিও বলে দেবে। তারপর তিনি যেমন বলেছেন কেবল সেই রকম করুন, অন্য রকম করবেন না।

ঠিক একইভাবে তীর্থস্থানের পূজো না করে ঐরকম সন্তের খোঁজ করুন, যিনি শাস্ত্র অনুসারে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের ভক্তি করেন এবং বলেন। তারপর তিনি যেমন বলেছেন কেবল সেই রকম করুন, নিজের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী ভক্তি করবেন না।

সামবেদ সংখ্যা নম্বর ১৪০০ উতার্চিক অধ্যায় নম্বর ১২ খন্ড নম্বর ৩ শ্লোক নম্বর ৫ (সন্ত রামপাল দাস জী দ্বারা অনুবাদিত) :-

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যাঅবসানো মহান্ কবির্নিবচনানী শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পুয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ ॥ ৫

হিন্দী থেকে বাংলা:- চতুর ব্যক্তিরা বচন দ্বারা পূর্ণ পরমাত্মার (পূর্ণ ব্রহ্ম) পূজা বা সত্ মার্গ দর্শন না করে, অমৃতের স্থানে অন্য (আন) উপাসনা {যেমন ভূত পূজা, পিতরপূজা, শ্রাদ্ধ করা, তিনগুনের পূজা (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শংকর) ও ব্রহ্ম কালের পূজা, মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, চার্চ ও তীর্থ,উপবাসের উপাসনা} রূপী ফোঁড়া বা ঘা থেকে বের হওয়া পুঁজকে আদরের সাথে আচমন করাতে থাকে। পরম সুখদায়ক পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর স্বশরীরে সাধারন বেশ ভূষায় (বস্ত্রের অর্থ বেশভূষা, সন্ত ভাষায় একে চোলাও বলা হয়। যেমন কোন শরীর ছেড়ে চলে গেলে বলে- মহাত্মা তো চোলা ছেড়ে চলে গেছে) সতলোকের শরীরের মত অন্য কম তেজপুঞ্জের শরীর ধারন করে সাধারন মানুষের মত জীবন যাপন ক'রে কিছু দিন সংসারে থেকে নিজের শব্দ-সাখীর মাধ্যমে বা ছন্দের মাধ্যমে সত্য জ্ঞানকে বর্ণনা

ক'রে পূর্ণ পরমাত্ম নিজের লুকানো বাস্তবিক সত্য জ্ঞান ও ভক্তিকে জাগ্রত করেন।

গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩

যঃ, শাস্ত্রবিধিম্, উৎসৃজ্য, বর্ততে, কামকারতঃ ন, সঃ,
সিদ্ধিম, অবাপ্নোতি, ন, সুখম, ন, পরাম্, গতিম্॥ ২৩॥

অনুবাদ :- যে ব্যক্তি (পুরুষ) শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছায় মনমর্জি আচরন করে, তাঁর না তো সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, না পরমগতি, না সুখ-শান্তি।

গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১৬

ন, অতি, অশ্রনতঃ, তু যোগঃ, অস্তি, ন, চ, একান্তম্,
অনশ্রনতঃ, ন, চ, অতি, স্বপ্নশীলস্য, জাগ্রতঃ, ন, এব, চ, অর্জুন॥

অনুবাদ :- হে অর্জুন! এই যোগ অর্থাৎ ভক্তি না তো বেশি খাওয়া ব্যক্তির, না তো একদম না খাওয়া ব্যক্তির, না একান্ত স্থানে আসন লাগিয়ে সাধনা করা ব্যক্তির, না তো অধিক শয়ন করা অথবা সদা জেগে থাকা ব্যক্তির সিদ্ধ হয়॥

পূজেঁ দেঈ ধাম কো, শীশ হলাবৈ জো। গরীব দাস সাচী কহৈ, হদ কাফির হৈ সো॥
কবীর, গঙ্গা কাঠৈ ঘর করৈ, পীবৈ নির্মল নীর। মুক্তি নহীঁ হরি নাম বিন, সতগুরু কহৈঁ কবীর॥
কবীর, তীর্থ কর-কর জগ মুবা, উড়ে পানী হ্নায়। রাম হী নাম না জপা, কাল ঘসীটে জায়॥
গরীব, পিতল হী কা থাল হৈ, পিতল কা লোটা। জর মূরত কো পূজতেঁ, আবৈগা টোটা॥
গরীব, পিতল চমচ্চা পূজিয়ে, জো থাল পরোসৈ। জড় মূরত কিস কাম কী, মতি রহো ভরসৈ॥
কবীর, পর্বত পর্বত মৈঁ ফিরয়া, কারণ আপনে রাম। রাম সরীখে জন মিলে, জিন সারে সব কাম॥

৩. দেবী-দেবতা তথা পিতর পূজা নিষেধ :- কোন প্রকারের পিতর পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করা যাবে না। ভগবান শ্রী কৃষ্ণও এই সব পিতর বা ভূতের পূজা করতে পরিষ্কার ভাবে মানা করেছেন।

গীতা অধ্যায় নং-৯ শ্লোক নং ২৫ এ বলা হয়েছে:

যান্তি, দেবব্রতা:, দেবান্, পিতৃঋণ, যান্তি, পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি, যান্তি, ভূতেজ্যাঃ, মদ্যাজিনঃ, অপি, মাম্॥ ২৫॥

অনুবাদ:- দেবতাকে পূজা করলে দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। পিতরকে পূজা করলে পিতর কে প্রাপ্ত হয়, আর ভূতের পূজা করলে ভূতকে প্রাপ্ত হয় এবং মতানুসার পূজা করা ভক্ত আমার দ্বারা লাভবান হয়।

বন্দীছোড় গরীব দাস জী মহারাজ আর কবীর সাহেব জী মহারাজও বলেছেন :-

গরীব, ভূত রমৈ সো ভূত হৈ, দেব রমৈ সো দেব।
রাম রমৈ সো রাম হৈ, সুনো সকল সুর ভেব॥

এই জন্য ঐ (পূর্ণ পরমাত্মা) পরমেশ্বরের ভক্তি করো যাতে পূর্ণ মুক্তি হবে। ঐ পরমাত্মা পূর্ণ ব্রহ্ম সতপুরুষ (সত কবীর)।

এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬ এ আছে:-

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥

অনুবাদ:- যে পরমেশ্বর থেকে সম্পূর্ণ প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যার দ্বারা সমস্ত জগত ব্যপ্ত, ঐ পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা পূজা করলে মানুষের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬॥

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২:-

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব ভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্‌যসি শাশ্বতম্॥ ৬২॥

অনুবাদ:- হে ভরত বংশদ্ভূত অর্জুন। তুই সর্ব ভাবে ঐ ঈশ্বরের শরণে চলে যা। তার কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং অবিনাশী পরম পদকে প্রাপ্ত করবি। সর্ব ভাবের তাৎপর্য হল অন্য কোনও পূজা না করে মন-কর্ম বচনে এক পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২২:-

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২॥

অনুবাদ:- হে পৃথানন্দন অর্জুন! সম্পূর্ণ প্রাণী যার অন্তর্গত এবং যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ সংসার ব্যপ্ত সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা তো অনন্য ভক্তিতে প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য। অনন্য ভক্তির অর্থ একাগ্র মনে এক পরমেশ্বরের (পূর্ণ ব্রহ্ম) ভক্তি করা, অন্য দেবী দেবতা অর্থাৎ তিনগুন (রজগুণ- ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ- বিষ্ণু, তমোগুণ- শিব) এর ভক্তি না করা।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ পর্যন্ত বর্ণনা আছে :-

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১

উর্দ্ধমূলম্, অধঃ শাখম্, অশ্বত্থম্, প্রাহুঃ, অব্যয়ম্,
ছন্দাংসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ, তম্, বেদ সঃ, বেদবিত্॥ ১॥

অনুবাদ:- উপরের দিকে মূল (শিকড়) ও নীচের দিকে শাখা ওয়ালা বিস্তৃত সংসার রূপী অবিনাশী অশ্বত্থবৃক্ষ যার ছোট ছোট অংশকে (বা ছোট ডাল) ডাল, পাতা বলা হয়। ঐ সংসার রূপী বৃক্ষকে যিনি ভালোভাবে জানেন তিনি পূর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ২

অধঃ, চ, উর্দ্ধম, প্রসৃতাঃ, তস্য, শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ॥
অধঃ চ. মুলানি, অনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধিনী মনুষ্যলোকে॥ ২॥

অনুবাদ :- ঐ বৃক্ষের নীচে আর উপরে তিন গুন, ব্রহ্মা-রজোগুণ, বিষ্ণু-সত্ত্বগুণ, শিব-তমোগুণ রূপী ছড়ানো বিকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, রূপী ডাল (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব)-ই জীবকে কর্ম বন্ধনে রাখার জড় অর্থাৎ মূলকারণ তথা মনুষ্য লোক, স্বর্গ লোক, নরক লোক, পৃথিবী লোকের নীচে (চৌরাশি লাখ যোনীতে) ও উপরে ব্যবস্থিত করে রেখেছে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৩

ন, রূপম, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ, ন, চ, আদিঃ ন, চ,।
সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম, এনম্, সুবিরূঢ়মূলম, অসঙ্গশস্ত্রেণ, দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩॥

অনুবাদ :- এই রচনার না শুরু (আরম্ভ) তথ না অন্ত (শেষ) আছে, না এমন স্বরূপ পাওয়া যায়, তথা এখানে বিচারকালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানে সম্পূর্ণ তথ্য নেই। কারণ সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচনার বিষয়ে আমি ভালোভাবে জানি না। এই ভালোভাবে স্থায়ী স্থিত মজবুত স্বরূপ ওয়ালা নির্মল তত্ত্বজ্ঞান রূপী দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ নির্মল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা খন্ডন করে, অর্থাৎ নিরঞ্জনের ভক্তিকে ক্ষনিক জানো। (৩)

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ :-

ততঃ পদং তত্পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্গতা, ন,নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যম পুরুষম প্রপদ্যে যতঃ প্রতৃত্তি প্রসূতা পুরানী॥ ৪॥

অনুবাদ:- তারপর ওই পরমপদ পরমাত্মার খোঁজ করা দরকার। যাকে প্রাপ্ত হওয়ার পর মানুষ পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। তখন অনাদিকাল থেকে চলে আসা এই সৃষ্টি বিস্তারকে প্রাপ্ত হয়, আমিও ঐ আদি পুরুষ পরমাত্মারই শরনে আছি। এইভাবে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী দেবতাদের রাজা ইন্দ্রদেবের পূজা বন্ধ ক'রে ওই পরমাত্মার ভক্তি করার জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন। সেই জন্য ইন্দ্র কুপিত হয়ে ব্রজবাসীকে ডুবানোর জন্য বর্ষা শুরু করেছিলেন, তখন ইন্দ্রের কোপের হাত থেকে ব্রজবাসীকে রক্ষা করার জন্য শ্রী কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে তুলেছিলেন।

গরীব, ইন্দ্র চড়া ব্রিজ ডুবোবন, ভীগা ভীত ন লেব।
ইন্দ্র কঢ়াঈ হোত জগৎ মেঁ, পূজা খা গএ দেব॥

কবীর, ইস সংসার কো সমঝাউঁ কৈ বার। পুঁছ জো পকড়ে ভেড় কী, উতরা চাহেঁ পার॥

৪.গুরুর আজ্ঞা/আদেশ পালন:-

গুরুদেবের আদেশ বা আজ্ঞা ছাড়া ঘরে কোন প্রকারের কোন ধার্মিক অনুষ্ঠান করাবেন না।

যেমন বন্দীছোড় নিজের বাণীতে বলেন যে:-

গুরু বিন যজ্ঞ হবন জো করহীং, মিথ্যা জাবে কবহু নহীং ফলহীং।
কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।
গুরু বিন দোনোঁ নিষ্ফল হৈঁ, পুছো বেদ পুরাণ॥ ॥

৫. মাতা মসানির পূজা করা নিষেধ:-

নিজের জমিতে তৈরি করা মণ্ডপে বা কোনো সাধু ইত্যাদির বা কোনো অন্য দেবতার সমাধিতে পুজো করা যাবে না। সমাধি সে তা যারই হোক না কেন একদম পূজো করা যাবে না। অন্য কোন উপাসনা করা যাবে না। এমনকি তিন গুনদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) পূজাও করা যাবে না। কেবল গুরুজীর বলা অনুসারেই করতে হবে।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৫

ন, মাম, দুষ্কৃতিনঃ, মূঢ়াঃ, প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ,
মায়য়া, অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরম, ভাবম্, আশ্রিতাঃ॥

অনুবাদ :- মায়ার দ্বারা যার জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছে, এমন অসুর স্বভাব ধারণ করা মানুষ নীচ, দুষিত কর্ম করা মূর্খ, আমাকেও ভজে না। অর্থাৎ সে তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু,তমোগুন-শিব) এর সাধনা করতে থাকে।

কবীর, মাঈ মসানী শেঢ় শীতলা, ভৈরব ভূত হনুমন্ত।
পরমাত্মা উনসে দূর হৈ, জো ইনকো পূজন্ত॥
কবীর, সৌ বর্ষ তো গুরু কী সেবা, একদিন আন উপাসী।
বো অপরাধী আত্মা, পরৈ কাল কী ফাঁসি॥
গুরুকো তজে ভজে জো আনা, তা পশুআ কো ফোকট জ্ঞানা॥
না, তা পশুয়া কো ফোকট জ্ঞানা॥

৬.সংকট মোচন হলেন কবীর সাহেব :-

কর্ম সংকট/কষ্ট উপস্থিত হলে কোনো অন্য ইষ্ট দেবতা বা মাতা-মসানি ইত্যাদির পূজা কখনো করবে না। না কোনো প্রকারের ঝাড়-ফুঁক করাবে। কেবলমাত্র বন্দীছোড়

কবীর সাহেবের পূজা করতে হবে। যিনি সমস্ত দুঃখের হরণকারী কষ্ট মোচনকারী।

সামবেদ সংখ্যা নম্বর ৮২২ উতার্চিক অধ্যায় ৩ খন্ড নম্বর ৫ শ্লোক নম্বর ৮ (সন্ত রামপাল দাস দ্বারা অনুবাদিত) :-

মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাং অসিষ্যদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ুং সখায় বর্ধয়ন্॥ ৪॥

অনুবাদ:- সনাতন অর্থাৎ অবিনাশী কবীর পরমেশ্বর, হৃদয় থেকে চাওয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি করা ভক্তাত্মাকে তিন মন্ত্র উপদেশ দিয়ে পবিত্র করে, জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন এবং তার প্রাণ অর্থাৎ জীবন রূপী শ্বাস যা সংস্কারবশত নিজের মিত্র অর্থাৎ ভক্তের প্রারব্ধ গুণে দেওয়া থাকে, তা নিজের ভান্ডার থেকেপূর্ণ রূপে বাড়িয়ে দেন। যার কারণে পরমেশ্বরের বাস্তবিক/আসল আনন্দকে নিজের আশীর্বাদ প্রসাদ রূপে প্রাপ্ত করান।

কবীর, দেবী দেব ঠাটে ভয়ে, হমকো ঠৌর বতাও।
জো মুঝ (কবীরকে) কো পূজেঁ নহীঁ, উনকো লুটো খাও॥
গরীব, কাল জো পীসৈ পীসনা, জৌরা হৈ পনিহার।
য়ে দো অসল মজুর হৈঁ, সদগুরু কে দরবার॥

৭. অনাবশ্যক দান করা নিষেধ:-

কোথাও বা কাউকে দান রূপে কিছু দেবেনা। না টাকা-পয়সা, না বিনা সেলাই করা বস্ত্র ইত্যাদি কিছু দেবে না। যদি কেউ দান রূপে কিছু চায় তো তাকে খাবার খাইয়ে দাও বা দুধ, লস্যি, জল ইত্যাদি খাইয়ে দাও, কিন্তু অন্য কিছু দেবেনা। কে জানে ঐ ভিখারী হয়তো ঐ টাকা নিয়ে কোন দুষ্কর্ম করবে। যেমন এক ব্যক্তি একজন ভিখারীকে তার মিথ্যা কাহিনী শুনে, যাতে সে বলেছিল যে কি তার বাচ্চা বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাচ্ছে দয়া করতে, দয়া বশত ১০০ টাকা দিয়ে দেয়। ঐ ভিখারী আগে ছোট গ্লাসে মদ খেত, ঐ দিন সে অর্ধেক বোতল মদ খেয়ে ফেলে। আর নিজের স্ত্রীকে গিয়ে পেটায়। তার স্ত্রী বাচ্চা সমেত সেদিন আত্মহত্যা করে নেয়। ঐ ব্যক্তির দ্বারা করা ঐ দান ঐ পরিবারের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। যদি আপনি ঐ দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে চান, তাহলে তার বাচ্চাকে ডাক্তার দেখিয়ে দিন, টাকা হাতে দেবেন না।

কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।
গুরু বিন দোনোঁ নিষ্ফল হৈঁ, পূছো বেদ পুরান॥

৮. এঁটো খাওয়া নিষেধ :- যে ব্যক্তি মদ, মাংস, তামাক, ডিম, বিয়ার, আফিং, গাজা ইত্যাদি খায় তার এঁটো খাওয়া নিষেধ।

৯. সত্যলোক গমন (দেহ ত্যাগ) করলে ক্রিয়া কর্ম করা নিষেধ:- যদি পরিবারের কারোর মৃত্যু হয়ে যায়, চিতাতে অগ্নি যে কেউ দিতে পারে, ঘরের বা অন্যকেউ তথা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সময় মঙ্গলাচরণ বলে দাও। আর তার ফুল ইত্যাদি কিছু তুলবে না। যদি ঐ জায়গাকে পরিষ্কার করার দরকার থাকে তো ঐ অস্থি উঠিয়ে নিজেই কোন স্থানে প্রবাহিত জলে দিয়ে দাও আর ঐ সময় মঙ্গলাচরণ উচ্চারণ করে দাও। না শ্রাদ্ধ করতে হবে, না ১৩ দিন, ৬ মাস, বার্ষিকী, পিন্ডদান ইত্যাদি কিচ্ছু করার দরকার নেই। কোন অন্য ব্যক্তি দ্বারা হবনযজ্ঞ ইত্যাদি করানোর দরকার নেই। নিজের আত্মীয়-স্বজন তথা পরিবার-পরিজন ইত্যাদি যারা শোক ব্যক্ত করতে আসবে, তাদের জন্য কোনো একটা দিন ঠিক করো। ঐ দিন প্রতিদিনের মতো নিত্য নিয়ম করো, জ্যোতি জ্বালাও তারপর সবাইকে খাবার খাওয়াও। যদি আপনি ঐ মৃত ব্যক্তির নামে কিছু ধর্ম করতে

চান তো আপনি নিজের গুরুদেব জীর আজ্ঞা নিয়ে বন্দীছোড় গরীব দাসজী মহারাজের অমৃতময়ী বাণীর অখন্ড পাঠ করানো উচিত। যদি পাঠ করার আদেশ না পান তো পরিবারকে উপদেশী ভক্তরা চার দিন অথবা সাত দিন ঘরে দেশী ঘি এর এক অখন্ড জ্যোতি জ্বালান এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র প্রতিদিন চারবার করুন তথা তিন অথবা এক বারের মন্ত্র সতলোক বাসিকে দান সংকল্প করুন। যেমন উচিত মনে করবেন এক, দুই বা তিন পর্যন্ত মন্ত্রের জপের ফল তাকে দান করুন। প্রতিদিনের মতো জ্যোতি ও আরতি, নাম স্মরণ করতে থাকুন। এই কথা মনে রাখবেন যে :–

কবীর, সাথী হমারে চলে গএ, হম ভী চালনহার।
কোয় কাগজ মেঁ বাকী রহ রহী, তাতৈ লগী হৈ বার॥
কবীর, দেহ পড়ী তো ক্যা হুয়া, ঝুটা সভী পটাট।
পক্ষী উড়ায় আকাশ কূঁ, চলতা কর গয়া বীট॥

" কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সত্য কথা "

আমার (সন্ত রামপাল দাসের) পূজ্যগুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দ জী মহারাজের ১৬ বছর বয়সে, কোন মহাত্মার সৎসঙ্গ শুনে বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল। একদিন তিনি ক্ষেতে গিয়েছিলেন। পাশে বন ছিল, ঐ বনে গিয়ে কোন মৃত জানোয়ারের হাড়গোড়ের কাছে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে রেখে ঐ মহাত্মার সাথে চলে গিয়েছিলেন।

যখন তার খোঁজ পড়লো তখন তার ঘরের লোকজন দেখল যে, বনের মধ্যে কিছু হাড়গোড়ের কাছে ছেঁড়াফাটা জামাকাপড় পড়ে আছে , দেখে তারা ভেবে নিল যে, কোন জংলি জানোয়ার তাকে খেয়ে ফেলেছে। ঐ কাপড় এবং হাড়গোড়গুলো উঠিয়ে নিয়ে এসে তার অন্তিম সংস্কার করে দিল। তারপর ১৩ দিনের কাজ তথা ছয় মাসের কাজ করতে লাগলো আর বার্ষিক শ্রাদ্ধ করা শুরু হয়ে গেল।

যখন আমার পূজ্য গুরুদেব অনেক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন একবার ঘরে গিয়েছিলেন। তখন তার ঘরের লোকজন জানতে পারলো যে, তিনি জীবিত আছেন, ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারা বলেন যে, যখন ইনি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তখন তার খোঁজ করা হয়েছিল। বনে এনার জামা কাপড় পাওয়া গিয়েছিল, তার কাছে কিছু হাড়গোড় পড়েছিল, তাই আমরা ভেবেছিলাম কোন জংলি জানোয়ারে ওনাকে খেয়ে ফেলেছে। আর ঐ কাপড় গুলো ঘরে এনে অন্তিম সংস্কার করে দিয়েছিলাম।

তারপর আমি (সন্ত রামপাল দাস) আমার পূজ্য গুরুদেবের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, যখন আমাদের পূজ্য গুরুদেব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন আপনারা কি করেছিলেন ? তিনি বললেন কি যখন আমি বিয়ের পর এলাম তখন সেই সময় আমি দেখলাম তার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে । আমি নিজের হাতে এনার প্রায় ৭০ বার শ্রাদ্ধ করেছি। তিনি বললেন যে, যখনই ঘরে কোনো লোকসান হতো, যেমন মহিষের দুধ না দেওয়া, তার দুধের বাটে খারাপ কিছু হয়ে যাওয়া, বা কোন রকমের কোনো লোকসান এসে পড়া ইত্যাদি হতো, তখন আমরা অভিজ্ঞ বয়স্কদের কাছে বুঝতে গেলে তারা বলতো যে, তোমাদের ঘরে কেউ নিঃসন্তান মারা গেছে সে তোমাদের দুঃখ দিচ্ছে। তখন আমি তাদের কাপড় ইত্যাদি দিতাম।

তখন আমি ওনাকে বলি যে, ইনি তো দুনিয়া উদ্ধার করছেন, ইনি কাকে দুঃখ দিচ্ছেন,ইনি তো সুখ দাতা। তারপর আমি (সন্ত রামপাল দাস) ঐ বৃদ্ধাকে বললাম যে এবার তো আপনার সামনে সত্যটা প্রকাশিত হলো। এবার তো ঐ ব্যর্থ সাধনা যেমন

শ্রাদ্ধ করা ইত্যাদি বন্ধ করে দিন। তখন উনি বললেন যে এসব তো পুরনো রেওয়াজ, এসব কি করে ছাড়বো! অর্থাৎ নিজের এই পুরনো রীতি রেওয়াজে এতটাই লীন হয়ে গেছেন যে এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনে পেলেন যে, এসব ভুল করছেন,দেখার পরও ওসব ছাড়তে পারছেন না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে শ্রাদ্ধ করা, পিতর পুজো করা (পিতৃ পুরুষদের পুজো করা) ইত্যাদি সব ব্যর্থ।

১০. সন্তান জন্মের পর শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পূজা করা নিষেধ :- সন্তানের জন্ম হলে ষষ্ঠী পুজো ইত্যাদি করা যাবে না আঁতুরের কারণে প্রতিদিনের করণীয় পূজা, ভক্তি, আরতী, জ্যোতি জ্বালানো ইত্যাদি বন্ধ করা যাবে না।

এই উপলক্ষে একটা ছোট্ট কথা বলছি যে, এক ব্যক্তির বিয়ের ১০ বছর পরে পুত্রের জন্ম হলো। পুত্র হওয়ার খুশিতে সে প্রচুর ধুমধাম করল, ২০-২৫ টা গ্রামের লোককে ভোজনে নিমন্ত্রণ করলো আর অনেক গান বাজনা হলো অর্থাৎ প্রচুর টাকা খরচ করল । তার এক বছর পর সেই পুত্রের মৃত্যু হয়ে গেল, এবার ঐ পরিবার মাথা ঠুকে কাঁদছে আর নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষারোপ করছে ।

এই জন্য কবীর্দেব আমাদের বলেছেন যে :-

কবীর, বেটা জায়া খুশী হূঈ, বহুত বজায়ে থাল । আনা জানা লগ রহা, জ্যোঁ কীড়ী কা নাল ॥
কবীর, পতঝড় আবত দেখ কর, বন রোবৈ মন মাহিঁ । উঁচী ডালী পাত থে, অব পীলে হো হো জাহিঁ॥
কবীর, পাত ঝড়ঁতা য়ূঁ কহৈ, সুন ভঈ তরুবর রায় । অব কে বিছুড়ে নহীঁ মিলা, ন জানে কহাঁ গিরেঙ্গে জায়॥
কবীর,তরুবরকহতাপাতসে,সুনোপাতএকবাত ।য়হাঁকীয়াহেরীতিহৈ,একআবতএকজাত ॥

১১. দেবস্থানে চুল দিতে যাওয়া নিষেধ:- সন্তানের চুল দিতে কোন দেবী দেবতাদের স্থানে যাওয়া যাবে না । যখন দেখবেন চুল বড় হয়ে গেছে কেটে ফেলে দেবেন । একটা মন্দিরে দেখা যায় যে, শ্রদ্ধালু ভক্তরা নিজের মেয়ে অথবা ছেলের চুল দিতে গেছে, ওখানে উপস্থিত নাপিত বাইরে যা রেট তার থেকে তিনগুণ টাকা নিচ্ছে আর একবার কাঁচি চালিয়ে বাবা-মার কাছে দিয়ে দিচ্ছে । তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে সেটা দান করছে। পূজারী একটা থলিতে ফেলে দিচ্ছে। রাত্রিতে সেখান থেকে তুলে নিয়ে দূরে কোনো ফাঁকা জায়গায় ফেলে দিচ্ছে। এটা কেবল একটা নাটক। আবার আগের মতো স্বাভাবিক ভাবে চুল কেটে বাইরে ফেলে দিলেই তো হয়। পরমাত্মা, নাম স্মরণে প্রসন্ন হন ভন্ডামিতে নয়।

১২. যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া নিষেধ :- দীক্ষা নেওয়ার পর যৌতুক নেওয়া ও দেওয়া নিষেধ।

১৩. নাম জপ করলে সুখ হয়:- কেবল মাত্র দুঃখ নিবারণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে নাম উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নয় । বরং আত্ম কল্যাণের জন্য নেওয়া উচিত। তারপর নাম স্মরণ (জপ) করলে তো সর্ব সুখ আপনা আপনি হয়ে যায়।

কবীর,সুমিরন সে সুখ হোত হৈ, সুমিরন সে দুঃখ জাএ।
কহেঁ কবীর সুমিরণ কিএ, সাঁঈ মাহিঁ সমায়॥

১৪. ব্যভিচার করা নিষেধ :- পরস্ত্রীকে মা-মেয়ে-বোনের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। ব্যভিচার হল মহাপাপ। যেমন :-

গরীব, পরদ্বারা স্ত্রী কা খোলৈ। সত্তর জন্ম অন্ধা হো ডোলৈ ॥
সুরাপান মদ্য মাংসাহারী। গবন করেঁ ভোগৈঁ পর নারী ॥
সত্তর জন্ম কটত হৈঁ শীশম্। সাক্ষী সাহিব হৈ জগদীশম্॥
পরনারী না পরসিয়ো, মানো বচন হমার । ভবন চতুর্দশ তাস সির, ত্রিলোকী কা ভার ॥

পরনারী না পরসিয়ো, সুনো শব্দ সলতন্ত। ধর্মরায় কে খম্ভ সে, অর্ধমুখী লটকন্ত॥

১৫. নিন্দা করা এবং শোনা উভয়ই নিষেধ :-

ভুল করেও নিজের গুরুর নিন্দা কখনো করবেন না আর না তো কারো কাছে শুনবেন। শুনবেন না কথাটা বলার মানে হলো, যদি কেউ আপনার গুরুর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে, তাহলে আপনি লড়াই করবেন না, কেন না এই কথাটা বুঝতে হবে যে, ও তো বিচার শক্তিহীন অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলছে।

গুরু কী নিন্দা সুনৈ জো কানা। তাকো নিশ্চয় নরক নিদানা॥
অপনে মুখ নিন্দা জো করহীঁ। শুকর শ্বান গর্ভ মেঁ পরহী॥

নিন্দা তো কারোরই করা যাবে না, আর না কারোর নিন্দা শোনা যাবে, তাতে সে কোনো সাধারণ ব্যক্তিই হোক না কেন ।

কবীর সাহেব বলেন যে :-

তিনকা কবহু ন নিন্দিয়ে, জো পাঁব তলে হো। কবহু উঠ আখিন পড়ে, পীর ঘনেরী হো॥

১৬. সতসঙ্গ শোনা এবং দেখা অনিবার্য :-

সময় পেলেই সৎসঙ্গে আসার চেষ্টা করুন আর সৎসঙ্গে মান-বড়াই করার জন্য আসবেন না । বরং নিজেকে একজন রোগী মনে করে আসবেন। যেমন একজন রোগী ব্যক্তি সে যতই পয়সা ওয়ালা হোক অথবা উচ্চ পদাধিকারী হোক, হাসপাতালে যখন যায়, তখন তার কেবল একটাই উদ্দেশ্য যে রোগ মুক্ত হওয়া । যেখানে ডাক্তার শুতে বলবেন সেখানেই শুয়ে পড়েন, যেখানে বসতে বলেন সেখানেই বসে পড়েন, বাইরে যেতে নির্দেশ দিলে বাইরে চলে যায় । আবার ভিতরে আসার জন্য ডাকলে চুপচাপ ভেতরে চলে আসে । ঠিক এইভাবে যদি আপনি সৎসঙ্গে আসেন, তাহলে আপনার সৎসঙ্গে আসার ফল মিলবে অন্যথায় আপনার আসা নিষ্ফল হবে । যেখানে বসার জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই বসে যাবেন, যা খাওয়ার জন্য পাওয়া যাবে তাই পরমাত্মা কবীর সাহেবের দয়ার প্রসাদ মনে করে খেয়ে প্রসন্ন হবেন।

গুরু দর্শনে অনেক লাভ পাওয়া যায়। কবীর পরমেশ্বর জী বলেছেন যে :-

কবীর, সন্ত মিলন কূঁ চালিএ, তজ মায়া অভিমান। জো-জো কদম আগে রখে, বো হী যজ্ঞ সমান॥
কবীর, সন্ত মিলন কূঁ জাইয়ে,দিন মেঁ কঈ-কঈ বার। আসোজ কে মেহ জ্যোঁ, ঘনা করে উপকার॥
কবীর, দর্শন সাধুকা পরমাত্মা আবৈ য়াদ। লেখে মেঁ বোহে ঘড়ী, বাকী কে দিন বাদ॥
কবীর, দর্শন সাধু কা, মুখ পর বসৈ সুহাগ। দর্শ উন্হীঁ কো হোত হৈঁ, জিনকে পূর্ণ ভাগ॥

১৭. গুরুদেবের সমান কাউকে মহত্ব দেবে না :-

যদি কোথাও পাঠ বা সৎসঙ্গ চলছে বা এমনিই গুরুদেবের দর্শনের জন্য গেছেন তো সর্বপ্রথম গুরুদেবকে দণ্ডবৎ (লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে) প্রণাম করা উচিত। পরে সদগ্রন্থ সাহেব এবং ফটো গুলিতে যেমন প্রভু (সাহেব) কবির্দেবের মূর্তি, গরীবদাস মহারাজ এবং স্বামী রামদেবানন্দ মহারাজ এবং গুরুদেবের মূর্তির সামনে প্রণাম করুন। যাতে শুধু (শ্রদ্ধাভক্তির) ভাব বজায় থাকে। মূর্তি পূজা করা যাবে না। কেবল প্রণাম করা পূজোর মধ্যে পড়ে না। এটা তো ভক্তের শ্রদ্ধাকে বজায় রাখতে সহযোগিতা করে। পূজা তো উপস্থিত গুরুর এবং নাম মন্ত্রের করতে হবে যা আপনাকে পার করবে।

কবীর, গুরু কো তজৈ, ভজৈ জো আনা। তা পশুবা কো ফোকট জ্ঞানা॥
কবীর, গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কাকে লাগূঁ পায়। বলিহারী গুরু আপনে, জিন গোবিন্দ দিয়ো মিলায়॥

কবীর, গুরু বড়ে হৈঁ গোবিন্দ সে, মন মেঁ দেখ বিচার। হরি সুমরে সো রহ গএ, গুরু ভজে হোয় পার॥
কবীর, হরি কে রুঠতাঁ, গুরু কী শরণ মেঁ জায়। কবীর গুরু জৈ রুঠ জাঁ, হরি নহীঁ হোত সহায়॥

কবীর, সাত সমুন্দ্র কী মসি করুঁ, লেখনি করুঁ বনিরায়।
ধরতী কা কাগজ করুঁ, তো গুরু গুন লিখা ন জায়॥

১৮. মাংস ভক্ষণ করা নিষেধ :-

ডিম, মাংস ভক্ষণ করা এবং জীব হিংসা করা যাবে না । এতে মহাপাপ হয় । যেমন প্রভু (সাহেব) কবির্দেব মহারাজ এবং গরীবদাস মহারাজ বলেছেন যে :-

কবীর, জীব হনে হিংসা করে, প্রকট পাপ সির হোয়, নিগম পুনি ঐসে পাপ তেঁ, ভিস্ত গয়া নহীঁ কোয়॥ ১॥
কবীর, তিলভর মছলী খায়কর, কোটি গউ দে দান। কাশী করৌঁত লে মরে, তো ভী নরক নিদান॥ ২॥
কবীর, বকরী পাতী খাত হৈ, তাকী কাটী খাল। জো বকরী কো খাত হৈ, তিনকা কৌন হবাল॥ ৩॥
কবীর, গলা কাটি কলমা ভরে, কীয়া কহৈ হলাল। সাহব লেখা মাংগসী, তব হোসী কৌন হবাল॥ ৪॥
কবীর, দিনকো রোজা রহত হৈঁ, রাত হনত হৈঁ গায়। য়হ খূন বহ বন্দগী, কহুঁ ক্যোঁ খুশী খুদায়॥ ৫॥
কবীর, কবীরা তেঈ পীর হৈঁ, জো জানৈ পর পীর। জো পর পীর ন জানি হৈ, সো কাফির বেপীর॥ ৬॥
কবীর, খুব খানা হৈ খীচড়ী, মাঁহী পরি টুক লৌন। মাংস পরায়া খায়কৈ, গলা কটাবৈ কৌন॥ ৭॥
কবীর, মুসলমান মারৈঁ করদ সোঁ, হিন্দু মারৈঁ তরবার। কহৈ কবীর দোনূঁ মিলি, জৈহৈঁ যম কে দ্বার॥ ৮॥
কবীর, মাংস অহারী মানব, প্রত্যক্ষ রাক্ষস জানি। তাকী সঙ্গতি মতি করৈ, হোঈ ভক্তি মেঁ হানি॥ ৯॥
কবীর, মাংস খাঁয় তে ঢেড় সব, মদ পীবৈঁ সব নীচ। কুল কী দুরমতি পর হরৈ, রাম কহৈ সো উঁচ॥ ১০॥
কবীর, মাংস মছলিয়া খাত হৈঁ, সুরাপান সে হেত। তে নর নরকৈ জাহিঙ্গে, মাতা পিতা সমেত॥ ১১॥
গরীব, জীব হিংসা জো করতে হৈঁ, যা আগে ক্যা পাপ। কন্টক জুনী জিহান মেঁ, সিংহ ভেড়িয়া ঔর সাঁপ॥
ঝোটে বকরে মুরগে তাঈ। লেখা সবহী লেত গুসাঈ। মৃগ মোর মারে মহমন্তা। অচরাচর হৈঁ জীব অনন্তা॥

জিহ্বা স্বাদ হিতে প্রাণা। নীমা নাশ গয়া হম জানা।
তীতর লবা বুটেরী চিড়িয়া। খূনী মারে বড়ে অগড়িয়া॥
অদলে বদলে লেখে লেখা। সমঝ দেখ সুন জ্ঞান বিবেকা॥
গরীব, শব্দ হমারা মানিয়ো, ঔর সুনতে হো নর নারি।
জীব দয়া বিন কুফর হৈ, চলে জমানা হারি॥

অজান্তে হয়ে যাওয়া হিংসাতে পাপ হয় না। বন্দীছোড় কবীর সাহেব বলেছেন যে:-

ইচ্ছা কর মারৈ নহীঁ, বিনা ইচ্ছা মর জাএ।
কহৈঁ কবীর তাস কা, পাপ নহী লগাএ।

১৯.গুরু দ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিষেধ:-

যদি কোন ভক্ত গুরুদেবের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা (গুরুদেবের থেকে বিমুখ হয়ে যায়) করে, সে মহাপাপের ভাগী হয়ে যায়। যদি কারোর এই মার্গ ভালো না লাগে, তাহলে নিজের গুরু বদলে নিতে পারে। যদি সে পূর্বের গুরুর সঙ্গে শত্রুতা করে বা তাঁর নিন্দা করে তাহলে তাকে গুরুদ্রোহী বলা হয়। এই ধরনের ব্যক্তির সাথে ভক্তি চর্চা করলে উপদেশীদের দোষ লাগে, তাদের ভক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়।

গরীব, গুরু দ্রোহী কী পৈড় পর, জে পগ আবৈ বীর। চৌরাসী নিশ্চয় পড়ৈ, সতগুরু কহৈঁ কবীর॥
কবীর, জান বুঝ সাচী তজৈ, করৈ ঝুঠে সে নেহ। জাকী সঙ্গত হে প্রভু, স্বপন মেঁ ভী না দেহ।

অর্থাৎ গুরুদ্রোহীর কাছে যাওয়া ব্যক্তি ভক্তি রহিত হয়ে নরক এবং চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনীতে চলে যাবে।

২০. জুয়া খেলা নিষেধ:- কখনো জুয়া, তাস খেলা যাবে না।

কবীর, মাংস ভখৈ ঔর মদ পিয়ে, ধন বেশ্যা সৌঁ খায়।
জুয়া খেলি চোরী করৈ, অন্ত সমূলা জায়।

২১. নাচ গান করা নিষেধ :-

কোনো ধরনের কোনো খুশির অনুষ্ঠানে নাচ করা বা অশ্লীল গান গাওয়া, ভক্তি ভাবের বিরুদ্ধ কর্ম। যেমন এক সময় এক বিধবা বোন কোনো খুশির অনুষ্ঠানে নিজের আত্মীয়ের ঘরে গিয়েছিল। সবাই খুশিতে নাচছিল, গান করছিল কিন্তু ঐ বোন এক ধারে বসে প্রভুর চিন্তায় লেগেছিল। তখন তার আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এইভাবে কেন নিরাশ হয়ে বসে আছো? তুমিও আমাদের মতো নাচ করো, গান করো, আনন্দ করো। এই কথায় ঐ বোন বলে যে, কিসের আনন্দ করব! আমার মতো বিধবার একটাই ছেলে ছিল, সেও ভগবানের প্রিয় হয়ে গেল। এখন কিসের খুশি আর আমার জন্য বাকি আছে? এই কালের লোকে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ঠিক একই রকম অবস্থা।

এর উপরে গুরু নানক দেবজীর বাণী রয়েছে যে :-

না জানে কাল কী কর ডারে, কিস বিধি ঢল জা পাসা বে।
জিন্হাদে সির তে মৌত খুড়গদী, উন্হাঁনু কেড়া হাঁসা বে॥
সাধ মিলে সাডী শাদী (খুশী) হোন্দী, বিছড় দাঁ দিল গিরি (দুঃখ) বে।
অখদে নানক সুনো জিহানা, মুশকিল হাল ফকীরী বে॥

কবীর দেব মহারাজ বলেছেন :-

কবীর, ঝূঠে সুখ কো সুখ কহৈ, মান রহা মন মোদ।
সকল চবীনা কাল কা, কুছ মুখ মেঁ কুছ গোদ ॥
কবীর, বেটা জায়া খুশী হঈ, বহুত বজায়ে থাল।
আবন জাণা লগ রহা, জ্যোঁ কীড়ী কা নাল॥

বিশেষ কথা:- স্ত্রী অথবা পুরুষ উভয়েই পরমাত্মা প্রাপ্তির অধিকারী। স্ত্রীদের মাসিক ধর্মের (menstruation) দিন গুলোতেও নিজের দৈনিক পূজা, জ্যোতি জ্বালানো ইত্যাদি বন্ধ করা উচিত নয়। আর না তো কারোর মৃত্যু বা জন্মের পর দৈনিক পূজা কর্ম বন্ধ করা উচিত।

নোট:- যে ভক্তগণ এই ২১-টি মূল আদেশ পালন করবে না, সে নাম বিহীন হয়ে যাবে। যদি অজান্তে কোন ভুল হয়ে যায়, তাহলে তা মাফ হয়ে যায়। আর যদি জেনে বুঝে কেউ ভুল করে, তাহলে ঐ ভক্ত নাম বিহীন হয়ে যায়। এর সমাধান এটাই হল যে, গুরুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দ্বিতীয়বার নাম উপদেশ নিতে হবে। দয়া করে পড়ুন, ঐ সমস্ত ভক্তদের আত্মকথা, যারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা ত্যাগ করে উপরোক্ত নিয়ম গুলি পালন করে কেমন সুখী হলো। আর পূর্বে তারা লোকবেদের আধারে পূজা-অর্চনা করেও মহা দুঃখী ছিল।

লেখক
সন্ত রামপাল দাস মহারাজ
সতলোক আশ্রম বরবালা,
জেলা- হিসার, হরিয়াণা (ভারত)।

“সৃষ্টি রচনা”

(সূক্ষ্ম বেদের সারাংশ স্বরূপ সৃষ্টি রচনার বর্ণনা)

প্রভু প্রেমী আত্মাগণ প্রথমবার যখন নিম্নলিখিত সৃষ্টি রচনা পড়বেন তখন এইরকম মনে হবে যে, এটা একটা গল্পকথা/ লোকগাতা/পৌরাণিক গল্প কাহিনী কিন্তু সমস্ত পবিত্র সদগ্রন্থের প্রমাণ পড়বার পরে আপনি গালে হাত দিয়ে বসে যাবেন যে, এই আসল/বাস্তবিক অমৃত জ্ঞান এতদিন কোথায় লুকানো ছিল ? ধৈর্য্যের সঙ্গে পড়তে থাকুন এবং এই অমৃত জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখুন। আপনার ১০১ বংশ পর্যন্ত কাজে আসবে। পবিত্র আত্মাগণ কৃপা করে সত্যনারায়ণ (অবিনাশী প্রভু/সতপুরুষ) দ্বারা রচিত এই সৃষ্টি রচনার বাস্তবিক/আসল জ্ঞান পড়ুন।

১.পূর্ণব্রহ্ম:- এই সৃষ্টি রচনায় সতপুরুষ-সতলোকের স্বামী (প্রভু), অলখ পুরুষ-অলখ লোকের স্বামী (প্রভু), অগম পুরুষ, অগম – লোকের স্বামী (প্রভু) এবং অনামী পুরুষ – অনামী লোকের স্বামী (প্রভু) তো ঐ একই পূর্ণ ব্রহ্ম, যিনি বাস্তবে অবিনাশী প্রভু, যিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে নিজের চার লোকে থাকেন। ওনার অন্তর্গত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

২.পরব্রহ্ম:- তিনি কেবল সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু) ওনাকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়। কিন্তু ইনি এবং এনার অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড গুলি বাস্তবে অবিনাশী নয়।

৩.ব্রহ্ম:- ইনি কেবল ২১ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু) এনাকে ক্ষর পুরুষ, জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ইত্যাদি নামে জানা যায়। ইনি এবং এনার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ শীল।

(উপরোক্ত তিন পুরুষদের (প্রভুদের) প্রমাণ পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অধ্যায় নং এর ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭ তেও আছে।)

৪. ব্রহ্মা:- ব্রহ্মা এই ব্রহ্মের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিষ্ণু মধ্যম পুত্র এবং শিব কনিষ্ঠ/তৃতীয় পুত্র। ব্রহ্মার এই তিন পুত্রগণ কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের এক এক বিভাগের স্বামী (প্রভু) এবং এনারা নাশবান।

বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য কৃপা করে নিম্নলিখিত সৃষ্টি রচনা পড়ুন:-

{কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) সূক্ষ্ম বেদে অর্থাৎ কবীর্বাণীতে নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ংই বলেছেন। যা হলো নিম্নরূপ }

সর্বপ্রথম কেবল একটাই স্থান ‘অনামী’ (অনাময়) লোক ছিল। যাকে অকহ লোকও বলা হয়ে থাকে, পূর্ণ পরমাত্মা, ঐ অনামী লোকে একা থাকতেন। ঐ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম কবীর্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর। সমস্ত আত্মারা ঐ পূর্ণ ধনীর শরীরে সমাহিত হয়ে ছিল। এই কবীর্দেবের উপমাত্মক (পদাধিকার জনিত) নাম অনামি পুরুষ (পুরুষের অর্থ হলো প্রভু, প্রভু মানুষকে নিজের স্বরূপে বানিয়েছেন, এই জন্য মানবের নামও পুরুষ হয়েছে।) অনামি পুরুষের এক লোমকূপের প্রকাশ শঙ্খ সূর্যের প্রকাশ থেকেও অধিক।

বিশেষ কথা:- যেমন কোন দেশের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নাম তো কিছু অন্যই হয় কিন্তু পদজনিত উপমাত্মক নাম প্রধানমন্ত্রী হয়। অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী নিজের অধীনেই বিভিন্ন বিভাগ রাখেন। তখন যে বিভাগের কাগজপত্রে হস্তাক্ষর করেন, ঐ সময় ঐ পদ এর নাম লেখেন। যেমন গৃহ মন্ত্রকের কাগজপত্রে হস্তাক্ষর করার সময় নিজেকে গৃহমন্ত্রী হিসেবে লেখেন। ওখানে ঐ ব্যক্তির হস্তাক্ষরের শক্তি কম। এইভাবেই কবীর পরমেশ্বরের (কবীর্দেবের) জ্যোতি বিভিন্ন লোকে আলাদা আলাদা হয়ে যায়।

পরমেশ্বর কবীর সাহেবের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র

অনামী লোকঃ- এই লোকে কবীর সাহেব অনামী পুরুষ রূপে আছেন। এখানে একাকি থাকেন।

অগম লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অগম পুরুষ রূপে থাকে।

অলখ লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অলখ পুরুষ রূপে থাকে।
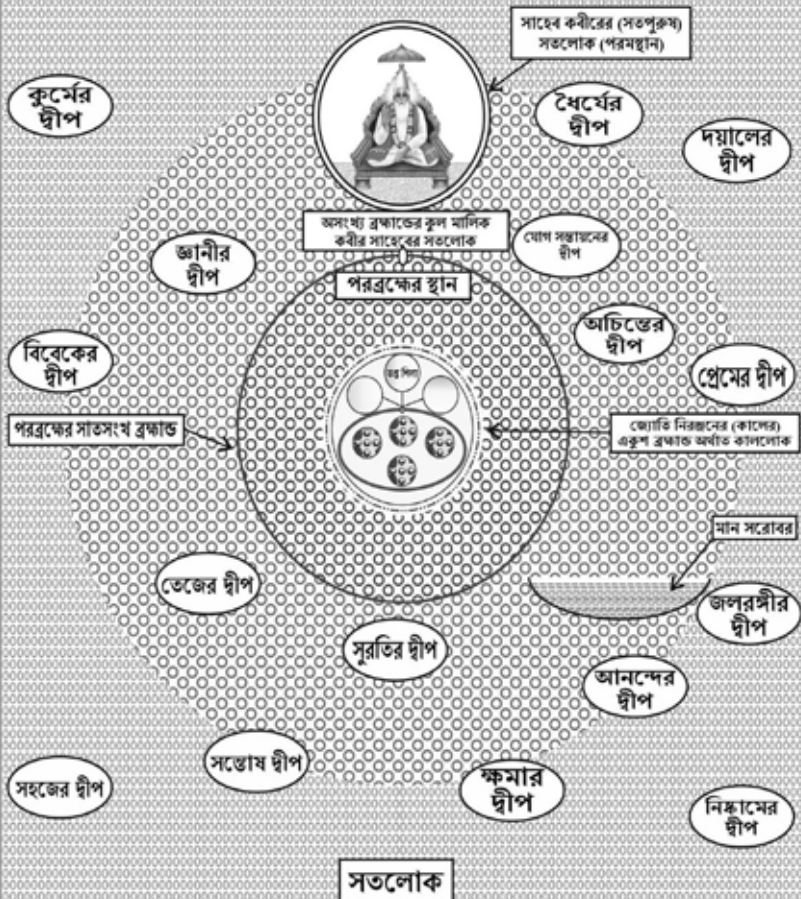
পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) এইভাবেই নিচের আরো তিন লোক (অগম লোক, অলখ লোক, সতলোক) শব্দ (বচন) দিয়ে রচনা করেছেন। এই পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব-ই (কবীর পরমেশ্বর) অগম লোকে প্রকট হয়েছেন এবং পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) অগম লোকেরও স্বামী এবং ওখানে এনার উপমাত্মক (পদ জনিত নাম) নাম অগমপুরুষ অর্থাৎ অগম প্রভু। এই অগম প্রভুর মানব সদৃশ্য শরীর ভীষণ তেজোময়, যাঁর এক লোমকূপের প্রকাশ বর্বুদ সূর্যের রশ্মির থেকেও বেশি।

এই পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব (কবীর দেব = কবীর পরমেশ্বর) অলখ লোকেও প্রকট হয়েছেন এবং স্বয়ং এই অলখ লোকেরও স্বামী এবং পদ জনিত উপমাত্মক নাম অলখ পুরুষও এই পরমেশ্বরই আর এই পূর্ণ প্রভুর মানব সদৃশ্য শরীর তেজময় (স্বর্জ্যোতি) ও স্বপ্রকাশিত। ওনার এক লোমকূপের প্রকাশ অর্বুদ সূর্যের প্রকাশের থেকেও অধিক।

এই পূর্ণ প্রভু সতলোকেও প্রকট হয়েছেন, সতলোকেরও অধিপতি তিনি। এই জন্য ওনার পদজনিত উপমাত্মক নাম অবিনাশী প্রভু)। এনারই নাম অকাল মূর্তি – শব্দ স্বরূপী রাম – পূর্ণ ব্রহ্ম – পরম অক্ষর ব্রহ্ম ইত্যাদি। এই সতপুরুষ কবীর্দেব (কবীর প্রভু) এর মানব সদৃশ্য শরীর তেজোময়। যার এক লোম কূপের প্রকাশ কোটি সূর্য কোটি চন্দ্রমার মিলিত প্রকাশের থেকেও অধিক।

এই কবীর দেব (কবীর প্রভু) সতপুরুষ রূপে প্রকট হয়ে, সতলোকে বিরাজমান হয়ে, প্রথমে সতলোকে অন্যান্য রচনা করেন।

একটি শব্দ (বচন) দ্বারা ষোলোটি দ্বীপ রচনা করেন। তারপর ১৬ টি শব্দ দ্বারা ১৬ টি পুত্র উৎপন্ন করেন। একটি মানসরোবর রচনা করেন যা অমৃতে ভরা। ১৬ জন পুত্রের নাম হল:- ১.“কূর্ম” ২. “জ্ঞানী” ৩.“বিবেক” ৪.“তেজ” ৫.“সহজ” ৬.“সন্তোষ” ৭.“সুরতি” ৮.“আনন্দ” ৯.“ক্ষমা” ১০.“নিষ্কাম” ১১.“জলরঙ্গী” ১২.“অচিন্ত” ১৩.“প্রেম” ১৪.“দয়াল” ১৫.“ধৈর্য” ১৬. “যোগ সন্তায়ন” অর্থাৎ “যোগজীত”।

সতপুরুষ কবীরদেব নিজের পুত্র অচিন্তকে সত্যলোকের অন্যান্য রচনার ভার দিয়েছিলেন এবং শক্তি প্রদান করেছিলেন। অচিন্ত অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) কে শব্দ দ্বারা উৎপন্ন করেন এবং বলেন যে আমাকে সাহায্য করো। অক্ষর পুরুষ স্নান করার জন্য মান সরোবরে গিয়েছিল, ওখানে ভীষণ আনন্দ পায় আর শুয়ে ঘুমিয়ে যায়। অনেক দিন পর্যন্ত বাইরে আসে না। তখন অচিন্তর প্রার্থনা শুনে অক্ষর পুরুষ কে নিদ্রা থেকে জাগানোর জন্য কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) ঐ মানসরোবরের কিছু অমৃত জল নিয়ে একটি অণ্ড বানান এবং ঐ অন্ডের মধ্যে একটি আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর ঐ অন্ডকে মানসরোবরের অমৃত জলে ছেড়ে দেন। অন্ডের গড়গড় আওয়াজ শুনে অক্ষর পুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি ক্রোধে অন্ডটির দিকে তাকান, যার কারণে অন্ডটি দুভাগ হয়ে যায়। তার মধ্যে থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন ক্ষর পুরুষ বেরিয়ে আসে, যাকে পরের দিকে ‘কাল’ বলা হয়েছে। এনার আসল নাম ‘কৈল’। তখন সতপুরুষ (কবীর্দেব) আকাশবাণী করলেন যে, তোমরা দুজন বাইরে এসো এবং অচিন্তর দ্বীপে গিয়ে থাকো। আদেশ পেয়ে অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষর পুরুষ (কৈল) দুজনে অচিন্তর দ্বীপে থাকতে শুরু করলো। (বাচ্চাদেরকে তাদের নাবালকত্ব দেখালেন যে, পরে যেন তাদের প্রভুত্ব করার ইচ্ছা না জাগে, কেননা সামর্থ্য ছাড়া কোন কাজ সফল হয় না।) তারপর পূর্ণ ধনী কবির্দেব সমস্ত রচনা স্বয়ং করলেন। নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা এক

রাজেশ্বরী (রাষ্ট্রী) শক্তি উৎপন্ন করলেন। যার মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপিত করলেন। একেই পরাশক্তি পরা নন্দিনী ও বলা হয়। পূর্ণ ব্রহ্ম সমস্ত আত্মাদের নিজের মধ্যে থেকে নিজের বচন শক্তি দ্বারা, নিজের মতো মানব সদৃশ্য শরীরে উৎপন্ন করলেন। প্রত্যেক হংস আত্মার শরীর পরমাত্মার মতো করেই রচনা করলেন, যার প্রকাশ ষোল সূর্যের সমান মানব সদৃশ্যই। কিন্তু পরমেশ্বরের শরীরের এক লোমকূপের প্রকাশ কোটি সূর্যের থেকেও অধিক। অতি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরে ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) ভাবলেন যে, আমরা তিনজন (অচিন্ত – অক্ষর পুরুষ – ক্ষর পুরুষ) একটা দ্বীপে থাকছি। আর অন্যরা এক একটা দ্বীপে থাকছে। আমিও সাধনা করে আলাদা দ্বীপ প্রাপ্ত করবো। এইরকম ভাবনা চিন্তা করে তিনি এক পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সত্তর (৭০) যুগ পর্যন্ত তপস্যা করলেন।

"আত্মারা কালের জালে কিভাবে ফেঁসে গেল" ?

বিশেষ কথা :- যখন ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) তপস্যা করছিল, তখন আমরা সব আত্মারা যারা আজ জ্যোতি নিরঞ্জনের ২১ ব্রহ্মাণ্ডে থাকি, তার সাধনার প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং হৃদয় থেকে তাকে চাইতে শুরু করেছিলাম। নিজের সুখদায়ী প্রভু সত্য পুরুষের প্রতি বিমুখ হয়ে গেলাম। প্রতিব্রতা পদ থেকে আমরা পতিত হয়ে গেলাম। পূর্ণ প্রভু বার বার সাবধান করা সত্ত্বেও ক্ষর পুরুষের প্রতি আমাদের আসক্তি দূর হলো না। {এই প্রভাব আজও কাল সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তরুণ তরুণীরা ফিল্মস্টারদের (অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের) ছলনাময় চেহারা দেখে আর ওদের রোজগারের উদ্দেশ্যে করা অভিনয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে যায়। থামালেও থামে না। যদি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিকটবর্তী কোনো শহরে আসে, তো দেখবেন এই নির্বোধ ছেলেমেয়েরা ভিড় করে কেবল তাদের দর্শনের জন্য, প্রচুর সংখ্যায় জড়ো হয়ে যাবে। কোনো লাভ হয় না, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের রোজগার করছে আর তরুণ তরুণীদের পকেট খালি হচ্ছে। মা-বাবা যতই বোঝাক কিন্তু তরুণ তরুণীরা মানে না। কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো লুকিয়ে-চুরিয়ে চলে যাবেই।}

পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর প্রভু) ক্ষর পুরুষ কে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তুমি কি চাও? তিনি বললেন যে, পিতাজী এই স্থান আমার জন্য ছোট, আমাকে কৃপা করে আলাদা দ্বীপ প্রদান করুন। হক্কা কবীর (সত্ কবীর) তাকে ২১ টি ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করে দিলেন। কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জ্যোতি নিরঞ্জন ভাবলেন, এর মধ্যে কিছু রচনা করা দরকার। খালি ব্রহ্মাণ্ড (প্লট) কি কাজে লাগবে। এইরকম চিন্তাভাবনা করে সত্তর (৭০) যুগ তপস্যা করে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেবের (কবীর প্রভু) কাছ থেকে রচনা সামগ্রী চাইলেন। সতপুরুষ তাকে তিনগুণ এবং পাঁচ তত্ত্ব প্রদান করলেন। সেগুলি দিয়ে ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) নিজের ব্রহ্মাণ্ডে কিছু রচনা করলেন। তারপর আবার ভাবলেন যে এর মধ্যে জীব থাকা দরকার, একা একা ভাল লাগে না। এই কথা ভেবে ৬৪ যুগ পর্যন্ত আবার তপস্যা করলেন। পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব জিজ্ঞাসা করায় বললেন যে আমাকে কিছু আত্মা দিয়ে দিন। আমার একা একা ভালো লাগছে না। তখন সতপুরুষ কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন যে, ব্রহ্ম তোর তপস্যার প্রতিফল স্বরূপ তোকে আরও ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার আত্মাদেরকে কোনো জপ-তপ-সাধনার ফলস্বরূপ দিতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ স্বেচ্ছায় তোর সাথে যেতে চায় তাহলে সে যেতে পারে। যুবা কবীর (সমর্থ কবীর) এর বচন শুনে

জ্যোতি নিরঞ্জন আমাদের কাছে এলো। আমরা সমস্ত হংস আত্মারা আগে থেকেই তার উপরে আসক্ত ছিলাম। আমরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে গেলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন বললেন যে, আমি পিতাজীর কাছ থেকে আলাদা ২১ টা ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করেছি, সেখানে নানা প্রকারের রমনীয় স্থান বানিয়েছি। তোমরা কি আমার সাথে যাবে? আমরা সমস্ত হংস আত্মারা যারা আজ এই ২১ ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ কষ্টে হয়রান হয়ে আছি বললাম যে, আমরা তৈরি আছি এখন যদি পিতাজী আজ্ঞা দেন, তখন ক্ষরপুরুষ, পূর্ণ ব্রহ্ম মহান কবির (সমর্থ কবীর প্রভু)-র কাছে গেলেন এবং সমস্ত কথা জানালেন। তারপর কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন যে, আমার সামনে স্বীকৃতি দেবে যারা তাদের আজ্ঞা দেব। ক্ষরপুরুষ এবং পরম অক্ষর ব্রহ্ম (কবিরমিতৌজা = কবির অমিত ঔজা অর্থাৎ যার শক্তি অসীম, উনিই কবীর) দুজনে আমদের/সমস্ত হংসাত্মাদের কাছে এলেন। সত কবির্দেব বললেন যে, যে হংস আত্মারা ব্রহ্মের সাথে যেতে চাও, তারা হাত তুলে স্বীকৃতি দাও। আপন পিতার সামনে কারোর হিম্মত হলো না, কেউ স্বীকৃতি দিল না। অনেক সময় পর্যন্ত নীরবতা ছেয়ে রইলো। তারপর একটি হংস আত্মার সাহস হলো আর বললো যে, পিতাজী! আমি যেতে চাই। তখন তার দেখাদেখি (আজ যারা কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে আছি) আমরা সমস্ত আত্মারা স্বীকৃতি দিয়ে দিলাম। পরমেশ্বর কবীর জ্যোতি নিরঞ্জন কে বললেন যে তুমি তোমার জায়গায় চলে যাও। যারা তোমার সাথে যাওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছে সেই সমস্ত আত্মাদেরকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফিরে গেল। ঐ সময় পর্যন্ত এই একুশ ব্রহ্মাণ্ড সতলোকেই ছিল।

তারপর পূর্ণব্রহ্ম সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হংস কে মেয়ের রূপ দিলেন, কিন্তু স্ত্রী ইন্দ্রিয় রচনা করেননি। এবং সমস্ত আত্মাদেরকে যারা জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) এর সাথে যেতে সহমত প্রকাশ করেছিল তাদের সকলকে ঐ মেয়ের শরীরে প্রবিষ্ট করে দিলেন, এবং তার নাম আষ্ট্রা (আদি মায়া/প্রকৃতি দেবী/দুর্গা) হলো। আর সত্যপুরুষ বললেন যে পুত্রী আমি তোমাকে শব্দ শক্তি প্রদান করে দিয়েছি। যত জীব ব্রহ্ম বলবে, তুমি উৎপন্ন করে দেবে। পূর্ণব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর সাহেব) নিজের পুত্র সহজ দাসের দ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সহজ দাস, জ্যোতি নিরঞ্জনকে গিয়ে বললেন যে, পিতাজী এই বোনের শরীরের মধ্যে ঐ সমস্ত আত্মাদের প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন, যারা তোমার সাথে যাওয়ার জন্য সহমত প্রকাশ করেছিল। আর এই বোনকে পিতাজী বচন শক্তি প্রদান করেছেন, যতগুলি জীব তুমি চাইবে, প্রকৃতি নিজের শব্দ দ্বারা উৎপন্ন করে দেবে। এই কথা বলে সহজ দাস নিজের দ্বীপে ফিরে গেল।

যুবতী হওয়ার কারণে, মেয়েটির রং-রূপের জৌলুষ ফুটে উঠেছিল, মেয়েটির রূপে মোহিত হয়ে ব্রহ্মের মনে কামনা-বাসনা জেগে ওঠে। আর প্রকৃতি দেবীর সাথে অভদ্র গতিবিধি শুরু করে দেয়। তখন দুর্গা বললেন যে, জ্যোতি নিরঞ্জন! আমার কাছে পিতাজীর প্রদান করা শব্দ শক্তি আছে তুমি যত প্রাণী চাইবে আমি বচন দিয়ে উৎপন্ন করে দেবো। তুমি মৈথুন পরম্পরা শুরু করো না। তুমিও ঐ একই পিতার শব্দ শক্তি দ্বারা অন্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছো আর আমিও ঐ পরম পিতার বচন দ্বারা পরে উৎপন্ন হয়েছি। তুমি আমার বড় ভাই হও, ভাই-বোনের মধ্যে এরকম সংযোগ মহাপাপের কারণ হবে। কিন্তু জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর একটা প্রার্থনাও শুনলো না আর নিজের শব্দ শক্তিতে নখ দিয়ে প্রকৃতি দেবীর স্ত্রী-অঙ্গ (ভগ-যোনী) বানিয়ে দিল এবং বলাৎকার করার চেষ্টা করলো। সেই সময় দুর্গা নিজের ইজ্জত রক্ষার করার আর কোন উপায় না দেখে সুক্ষ্ম রূপ বানালো আর জ্যোতি নিরঞ্জনের খোলা মুখ দিয়ে

এক ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র
শূন্য স্থান
পরমেশ্বরের রাজদূত ভবন
মহাব্রহ্মা রূপে কাল
তমোগুন প্রধান স্থান
রজগুন প্রধান স্থান
ব্রহ্মলোক
সপ্তপুরী
ধর্মরাজের লোক
স্বর্গ
নরক
সুমেরু পর্বত
ফলযুক্ত বন
জটাকুণ্ডলী দ্বীপ
বিষ্ণুলোক
শিবলোক
সূর্য
ব্রহ্মালোক
পৃথিবী
চন্দ্রমা
ইন্দ্রের লোক
মহাতল
বিতল
অতল
সুতল
রসাতল
তলাতল
পাতাল লোক

পেটের মধ্যে প্রবেশ করে, পূর্ণব্রহ্ম কবীর দেব কে নিজের রক্ষার্থে প্রার্থনা করতে লাগলো। সেই সময় কবীরদেব নিজের পুত্র যোগ সন্তায়ন অর্থাৎ জোগজীতের রূপ বানিয়ে ওখানে প্রকট হলেন এবং কন্যাকে ব্রহ্মের উদর থেকে বাইরে নিয়ে এলেন আর বললেন যে, জ্যোতি নিরঞ্জন আজ থেকে তোর নাম 'কাল' হবে। তোর জন্ম মৃত্যু হতে থাকবে। এই জন্য তোর নাম ক্ষর পুরুষ হবে এবং ১ লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে প্রতিদিন আহার করবি আর সওয়া লক্ষ উৎপন্ন করবি। তোমাদের দুজনকে একুশ ব্রহ্মাণ্ড সমেত এখান থেকে নিষ্কাশীত করা হলো। এই কথা বলতেই ২১ টি ব্রহ্মাণ্ড বিমানের মত চলতে শুরু করল। সহজ দাসের দ্বীপের পাশ দিয়ে সতলোক থেকে ষোল শঙ্খ ক্রোশ (এক ক্রোশ প্রায় তিন কিমি হয়) দূরে গিয়ে থেমে গেল।

বিশিষ্ট বিবরণ:- এখনো পর্যন্ত তিনটি শক্তির বর্ণনা এসেছে।

১.পূর্ণব্রহ্ম, যাকে অন্য উপমাত্মক নামেও জানা যায়। যেমন সতপুরুষ, অকালপুরুষ, শব্দস্বরূপী রাম, পরম অক্ষম পুরুষ, ইত্যাদি। এই পূর্ণ ব্রহ্ম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী এবং বাস্তবে/আসলে অবিনাশী।

২.পরব্রহ্ম, যাকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়, তিনি বাস্তবে অবিনাশী নন। ইনি সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক।

৩. ব্রহ্ম, যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন, কাল, কৈল ক্ষরপুরুষ এবং ধর্মরায় ইত্যাদি নামে জানা যায়। যিনি কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এরপর এই ব্রহ্মের সৃষ্টির এক ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দেওয়া হবে যার মধ্যে আরো তিনটি নাম আপনারা পড়তে গিয়ে পাবেন - ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মার মধ্যে পার্থক্য:- একটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোপরি স্থানে ব্রহ্ম/ক্ষর-পুরুষ স্বয়ং তিনটি গুপ্ত স্থানের রচনা করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব রূপে থাকেন আর নিজের পত্নী প্রকৃতি/দুর্গার সহযোগে তিনটি পুত্র উৎপন্ন করেন। তাদের নামও ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব রাখেন। ব্রহ্মের পুত্র ব্রহ্মা যিনি, তিনি এক ব্রহ্মাণ্ডের কেবল ৩ লোকের (পৃথিবী লোক স্বর্গলোক এবং পাতাল লোকের) একটি রজোগুণ বিভাগের মন্ত্রী/স্বামী/প্রভু। এনাকে ত্রিলোকীয় ব্রহ্মা বলা হয় আর ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা রূপে থাকেন তাকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মলোকীয় ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্ম (কাল)-কে সদাশিব, মহাশিব, মহাবিষ্ণুও বলা হয়েছে।

শ্রী বিষ্ণু পুরাণের মধ্যে প্রমাণ:- চতুর্থ অংশ অধ্যায় নম্বর একের পৃষ্ঠা নম্বর ২৩০-২৩১ এ শ্রী ব্রহ্মা বলছেন, যে অজন্মা, সর্বময় বিধাতা পরমেশ্বর এর আদি মধ্য অন্তর স্বরূপ স্বভাব আর সার আমি জানতে পারি না (শ্লোক ৮৩)।

যিনি আমার রূপ ধারণ করে সংসারের রচনা করেন, স্থিতির সময়, যে পুরুষ রূপে থাকেন এবং যিনি রুদ্র রূপে বিশ্বকে গ্রাস করেন, অনন্ত রূপ দ্বারা সম্পূর্ণ জগতকে ধারণ করেন (শ্লোক ৮৬)।

"শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের উৎপত্তি কথা"

কাল (ব্রহ্ম) প্রকৃতিকে (দুর্গা) বললেন, এখন আর আমাকে কে কি করতে পারবে? মনের ইচ্ছামতো কাজ করব। প্রকৃতি পুনরায় প্রার্থনা করলেন যে, একটু তো লজ্জা শরম রাখো। প্রথমতঃ তুমি আমার বড় ভাই হও, কেননা তুমিও ঐ একই পিতার শব্দ শক্তি দ্বারা অন্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছো, আর আমিও ঐ পরম পিতার বচন দ্বারা পরে উৎপন্ন হয়েছি। দ্বিতীয়তঃ তোমার পেট থেকে বাইরে এসেছি, তাহলে আমি তোমার মেয়ে হলাম আর তুমি আমার পিতা হলে। এই পবিত্র সম্পর্ককে নষ্ট করা মহাপাপ হবে। আমার

কাছে পিতার প্রদান করা শব্দ শক্তি রয়েছে। যতগুলি প্রাণী তুমি বলবে আমি বচন দ্বারা উৎপন্ন করে দেবো। জ্যোতি নিরঞ্জন দুর্গার একটাও অনুনয়-বিনয় শুনল না এবং বলল যে আমার যা সাজা পাওয়ার ছিল, তা পেয়ে গেছি। আমাকে সতলোক থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, এবার যা মন চায় তাই করবো। এই কথা বলে কালপুরুষ ক্ষরপুরুষ প্রকৃতির সাথে জোর জবরদস্তি বিবাহ করলেন এবং তিন পুত্রকে (রজোগুণ যুক্ত – ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ যুক্ত – বিষ্ণু এবং তমোগুণ যুক্ত – শিব শংকর) উৎপন্ন করলেন। যুবক না হওয়া পর্যন্ত তিন পুত্রকে দুর্গার দ্বারা অচেতন করে রেখে দেয়। তারপর যুবাবস্থায় এলে শ্রী ব্রহ্মাকে কমল ফুলের উপরে, শ্রীবিষ্ণুকে শীষনাগের শয্যায়, এবং শ্রী শিবকে কৈলাস পর্বতের উপর সচেতন ক'রে, তারপর সবাইকে একত্রিত করে দেন। এরপর প্রকৃতি দ্বারা তিন গুণের বিবাহ করিয়ে দেন এবং একটি ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি লোক (স্বর্গলোক এবং পাতার লোক) এর এক একটি বিভাগের মন্ত্রী/প্রভু/স্বামী নিযুক্ত করে দেন। যেমন শ্রী ব্রহ্মাকে রজোগুণ বিভাগে এবং শ্রীবিষ্ণুকে সত্ত্বোগুণ বিভাগে এবং শ্রী শিব শংকরকে তমোগুণ বিভাগের আর স্বয়ং নিজে গুপ্ত রূপে (মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিব রূপে) একটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটা ব্রহ্মলোক রচনা করেছে। তার মধ্যে তিনটে গুপ্তস্থান বানিয়ে রেখেছেন। একটি রজোগুণ প্রধান স্থান আছে যেখানে ব্রহ্ম (কাল) স্বয়ং মহা ব্রহ্মা (মুখ্যমন্ত্রী) রূপে থাকেন এবং নিজের পত্নী দুর্গাকে মহা সাবিত্রী রূপে রাখেন। এই দুজনের সংযোগে যে পুত্র এই স্থানে উৎপন্ন হয় তিনি স্বাভাবিকভাবেই রজোগুণী হয়ে যান। দ্বিতীয় স্থান সত্ত্বগুণ প্রধান বানিয়েছেন ওখানে এই ক্ষর পুরুষ মহাবিষ্ণু রূপ বানিয়ে থাকেন এবং নিজের পত্নী দুর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রেখে যে পুত্র উৎপন্ন করেন তার নাম বিষ্ণু রাখেন। এবং তৃতীয়তঃ এই কাল ওখানে একটি তমোগুন প্রধান ক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছেন। ওখানে ইনি স্বয়ং সদাশিব রূপ বানিয়ে থাকেন এবং নিজের পত্নী দুর্গাকে মহা পার্বতী রূপে রাখেন। এই দুজনের পতি পত্নী ব্যবহারে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তার নাম শিব রেখে দেন এবং তমোগুন যুক্ত করে দেন। (প্রমাণের জন্য দেখুন পবিত্র শিব মহাপুরাণ, বিদ্ধেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ২৪-২৬, যেখানে ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শিব, রুদ্র এবং মহেশ্বর এর থেকে অন্য কেউ সদাশিব রয়েছেন। রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬,৭, ৯ এর পৃষ্ঠা নম্বর ১০০ থেকে ১০৫ এবং ১১০ এ, অনুবাদ কারক হনুমান প্রসাদ পোদ্দার গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত এবং পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত, গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, যার অনুবাদক হলেন শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী।) তারপর এনাদেরকে ধোঁকার মধ্যে রেখে নিজের খাওয়ার জন্য জীবদের উৎপত্তি ব্রহ্মার দ্বারা এবং স্থিতি (একে অপরের প্রতি মায়া-মমতার বন্ধন রেখে কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখা) বিষ্ণুর দ্বারা এবং সংহার (কেননা কাল পুরুষ কে অভিশাপবশত: এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের সুক্ষ্ম শরীর থেকে নোংরা বের করে খেতে হয়। তার জন্য ২১তম ব্রহ্মাণ্ডে একটি তপ্ত শিলা রাখা আছে যেটা সততই গরম থাকে, সেখানে উত্তপ্ত করে নোংরা গলিয়ে আহার করেন, জীবাত্মা মরে না কিন্তু অসহ্য কষ্ট পায়। তারপর প্রাণীদেরকে তাদের কর্মের আধারে অন্য শরীর প্রদান করেন) শিবের দ্বারা করান। যেমন কোন ঘরে তিনটি কক্ষ আছে। এক কক্ষে অশ্লীল চিত্র লাগানো আছে। ওই কক্ষে যেতেই মনে মলিন বিচার চলে আসে। দ্বিতীয় কক্ষে সাধু-সন্ত-ভক্তদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে যেতেই মনে ভালো বিচার এবং প্রভুর প্রতি চিন্তা আসে। তৃতীয় কক্ষে দেশ ভক্ত শহীদদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে গেলে মনে বিদ্রোহীভাব বা জোশ ভাব উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম (কাল) নিজের চিন্তা ভাবনা (বিচার-বুদ্ধি) দিয়ে তিন গুণের তিনটি বিশেষ স্থানের রচনা করেন।

"তিন গুণ কি? প্রমাণ সহিত"

" তিন গুণ - রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব । এই তিন গুণ ব্রহ্ম (কাল) তথা প্রকৃতি (দূর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তিন জনই নশ্বর"

প্রমাণ:- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠা ২৪ থেকে ২৬ বিধ্যেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা" ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ আছে। কিন্তু সদা শিব (ব্রহ্ম-কাল) কে গুণাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ :- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ দেবী ভাগবত্ পুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩ :- ভগবান বিষ্ণু দূর্গার স্তুতি করে বলছেন - আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা এবং শঙ্কর তোমার কৃপায় বিদ্যমান আছি। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য (অবিনাশী), জগৎ জননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।

ভগবান শঙ্কর বললেন, যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার পরে উৎপন্ন হওয়া আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান নই? অর্থাৎ তুমিই আমাকে উৎপন্ন করেছো। এই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি-সংহারে তোমার গুণ সর্বত্র বিদ্যমান। এই তিন গুণে উৎপন্ন আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর সর্বদা নিয়মানুসারে কর্মে তৎপর থাকি।

❖ উপরোক্ত এই বিবরণ একমাত্র হিন্দীতে অনুবাদিত শ্রীদেবী মহাপুরাণে বিদ্যমান আছে। এখানে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। সেই জন্য আপনারা প্রমাণ দেখুন শ্রীমদদেবী ভাগবত মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণদাস প্রকাশিত মুম্বাই, এতে সংস্কৃত সহ হিন্দী অনুবাদ আছে। তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক ৪২:-

ব্রহ্মা - অহম্ ঈশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাত্সর্বে বয়ং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা। (৪২)

হিন্দী থেকে বাংলা অনুবাদ:- হে মাতা! ব্রহ্মা, আমি এবং শিব তোমার প্রভাবে (শক্তিতে বা দয়ায়) জন্ম নিয়েছি। আমরা নিত্য নই অর্থাৎ আমরা অবিনাশী নই। তাহলে অন্য দেবী দেবতা ইন্দ্রাদি কিভাবে নিত্য (অবিনাশী) হতে পারে? তুমিই অবিনাশী প্রকৃতি তথা সনাতনী দেবী।

পৃষ্ঠা ১১ - ১২, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৮ :- **যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাংৎবিকে কথমহং বিহিতঃ চ তমোগুণঃ কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণোঁ হরিঃ। (৮)**

অনুবাদ:- ভগবান শঙ্কর বললেন, "হে মাতা! যদি আমার উপর দয়াযুক্ত হন, তাহলে আমাকে তমোগুণ কেন বানিয়েছেন, কমল থেকে (পদ্ম) উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ কি জন্য বানিয়েছেন এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ কেন বানিয়েছেন? অর্থাৎ জীবের জন্ম - মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মে আমাদের কেন লাগিয়েছেন?

শ্লোক-১২ :- **রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদম শিবে (১২)**

হিন্দি :- নিজের পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা (সর্বদা) ভোগ বিলাস করতে থাকো। তোমার গতি (ভেদ) কেউ জানে না।

নিষ্কর্ষ :- উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে, রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিব, এই তিন জনই নশ্বর। দূর্গার স্বামী ব্রহ্ম (কাল) দূর্গার সাথে সদাভোগ বিলাস করতে থাকে। এটা প্রমাণিত হল যে, দূর্গা এবং ব্রহ্ম (কাল) ও সাকার।

"ব্রহ্ম (কাল) এর অব্যক্ত থাকার প্রতিজ্ঞা"

(সূক্ষ্ম বেদের অবশিষ্ট সৃষ্টি রচনা)

তিন পুত্রের উৎপত্তির পর ব্রহ্ম নিজের পত্নী দুর্গা (প্রকৃতি)-কে বলে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভবিষ্যতে কাউকে নিজের বাস্তবিক রূপে দর্শন দেবো না। যেই কারণে আমি অব্যক্ত বলে বিবেচিত হবো। দুর্গাকে বললো যে, তুমি আমার গোপন থাকার কথা কাউকে বলবে না। আমি গুপ্ত থাকবো। দুর্গা জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি কি নিজের পুত্র দেরকেও দর্শন দেবেন না? ব্রহ্ম বললো, আমি আমার পুত্রদের বা অন্যান্যদের কখনো কোনো সাধনার দ্বারাই দর্শন দেবো না, এটি আমার অটল নিয়ম থাকবে। দুর্গা বললো, এতো আপনার উত্তম নিয়ম নয়, যে আপনি নিজের সন্তানদের কাছ থেকেও লুকিয়ে থাকবেন। তখন কাল বলে, দুর্গা, এটি আমার বাধ্যতা। আমি এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে নিত্য আহার করার অভিশাপ পেয়েছি। আমার পুত্রের (ব্রহ্মা,বিষ্ণু,মহেশ) যদি জানতে পারে তবে তারা উৎপত্তি, স্থিতি সংহার কার্য করবে না। এই কারণেই, আমার এই অনুত্তম নিয়ম সদা থাকবে। যখন এই তিনজন কিছুটা বড় হয়ে যাবে তখন এদের অচেত করে দেবে। আমার বিষয়ে কিছু জানাবে না, নইলে তোমাকেও সাজা দেবো। এই ভয়ে দুর্গা বাস্তবিকতা কাউকে বলেন না।

তাই গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ এ বলেছে যে, এই বুদ্ধিহীন জনসম্প্রদায় আমার অনুত্তম নিয়ম দ্বারা অপরিচিত যে, আমি কখনও কারোর সামনে প্রকট হই না, নিজের যোগমায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকি। এই কারণে অব্যক্ত আমাকে, মনুষ্য রূপে আগত কৃষ্ণ মনে করে।

(অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন (মম্) আমার (অনুত্তমম্) অনুত্তম অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ (অব্যয়ম্) অবিনাশী (পরম্ ভাবম্) বিশেষ ভাবকে (অজানন্তঃ) না জেনে (মাম্ অব্যক্তম্) অব্যক্ত আমাকে (ব্যক্তিম্) মনুষ্য রূপে (আপন্নম) আসা (মন্যন্তে) মনে করে অর্থাৎ আমি কৃষ্ণ নই। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪)

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এবং ৪৮ এর মধ্যে বলেছেন যে, এটি আমার বাস্তবিক কাল রূপ। এই রূপের দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি না বেদে বর্ণিত বিধিতে, না জপ করে, না তপ করে তথা না কোনো প্রকার ক্রিয়া দ্বারা সম্ভব।

তিন সন্তান যখন যুবক হয়ে যায়, তখন মাতা ভবাণী (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) তাদেরকে বললেন, "তোমরা সাগর মন্থন করো।" প্রথম বারে সাগর মন্থন করলে (জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের নিশ্বাস দ্বারা চার বেদ উৎপন্ন করলো এবং তাদেরকে সাগরে নিবাস করো বলে গুপ্ত বাণী দ্বারা আজ্ঞা দিল) যে চার বেদ বেরোয়, সেগুলি ব্রহ্মা নিলেন। বেদগুলি নিয়ে তিন সন্তান মায়ের কাছে আসলে, মাতা বললেন, "ব্রহ্মা! বেদ গুলি তুমি নিজের কাছে রাখো এবং পড়ো।"

বিশেষ :- বাস্তবে পূর্ণব্রহ্মাই, ব্রহ্ম অর্থাৎ কালকে পাঁচটি বেদ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম তার মধ্যে কেবল চারটি বেদ প্রকট করে। আর পঞ্চম বেদটি লুকিয়ে রাখে। যা পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে "কবির্গির্ভীঃ" অর্থাৎ কবির্বাণী (কবীর বাণী) দ্বারা প্রবাদ বাক্য ও দোঁহার মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় বার সাগর মন্থন করলে তিন কন্যা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি (দুর্গা) নিজেরই অন্য তিনটি রূপ (সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও পার্বতী) ধারণ করে সমুদ্রে লুকিয়ে গেলেন। সমুদ্র মন্থনের সময় বেরিয়ে এলেন। মাতা তিন জনকে ভাগ করে দিলেন। তিনটি রূপের মধ্যে ভগবান ব্রহ্মাকে সাবিত্রী, ভগবান বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ভগবান শঙ্করকে পার্বতী,

পত্নী রূপে দিলেন। তিন জনেরই ভোগ বিলাসের মাধ্যমে সুর ও অসুর দুই'ই জন্ম নিল।

{তৃতীয় বার সাগর মন্থন করলে ব্রহ্মা চৌদ্দটি রত্ন, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাগণ অমৃত, অসুরগণ মদ (মদিরা) প্রাপ্ত করে এবং পরোপকারী শিব বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করে নেয়। এটি অনেক পরের ঘটনা।} বেদ পড়ার পর ব্রহ্মা জানতে পারেন যে, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকর্তা কূলের মালিক পুরুষ (প্রভু) কেউ অন্য। তখন শ্রী ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণুকে বললেন বেদে বর্ণিত আছে যে, সৃজনহার অন্য কোনো প্রভু রয়েছেন। অথচ বেদ বলছে যে এর খোঁজ আমরাও জানি না। তার জন্য সংকেত আছে যে, কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে জিজ্ঞেস করো। ব্রহ্মা তখন মাতার কাছে এলেন এবং সব বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। মাতা বলে থাকতেন যে, আমি (দুর্গা) ছাড়া আর কেউ নেই। আমিই কর্তা, আমিই সর্ব শক্তিমান। ব্রহ্মা বললেন কিন্তু বেদ ঈশ্বরের সৃষ্টি এটি মিথ্যা হতে পারে না। তখন দুর্গা বললেন, তোমার পিতা তোমাকে দর্শন দেবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। ব্রহ্মা তার মাতা কে বললেন, মা আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয়ে গেছে। আমি ঐ পুরুষকে (প্রভুকে) খুঁজে বের করবই। দুর্গা বললেন, যদি তিনি দর্শন না দেন তবে তুমি কি করবে? আমি আপনাকে নিজের মুখ দেখাবো না, ব্রহ্মা বললেন। অপর দিকে জ্যোতি নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করেছে আমি অব্যক্ত অবস্থায় থাকবো, কাউকে দর্শন দেবো না অর্থাৎ ২১ ব্রহ্মাণ্ডে কখনও নিজের বাস্তবিক কাল রূপে আকার ধারণ করে আসবো না।

গীতা অধ্যায় নং. ৭ এর শ্লোক নং. ২৪

অব্যাক্তম্, ব্যক্তিম্, আপন্নম্, মন্যন্তে, মাম্, অবুদ্ধয়ঃ।
পরম্ ভাবম্, অজানন্তঃ, মম, অব্যয়ম্ অনুত্তমম্॥ ২৪॥

অনুবাদ : (অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন লোকেরা (মম্) আমার (অনুতমম্) অশ্রেষ্ঠ (অব্যয়ম্) অটল (পরম্) পরম্ (ভাবম্) ভাবকে (অজানন্তঃ) না জেনে (অব্যকত্তম্) অসদৃশ্যমান (মাম্) আমি কালকে (ব্যকত্তিম্) আকার রূপে কৃষ্ণ অবতার (আপন্নম্) প্রাপ্ত হয়েছে (মন্যন্তে) মনে করে।

গীতা অধ্যায় নং. ৭ এর শ্লোক নং. ২৫

ন, অহম্ প্রকাশঃ, সর্বস্য, যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়ঃ, অয়ম্, ন, অভিজানাতি, লোকঃ, মাম্, অজম্, অব্যয়ম্ ॥ ২৫॥

অনুবাদ : (অহম্) আমি (যোগমায়া সমাবৃতঃ) যোগমায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকা (সর্বস্ব) সবার (প্রকাশঃ) প্রত্যক্ষ (ন) হয় না অর্থাৎ অদৃশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত থাকি তাই (অজম্) জন্ম না নেওয়া (অব্যয়ম্) অবিনাশী অটল ভাবকে (অয়ম্) এই (মূঢ়ঃ) অজ্ঞানী (লোকঃ) জনসম্প্রদায় সংসার (মাম্) আমাকে (ন) (অভিজানাতি) জানে না অর্থাৎ আমাকে অবতার রূপে আগত মনে করে। কারণ, ব্রহ্ম নিজ শব্দ শক্তি দ্বারা নানান রূপ ধারণ করে নেয়। ব্রহ্ম হলো দুর্গার স্বামী তাই উপরোক্ত মন্ত্রে বলেছেন যে, আমি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিদের মতো দুর্গার থেকে জন্ম নিই না।

"নিজের পিতাকে (কাল/ব্রহ্ম) প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মার প্রচেষ্টা"

শ্রী দুর্গা ব্রহ্মাকে বললেন যে, অলখ নিরঞ্জন তোমার পিতা কিন্তু সে তোমাকে দর্শন দেবেনা। ব্রহ্মা বললেন, আমি দর্শন করে তবেই ফিরবো। মাতা জিজ্ঞাসা করলেন পিতার দর্শন না হলে তুই কি করবি? ব্রহ্মা বললেন আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পিতার দর্শন যদি না হয় তবে আমি আপনার সম্মুখীন হবোনা। এই বলে শ্রী ব্রহ্মা ব্যকুল

হয়ে উত্তর দিকে রওনা দিলেন যেদিকে কেবল মাত্র অন্ধকারময় ছিল। সেখানে ব্রহ্মা চার যুগ পর্যন্ত ধ্যানমগ্ন ছিলেন কিন্তু কোনো কিছুই প্রাপ্ত হয়নি। কাল আকাশবাণী করলো যে জীব উৎপত্তি করোনি কেনো? ভবাণী বললেন, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মা জেদ করে আপনার খোঁজে গিয়েছে। ব্রহ্মাকে ছাড়া জীব উৎপত্তির সব কার্য অসম্ভব। ব্রহ্ম (কাল) বললো, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আমি দর্শন দেবো না। তারপর দুর্গা (প্রকৃতি) নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা গায়েত্রী নামে একটি কন্যা উৎপন্ন করলেন এবং তাকে ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বললেন। গায়েত্রী যখন ব্রহ্মার কাছে গেলেন তখন ব্রহ্মা সমাধি অবস্থায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন যার জন্য তিনি কিছুই টের পেলেন না যে কেউ একজন এসে উপস্থিত হয়েছে। তারপর আদি কুমারী (প্রকৃতি) ধ্যান যোগের মাধ্যমে গায়েত্রীকে বললেন, ব্রহ্মার চরণ স্পর্শ করো। গায়েত্রী তেমনটাই করলেন। ফল স্বরূপ ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রধিত হয়ে বললেন "কোন পাপিনী আমার ধ্যান ভঙ্গ করলি! আমি তোকে অভিশাপ দেবো। এইকথা শুনে গায়েত্রী বলতে লাগলেন, আমার কোনো দোষ নেই, প্রথমে আমার কথা শুনুন তারপর অভিশাপ দেবেন। মাতা আপনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে বলেছেন, কারণ আপনাকে ছাড়া জীবের উৎপত্তি সম্ভব নয়। ব্রহ্মা বললেন কিন্তু আমি যাই কিভাবে? পিতার দর্শন তো হলো না, এখন যদি আমি যাই, তাহলে আমার উপহাস করা হবে। তাই, যদি আপনি মাতার কাছে এটা বলে দেন যে, ব্রহ্মা তার পিতার (জ্যোতি নিরঞ্জন) দর্শন পেয়েছে তবে আমি আপনার সাথে যাব। তখন গায়েত্রী ব্রহ্মাকে বললেন যে আপনি যদি আমার সাথে সম্ভোগ (সেক্স) করেন তবেই আমি আপনার মিথ্যা সাক্ষী দেবো। ব্রহ্মা মনে করলেন পিতার দর্শন তো করা হলো না এই অবস্থায় মায়ের সামনে গেলে লজ্জাবোধ হবে তাই কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে গায়েত্রীর সাথে রতী ক্রিয়া (সম্ভোগ) করেন।

তারপর গায়েত্রী বললেন যে, আরও একজন সাক্ষী তৈরি করে নিলে কেমন হয়? ব্রহ্মা বললেন, খুবই ভালো হয়। গায়েত্রী তখন নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা একটি কন্যা (পূহপবতী নামে) উৎপন্ন করে এবং দুজনেই তাকে বলে দিলেন যে, তুমি সাক্ষী দিয়ে এই বলবে যে, "ব্রহ্মা পিতার দর্শন করেছেন।" এইকথা শুনে পূহপবতী বললো "আমি কেনো মিথ্যা সাক্ষী দেবো? হ্যাঁ, যদি ব্রহ্মা আমার সাথে রতী ক্রিয়া করে তাহলে আমি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারি।" গায়েত্রী ব্রহ্মাকে বোঝালেন যে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তখন ব্রহ্মা পূহপবতীর সাথে সম্ভোগ ক্রিয়া করে এবং তিনজনে আদি মায়া (প্রকৃতির) কাছে ফিরে আসে। এই দুই দেবী উপরোক্ত শর্ত এই কারণেই রেখেছিল, কেননা যদি ব্রহ্মা মাতার সামনে আমাদের মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কথা বলে দেয়, তাহলে মাতা আমাদেরকে অভিশাপ দেবে। এই জন্য তারা ব্রহ্মাকেও দোষী বানিয়ে নেয়।

(এখানে মহারাজ গরীবদাস জী বলছেন যে - "দাস গরীব যহ চূক ধুরোঁ ধুর")

ভাবার্থ:- এই কাল (ব্রহ্ম)-এর লোকে এই মন্দ কর্ম প্রারম্ভ থেকেই আছে এবং কালের লোকে দেবতারাও মন্দ কর্ম থেকে দূরে নেই। যেমন শ্রী বিষ্ণু জলনধর রাক্ষসের পতিব্রতা পত্নী তুলসীর সাথে ধোঁকা দিয়ে তার সাথে রতি ক্রিয়া (সেক্স) করে তার পতিব্রতা ধর্ম ভঙ্গ করে দেয়। ভগবান শ্রী শিব, শ্রী বিষ্ণুর মোহিনী রূপে মোহিত হয়ে তার সাথে সম্ভোগ (সেক্স) করার উদ্দেশ্যে তার হাত ধরে। সেই কারনে শ্রী শিবের শুক্র (বীর্য) স্খলিত হয়ে যায়। শ্রী বিষ্ণু নিজের বাস্তবিক রূপে প্রকট হয়ে যায়।

"ব্রহ্মাকে মাতার (দুর্গার) অভিশাপ"

ব্রহ্মা বেদে পড়েছে যে, যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র নং ১ - অগ্নেঃ তনুঃ অসি। যার অর্থ হল পরমেশ্বর তেজোময় শরীর যুক্ত। বিষ্ণবে ত্বা সোমস্য তনুঃ অসি। অর্থ হল - সকলের পালন করার জন্য ঐ অবিনাশী পরমাত্মার শরীর আছে। এজন্য ব্রহ্মা ঐ দুজন স্ত্রী-কে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, পরমাত্মা মানব সদৃশ্য ও তেজোময় শরীর যুক্ত।

ব্রহ্মাকে দেখে মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, " তুই কি তোর পিতার দর্শন পেয়েছিস?" ব্রহ্মা বললেন, হ্যাঁ আমার পিতার দর্শন হয়েছে। উনি মনুষ্য সদৃশ্য তেজোময় শরীর যুক্ত। দুর্গা বললেন, কোনো সাক্ষী দেখা। তখন ব্রহ্মা বললেন, এই দুজনের (ব্রহ্মার সাথে যে দুই দেবী ছিলেন) সামনেই সাক্ষাৎকার হয়েছে। দুর্গা ঐ দুই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের সামনে কি ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়েছে? দুই কন্যা বললো হ্যাঁ, আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি। এই কথা শুনে ভবাণীর (প্রকৃতির) মনে সন্দেহ হয় এই যে, ব্রহ্ম আমাকে বলেছিলেন যে "আমি কাউকে দর্শন দেবো না", কিন্তু এরা তো বলছে এদের দর্শন হয়েছে! তখন অষ্টাঙ্গী ধ্যান যোগের মাধ্যমে কাল/জ্যোতি নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আসলে ঘটনাটি কি? উত্তরে জ্যোতি নিরঞ্জন বললেন এরা তিন জনই মিথ্যা বলছে। মাতা তাদেরকে বললেন যে, তোমরা তো মিথ্যে কথা বলছো! আকাশবাণী হয়েছে এদের কোনো প্রকার দর্শন হয়নি। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন যে, "মাতা! আমি প্রতিজ্ঞা করে পিতার খোঁজে গিয়েছিলাম। কিন্তু পিতার (ব্রহ্ম) দর্শন না হওয়ায় আপনার সম্মুখে আসতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছিল। তাই আমরা মিথ্যে বলেছিলাম।" তখন মাতা (দুর্গা) বললেন,"আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।"

ব্রহ্মাকে অভিশাপ :- বিশ্বে তোর পূজা হবে না। তোর পরবর্তী বংশ কপটতা করবে। মিথ্যে কথা বলে জগৎকে ঠকাবে। উপর থেকে কর্ম কান্ড করবে কিন্তু অন্তরে বিকার থাকবে। পুরাণ পড়ে শুনিয়ে বেড়াবে অথচ সদগ্রন্থের বাস্তবিক জ্ঞান নিজেরাও জানবেনা তবুও মান সম্মান বশত ও ধন প্রাপ্তির জন্য গুরু হয়ে অনুগামীদের লোকবেদ (শাস্ত্র বিরুদ্ধ দন্ত কথা) শুনিয়ে বেড়াবে। দেব - দেবীর পূজা করে, অপরের নিন্দা করে কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করবে। নিজের অনুগামীদের তারা কখনোই পরমার্থের মার্গ বলবেনা। দক্ষিনা নেওয়ার জন্য জগৎকে পথভ্রষ্ট করবে। নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে, অপরকে নীচ মনে করবে। মাতার মুখ থেকে এইসব কথা শুনে ব্রহ্মা মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলো।

গায়েত্রীকে অভিশাপ : - তোর স্বামী একজন ষাড় হবে। তুই মৃত্যুলোকে গাভী হবি।

পুহপবতীকে অভিশাপ : - নোংরা জায়গায় ময়লায় তোর স্থান হবে। তোর ফুল কেউ পুজোয় নেবে না। এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্যই তোকে নরক ভোগ করতে হবে। তোর নাম কেওড়া কেতকী হবে। (হরিয়াণাতে একে কুসোন্ধী বলে, এটি সাধারণত ময়লাযুক্ত স্থানে পাওয়া যায়)

এই প্রকার তিন জনকে অভিশাপ দিয়ে মাতা ভবাণী খুব অনুতাপ করলেন।{একই প্রকারে প্রথমত জীব চিন্তাভাবনা না করেই মন (কাল নিরঞ্জন) এর প্রভাবে অন্যায় কাজ করে ফেলে। তারপর আত্মার (সতপুরুষের অংশ) প্রভাবে যখন তার জ্ঞান হয় তখন অনুতাপ করতে হয়। যেই প্রকার মাতা - পিতা নিজের সন্তানের সামান্য ভুলের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয় (ক্রোধের বশে) কিন্তু পরে অনুতাপ করে। একই প্রক্রিয়া মনে (কাল নিরঞ্জনের) প্রভাবে সমস্ত জীবের মধ্যে কাজ করছে।} হ্যাঁ, এখানে একটি বিশেষ কথা রয়েছে, নিরঞ্জনও (কাল-ব্রহ্ম) নিজের আইন বানিয়ে রেখেছে যে, যদি কোনো জীব কোনো দুর্বল জীবকে কষ্ট দেয় তবে তার শোধ তাকে দিতেই হবে। আদি ভবাণীর

(প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) ব্রহ্মা, গায়েত্রী ও পুহপবতীকে অভিশাপ দেওয়ায় অলখ নিরঞ্জন (ব্রহ্মা-কাল) বলে, “হে ভবাণী! (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) এটা তুমি ঠিক করোনি। এখন আমি (নিরঞ্জন) তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি! দ্বাপর যুগে তোমার পাঁচ স্বামী হবে।”(দ্রৌপদীই আদি মায়ার অবতার হয়েছিলেন।) আকাশবাণীতে এই কথা শুনে আদি মায়া বললেন, হে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল)! আমি তোমার বশীভূত হয়ে আছি, তুমি যা চাও করে নাও।

{সৃষ্টি রচনাতে দেবী দুর্গার অন্যান্য নাম গুলি বারে বারে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, পুরান গুলিতে, গীতা এবং বেদের মধ্যে প্রমাণ দেখার সময় যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। যেমন গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং ৩-৪ এর মধ্যে কাল ব্রহ্ম বলেছেন যে, “প্রকৃতি হলেন গর্ভ ধারণকারী সকল জীবের মাতা আর আমি হলাম তার গর্ভে বীজ স্থাপনকারী পিতা। শ্লোক নং ৪ এ বলেছেন যে, প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন তিন প্রকার গুন জীবাত্মাকে কর্ম বন্ধনে বাঁধে। - (লেখা সমাপ্ত) ।

এই প্রকরণে, প্রকৃতি হলেন দেবী দুর্গা এবং তিন প্রকার গুন হলেন তিন দেবতা অর্থাৎ রজোগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের সাংকেতিক নাম।}

“পিতার (কাল/ব্রহ্ম) প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুর প্রস্থান ও মাতার আশির্বাদ প্রাপ্ত করা ”

এরপর বিষ্ণুকে প্রকৃতি বললেন,“হে পুত্র! যা তুইও তোর পিতার খোঁজ কর”। বিষ্ণু তখন পিতার (ব্রহ্ম) খোঁজ করতে করতে পাতাল লোকে পৌঁছে গেলো যেখানে শেষ নাগ থাকতো। বিষ্ণুকে নিজের সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে বিষে ভরা ফুঁতকার মারলো। তার বিষের প্রভাবে শ্রী বিষ্ণুর রং কালো হয়ে গেলো, ঠিক স্প্রে পেন্ট করলে যেমনটা হয়। তখন বিষ্ণু মনে করে, নাগটিকে মজা দেখাতে হবে। জ্যোতি নিরঞ্জন দেখলো যে, এবার বিষ্ণুকে শান্ত করতে হবে। তখনই আকাশবাণী হয় যে, বিষ্ণু! এখন তুই তোর মাতার কাছে যা এবং সমস্ত বিবরণ সত্য সত্য বলে দিবি। আর এখন শীষ নাগ দ্বারা যে কষ্ট হয়েছে তার প্রতিশোধ দ্বাপর যুগে নিবি। দ্বাপর যুগে তুই (বিষ্ণু) শ্রী কৃষ্ণের অবতার ধারণ করবি আর কালিদহতে কালিন্দী নামক নাগ, শীষ নাগের অবতার হবে।

উঁচ হোঈ কে নীচ সতাবৈ, তাকর ঔএল (প্রতিশোধ) মোহী সোঁ পাবৈ।
জো জীব দেঈ পীর পুনী কাঁহু, হম পুনি ঔএল দিবাবেঁ তাহুঁ॥

তারপর শ্রী বিষ্ণু মাতার কাছে এসে সত্য সত্য সব বলে দিলেন যে, পিতার দর্শন আমি পাইনি। এই কথায় মাতা (প্রকৃতি) অতি প্রসন্ন হলেন আর বললেন যে,“পুত্র তুই সত্যবাদী। আমি নিজের শক্তি দ্বারা তোর পিতার সাথে দেখা করে তোর সংশয় সমাপ্ত করছি।”

কবীর দেখ পুত্র তোহি পিতা ভীটাউঁ, তৌরে মন কা ধোখা মিটাউঁ।
মন স্বরূপ কর্তা কহ জানোঁ, মন তে দূজা ঔর ন মানো।
স্বর্গ পাতাল দৌর মন কেরা, মন অস্থীর মন অহে অনেরা।
নিরঙ্কার মন হী কো কহিয়ে, মন কী আস নিশ দিন রহিএ।
দেখ হুঁ পলটি সুন্য মহ জ্যোতি, জহাঁ পর ঝিলমিল ঝালর হোতী॥

এই প্রকার মাতা (অষ্টাঙ্গী/প্রকৃতি) বিষ্ণুকে বললেন যে, “মন হলো জগতের কর্তা, মনই হলো জ্যোতি নিরঞ্জন। ধ্যান যোগ করলে যে এক হাজার জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় ওটাই তার স্বরূপ। যে শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজতে শোনা যায়, সেটা মহাস্বর্গে নিরঞ্জনের বাজছে।” তারপর মাতা (অষ্টাঙ্গী/ প্রকৃতি) বললেন, “হে পুত্র! তুই সকল

দেবতাদের রাজা তোর সকল কামনা ও সকল কার্য আমি পূর্ণ করবো। তোর পূজা সমস্ত জগতে হবে। তুই আমাকে সব সত্যি কথা বলেছিস। কালের ২১টি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের বিশেষ অভ্যাস আছে যে তারা সবাই নিজের ব্যর্থ মহিমা দেখাতে চায়, ঠিক যেভাবে দেবী দুর্গা শ্রী বিষ্ণুকে বলেছিলেন যে তোর পূজা সমস্ত জগতে হবে। তারপর দেবী দুর্গা কেবল প্রকাশ দেখিয়েই শ্রী বিষ্ণুকে বললেন, "আমি তোকে তোর পিতার দর্শন করিয়ে দিয়েছি" এই কথা বলে শ্রী বিষ্ণুকে বিভ্রান্ত করে দিলেন। শ্রী বিষ্ণুও প্রভুর এই প্রকাশ রূপ অবস্থাকেই নিজের অনুগামীদের বোঝাতে লাগলেন যে পরমাত্মার কেবল প্রকাশ দেখা যায়। পরমাত্মা নিরাকার। এরপর আদি ভবাণী রুদ্রের (মহেশের) কাছে গিয়ে বললেন, "মহেশ! তুইও গিয়ে তোর পিতার খোঁজ কর, তোর ভাইয়েরা তো পিতার দর্শন পেলো না, তাই তাদের যা দেওয়ার ছিল আমি প্রদান করে দিয়েছি এখন তোর যা চাওয়ার তুই নিয়ে নে।" তখন মহেশ বললেন যে, "জননী! আমার দুই বড় ভাইয়েরা যখন পিতার দর্শন পায়নি তখন আমার প্রচেষ্টা করা বৃথা। কৃপা করে আমায় এমন বর দিন যেনো আমি অমর (মৃত্যুঞ্জয়) হয়ে যাই।" মাতা বললেন, "আমি এটা করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, এমন কৌশল বলতে পারি, যাতে তোর আয়ু দীর্ঘ হবে। যোগ সমাধি হলো সেই বিধি (তাই মহাদেব বেশিরভাগ সময় সমাধির মধ্যেই থাকেন)।

এই প্রকার মাতা (অষ্টাঙ্গী/প্রকৃতি) তিন পুত্রকে বিভাগ ভাগ করে দিলেন :-

ভগবান ব্রহ্মাকে কাল লোকে চুরাশি লক্ষ পোশাক (শরীর) বানানোর (রচনার) জন্য অর্থাৎ রজোগুণ প্রভাব যুক্ত করে সন্তান উৎপত্তির জন্য বাধ্য ক'রে জীবের উৎপত্তি করার বিভাগটি প্রদান করলেন।

ভগবান বিষ্ণুকে এইসকল জীবের পালন পোষণ (কর্ম অনুসারে) করার ও মোহ-মমতা উৎপন্ন করে স্থিতি বানিয়ে রাখার বিভাগটি প্রদান করেন। ভগবান শিব শঙ্কর (মহাদেব)-কে সংহার করার বিভাগ প্রদান করেন। কারণ এদের পিতা নিরঞ্জনকে প্রতিদিন এক লক্ষ মানব শরীরধারী জীবের আহার করতে হয়।

এখানে মনে একটি প্রশ্ন উৎপন্ন হতে পারে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার কিভাবে হয়। এরা তিনজন নিজের নিজের লোকে বিরাজ করে। বর্তমানে যোগাযোগ মাধ্যম স্বয়ংক্রিয় করতে স্যাটেলাইট উপরের আকাশে পাঠানো হয় আর সেইগুলি পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালায়। ঠিক একই প্রকারে, এই তিন দেবতা যেখানেই থাকুক, তাদের শরীর থেকে বের হওয়া সূক্ষ্ম গুণের তরঙ্গ তিন লোকের মধ্যে সকল প্রাণীর ওপর তার প্রভাব ফেলতে থাকে।

উপরোক্ত বিবরণ এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম (কাল) লোকের সৃষ্টির রচনার। এইরকম ক্ষর পুরুষ কালের ২১-টি ব্রহ্মাণ্ড আছে।

কিন্তু ক্ষর পুরুষ (কাল) স্বয়ং ব্যক্ত অর্থাৎ বাস্তবিক শরীর রূপে সবার সামনে আসেনা। তাকে প্রাপ্ত করার জন্যই তিন দেবতা (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব) বেদে বর্ণিত বিধি অনুসার যতটুকু সম্ভব সাধনা করার পরেও ব্রহ্ম (কাল) এর দর্শন পায়নি। পরবর্তীকালে ঋষিগণ বেদ গুলি পড়লেন। তাতে লেখা আছে যে, 'অগ্নেঃ তনুর্ অসি' (পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ১ মন্ত্র নং ১৫) পরমেশ্বর সশরীরে আছেন এবং পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র নং ১ এ লেখা আছে যে, 'আগ্নেঃ তনুর্ অসি বিষ্ণবে ত্বা সৌমস্যা তনুর্ অসি।' এই মন্ত্রে বেদ দুই বার প্রমাণ দিচ্ছে যে, সর্বব্যাপী, সর্ব পালনকর্তা সতপুরুষ সশরীরে আছেন। পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র নং ৮ এ উল্লেখিত আছে যে (কবির্ মনিষী) যেই পরমেশ্বকে পাওয়ার আশায় সকল প্রাণীর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সেই পরমেশ্বর'ই হলেন কবির অর্থাৎ কবীর। তাঁর শরীর নাড়ী বিহীন (অস্নাবিরম্),

(শুক্রম্) বীর্য দ্বারা তৈরী পাঁচ তত্ত্বের ভৌতিক (অকায়ম্) শরীর নয়। তিনি সবার মালিক সর্বোপরি সত্যলোকে বিরাজমান, ঐ পরমেশ্বরের তেজপুঞ্জের (স্বজ্যোতি) স্ব-প্রকাশিত শরীর রয়েছে যা শব্দ রূপী অর্থাৎ অবিনাশী। তিনিই হলেন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) যিনি সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকর্তা (ব্যদধাতা) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা (স্বয়ম্ভুঃ) স্বয়ং প্রকটমান (যথা তথ্য অর্থান্) বাস্তবে (শাশ্বত্) অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তেও এর প্রমাণ আছে।) এর ভাবার্থ হলো যে, পূর্ণ ব্রহ্মের শারীরিক নাম কবীর (কবির্দেব)। ঐ পরমেশ্বরের শরীর নূর তত্ত্ব দিয়ে তৈরি। পরমাত্মার শরীর অতি সূক্ষ্ম এবং সেই সাধকই দেখতে পান যার দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। এই প্রকার জীবেরও সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে, যার উপর পাঁচ তত্ত্বের খোলস (কভার) অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের শরীর চাপানো আছে, যা মাতা-পিতার মিলনে (শূক্রম) বীর্য দ্বারা তৈরি। শরীর ত্যাগের পরেও জীবের সূক্ষ্ম শরীর থেকে যায়। সেই সূক্ষ্ম শরীর ঐ সাধকই দেখতে পায় যার দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। এই প্রকার পরমাত্মা ও জীবের অবস্থা সম্পর্কে বোঝা যায়। বেদে ওম্ নাম স্মরণের প্রমাণ আছে, যা কেবল ব্রহ্মেরই সাধনা। ঋষিগণ এই উদ্দেশ্যে ওম্ নামের জপকেই পূর্ণ ব্রহ্মের মনে করে হাজার হাজার বছর সমাধি লাগিয়ে (হঠযোগ করে) প্রভু প্রাপ্তির চেষ্টা করেছিলেন! কিন্তু প্রভুর দর্শন পেলেন না। পরিবর্তে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেলো। ঐ সিদ্ধি রূপী খেলনা দিয়ে খেলে ঋষিরাও জন্ম-মৃত্যুর চক্রেই রয়ে গেলেন। এবং নিজের অনুভবই শাস্ত্রে লিখে দিলেন, পরমাত্মা নিরাকার। ব্রহ্ম (কাল) প্রতিজ্ঞা করেছে যে, "আমি আমার বাস্তবিক রূপে কাউকে দর্শন দেবো না। আমাকে সকলে অব্যক্ত বলেই জানবে। (অব্যক্ত কথার ভাবার্থ হলো এই যে, কেউ আকারে আছে অথচ ব্যক্তিগত রূপে সে স্থূল শরীরে (ভৌতিক শরীরে) দর্শন দেয় না। যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সূর্য তখন দৃশ্যমান হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য মেঘের আড়ালে পূর্বের অবস্থাতেই থাকে, এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়ে থাকে। (প্রমাণের জন্য দেখুন গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ - ২৫, অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮ এবং ৩২)

পবিত্র গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম (কাল) শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মত প্রবেশ করে অর্জুনকে বলছেন যে, "আমি বেড়ে ওঠা কাল এবং সকলকে খাওয়ার জন্যে এসেছি।"(গীতা অধ্যায় ১১ এর শ্লোক নং ৩২) এটাই আমার বাস্তবিক রূপ। তুই ছাড়া অন্য কেউ আমার এই রূপ আগে কখনো দেখেনি, পরেও কেউ এই রূপ দেখতে পাবে না। অর্থাৎ বেদে বর্ণিত যজ্ঞ-জপ-তপ তথা ওম্ নাম ইত্যাদি কোনো কিছুর দ্বারা আমার বাস্তবিক স্বরূপকে (কাল রূপকে) দেখা সম্ভব নয়। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮) আমি কৃষ্ণ নই, এই মূর্খ জনসমুদয় কৃষ্ণ রূপে আমার অব্যক্ততাকে মানুষ রূপ (ব্যক্ত) মনে করছে। কারণ এরা আমার এই খারাপ (অনুত্তম) নিয়মের সাথে অপরিচিত, আমি কখনো আমার বাস্তবিক কাল রূপে সবার সামনে আসি না। নিজের যোগ মায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকি (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৪-২৫) **বিচার করুন :-** নিজের গুপ্ত থাকার বিধানকে নিজেই অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তম) কেনো বলছেন?

কোনো পিতা যদি তার নিজের সন্তানকে দর্শন না দেয় তবে তার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা দোষ আছে যে-কারণে সে লুকিয়ে থেকে সব সুবিধা প্রদান করছে। কাল (ব্রহ্মা) কে তাঁর অভিশাপের কারণে এক লক্ষ সূক্ষ্ম মানব শরীর ধারী প্রাণীকে নিত্য আহার করতে হয় এবং প্রতিদিন যেই ২৫ শতাংশ জীব বেশি উৎপন্ন হয়ে যায়, তাদের কর্ম ভোগের শাস্তি দিতে চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনী রচনা করে রেখেছে। যদি সকলের চোখের সামনে বসে তাদের পুত্র-পুত্রী, স্ত্রী, মাতা-পিতা ইত্যাদি সবাইকে মেরে খায়

তবে ব্রহ্মের প্রতি সকলের ঘৃনা হয়ে যাবে এবং যখন পূর্ণ পরমাত্মা কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং আসেন অথবা নিজের কোনো বার্তা বাহক (দূত) পাঠান তখন সকল প্রাণী সত্যভক্তি করে কালের জাল থেকে বেরিয়ে যাবে।

এই কারণেই সকলকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮, ২৪, ২৫ এ নিজের সাধনা দ্বারা হওয়া (গতি) মুক্তিকেও (অনুত্তম) অতি অশ্রেষ্ঠ বলেছে এবং নিজস্ব বিধান (নিয়ম) কেও (অনুত্তম) অশ্রেষ্ঠ বলেছে।

প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে তৈরি ব্রহ্মালোকে একটি করে মহাস্বর্গ বানিয়ে রেখেছে। প্রাণীদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রকৃতি (দুর্গা/আদি মায়া) দ্বারা ঐ মহাস্বর্গের একটি স্থানে নকল সতলোক - নকল অলখ লোক - নকল অগম লোক ও নকল অনামী লোকের রচনা করে রেখেছে। কবীর সাহেবের একটি শব্দ আছে -

'কর নৈনোঁ দীদার মহল মেঁ প্যারা হৈ' তে বাণীতে আছে যে

'কায়া ভেদ কিয়া নিরবারা, য়হ সব রচনা পিণ্ড মঁঝারা হৈ।

মায়া অবিগত জাল পসারা, সো কারিগর ভারা হৈ।

আদি মায়া কিন্হী চতুরাঈ, ঝূঠী বাজী পিণ্ড দিখাঈ,

অভিগত রচনা রচি অণ্ড মাহি বাকা প্রতিবিম্ব ডারা হৈ।'

একটি ব্রহ্মাণ্ডে অন্যান্য লোকেরও রচনা আছে, যেমন শ্রী ব্রহ্মার লোক, শ্রী বিষ্ণুর লোক ও শ্রী শিবের লোক। সেখানে বসে তিন প্রভু নিচের তিনটি লোকের মধ্যে (স্বর্গ লোক অর্থাৎ ইন্দ্রের লোক - পৃথিবী লোক ও পাতাল লোক) এক একটি বিভাগের মালিক হয়ে আধিপত্য করেন এবং নিজের পিতা কালের আহারের জন্য প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কার্য পরিচালনা করেন। তিন প্রভুরও জন্ম মৃত্যু হয়। তখন কাল নিজের পুত্রদেরকেও খায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে { এটিকে অন্ডও বলা হয় কারণ ব্রহ্মাণ্ডের গঠন ডিমের মত, একে পিন্ডও বলা হয়ে থাকে কারণ শরীরের (পিন্ডের) মধ্যে একটি ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কমল গুলিতে টি.ভির মত দেখতে পাওয়া যায় } একটি মানসরোবর এবং ধর্মরাজের (ন্যায় পালিকা) লোকও আছে, এছাড়া একটি গুপ্ত স্থানে পূর্ণ পরমাত্মা অন্য রূপ ধারণ করে নিবাস করেন, যেমন প্রত্যেক দেশের 'রাজদূত ভবন' থাকে। ঐ স্থানে কেউ যেতে পারেনা। ওখানে কেবল মাত্র সেই সমস্ত আত্মারা থাকে, যাদের সতলোকে যাওয়ার ভক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যখন ভক্তি যুগ আসে তখন, কবীর পরমেশ্বর নিজের প্রতিনিধি রূপে পূর্ণ সন্ত সতগুরু পাঠান। সেই সময় পৃথিবীতে এই সমস্ত পূণ্য আত্মাদের মানব শরীর প্রাপ্তি হয় এবং এরা খুব শীঘ্রই সদভক্তিতে লেগে পড়ে ও সদগুরুদেবের থেকে দীক্ষা নিয়ে পূর্ণ মোক্ষের অধিকারী হয়ে যায়। ঐ স্থানে (পূর্ণ পরমাত্মার রাজদূত ভবনে) নিবাস করা হংস আত্মাদের নিজস্ব ভক্তি ধন খরচ (নষ্ট) হয় না। পরমাত্মার ভান্ডার থেকে সমস্ত সুবিধা উপলব্ধ হয়ে থাকে। ব্রহ্মের (কাল) উপাসকদের ভক্তি ধন স্বর্গে - মহাস্বর্গে সমাপ্ত হয় যায়, কারণ এই কাল লোকে (ব্রহ্ম লোকে) এবং পরব্রহ্মের লোকে সমস্ত প্রাণীদের নিজেদের কর্ম ফলই মেলে।

ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) নিজের ২০-টি ব্রহ্মাণ্ডকে চারটি মহাব্রহ্মাণ্ডে বিভাজিত করে রেখেছে। একটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পাঁচটি ব্রহ্মাণ্ডের এক সমূহ বানিয়ে রেখেছে এবং তা চার দিক দিয়ে ডিম্বাকার গোলকের (পরিধির) মধ্যে আটকানো আছে আবার চারটি মহাব্রহ্মাণ্ড কেও একটি ডিম্বাকার গোলকের (পরিধির) মধ্যে আটকে রেখেছে। ২১ তম ব্রহ্মাণ্ডের রচনা একটি মহাব্রহ্মাণ্ডের সমান স্থান নিয়ে বানিয়ে রেখেছে। ২১ তম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করতেই তিনটি রাস্তা তৈরি করে রেখেছে। প্রাণীদের ভ্রমিত করে

রাখার জন্য আদি মায়া (দুর্গা) দ্বারা একুশ তম ব্রহ্মাণ্ডের, বামদিকে নকল সতলোক, নকল অলখ লোক, নকল অগম লোক ও নকল অনামী লোকের রচনা করে রেখেছে এবং ডানদিকে বারোটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম সাধকদের (ভক্ত দের) রেখে দেয়। তারপর সেই সাধকদেরকে প্রত্যেক যুগে নিজের বার্তা বাহক (সন্ত সতগুরু) রূপে পৃথিবীতে পাঠায়, যারা শাস্ত্রবিধি ছাড়া সাধনা ও জ্ঞান বলতে থাকে, নিজেরাও ভক্তিহীন হয়ে যায় এবং নিজের অনুগামীদেরও কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। এরপর সেই গুরু ও তার অনুগামীরা দুই জনেই নরকে চলে যায়। তারপর সামনে একটি তালা (কুলুপ) লাগানো আছে। সেই রাস্তা কালের (ব্রহ্মের) নিজ লোকে প্রবেশ করে। যেখানে ব্রহ্ম (কাল) নিজের বাস্তবিক মানব সদৃশ্য কাল রূপে থাকে। এই স্থানে চাটু (রুটি তৈরি করার জন্য লোহার যে গোল প্লেট আকৃতির বাসন) আকারের একটি পাথরের টুকরো সবসময় গরম হয়ে থাকে। এটির ওপর এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের সূক্ষ্ম শরীরকে ভেজে তার মধ্যে থেকে নির্গত ময়লা বের করে খায়। ঐ সময় সকল প্রাণীরা অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে এবং তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। কিছু সময় পর জীব অজ্ঞান হয়ে যায় কিন্তু মারা যায় না। এই সব কিছুর পর ধর্মরাজের লোকে গিয়ে কর্মের আধারে অন্যান্য জন্ম প্রাপ্ত করতে থাকে অর্থাৎ এই ভাবে জন্ম মৃত্যুর চক্র চলতে থাকে। উপরোক্ত ব্রহ্ম লোকের সামনে লাগানো তালাটি কেবল মাত্র তার আহারের উপযুক্ত প্রাণীদের প্রবেশের জন্য কিছুক্ষন খোলা রাখে। পূর্ণ পরমাত্মার সত্যনামে ও সারনামে এই তালা স্বয়ং খুলে যায়। কালের এমন জাল সম্পর্কে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর সাহেব) স্বয়ং নিজ ভক্ত ধর্মদাসকে বোঝালেন।

"পর ব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্থাপনা"

কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) আরোও বললেন যে, সতলোকে পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) নিজ কাজে গাফিলতি (ফাঁকি দিয়ে) করে মানসরোবরে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং যখন পূর্ণ পরমেশ্বর (আমি অর্থাৎ কবীর সাহেব) ঐ মানসরবরে একটি ডিম (অন্ড) ছাড়ে, তখন অক্ষর পুরুষ (পর ব্রহ্ম) সেটিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখে। এই দুটি অপরাধের কারণে একেও সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ড সহ সতলোক থেকে বের করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, অক্ষর পুরুষ (পর ব্রহ্ম) নিজ সাথী ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষের) বিদায়ে ব্যাকুল হয়ে পরমপিতা কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বরের) কথা ভুলে গিয়ে ক্ষরপুরুষের কথা মনে করতে লাগে এবং ভাবে যে ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) সেখানে খুব আনন্দ করছে, আমি পিছনে রয়ে গেলাম। অন্যান্য কিছু আত্মারা যারা পর ব্রহ্মের সাথেই সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জন্ম মৃত্যুর কর্ম দন্ড ভোগ করছে, তারা ব্রহ্মের (কালের) সাথে একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে যাওয়া হংস আত্মাদের বিদায়ের কথা ভেবে দুঃখী হয়ে যায় এবং সুখদায়ী পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেবের কথা ভুলে যায়। পরমেশ্বর কবির্দেবের বার বার বোঝানোর সত্ত্বেও তাদের ওপর থেকে একটুও আস্থা কম হয়নি। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) ভাবলেন আমিও আলাদা একটি স্থান প্রাপ্ত করলে ভালো হয়! এই কথা ভেবে রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছায় সারনামের জপ করতে শুরু করে দেয়। ঠিক এই প্রকার অন্যান্য আত্মারাও (যারা পরব্রহ্মের সাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে আছে) ভাবলো যে, ব্রহ্মের সাথে যে আত্মারা চলে গিয়েছে, নিশ্চয়ই সেখানে তারা খুব আনন্দ-ফুর্তি করছে আর কেবল আমরাই পিছনে রয়ে গেলাম! পরব্রহ্মের মনে এই ধারণা জন্মে গেলো যে হয়তো ক্ষরপুরুষ আলাদা হয়ে খুব সুখে আছে। এই কথা বিচার করে অক্ষর পুরুষ ভিন্ন একটি স্থান প্রাপ্তির দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলো। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) হঠযোগ (কঠোর তপস্যা) করলো না তবে আলাদা রাজ্য প্রাপ্তির জন্য কেবল সহজ ধ্যান যোগ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে করতে শুরু করে। আলাদা স্থান প্রাপ্ত করার জন্য পাগলের মত বিচরণ করতে

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র
মহাবিষ্ণু রূপী কাল (ব্রহ্ম)
জটাকুন্ডলীর স্ত্রী
মহাশীব রূপে কাল
মহাব্রহ্মা রূপে কাল
সত গুন প্রধান স্থান
তমোগুন প্রধান স্থান
রজোগুন প্রধান স্থান
শূন্য স্থান
দূর্গা লোক
সপ্তপুরী
নকল অনামি লোক
নকল অগম লোক
নকল অলখ লোক
নকল সতলোক
মহা ইন্দ্রের দ্বীপ
মহাস্বর্গ
মিষ্টি জলের সমুদ্র
অষ্টাশি হাজার দ্বীপ
সুমেরু পর্বত
ফলযুক্ত বন

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের লোক (২১ ব্রহ্মাণ্ড) এর লঘুচিত্র
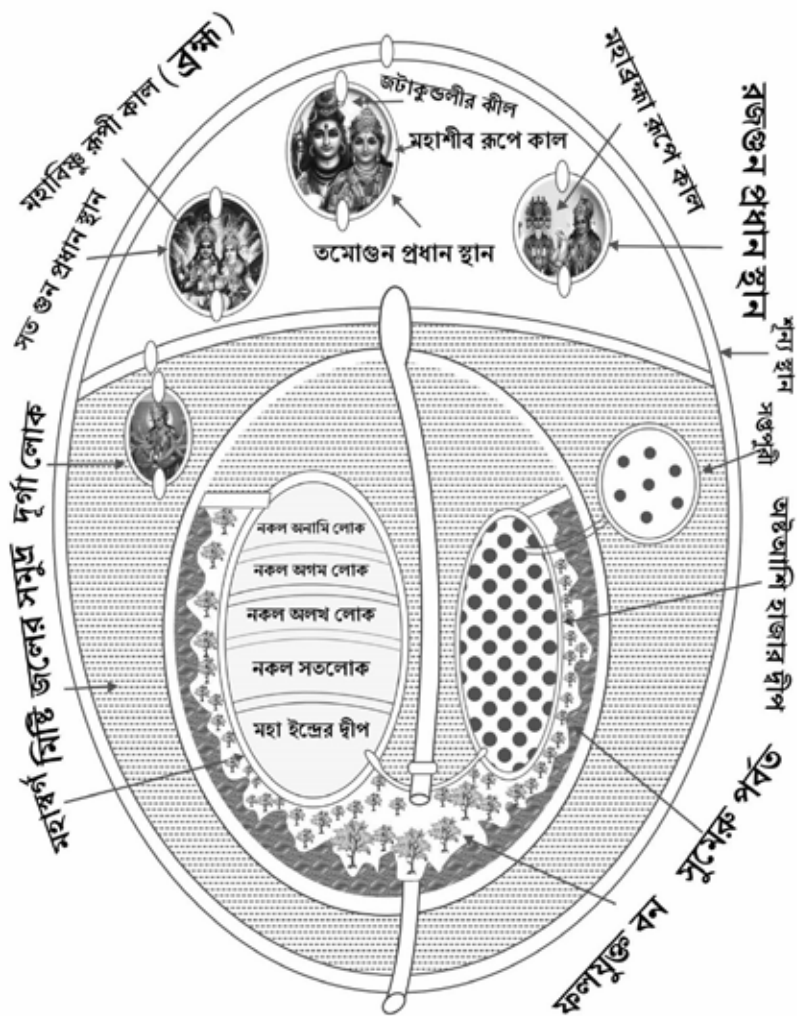
থাকে, খাওয়া - দাওয়াও ছেড়ে দেয়। অন্য কিছু আত্মারা ওর এই বৈরাগ্যের ওপর আসক্ত হয়ে ওকেই ভালোবাসতে শুরু করে, পূর্ণ প্রভুর জিজ্ঞাসা করতে, পরব্রহ্ম আলাদা স্থান চায় এবং কিছু হংস আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। তারপর কবির্দেব বললেন, "যেই সকল আত্মা তোমার সাথে স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। পূর্ণ প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কোন হংস আত্মারা পরব্রহ্মের সাথে যেতে চাও, সম্মতি ব্যক্ত কর? অনেক্ষন নিস্তব্ধ থাকার পর এক হংস আত্মা স্বীকৃতি দেয়, তারপর তার দেখাদেখি অন্য সকল হংস আত্মারাও সম্মতি ব্যক্ত করে। সর্ব প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হংস আত্মাকে পূর্ণ পরমাত্মা স্ত্রী রূপ বানায় এবং তার নাম ঈশ্বরী মায়া (প্রকৃতি সুরতি) রেখে দেয়। সেই সাথে অন্যান্য আত্মাদেরকেও ঐ ঈশ্বরী মায়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অচিন্তের দ্বারা অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্মের) কাছে পাঠায়। (পতিব্রতা পদ থেকে সরে যাওয়ার শাস্তি পায়।) বহু যুগ ধরে দুজনে একসাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকার সত্ত্বেও পরব্রহ্ম দুর্ব্যবহার করেনি। ঈশ্বরী মায়ার ইচ্ছায় নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা নখ দিয়ে স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনী) তৈরি করে। ঈশ্বরী দেবীর সম্মতিতে অক্ষর পুরুষ সন্তান উৎপত্তি করলেন। এই জন্য পরব্রহ্ম লোকের (সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের) প্রাণীদের তপ্তশিলার কষ্ট ভোগ করতে হয় না এবং ঐ স্থানের পশু-পাখিরাও ব্রহ্ম লোকের দেবী দেবতাদের থেকেও ভালো চরিত্রযুক্ত হয়। তাদের আয়ুও সুদীর্ঘ হয় কিন্তু জন্ম- মৃত্যু, কর্ম অনুসারে কর্মদন্ড এবং পরিশ্রম করে উদর পূর্তি করতে হয়। এই রূপ সেখানেও স্বর্গ ও নরক রয়েছে। পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছা রূপী ভক্তি ধ্যানে অর্থাৎ সহজ সমাধি বিধিতে করা ভক্তি ধনের প্রতিফলে প্রদান করা হয় এবং পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডকে একটি গোলাকার পরিধির মধ্যে বন্ধ করে অক্ষর ব্রহ্ম সহিত ঈশ্বরী মায়া কে সতলোক থেকে ভিন্ন স্থানে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হয়।

❖ পূর্ণ ব্রহ্ম (সত পুরুষ) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যা সতলোকের মধ্যে রয়েছে, ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রভু (মালিক) অর্থাৎ পরমেশ্বর কবির্দেব হলেন সর্ব কূলের মালিক।

শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শঙ্করের চারটি করে বাহু আছে এবং এনারা ১৬ কলা যুক্ত, প্রকৃতি দেবী (দুর্গা) আট বাহু ও ৬৪ কলা যুক্ত। ব্রহ্মের (ক্ষরপুরুষ) এক হাজার বাহু ও এক হাজার কলা আছে এবং ইনি একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। পরব্রহ্ম দশ হাজার বাহু ও দশ হাজার কলা যুক্ত প্রভু এবং ইনিও সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। পূর্ণ ব্রহ্ম (পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ সতপুরুষ) অসংখ্য বহু ও অসংখ্য কলা যুক্ত প্রভু, সেই সাথে ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ড এবং পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড সহ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। প্রত্যেক প্রভু নিজের সকল বাহু লুকিয়ে রেখে কেবল দুটি বাহুও রাখতে পারেন এবং ইচ্ছা মত সর্ব বাহু প্রকট করতে পারেন। পূর্ণ পরমাত্মা পরব্রহ্মের প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে আলাদা আলাদা স্থান বানিয়ে স্বয়ং অন্য রূপে গুপ্ত থাকেন। মনে করো, যেমন একটি ঘুরতে থাকা ক্যমেরা ঘরের বাইরে লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে টি.ভি. (টেলিভিশন) রেখে দিলে, টি.ভি. তে বাইরের সকল দৃশ্য দেখা যায়। অনুরূপভাবে অন্য একটি টি.ভি. বাইরে রেখে দিয়ে ভিতরে ক্যামেরা লাগলে, টিভিতে কেবল ঘরের ভিতরে বসা প্রবন্ধকের চিত্র দেখা যায়। যাতে সকল কর্মচারীরা সর্বদা সতর্ক থাকে।

এই প্রকার পূর্ণ পরমাত্মা নিজ সতলোকে বসে সেখান থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও সদগুরু রূপে কবির্দেব বিদ্যমান থাকেন যেমন সূর্য দূরে থেকেও নিজের প্রভাব অন্যান্য লোকের ওপর বিস্তার করে রেখেছে।

"পবিত্র অথর্ববেদ এ সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

অথর্ববেদ কাণ্ড নং. ৪ অনুবাক নং. ১ মন্ত্র নং. ১ :-

ব্রহ্ম জজ্ঞানম্ প্রথমম্ পুরসত্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
সঃ বুধন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥ ১॥

ব্রহ্ম-জ-জ্ঞানম্-প্রথমম্-পুরসত্তাত্ -বিসিমতঃ- সুরুচঃ- বেনঃ- আবঃ - সঃ বুধন্যাঃ - উপমা - অস্য - বিষ্ঠাঃ - সতঃ-চ- যোনিম্ - অসতঃ - চ - বি বঃ

অনুবাদ :- (প্রথমম্) প্রাচীন অর্থাৎ সনাতন (ব্রহ্ম) পরমাত্মা (জ) প্রকট হয়ে (জ্ঞানম্) নিজ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা (পুরসত্তাত্) শিখরে অর্থাৎ সতলোক ইত্যাদিকে (সুরুচঃ) স্বেচ্ছায় বড় আদরের সহিত স্ব-প্রকাশিত (বিসিমতঃ) সীমা রহিত অর্থাৎ সুবিশাল সীমা যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচনা করেন। ঐ (বেনঃ) তাঁতি, কাপড়ের মত বুনে (আবঃ) সুরক্ষিত করলেন (চ) এবং (সঃ) ঐ পূর্ণ ব্রহ্মই সর্ব কিছু রচনা করেন (অস্য) এই জন্যে ওই (বুধন্যাঃ) মূল মালিক (যোনিম্) মূলস্থান সত্যলোকের রচনা করেন (অস্য) এর (উপমা) সদৃশ্য অর্থাৎ অনুরূপ (সতঃ) অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের লোক কিছুটা স্থায়ী (চ) এবং (অসতঃ) ক্ষর পুরুষের অস্থায়ী লোক ইত্যাদি (বি বঃ) ভিন্ন ভিন্ন আবাস স্থান (বিষ্ঠাঃ) স্থাপিত করেছেন।

ভাবার্থ :- পবিত্র বেদের জ্ঞান বলা ব্রহ্ম (কাল) বলছেন যে, সনাতন পরমেশ্বর স্বয়ং অনাময় (অনামী) লোক থেকে সতলোকে প্রকট হয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাপড়ের মত রচনা করে উপরের সতলোক ইত্যাদিকে সীমা রহিত স্ব-প্রকাশিত অমর অর্থাৎ অবিনাশী করেছেন এবং নিচে পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তথা ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মাণ্ড ও এর মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম রচনাও ঐ পরমাত্মা অস্থায়ী রূপে করেছেন।

প্রার্থনা :- পাঠকগণ চিত্র-তে উপরের লোকের সীমানা দেখলে মনে সন্দেহ উৎপন্ন হবে যে বেদে-তে লেখা আছে যে সীমানা নেই। এইজন্য চিত্র সঠিক নয়। এজন্য এখানে স্পষ্ট করছি যে পরমাত্মার লীলা অদ্ভুত। তিনি অনামী লোক ব্যতীত অন্য লোকের বিস্তার অধিক এবং কম করতে থাকেন। এইজন্য এর ব্যাস (পরিধি) সীমিত নয়।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং. ৪ অনুবাক নং. ১ মন্ত্র নং. ২ :-

ইয়ম্ পিত্র্যা রাষ্ট্র্যেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ।
তস্মা এতম সুরুচম্ হ্বারমহ্যম্ ধর্মম্ শ্রীণন্তু প্রথমায় ধাস্যবে ॥ ২॥

ইয়ম্-পিত্র্যা-রাষ্ট্রি-এতু-অগ্রে-প্রথমায়-জনুষে-ভুবনেষ্ঠাঃ-তরস্মা-এতম্-সুরুচম্- হ্বারমহ্যম্ - ধর্মম্-শ্রীণান্তু- প্রথমায়-ধাস্যবে।

অনুবাদ :- (ইয়ম্) এই (পিত্র্যা) জগত পিতা পরমেশ্বর (এতু) এই (অগ্রে) সর্বোত্তম্ (প্রথমায়) সর্ব প্রথম মায়া পরানন্দনী (রাষ্ট্রি) রাজেশ্বরী শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তি, যাকে আকর্ষণ শক্তিও বলা হয়, এই পরাশক্তিকে (জনুষে) উৎপন্ন করে (ভুবনেষ্ঠাঃ) বিভিন্ন লোক স্থাপনা করে, (তস্মা) ওই পরমেশ্বর (সরুচম্) বড়ই প্রেমের সহিত স্বেচ্ছায় (এতম্) এই (প্রথমায়) প্রথম উৎপত্তি করা শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তির দ্বারা (হ্বারমহ্যম্) একে অপরের সঙ্গে বিচ্যুতি আটকানোর জন্য অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তির (শ্রীণান্তু) মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরমাত্মা আদেশ দেয় যে সর্বদা থাকো ওই কখনো সমাপ্ত না হওয়া (ধর্মম্) স্বভাবকে (ধাস্যবে) ধারণ করে তানে অর্থাৎ কাপড়ের মত বুনে স্থিত করে রেখেছে।

ভাবার্থ :- জগৎ পিতা পরমেশ্বর নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা রাষ্ট্রী অর্থাৎ সর্ব প্রথম মায়া রাজেশ্বরী উৎপন্ন করলেন তথা ঐ পরাশক্তি দ্বারা একে-অপরকে আকর্ষণ শক্তি দিয়ে আবদ্ধ করে কখনো সমাপ্ত না হওয়া গুণের মাধ্যমে উপরোক্ত সর্ব ব্রহ্মাণ্ড স্থাপন করেন।

অথর্ববেদ:- কাণ্ড নং. ৪ অনুবাক নং. ১ মন্ত্র নং. ৩:-

প্র যো জজ্ঞে বিদ্বানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাম জনিমা বিবক্তি।

ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নীচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ॥ ৩॥

প্র-যঃ-জজ্ঞে-বিদ্বানস্য-বন্ধুঃ-বিশ্বা-দেবানাম্-জনিমা-বিবক্তি-

ব্রহ্মঃ- ব্রহ্মাণঃ- উজ্জভার-মধ্যাত্-নিচৈঃ-উচ্চৈঃ-স্বধা-অভিঃ-প্রতস্থৌ

অনুবাদ:- (প্র) সর্ব প্রথম (দেবানাম্) দেবতাদের ও ব্রহ্মাণ্ডের (জজ্ঞে) উৎপত্তির জ্ঞানকে (বিদ্বানস্য) জিজ্ঞাসু ভক্তের (যঃ) যিনি (বন্ধুঃ) বাস্তবিক সাথী বা আসল সাথী অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মাই নিজের সেবককে (জনিমা) নিজের দ্বারা সৃজিত করা, (বিবক্তি) স্বয়ংই সঠিক ভাবে বিস্তার পূর্বক বলেন যে, (ব্রহ্মণঃ) পূর্ণ পরমাত্মা (মধ্যাত্) নিজের মধ্যে থেকে অর্থাৎ শব্দ শক্তি দিয়ে (ব্রহ্মঃ) ব্রহ্ম-ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ কাল-কে (উজ্জভার) উৎপন্ন করে (বিশ্বা) সমস্ত সংসারকে অর্থাৎ সর্ব লোকের (উচ্চৈঃ) উপর সত্যলোক ইত্যাদি (নিচে:) নীচে পরব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-এর সর্ব ব্রহ্মাণ্ড (স্বধা) নিজ ধারণকারী (অভিঃ) আকর্ষণ শক্তি দিয়ে (প্র তস্থৌ) দুটো কেই ভালো ভাবে স্থির করেন।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান তথা সকল আত্মার উৎপত্তির জ্ঞান নিজ দাসকে স্বয়ং সঠিক ভাবে বলেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা নিজের মধ্যে অর্থাৎ নিজ শরীর থেকে নিজ শব্দ শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ/কাল) এর উৎপত্তি করলেন এবং সর্ব ব্রহ্মান্ডের উপরে সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক ইত্যাদি ও নিচে পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তথা ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের ধারণকারী আকর্ষণ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন।

যেমন, পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) নিজ সেবক অর্থাৎ সখা শ্রী ধর্মদাস, শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী প্রমুখদের নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ং বলেছেন। উপরোক্ত বেদ মন্ত্র গুলিও এই ঘটনার সমর্থন করছে।

অথর্ববেদ:- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৪

সঃ হি দিবঃ সঃ পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষোমম রোদসী অকস্ভায়ত্।

মহান্ মহী অস্কভায়দ্ বি জাতো দ্যাঁ সা পার্থিব চ রজঃ ॥ ৪॥

হি-দিবঃ-স-পৃথিব্যা-ঋতস্থা-মহী-ক্ষমম্-রোদসী-অকস্ভায়ত্-

মহান্- মহী-অকস্ভায়ত্- বিজাতঃ- ধাম্-সদম্-পার্থিবম্-চ-রজঃ

অনুবাদ: - (সঃ) ওই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা (হি) নিঃসন্দেহে (দিবঃ) ওপরের চার দিব্য লোক যেমন সত্যলোক, অলখ লোক, অগম লোক ও অনামী অর্থাৎ অকহ লোক অর্থাৎ দিব্য গুণ যুক্ত লোকগুলিকে (ঋতস্থা) সত্য স্থির অর্থাৎ অজর-অমর রূপে স্থিত করে (স) ওনার সমান (পৃথিব্যা) নিচে পৃথিবীর সমস্ত লোকগুলি, যেমন পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ড ও কাল/ব্রহ্মের ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মান্ড (মহী) পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে (ক্ষেমম্) সুরক্ষার সহিত (অকস্ভায়ত্) স্থির করেছেন (রোদসি) আকাশ তত্ত্ব ও পৃথিবী তত্ত্ব এই দুইয়ের উপরে, নিচের ব্রহ্মান্ডকে {যেমন আকাশ হলো একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, আকাশের গুণ শব্দ, পূর্ণ পরমাত্মা উপরের লোক শব্দ রূপে রচনা করেন (বচনে) যা তেজপুঞ্জের

বানিয়েছেন। তথা নীচের পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তথা ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষের একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে অস্থায়ী রূপে বানিয়েছেন} (মহান) পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা (পাথির্বম) পৃথিবীর মত (বি) ভিন্ন-ভিন্ন (ধাম) লোকে (চ) আরও (সদম) আবাস স্থান (মহী) পৃথিবী তত্ত্বে (রজঃ) প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ছোট ছোট লোকেরও (জাতঃ) রচনা করে (অকস্ভায়ত্) স্থির করেছেন।

ভাবার্থ :- উপরের চার লোক সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক, এইগুলি অজর - অমর স্থায়ী অর্থাৎ অবিনশ্বর বানিয়েছেন এবং নিচে ব্রহ্মের ও পরব্রহ্মের লোকগুলিকে অস্থায়ী রচনা করে তথা অন্যান্য ছোট ছোট লোক গুলিকেও ঐ পরমেশ্বর রচনা করে স্থিত করেন।

অথর্ববেদ:- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৫

সঃ বুধ্ন্যাদাষ্ট্র জনুষোৎভ্যগ্রম বৃহস্পতিদেবতা তস্য সম্রাট্।
অহর্যচ্ছুক্রম জ্যোতিষো জনিষ্টাথ দ্যুমন্তো বি বসন্তু বিপ্রাঃ ॥ ৫॥

সঃ-বুধ্ন্যাত্ - আষ্ট্র - জনুষে - অভি - অগ্রম্ - বৃহস্পতিঃ - দেবতা-তস্য - সম্রাট - অহঃ - যত্ শুক্রম্ - জ্যোতিষঃ - জনিষ্ট - অথ - দ্যুমন্তঃ - বি - বসন্তু - বিপ্রাঃ।

অনুবাদ :- (সঃ) ওই (বুধ্ন্যাত্) মূল মালিকের প্রথম স্থানে (অভি-অগ্রম্) সর্ব প্রথম (আষ্ট্র) অষ্টঙ্গী মায়া-দুর্গা অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী (জনুষেঃ) উৎপন্ন হয়, কারণ নিচের পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের লোকগুলির মধ্যে প্রথম স্থানটি হলো সতলোক, একে তৃতীয় ধামও বলা হয় (তস্য) এই দূর্গারও মালিক হলেন (সম্রাট) রাজাধিরাজ (বৃহস্পতিঃ) সব চেয়ে বড় স্বামী ও জগত গুরু (দেবতা) পরমেশ্বর। (যত্) যার থেকে (অহঃ) সকলের বিয়োগ ঘটেছে (অথ) এর পরে (জ্যোতিষঃ) জ্যোতি রূপ নিরঞ্জন অর্থাৎ কালের (শুক্রম্) বীর্য অর্থাৎ বীজ শক্তিতে (জনিষ্ট) দুর্গার উদর থেকে উৎপন্ন হয়ে (বিপ্রাঃ) ভক্ত আত্মারা (বি) পৃথক (দ্যুমন্তঃ) মনুষ্যলোকে ও স্বর্গলোকে জ্যোতি নিরঞ্জনের আদেশে দুর্গা বলে (বসন্তু) নিবাস করো, অর্থাৎ তারা বসবাস করতে শুরু করে।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা উপরের চারটি লোকের মধ্যে থেকে নিচের দিক দিয়ে সর্ব প্রথম অর্থাৎ সত্যলোকের মধ্যে আষ্ট্রা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গীর (প্রকৃতি দেবী/ দুর্গা) উৎপত্তি করেন। ইনিই রাজাধিরাজ, জগতগুরু, পূর্ণ পরমেশ্বর (সতপুরুষ) যাঁর থেকে সকলের বিয়োগ ঘটেছে। তারপর সর্ব প্রাণী জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) এর বীর্য দ্বারা দুর্গার (আষ্ট্রা) গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বর্গ লোকে ও পৃথিবী লোকে নিবাস করতে শুরু করে।

কাণ্ড নং. ৪ অনুবাদ নং. ১ মন্ত্র ৬

অথর্ববেদ :- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৬

নূনম্ তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূর্ব্যস্য ধাম।
এষ যজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিত্থা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন্ নু॥ ৬॥

নূনম্ - তত্ - অস্য - কাব্যঃ - মহঃ - দেবস্য - পূর্ব্যস্য - ধাম - হিনোতি - পূর্বে - **বিষিতে - এষ-যজ্ঞে - বহুভিঃ - সাকম্ - ইথা - অর্ধে - সসন্ - নু।**

অনুবাদ :- (নূনম্) নিঃসন্দেহে (তত্) ওই পূর্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ তত্ ব্রহ্ম - ই (অস্য) এই (কাব্যঃ) ভক্তআত্মা যে, পূর্ণ পরমেশ্বরের বিধিবৎ ভক্তি করে, তাকে পুনঃ (মহঃ) সর্বশক্তিমান (দেবস্য) পরমেশ্বরের (পূর্ব্বস্য) পূর্বের (ধাম) লোকে অর্থাৎ সত্যলোকে (হিনোতি) ফিরিয়ে নিয়ে যান।

(পূর্বে) পূর্বের (বিষিতে) বিশেষ ভাবে চাওয়া (এষ) এই পরমেশ্বরকে (যজ্ঞে) সৃষ্টি উৎপত্তির জ্ঞানকে জেনে (বহুভিঃ) খুব আনন্দের (সাকম্) সহিত (অর্ধে) অর্ধ (সসন্) সায়িত হয়ে (ইতমা) বিধিবৎ এই প্রকার (নু) সত্য আত্মা দিয়ে স্তুতি করে।

ভাবার্থ :- ঐ পূর্ণ পরমেশ্বর, সত্য সাধনা করা সাধককে সেই আগের স্থানে (সত্যলোকে) নিয়ে যান, যেখান থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছিলো। সেখানে ঐ প্রকৃত সুখদায়ী প্রভুকে পাওয়ার খুশিতে আত্মা বিভোর হয়ে আনন্দে এই স্তুতি করতে থাকে যে, "হে পরমাত্মা! অসংখ্য জন্মের ভুলে থাকা - হারিয়ে যাওয়া আত্মা তার বাস্তবিক ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। এরই প্রমাণ পবিত্র ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬ এর মধ্যেও আছে।

শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জীকে এই ভাবে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং সত্যভক্তি প্রদান করে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজ স্বচক্ষে দেখা পরমাত্মার মহিমা নিজ অমৃত বাণীতে বর্ণনা করেছেন :-

গরীব, অজব নগর মেঁ লে গয়ে, হমকুঁ সতগুরু আন।
ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি, সুতে চাদর তান॥

অথর্ববেদ: কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৭

যোৎথর্বাণম্ পিত্তরম্ দেববন্ধুম্ বৃহস্পতিম্ নমসাব চ গচ্ছাত্।
ত্বম্ বিশ্বেতাম্ জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ত্ স্বধাবান্ ॥ ৭।

যঃ - অথর্বাণম্ - পিত্তরম্ দেববন্ধুম্ - বৃহস্পতিম্ - নমসা - অব - চ - গচ্ছাত্ - ত্বম্ -**বিশ্বেষাম্ - জনিতা - যথা - সঃ - কবির্দেবঃ - ন - দভায়ত্ - স্বধাবান্ ।**

অনুবাদ :- (যঃ) যে (অথর্বানম্) স্থির অর্থাৎ অবিনাশী (পিত্তরম্) জগত পিতা (দেব বন্ধুম্) ভক্তের বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ আত্মার আধার (বৃহস্পতিম্) জগত গুরু (চ) তথা (নমসা) বিনম্র পূজারী অর্থাৎ বিধিবৎ সাধক-কে (অব) সুরক্ষার সহিত (গচ্ছত্) সতলোকে গিয়েছেন যারা অর্থাৎ সতলোক নিয়ে যাওয়া (বিশ্বেষাম্) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের (জনিতা) রচনাকার জগদম্বা অর্থাৎ মায়ের মতোও গুণ যুক্ত (ন দভায়ত্) কালের মতো প্রতারণা না করা (স্বধাবান্) স্বভাবের অর্থাৎ গুন যুক্ত (যথা) যথাযথ অর্থাৎ তদ্রুপ (সঃ) তিনি (ত্বম্) নিজে (কবির্দেবঃ/কবির্ দেব) কবির্দেব অর্থাৎ ভিন্ন ভাষায় কবীর পরমেশ্বরও বলা হয়।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্র এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, ঐ পরমেশ্বরের নাম হলো কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর, যিনি সবকিছু রচনা করেছেন।

যে পরমেশ্বর অচল অর্থাৎ বাস্তবে অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং. ১৬-১৭ তেও প্রমাণ আছে) জগৎ গুরু, আত্মার আধার, যারা পূর্ণ মুক্তি পেয়ে সত্যলোকে চলেগিয়েছে, তাদের সতলোকে নিয়ে যাওয়া প্রভু, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকার, কালের (ব্রহ্ম) মত প্রতারণা না করা যথাযথ গুন বিশিষ্ট হলেন স্বয়ং কবির্দেব অর্থাৎ কবীর প্রভু। এই পরমেশ্বরই সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের ও সকল প্রাণীদেরকে নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করার কারণে এনাকে (জনিতা) মাতাও বলা হয়, (পিত্তরম্) পিতা ও (বন্ধু) ভাইও বাস্তবে ই'নি আর (দেব) পরমেশ্বরও ইনিই। সেই জন্যে এই কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বর) স্তুতি করা হয়। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রাবিণম ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম্ দেব দেব। পবিত্র ঋগ্বেদ মন্ডল নং. ১ সুক্ত নং. ২৪ এ এই পরমেশ্বরের মহিমা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

"পবিত্র ঋগ্বেদ এ সৃষ্টি রচনার প্রমাণ "

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্।
স ভূমিং বিশ্বতোং বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১॥

সহস্রশির্ষা - পুরুষ - সহস্রাক্ষঃ - সহস্রপাত - স - ভূমিম্ - বিশ্বত) - বৃত্বা - অত্যাতিষ্ঠত্ - দশংগুলম্।

অনুবাদ :- (পুরুষ) বিরাট রূপ কাল ভগবান অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (সহস্রশির্ষা) হাজার মাথা (শির), (সহস্রাক্ষঃ) হাজার চোখ (সহস্রপাত) হাজার পা-ওয়ালা (স) সেই কাল (ভূমিম্) পৃথিবীর মত একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে (বিশ্বতঃ) সর্বদিক থেকে (দশংগুলম) দশ আঙ্গুল দিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ রূপে কন্ট্রোল করে (বৃত্বা) গোলাকার পরিধিতে বেঁধে (অত্যাতিষ্ঠত্) এর থেকে বড় পরিধিযুক্ত নিজের লোকে সকলের থেকে পৃথক (ন্যারা) একুশতম ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রে বিরাট রূপের (কাল/ব্রহ্ম) বর্ণনা আছে। (গীতা অধ্যায় ১০-১১ তেও এই কাল/ব্রহ্ম -এর রূপের একই বর্ণনা রয়েছে। গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং. ৪৬ এ অর্জুন বলছেন যে, "হে সহস্রাবাহু! অর্থাৎ হাজার বাহু যুক্ত প্রভু আপনি আপনার চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দিন)

যার হাজার সংখ্যক হাত, পা, হাজার সংখ্যক চোখ, কান প্রভৃতি আছে সেই বিরাট রূপী কাল প্রভু নিজ অধীনে থাকা সর্ব প্রাণীদেরকে সম্পূর্ণ রূপে কাবু করে অর্থাৎ ২০টি ব্রহ্মাণ্ডকে একটি গোলাকার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করে স্বয়ং এর ওপরে আলাদা একুশ তম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বসে আছেন।

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ২

পুরুষ এবেদং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতা মৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২॥

পুরুষ - এব - ইদম -সর্বম্ - যত্ ভুতম্ যত চ ভাব্যম - উত - অমৃতত্বস্য - ইশানঃ - যত্ - অন্নেন - অতিরোহতি।

অনুবাদ:- (এব) এই রূপ কিছু ঠিক (পুরুষ) ভগবান আছেন যিনি অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, (চ) আর (ইদম্) এই (যত) যে উৎপন্ন হয়েছে এবং যে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে (সর্বম্) সব চেষ্টার দ্বারা অর্থাৎ পরিশ্রম দ্বারা (অন্নে ন) অন্ন থেকে (অতিরোহতি) বিকশিত হয়। এই অক্ষর পুরুষ ও (উত) সন্দেহ যুক্ত (অমৃতত্বস্য) মোক্ষের (ইশানঃ) স্বামী অর্থাৎ ভগবান অক্ষর পুরুষ ও কিছু ঠিক (সাথী) পরন্তু পূর্ণ মোক্ষদায়ক নয়

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রের মধ্যে পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) এর বিবরণ আছে, যিনি কিছুটা হলেও ভগবানের লক্ষণ যুক্ত প্রভু, তবুও এনার ভক্তি করেও পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব নয়, এইজন্য এনাকে সন্দেহযুক্ত মুক্তি দাতা বলা হয়। এনাকে কিছুটা হলেও প্রভুর গুণ যুক্ত বলা হয়েছে, কারণ এই প্রভু কালের মত প্রাণীদের সূক্ষ্ম শরীরকে তপ্ত শিলায় ভেজে খায় না। কিন্তু এই পরব্রহ্মের লোকেও প্রাণীদেরকে পরিশ্রম করে কর্মের আধারেই ফল পেতে হয় এবং অন্ন দ্বারাই সমস্ত প্রাণীর শরীর বিকশিত হয়ে থাকে। সেখানে জন্ম ও মৃত্যুর সময় সীমা যদিও কালের (ক্ষর পুরুষের) থেকে অধিক হয়, তবুও উৎপত্তি - প্রলয় ও চুরাশি লক্ষ যোনীর কষ্ট ভোগ করতে হয়।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৩ :-

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ।

পাদোৎস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩॥

এ তাবান্ - অস্য - মহিমা - অতঃ - জ্যাযান্ - চ - পুরুষঃ - পাদঃ - অস্য - বিশ্বা - ভূতানি - ত্রি - পাদ্ - অস্য - অমৃতম্ - দিবি ।

অনুবাদ:- (অস্য) এই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের তো (এতাবান) এতটাই (মহিমা) প্রভুত্ব আছে। (চ) তথা (পুরুষঃ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর (অতঃ) এর থেকেও (জ্যায়ান) বড়। (বিশ্বা) সমস্ত (ভূতানি) ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ তথা এদের লোক ও সত্যলোক তথা এই সব লোকে যত প্রাণী আছে (অস্য) এই পূর্ণ পরমাত্মা পরম অক্ষর পুরুষের (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এক অংশ মাত্র। (অস্য) এই পরমেশ্বরের (ত্রি) তিন (দিবি) দিব্য লোক, যেমন-সতলোক-অলখ লোক-অগম লোকে (অমৃতম) অবিনাশী (পাদ্) অন্য পা মনে কর। অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডে উৎপন্ন সব কিছু সতপুরুষ পূর্ণ পরমাত্মার অংশ বা অঙ্গ।

ভাবার্থ :- উপরের এই ২ নং মন্ত্রের মধ্যে অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এর এতটাই মহিমা বর্ণিত আছে কিন্তু ঐ পূর্ণ পুরুষ কবির্দেব হলেন পরব্রহ্মের থেকেও বড় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই অংশ মাত্র। এই মন্ত্রের মধ্যে তিন লোকের বর্ণনা আছে কারণ চতুর্থ অনামী (অনাময়) লোকটি অন্যান্য লোকের থেকেও পূর্বে রচনা হয়েছিল। এই তিন প্রভুদের (ক্ষর পুরুষ-অক্ষর পুরুষ ও এই দুই প্রভু থেকে ভিন্ন প্রভু হলেন পরম অক্ষর পুরুষ) বিবরণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক সংখ্যা ১৬-১৭ তে আছে

এরই প্রমাণ শ্রদ্ধেয় গরীবদাস সাহেব জী বলেন যে :-

গরীব, জাকে অর্ধ রূম পর সকল পসারা, ঐসা পূর্ণ ব্রহ্ম হমারা॥

গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতি নহীঁ ভার।

সতগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, কুলকে সৃজনহার॥

এর-প্রমাণ আদরণীয় দাদু সাহেব জী বলছেন :-

জিন মোকুঁ নিজ নাম দিয়া, সোঈ সতগুরু হমার।

দাদু দুসরা কোয়ে নহীঁ, কবীর সৃজনহার।

এরই প্রমাণ শ্রদ্ধেয় নানক সাহেব জী দিচ্ছেন যে :-

যক অর্জ গুফতম্ পেশ তো দর কূন করতার।

হক্কা কবীর করীম তু, বেএব পরবরদিগার॥

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা নং. ৭২১, মহলা ১, রাগ তিলঙ্গ)

কুন করতার শব্দের অর্থ হল সকলের রচনহার, অর্থাৎ শব্দ শক্তি দ্বারা রচনাকারী শব্দ স্বরূপী প্রভু, ‘হক্কা কবীর’ এর অর্থ হল সত্ কবীর, করীম এর অর্থ দয়ালু, পরবরদিগার শব্দের অর্থ হল পরমাত্মা।}

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৪

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈত্পুরুষঃ পাদোৎস্যেহাভবত্পুনঃ।

ততো বিশ্ব ডব্যক্রামত্সাশনানশনে অভি॥ ৪॥

ত্রি - পাদ - উর্ধ্ব - উদৈত্ - পুরুষঃ পাদঃ - অস্য - ইহ - অভবত্ - পুনঃ - **ততঃ - বিশ্বড় - ব্যক্রামত্ - সঃ - অশনানশনে - অভি**

অনুবাদ:- (পুরুষ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মা (উর্ধ্বঃ)

উপরের (ত্রি) তিন লোক যেমন সত্যলোক-অলখলোক-অগমলোক রূপী (পাদ) পা অর্থাৎ উপরের স্থানে (উদৈত) প্রকট হন অর্থাৎ বিরাজমান আছেন। (অস্য) এই পরমেশ্বর পূর্ণ ব্রহ্ম এর (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এক অংশ জগত রূপে (পুনর) পুনরায় তিনি (ইহ) এখানে (অভবত্) ও প্রকট হন। (ততঃ) এই জন্য (সঃ) এই অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা (অশনান শনে) আহার (খাওয়া) করা কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ ও আহার না করা পরব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষর পুরুষেরও (অভি) উপর (বিশ্বড়্) সর্বত্র (ব্যক্রামত্) ব্যাপ্ত আছেন। অর্থাৎ তাঁর প্রভুত্ব সর্বব্রহ্মাণ্ড ও সর্ব প্রভুর উপর, তাই তিনি সর্ব কূলের মালিক। তিনি নিজের শক্তি সর্বত্র বিস্তার করে রেখেছেন।

ভাবার্থ :- ইনিই সর্ব সৃষ্টির রচনাকার প্রভু, ইনি নিজ রচিত সৃষ্টির ওপরের অংশে তিনটি পৃথক স্থানে (সতলোক, অলখলোক, অগমলোক) তিনটি পৃথক রূপে স্বয়ং প্রকট হন অর্থাৎ স্বয়ং বিরাজমান আছেন। এখানে অনামী লোকের বর্ণনা এই কারণেই করা হয়নি, কারণ অনামী লোকে কোনো প্রকার রচনা নেই এবং অকহ (অনাময়) লোক বাকি রচনা গুলির থেকেও পূর্বে রচনা হয়েছে, আবারও বলা হয়েছে যে, ঐ পরমাত্মার সত্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই নিচের ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের লোক উৎপন্ন হয়েছে এবং ঐ পূর্ণ পরমাত্মা সকলকে খেতে থাকা ব্রহ্ম বা কাল (কারণ ব্রহ্ম/কাল ভয়ংকর অভিশাপের কারণে এক লক্ষ সূক্ষ্ম মানব শরীর ধারী প্রাণীদের আহার করে) ও কাউকে আহার না করা পরব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্ম প্রাণীদের ভক্ষণ করে না, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু, কর্মদণ্ড যথাযথ বজায় থাকে) থেকেও ওপরে সর্বত্র ব্যপ্ত আছেন অর্থাৎ এই পূর্ণ পরমাত্মার আধিপত্য (প্রভুত্ব) সকলের ওপর আছে, কবীর পরমেশ্বরই সর্ব কুলের মালিক। যিনি নিজের শক্তি সকলের ওপর বিস্তার করে রেখেছেন। যেমন সূর্য নিজের প্রকাশ ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে প্রভাবিত করে, এই ভাবে পূর্ণ পরমাত্মা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য নিজের শক্তি অর্থাৎ মোবাইল ফোনের রেঞ্জ (ক্ষমতা) সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন। যেমন মোবাইল ফোনের টাওয়ার এক দেশীয় হওয়ার সত্ত্বেও নিজ শক্তি অর্থাৎ মোবাইল ফোনের রেঞ্জ (ক্ষমতা/পরিসর) চারদিকে বিস্তার করে রাখে। ঠিক এইভাবে পূর্ণ প্রভুও নিজ নিরাকার শক্তি সর্বব্যাপী করে রেখেছেন, যার দ্বারা পূর্ণ পরমাত্মা সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে নিয়ন্ত্রণ করেন।

এরই প্রমাণ শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজ দিচ্ছেন ।

(অমৃতবাণী রাগ কল্যাণ)

তীন চরণ চিন্তামণী সাহেব, শেষ বদন পর ছাএ।
মাতা, পিতা, কুল ন বন্ধু, না কিন্হে জননী জায়ে॥

মণ্ডল ১০ সুপ্ত ৯০ মন্ত্র ৫

তস্মা দ্দিরাটজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

তস্মাত্ - বিরাট্ - অজায়ত - বিরাজঃ- অধি-পুরুষঃ-

স - জাতঃ- অত্যারিচ্যত-পশ্চাত্ - ভূমিম্-অথঃ- পুরঃ ।

অনুবাদ:- (তস্মাত্) তার পরে ওই পরমেশ্বর সতপুরুষের শব্দ শক্তিতে (বিরাট) বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্ম যাকে কালপুরুষ বলা হয় তাঁর (অজায়ত) উৎপত্তি হয়। (পশ্চাৎ) তার পরে (বিরাজঃ) বিরাট পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের থেকে ও (অধি) বড় (পুরুষঃ) পরমেশ্বর (ভূমিম) পৃথিবী অর্থাৎ পরব্রহ্মের লোককে (অত্যারিচ্যত) ভালভাবে রচনা করে (অথঃ) পুনরায় (পুরঃ) অন্য ছোট ছোট লোককে (স) ওই পূর্ণ পরমেশ্বরই (জাতঃ) সৃষ্টি করে স্থাপিত করেন॥

ভাবার্থ :- উপরোক্ত মন্ত্র ৪ এ বর্ণিত তিন লোকে (অগমলোক, অলখলোক ও সতলোক) এর রচনা করার পর পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতি নিরঞ্জনের (ব্রহ্মের) উৎপত্তি করলেন অর্থাৎ ঐ সর্ব শক্তিমান পরমাত্মা পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেবের থেকেই (কবীর প্রভু) বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মের (কালের) উৎপত্তি হয়েছে। এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৩ মন্ত্র ১৫ তে রয়েছে যে পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ অবিনাশী প্রভুর থেকেই ব্রহ্ম উৎপন্ন হয় যার প্রমাণ অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ অনুবাক ১ সুক্ত ৩ এ আছে যে পূর্ণ ব্রহ্মের থেকেই ব্রহ্মের উৎপত্তি হয় এবং ঐ পূর্ণ ব্রহ্মই (ভূমিম্) ভূমি ইত্যাদি ছোট-বড় সর্ব লোকের রচনা করেন। ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম এই বিরাট ভগবান অর্থাৎ ব্রহ্মের থেকেও বড় অর্থাৎ এরও মালিক তিনিই।

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৫

সপ্তাস্যাসম্পরিধযাস্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫॥

সপ্ত - অস্য - আসন্ - পরিধয়ঃ - ত্রিসপ্ত - সমিধঃ - কৃতাঃ -
দেবা - যত্ - যজ্ঞম্ - তন্বনাঃ - অবধ্নন্ - পুরুষম - পশুম্।

অনুবাদ:- (সপ্ত) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তো পরব্রহ্মের তথা (ত্রিসপ্ত) একুশ ব্রহ্মান্ড কাল ব্রহ্মের (সমিধঃ) কর্ম দণ্ড দুঃখ রূপী আগুন দ্বারা দুঃখদায়ী (পরিধিয়ঃ) গোলাকার পরিধিতে ঘেরা সীমানায় (আসন) বিদ্যমান। (যত্) যে (পুরুষ) পূর্ণ পরমাত্মার (যজ্ঞম) বিধিবত্ ধার্মিক কর্ম অর্থাৎ পূজা করে, (পশুম) বলির পশুর মত কালের জালে কর্ম বন্ধনে বাঁধা (দেবা) ভক্ত আত্মাকে (তন্বানাঃ) কালের দ্বারা রচনা করা অর্থাৎ পাপ কর্ম বন্ধনের জাল থেকে যিনি (অবধ্নন) বন্ধন রহিত করেন বা ছাড়িয়ে দেন তাঁকে বন্দীছোড় বলা হয়।

ভাবার্থ :- সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মের লোক ও একুশ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের লোক, যার মধ্যে গোলাকার সীমায় আবদ্ধ পাপ কর্মের আগুনে জ্বলতে থাকা প্রাণীদের বাস্তবিক পূজার বিধি বলে সঠিক উপাসনা করান, যেই কারণে বলি দেওয়া পশুর মত জন্ম-মৃত্যুর কালের (ব্রহ্মের)খাওয়ার জন্য তপ্ত শিলার কষ্টে নিপীড়িত আত্মাদের কালের কর্ম বন্ধনের বিস্তৃত জাল ছিঁড়ে বাঁধন মুক্ত করেন অর্থাৎ তিনি বাঁধন থেকে মুক্ত করা বন্দীছোড়। এর প্রমাণ পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ৩২ এ আছে যে, কবিরংঘারিসি (কবির্) কবির পরমেশ্বর (অংঘ) পাপের (অরি) শত্রু (অসি) অর্থাৎ পাপ বিনাশক হলেন কবীর। বম্ভারিসি (বম্ভারি) বন্ধনের শত্রু অর্থাৎ বন্দী ছোড় (অসি) হলেন কবীর পরমেশ্বর।

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মানি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকম্ মহিমানঃ সচন্ত য়ত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬॥

যজ্ঞেন - অযজ্ঞম্ - অ - যজন্ত - দেবাঃ - তানি - ধর্মাণি - প্রথমানি - আসন্ - তে - হ - নাকম - মহিমানঃ - সচন্ত - যত্র - পূর্বে - সাধ্যা - সন্তি দেবাঃ।

অনুবাদ:- যে (দেবাঃ) নির্বিকার দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা (অযজ্ঞম্) অসম্পূর্ণ ভুল ধার্মিক পূজার স্থানে (যজ্ঞেন) সত্য ভক্তির ধার্মিক কর্মের আধারে (অজন্ত) পূজা করেন, (তানি) তাঁরা (ধর্মানি) ধার্মিক শক্তি সম্পন্ন (প্রথমানি) মুখ্য অর্থাৎ উত্তম। (তে-হ)তাঁরাই বাস্তবে (মহিমানঃ) মহান ভক্তি শক্তি যুক্ত হয়ে (সাধ্যাঃ) সফল ভক্তজন (নাকম) পূর্ণ সুখদায়ক পরমেশ্বরকে (সচন্ত) ভক্তি নিমিতের কারণ অর্থাৎ সত্ভক্তির কামাঈ এর ফলে প্রাপ্ত হন। তাঁরা ওখানে চলে যান। (যত্রঃ) যেখানে (পূর্বে) প্রথম সৃষ্টির (দেবাঃ) পাপরহিত

দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা (সন্তি) আছেন।

ভাবার্থ :- যিনি নির্বিকার (যারা মাংস, মদ, তামাক সেবন করা ত্যাগ করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকেন তারা) দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা শাস্ত্রবিধি রহিত পূজার বিধি ত্যাগ করে শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করেন তারা ভক্তির কামাই দ্বারা ধনী হয়ে কালের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সতভক্তির কামাইয়ের ফলে ঐ সর্ব সুখদায়ী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ সতলোকে চলে যান, যেখানে সর্ব প্রথম রচিত সৃষ্টির দেব স্বরূপ অর্থাৎ পাপ রহিত আত্মারা থাকে।

যেমন, কিছু আত্মারা কালের (ব্রহ্মের) জালে ফেঁসে গিয়ে এখানে চলে এসেছে, কিছু আত্মারা পরব্রহ্মের সাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে চলে যায়, তবুও অসংখ্য আত্মা যাদের বিশ্বাস পূর্ণ পরমাত্মার মধ্যে অটল রয়ে গেছে, যারা পতি ব্রতা পদ থেকে বিচ্যুত হয়নি, তারা ওখানেই রয়ে গেলেন, এই জন্যে এইরূপ বর্ণনা পবিত্র বেদেও সত্য বলা হয়েছে। একই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৮ এর শ্লোক ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে বলা আছে যে, যেই সাধক পূর্ণ পরমাত্মার সত্য সাধনা শাস্ত্রবিধি অনুসারে করে, সে ভক্তিতে উপার্জিত শক্তি দ্বারা ঐ পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে অর্থাৎ তাঁর কাছে চলে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিন প্রভু হলেন ব্রহ্মা - পরব্রহ্ম - পূর্ণব্রহ্ম । এদেরকেই ১.ব্রহ্ম-ঈশ-ক্ষর পুরুষ ২.পরব্রহ্ম-অক্ষর পুরুষ/অক্ষর ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং ৩.পূর্ণ ব্রহ্ম -পরম অক্ষর ব্রহ্ম-পরমেশ্বর-সতপুরুষ ইত্যাদি সমর্থক শব্দের দ্বারা পরিচিত হন।

একই প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০ তে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) শিশুর রূপ ধারণ করে প্রকট হন এবং নিজের নির্মল জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান (কবিগির্ভিঃ) কবীর বাণীর মাধ্যমে নিজ অনুগামীদের উচ্চারণ করে বর্ণনা করেন। ঐ কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) , ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ) ধাম ও পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) ধামের থেকে ভিন্ন, যেটি হলো পূর্ণ ব্রহ্মের (পরম অক্ষর পুরুষ) তৃতীয় ঋতধাম (সতলোক), যেখানে আকার রূপে বিরাজমান আছেন এবং সতলোক থেকে চতুর্থ তম অনামী লোক রয়েছে, সেখানেও ঐ কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) অনামী পুরুষ রূপে মনুষ্য সদৃশ্য আকারে বিরাজমান।

“পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ”

“ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা-পিতা”

(দুর্গা ও ব্রহ্মের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম)

পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরান তৃতীয় স্কন্ধ অধ্যায় ১-৩ গীতা (প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার এবং শ্রী চিমন লাল গোস্বামী, পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ থেকে)

পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ থেকে ১১৮ পর্যন্ত বিবরণ আছে যে, কয়জন আচার্য ভবাণীকে সম্পূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণকারী বলেন। ওনাকে প্রকৃতিও বলা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে অনন্য বা অতুল্য সম্বন্ধ রয়েছে, যেমন পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনীও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ দূর্গা হলেন ব্রহ্মের (কালের) পত্নী। একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাজা শ্রী পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলে শ্রী ব্যাসদেব বললেন যে, “আমি শ্রী নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘হে দেবর্ষি! এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কিভাবে হলো?’ আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নারদ বললেন, ‘আমি আমার পিতা শ্রী ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ‘এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা আপনি করেছেন, না শ্রীবিষ্ণু, না শ্রী শিব? সত্য সত্য বলার কৃপা করুন। তখন আমার পূজ্য পিতা শ্রী ব্রহ্মা বললেন, পুত্র নারদ! আমি নিজেকে পদ্ম ফুলের উপর বসে দেখতে পেলাম, আমার এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই যে, আমি এই অগাধ জলের

মাঝে কি করে উৎপন্ন হলাম! এক হাজার বছর ধরে আমি পৃথিবীর অন্বেশন (খুঁজতে) করতে থাকি। কোথাও জলের কোনো কূল-কিনারা পাই না। তারপর আকাশবাণী হয়, তপ করো! ১০০০ বর্ষ ধরে তপস্যা করি, তারপর সৃষ্টি রচনা করার আকাশ বাণী হলো এরই মধ্যে মধু ও কৈটভ নামক দুই রাক্ষস এসে উপস্থিত হয়। তাদের ভয়ে আমি পদ্ম ফুলের বৃন্তের দণ্ড ধরে নিচের দিকে নেমে আসতেই সেখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে শীষ নাগের সজ্জায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। শ্রী বিষ্ণুর মধ্যে থেকে এক স্ত্রী (প্রেতবশ প্রবিষ্ট দুর্গা) বের হলেন, তিনি অলংকার পরিহিত অবস্থায় আকাশে দেখা দেন। তারপর ভগবান বিষ্ণুর চেতনা আসে। সেখানে আমি ও ভগবান বিষ্ণু দুজনেই ছিলাম। এরই মধ্যে ভগবান শিবও চলে আসেন। দেবী দুর্গা আমাদের সকলকে বিমানে বসিয়ে ব্রহ্ম লোকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও একজন শিবকে দেখি এবং এক দেবীকেও দেখা গেলো, যাকে দেখে ভগবান বিষ্ণু বিবেকপূর্বক নিম্নের বর্ণনা করলেন (কাল ব্রহ্মই ভগবান বিষ্ণুকে চেতনা প্রদান করেন এবং তার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে যায় ও ছোটবেলার গল্প শোনান।) ।

পৃষ্ঠা নম্বর ১১৯ - ১২০ তে ভগবান বিষ্ণু, শ্রী ব্রহ্মা ও শ্রী শিবকে বললেন, "ইনি হলেন আমাদের তিনজনের মাতা, ইনিই জননী প্রকৃতি দেবী। এই দেবীকে আমি সেই সময় দেখি যখন আমি ছোট্ট বালক ছিলাম, ইনি আমাকে দোলনায় দোলাচ্ছিলেন।"

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং. ১২৩ এ শ্রীবিষ্ণু শ্রী দুর্গার স্তুতি করে বলছেন, তুমি শুদ্ধ স্বরূপা, এই সমস্ত সংসার তোমার দ্বারাই উদ্ভাসিত হচ্ছে, "আমি (বিষ্ণু) , ব্রহ্মা ও শঙ্কর আমরা সকলেই তোমার কৃপাতেই বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে অর্থাৎ আমরা তিন দেবই নাশবান, কেবল তুমিই নিত্য (অবিনাশী), জগত জননী, তুমি প্রকৃতি দেবী।"

ভগবান শংকর বললেন, "দেবী! যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমার থেকেই প্রকট (উৎপন্ন) হয়ে থাকে তবে ওনার পরে উৎপন্ন হওয়া শ্রী ব্রহ্মাও আপনারই পুত্র হলেন। তাহলে আমি তমোগুণী লীলা কারী শঙ্কর কি আপনার পুত্র নয়? অর্থাৎ আমাকেও আপনি উৎপন্ন করেছেন।"

বিচার করো :- উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রী শিব তিন জনই নাশবান! মৃত্যুঞ্জয় (অজর-অমর) ও সর্বেশ্বর নন। এনারা হলেন দুর্গা (প্রকৃতি) ও ব্রহ্মের (কাল-সদাশিবের) পুত্র।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং. ১২৫ এ শ্রী ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মাতা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্ম কি আপনি, না অন্য কোন প্রভু?" এই প্রশ্নের উত্তরে এই স্থানে দুর্গা বলেছেন যে, "আমি ও ব্রহ্ম একই"। আবার একই স্কন্দের অধ্যায় ৬ এর পৃষ্ঠা নম্বর ১২৯ এ বলেছেন যে, "এবার আমার কার্যসিদ্ধ করার জন্য তোমরা বিমানে বসে শীঘ্রই প্রস্থান করো (যাও)। কোনো কঠিন কার্য এসে উপস্থিত হলে, যখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করবে, আমি তোমাদের সামনে চলে আসব। দেবতাগণ! আমার (দুর্গার)ও ব্রহ্মের ধ্যান তোমাদের সব সময় করা উচিত। আমাদের দুজনকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের কার্যসিদ্ধ হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্বয়ং প্রমাণিত হয় যে, দুর্গা (প্রকৃতি) ও ব্রহ্ম (কাল) হল তিন দেবতার মাতা-পিতা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এনারা নাশবান অর্থাৎ এক পূর্ণ শক্তি যুক্ত নন।

তিন দেবতার (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের) বিবাহ দুর্গা (প্রকৃতি দেবী) করান। পৃষ্ঠা নং. ১২৮-১২৯ এর তৃতীয় স্কন্ধে।

গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক ১২

য, চ, এব, সাত্বিকাঃ,ভাবাঃ, রাজসাঃ, তামসাঃ, চ, যে,
মতঃ, এব, ইতি, তান, বিদ্ধি, ন, তু,অহম, তেষু, তে, ময়ি।

অনুবাদ:- (চ) আর (এব) ও (যে) যে (সাত্বিকাঃ) সত্ত্বগুণ বিষ্ণু থেকে স্থিতি (ভাবাঃ) ভাবা হয় আর (যে) যে (রাজসাঃ) রজ গুন ব্রহ্মা থেকে উৎপত্তি (চ) তথা (তামসাঃ) তমোগুণ শিব থেকে সংহার হয় (তান) ওই সব (মতঃএব) আমার দ্বারা সুনিয়োজিত নিয়ম অনুসারেই হয়। (ইতি) এমন (বিদ্ধি) জান (তু) পরন্তু বাস্তবে (তেষু) এতে (অহম্) আমি আর (তে) তাঁরা (ময়ি) আমার মধ্যে (ন) নেই।

"পবিত্র শিব মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ "

(কাল ব্রহ্ম ও দুর্গা থেকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি)

এর প্রমাণ পবিত্র শ্রী শিব পুরাণ গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত। অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার। অধ্যায় ৬ রুদ্র সংহিতা পৃষ্ঠা নং ১০০ -তে বলা হয়েছে, যে মূর্তি রহিত পরব্রহ্ম রয়েছেন, তারই মূর্তি হল ভগবান সদাশিব। তার শরীর থেকে একটি শক্তি নির্গত হয়, সেই শক্তি অম্বিকা, প্রকৃতি (দুর্গা), ত্রিদেব জননী (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের জন্ম প্রদানকারী মাতা) নামে পরিচিত হলেন। যিনি অষ্টভুজা যুক্ত। সেই সদাশিবকে শিব, শম্ভু ও মহেশ্বর বলা হয়। (পৃষ্ঠা নম্বর ১০১ -এ বলা আছে) তিনি নিজের সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে থাকেন। ঐ কালরূপী ব্রহ্ম এক শিবলোক নামক ক্ষেত্রের নির্মাণ করেন। তারপর দুজনের স্বামী স্ত্রী ব্যবহারে এক পুত্র উৎপন্ন হল। তার নাম বিষ্ণু রাখলেন (পৃষ্ঠা নং ১০২)।

রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং. ৭ পৃষ্ঠা নং. ১০৩ -এ শ্রী ব্রহ্মা বললেন, "আমার উৎপত্তি ভগবান সদাশিব (ব্রহ্ম-কাল) ও প্রকৃতির (দুর্গার) মিলনে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ব্যবহারে হয়েছে। তারপর আমাকে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়।

রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং. ৯ পৃষ্ঠা নং. ১১০ এ বলা আছে যে, এই প্রকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ রয়েছে কিন্তু শিবকে (কাল-ব্রহ্ম) গুণাতীত মানা হয়।

এখানেই চারটি বিষয় প্রমাণিত হলো, সদাশিব (কাল-ব্রহ্ম) ও প্রকৃতির (দুর্গার) থেকেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। তিন ভগবানের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রী শিবের) মাতা শ্রী দূর্গা এবং পিতা শ্রী জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম)। এই তিন প্রভু হলেন রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব।

"পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে সৃষ্টি রচনা প্রমাণ"

এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫ এর মধ্যে আছে। ব্রহ্ম (কাল) বলছেন যে, প্রকৃতি (দুর্গা) হলো আমার স্ত্রী এবং আমি ব্রহ্ম (কাল) তার স্বামী। আমাদের দুজনের মিলনে সমস্ত প্রাণী সহ তিন গুণের (রজোগুণ - ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ - বিষ্ণু, তমোগুণ - শিবের) উৎপত্তি হয়েছে। আমি (ব্রহ্ম) সর্ব প্রাণীর পিতা এবং প্রকৃতি (দুর্গা) হলেন তাদের মাতা। আমি দুর্গার উদরে বীজ স্থাপন করি, যার দ্বারা সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির (দুর্গার) থেকে উৎপন্ন তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) জীবেদের কর্মের আধারে শরীর প্রদান করে।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১

উর্ধ্ব মূলম, অধঃশাখম্, অশ্বত্থম্, প্রহুঃ অব্যয়ম্,
ছন্দাসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ,তম্, বেদ, সঃ বেদবিত্॥

এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন – উপরে মূল (শিকড়)
নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রুপী বৃক্ষের চিত্র
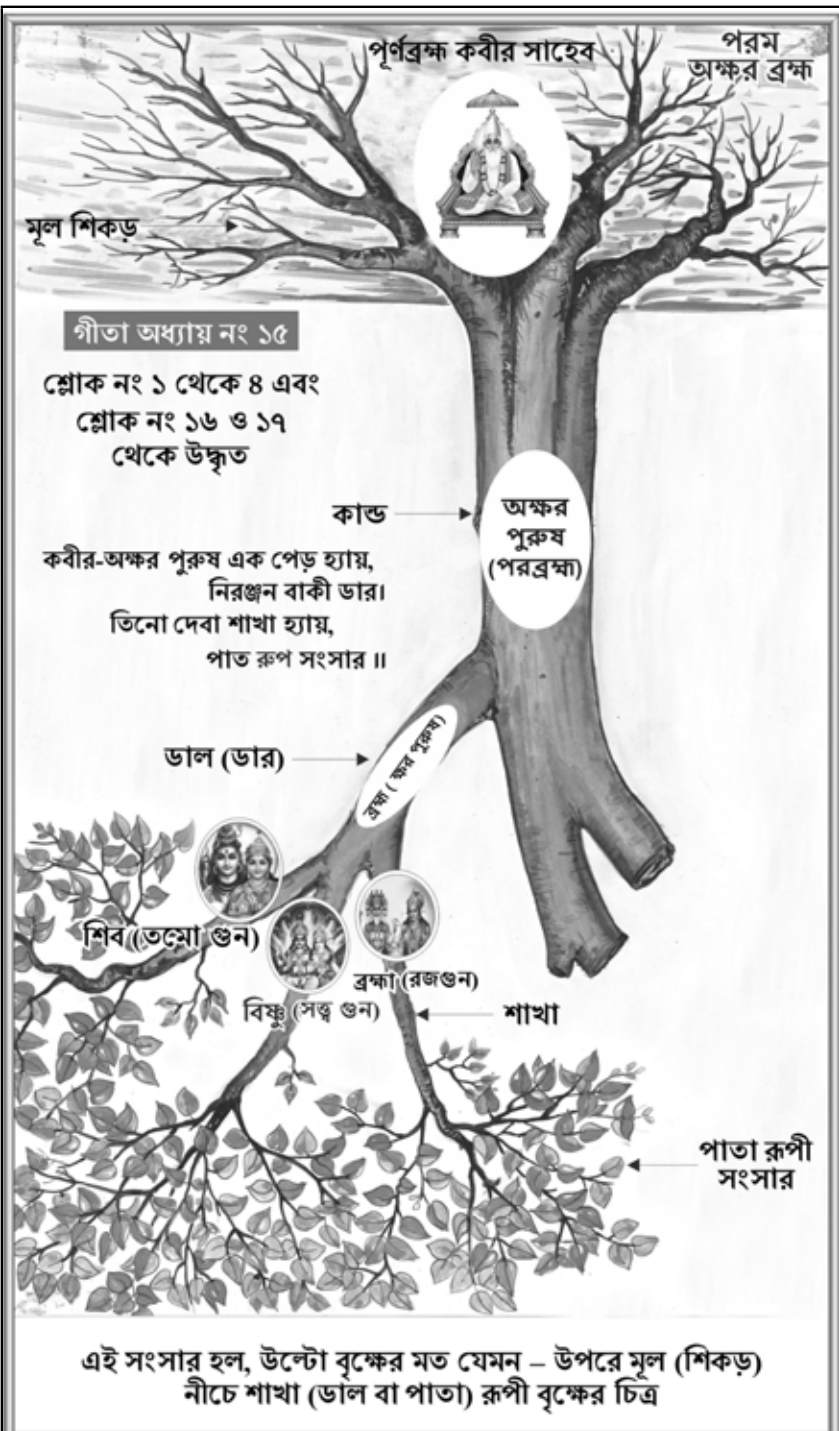
অনুবাদ:- (উর্দ্ধমূলম) উপরে পূর্ণ পরমাত্মা আদি পুরুষ পরমেশ্বর রূপী শিকড় (অধঃশাখম্) নীচের তিন গুণ অর্থাৎ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব রূপী শাখা ওয়ালা (অব্যয়ম্) অবিনাশী (অশ্বত্থম্) বিস্তারিত অশ্বত্থের বৃক্ষের মত (যস্য) যার, (ছন্দাসি) যেমন বেদ এ ছন্দ (ভাগ) আছে-এমন সংসার রূপী বৃক্ষের ছোট-ছোট ভাগের ডাল ও (পর্ণানি) পাতা (প্রাহুঃ) বর্নিত আছে,(তম্) ওই সংসার রূপী বৃক্ষকে (যঃ) যিনি (বেদ) বিস্তারিত ভাবে জানেন(সঃ) তিনি (বেদবিত্) পূর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ২

অধঃ, চ, উর্ধ্বম্, প্রসৃতাঃ, তস্য, শাখাঃ, গুণ প্রবৃদ্ধাঃ, বিষয়প্রবালাঃ,
অধঃ, চ, মুলানি, অনুসন্ততানি, কর্মানুবন্ধীনি, মনুষ্যলোকে॥

অনুবাদ:- (তস্য) ওই বৃক্ষের (অধঃ) নীচে (চ) আর (উর্ধ্বম্) উপরে (গুণপ্রবৃদ্ধাঃ) তিন গুণের-ব্রহ্মা-রজোগুণ, বিষ্ণু-সত্বগুণ-শিব-তমোগুণ রূপী (প্রসৃতা) বিস্তারিত (বিষয়প্রবালাঃ) বিকার-কাম-ক্রোধ, মোহ, লোভ, অহংকার রূপী মোটা (শাখাঃ) ডাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব (কর্মানুবন্ধীনি) জীবকে কর্মের বাঁধনে বাঁধার (মুলানি) মূল শিকড় অর্থাৎ মুখ্য কারণ (চ) তথা (মনুষ্যলোকে) মানব লোকে অর্থাৎ পৃথিবী লোকের (অধঃ) নীচে নরক ও (উর্ধ্বম) উপরে স্বর্গ লোক ইত্যাদি চুরাশি লাখ যোনীতে(অনুসন্ততানি) ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে ।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৩

ন, রুপম্, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ, ন, চ, আদিঃ, ন, চ
সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম্, এনম, সুবিরুঢ়মূলম, অসংগশস্ত্রেণ, দৃঢ়েন, ছিত্বা॥

অনুবাদ:- (অস্য) এই রচনার (ন) না (আদিঃ) শুরু (চ) তথা (ন) না (অন্তঃ) শেষ আছে, (ন) না (তথা)তার (রূপম্) স্বরূপ (উপলভ্যাতে) পাওয়া যায় (চ) তথা (ইহ) এখানে বিচারকালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানে পূর্ণ তথ্য নেই, কারণ ভালভাবে আমারও জানা (ন) নেই। (সম্প্রতিষ্ঠা) সমস্ত ব্রহ্মান্ডের রচনার বিষয় আমি ভালোভাবে জানি না। (এনম্) এই (সুবিরুঢ়মূলম্) ভাল ভাবে স্থায়ী স্থিতিওয়ালা (অশ্বত্থম) মজবুত স্বরূপওয়ালা সংসার রূপী বৃক্ষের জ্ঞানকে (অসংগশস্ত্রেন) পূর্ণ জ্ঞান রূপী (দৃঢ়েন) দৃঢ় সূক্ষ্ম বেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা (ছিত্বা) কেটে অর্থাৎ নিরঞ্জনের ভক্তিকে ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণ ভঙ্গুর মেনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্ম তথা পরব্রহ্ম থেকেও আগে পূর্ণ ব্রহ্মের খোঁজ করা উচিত ।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৪

ততঃ, পদম্, তত্,পরিমার্গিতব্যম্, যস্মিন, গতাঃ, ন, নিবর্তন্তি, ভূয়ঃ,
তম, এব, চ,আদ্যম্, পুরুষম, প্রপদ্যে, যতঃ, প্রবৃতিঃ, প্রসৃতা, পুরাণী॥

অনুবাদ:- যখন তত্ত্বদর্শী সন্ত খুঁজে পাবে (ততঃ) তার পরে (তত্) ঐ পরমাত্মার (পদম) পরম পদ বা স্থান অর্থাৎ সতলোকের (পরিমার্গিত ব্যম) ভালোভাবে খোঁজ করা উচিত,(যস্মিন) যেখানে (গতাঃ) যাওয়ার পর সাধক আর (ভূয়ঃ) এই সংসারে (ন, নিবর্তন্তি) ফিরে আসে না। (চ) আর (যতঃ) যে পরমাত্মা পরম অক্ষর ব্রহ্ম থেকে (পুরাণী) আদি (প্রবৃতিঃ) রচনার সৃষ্টি (প্রসৃতা) উৎপন্ন হয়েছে, (তম) অজ্ঞাত (আদ্যম্) আদি যম অর্থাৎ আমি কাল নিরঞ্জন (পুরুষম্) পূর্ণ পরমাত্মার (এব) ই (প্রপদ্যে) শরণে আছি তথা তাঁরই পূজা করি।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬

দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে, ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ, এব, চ,
ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি, কূটস্থঃ,অক্ষরঃ, উচ্যতে॥

অনুবাদ:- (লোকে) এই সংসারে (দ্বৌ) দুই প্রকারের (পুরুষ) ভগবান আছে এক (ক্ষর) নাশবান (চ) আর এক (অক্ষরঃ) অবিনাশী (পুরুষঃ) ভগবান (এব) এই রূপ (ইমৌ) এই দুই প্রভুর লোকে (সর্বাণি) সম্পূর্ণ (ভূতানি) প্রাণীর শরীর (ক্ষর) নাশবান (চ) আর (কূটস্থঃ) জীবাত্মাকে (অক্ষরঃ)অবিনাশী (উচ্যতে) বলা হয়।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১৭

উত্তমঃ, পুরুষঃ, তু, অন্যঃ,পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ, যঃ,
লোকত্রয়ম্ আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ॥

অনুবাদ:- (উত্তমঃ) উত্তম (পুরুষঃ)প্রভু (তু) তো (অন্যঃ) উরপরোক্ত দুই প্রভু "ক্ষরপুরুষ তথা অক্ষর পুরুষ" থেকেও অন্য, (ইতি) তাঁকে বাস্তবে পরমাত্মা (উদাহৃত) বলা হয়। (যঃ) যিনি (লোকত্রয়ম) তিন লোকে (আবিশ্য) প্রবেশ করে (বিভর্তি) সকলের ধারন পোষণ করেন, তিনিই (অব্যয়ঃ) অবিনাশী (ঈশ্বরঃ) ঈশ্বর (প্রভুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সমর্থ প্রভু)।

ভাবার্থঃ- গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু কেবল মাত্র এতটুকুই বলেছেন যে, এই সংসারকে উল্টোভাবে ঝুলে থাকা বৃক্ষের সমতুল্য জানো। যার উপরের দিকে শিকড় (মূল) তো পূর্ণ পরমাত্মা। নিম্নভাগে কাণ্ড সহ ডালপালাকে অন্যান্য অংশ মনে করুন। এই সংসার রূপী বৃক্ষের প্রতিটা বিভাগের বিবরণ ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে যে সন্ত জেনে থাকেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী সন্ত। সেই তত্ত্বদর্শী সন্তের বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪-এ বলা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২-৩ এর মধ্যে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তিনগুণ রূপী শাখা আছে। এখানে এই বিচার কালে অর্থাৎ গীতা জ্ঞানের আলোচনায় আমি (গীতা জ্ঞানদাতা) তোমাকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারবো না, কারণ এই সংসার সৃষ্টির আদি এবং অন্তের বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। সেই জন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং. ৩৪-এ বলেছেন যে, কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে ঐ পূর্ণ পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান জানো, এই গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১-এর মধ্যে ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি সংসার রূপী বৃক্ষের প্রতিটি বিভাগের জ্ঞান করাবেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ -এ বলা হয়েছে যে, ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের সন্ধান পাওয়ার পর, পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত, অর্থাৎ ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের বলা, বিধি অনুসারে সাধনা করা উচিত, যার ফলে পূর্ণ মোক্ষ (অনাদি মুক্তি) পাওয়া যায়, গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ -তে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিনজন প্রভু আছেন, তাদের মধ্যে একজন ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম), দ্বিতীয় জন অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এবং তৃতীয় জন হলেন পরম অক্ষর পুরুষ (পূর্ণ ব্রহ্ম)। ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ বাস্তবে অবিনাশী নয়। সেই অবিনাশী পরমাত্মা তো এই দুই প্রভু থেকে ভিন্ন অন্য কেউ আছেন। তিনিই তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের পালন-পোষণ করেন।

উপরোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এবং ১৬-১৭ তে এটি প্রমাণিত হল যে, উল্টো ভাবে ঝুলে থাকা সংসার রূপী বৃক্ষের মূল অর্থাৎ শিকড় তো হল পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম। যাঁর থেকে সম্পূর্ণ বৃক্ষের পালন হয়ে থাকে, এবং এই বৃক্ষের যে অংশ ভূমির বাইরে মাটির উপরে দেখতে পাওয়া যায়, তাকে কাণ্ড বলা হয়, একে অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম জানো। উপরের দিকে ঐ কাণ্ড থেকে অন্যান্য মোটা ডাল বের হয়, সেই ডালগুলির মধ্যে একটি ডালকে ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ মনে করো এবং ঐ ডাল থেকে অন্য তিনটি শাখাও বের হয়, সেগুলিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব জানো, আর ঐ শাখাগুলি থেকে যে সমস্ত পাতা বের হয়েছে, সেগুলিকে সাংসারিক প্রাণী জানো। উপরোক্ত গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭-তে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে

যে, ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) এবং অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এবং এনাদের লোকে যতপ্রাণী আছে, তাদের স্থুল শরীর তো নাশবান এবং জীবাত্মা অবিনাশী অর্থাৎ উপরোক্ত দুই প্রভু এবং এনাদের অন্তর্গত সকল প্রাণীই নাশবান। যদিও অক্ষর পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) অবিনাশী বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে অবিনাশী পরমাত্মা তো এই দুইজনের থেকে ভিন্ন অন্য কেউ আছেন। তিনিই তিনলোকে প্রবেশ করে সকলের পালন-পোষন করেন। উপরোক্ত বিবরণের মধ্যে তিনটি প্রভুর আলাদা-আলাদা বিবরণ দেওয়া আছে।

"পবিত্র বাইবেল এবং পবিত্র কুরান শরীফে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

এই প্রমাণ পবিত্র বাইবেলে এবং পবিত্র কুরান শরীফের মধ্যেও আছে। কুরান শরীফের মধ্যে পবিত্র বাইবেলের জ্ঞানও আছে, এইজন্য এই দুটি পবিত্র সদগ্রন্থ মিলে প্রমাণিত করেছে যে, সৃষ্টির রচয়িতা কে? এবং তিনি কেমন দেখতে? আর তাঁর বাস্তবিক নাম'ই বা কি ?

পবিত্র বাইবেল (উৎপত্তি গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ২, অঃ ১:২০- ২.৫ তে)

ষষ্ঠ দিনঃ- প্রাণী আর মানুষ :

অন্য সকল প্রাণী রচনা করে, ২৬. তারপর পরমেশ্বর বললেন, আমি মানুষকে নিজের স্বরূপে নিজের মত বানিয়েছি, যে সর্ব প্রাণীদের নিজেদের অধীনে রাখবে। ২৭. তখন পরমেশ্বর মানুষকে নিজের স্বরূপ অনুসারে উৎপন্ন করেন। নর আর নারী রূপে মানুষকে সৃষ্টি করেন।

২৯. প্রভু মানুষের খাওয়ার জন্য বীজওয়ালা দানাশস্য, সবুজ শাক সবজি, ছোট ছোট গাছ ও যে গাছে বীজ ওয়ালা ফল হয় তা ভোজনের জন্য প্রদান করলেন, (মাছ, মাংস ইত্যাদি খেতে বলেননি।)

সপ্তম দিনঃ- বিশ্রামের দিন

পরমেশ্বর ষষ্ঠ দিনে সর্ব সৃষ্টি উৎপন্ন করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন।

পবিত্র বাইবেলে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পরমাত্মা মানব সদৃশ্য শরীর যুক্ত। তিনি ছয় দিনে সর্ব সৃষ্টির উৎপত্তি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন। পবিত্র কোরান শরীফ (সুরত ফুর্কানি ২৫, আয়ত নং ৫২, ৫৮, ৫৯)

আয়ত ৫২:- ফলা তুতিঅল্,- কাফিরণ ব জহিদ্হুম বিহী জিহাদন্ কবীরা (কবীরন)। ৫২।

এর ভাবার্থ এই যে, হজরত মুহম্মদের খুদা (প্রভু) বলছেন যে, হে পৈগম্বর! তুমি কাফিরদের (যারা এক প্রভুর ভক্তি ত্যাগ করে অন্য দেবী-দেবতাদের মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে) কথা শুনবে না, কারণ ঐ লোকেরা কবীরকে পূর্ণ পরমাত্মা মানে না, তুমি আমার দ্বারা দেওয়া কুরাণ শরীফের জ্ঞানের আধারে অটল থাকবে যে, কবীরই পূর্ণ প্রভু এবং কবীর আল্লাহের জন্যই সংঘর্ষ করবে (লড়াই করবে না) অর্থাৎ কোরানের জ্ঞানের আধারে দৃঢ় থাকবে, লড়াই করবে না।

আয়ত ৫৮:- ব্ তবক্কাল্ অলল্, হয়ুল্লিজী লা যমূতু ব সব্বিহ বিহম্দিহী ব কফা বিহী বিজুনূবি ইবাদিহী খবীরা (কবীরা) ॥ ৫৮॥

ভাবার্থ এই যে, হজরত মুহম্মদ জী স্বয়ং যাকে প্রভু মানেন, সেই আল্লাহ্ (প্রভু) কোনো অন্য পূর্ণ প্রভুর দিকে সংকেত করছেন এবং বলছেন যে, হে পৈগম্বর! ঐ কবীর পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখ, যে তোকে জিন্দা মহাত্মা রূপে এসে দর্শন দিয়েছিলেন।সে কখনো মৃত্যুবরণ করে না, অর্থাৎ বাস্তবে (আসলে) তিনি অবিনাশী। প্রশংসার সাথে ওনার মহিমার (পাকী) গুনগান করে যা, ঐ কবীর আল্লাহ্ (কবির্দের) পূজার যোগ্য।

তিনি নিজের উপাসকের সমস্ত পাপ বিনাশ করে দেন।

আয়ত ৫৯:-অল্ল্জী খলকস্সমাবাতি বল্অর্জ ব মা বৈনহুমা ফী সিত্ততি অয্যামিন্ সুম্মস্তবা অলল্অর্শি অর্রহ্মানু ফস্অল বিহী খবীরন্ (কবীরন) ॥ ৫৯॥

ভাবার্থ:- হজরত মুহম্মদকে কুরান শরীফের জ্ঞান বলা প্রভু (আল্লাহ) বলছেন যে, এই কবীর প্রভু তো সেই প্রভু, যিনি ধরতী ও আকাশের মাঝখানে যা কিছু আছে, সেই সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করে এবং সপ্তম দিনে উপরের আকাশে সতলোকে সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে যান। তাঁর বিষয়ে জানার জন্য কোনো (বাখবর) তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, ঐ পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি কিভাবে হবে অর্থাৎ বাস্তবিক জ্ঞান তো কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের (বাখবরের) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, আমি জানি না।

উপরোক্ত দুই পবিত্র ধর্মের (ঈসাই ও মুসলমান) পবিত্র শাস্ত্র দুটি একসাথে মিলে প্রমাণিত করে দিয়েছে যে, সকল সৃষ্টির রচনা কর্তা, সর্ব পাপ বিনাশক, সর্ব শক্তিমান, অবিনাশী পরমাত্মা মানব সদৃশ্য শরীরের আকারে আছেন এবং সতলোকে থাকেন। ওনার নাম কবীর, ওনাকেই আল্লাহু আকবিরু বলা হয়।

শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস জী পূজ্য কবীর প্রভু কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে সর্ব শক্তিমান! আজ পর্যন্ত এই তত্ত্বজ্ঞান কেউ বলেনি, বেদ বিশেষজ্ঞরাও বলেনি। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে, চার বেদ এবং চারটি পবিত্র কতেব (কুরান শরীফ প্রভৃতি) মিথ্যা। কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মা বলেন:-

কবীর, বেদ কতেব ঝুঠে নহীঁ ভাই, ঝুঠে হেঁ যো সমঝে নাহিঁ।

ভাবার্থ:-চারটি পবিত্র বেদ (ঋগবেদ, অথর্ববেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ) এবং পবিত্র চারটি কতেব (কুরান শরীফ-জবুর-তৌরাত-ইঞ্জিল) মিথ্যা নয়। কিন্তু যারা এরগুলির অর্থ বুঝতে পারেনি তারা অজ্ঞানী (নাদান) ।

“পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের (কবীর্দেব) অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ”

⇨ **বিঃ.দ্রঃ :**- নিম্নের অমৃতবাণী গুলি সন্ ১৪০৩ থেকে {যখন পূজ্য কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) লীলাময় শরীরে পাঁচ বছর বয়সী ছিলেন } সন্ ১৫১৮ সালের {যখন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) মগহর স্থান থেকে সশরীরে সতলোকে চলে যান।} মধ্যবর্তী সময় প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) তাঁর নিজ সেবক (দাস ভক্ত) শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস সাহেব জী কে শুনিয়েছিলেন এবং ধনী ধর্মদাস সাহেব তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় পবিত্র হিন্দু সমাজের ও পবিত্র মুসলমান সমাজের অজ্ঞানী গুরুরা (নীম-হাকিমরা) বলেছিল যে, এই ধানক (তাঁতি) কবীর মিথ্যা কথা বলছে। কোনো সদগ্রন্থের মধ্যে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের মাতা পিতার নাম উল্লেখ নেই। এই তিনজন প্রভু অবিনাশী, এনাদের জন্ম মৃত্যু হয় না। নাই বা পবিত্র বেদ এবং পবিত্র কুরান শরীফ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে কবীর পরমেশ্বরের প্রমাণ আছে, তার পরিবর্তে পরমাত্মা নিরাকার লেখা আছে। আমরা প্রতিদিন পড়ি। সহজ সরল আত্মারা এই বিজ্ঞদের (চতুর গুরুদেব) উপর সহজে বিশ্বাস করে নেয় যে, সত্য কথা তো এই কবীর তাঁতি তো অশিক্ষিত! কিন্তু গুরুদেব শিক্ষিত, নিশ্চয় সত্য কথা বলছেন। আজ সেই সমস্ত সত্য সভ্য সমাজের শিক্ষিত মানুষের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে, এবং আমাদের সর্ব পবিত্র ধর্মের সকল পবিত্র সদ্গ্রন্থ তার সাক্ষী দিচ্ছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণ পরমেশ্বর সকল সৃষ্টির রচনা কর্তা, সর্ব কূলের মালিক এবং সর্বজ্ঞ হলেন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) , যিনি কাশী (বেনারস) শহরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের উপর প্রকট হয়েছিলেন এবং ১২০ বছর ধরে নিজের বাস্তবিক তেজোময় শরীরের উপর

মানব সদৃশ্য হালকা তেজপুঞ্জের শরীর বানিয়ে ছিলেন এবং নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির একদম সঠিক (বাস্তবিক) জ্ঞান প্রদান করে সশরীরে সতলোকে চলে গিয়েছেন।

কৃপা করে প্রভু প্রেমী পাঠকগণ পড়ুন, কবীর সাহেব জী দ্বারা উচ্চারিত করা নিচে লেখা অমৃতবাণী:-

ধর্মদাস য়হ জগ বৌরনা। কোঈ ন জানে পদ নিরবানা ॥ 1 ॥
য়হী কারণ মৈঁ কথা পসারা। জগসে কহিয়ো রাম নিয়ারা ॥
যহী জ্ঞান জগ জীব সুনাউ। সব জীবোঁ কা ভরম নশাউ॥ 2॥
ভরম গয়ে জগ বেদ পুরাণা। আদি রামকা ভেদ ন জানা॥ 3॥
রাম রাম সব জগত বাখানে। আদি রাম কোঈ বিরলা জানে॥ 4॥
জ্ঞানী সুনে সো হিরদৈ লগাঈ। মূর্খ সুনে সো গম্য না পাঈ॥ 5॥
অব মৈঁ তুমসে কহুঁ চিতাঈ। ত্রিদেবন কী উৎপত্তি ভাঈ॥ 6॥
কুছ সংক্ষেপ কহুঁ গৌহরাঈ। সব সংশয় তুম্হরে মিট জাঈ॥ 7॥
মাঁ অষ্টঙ্গী পিতা নিরঞ্জন। বে জম দারুন বংশন অঞ্জন॥ 8॥
পহিলে কীন্হ নিরঞ্জন রাঈ। পীছে সে মায়া উপজাঈ॥ 9॥
মায়া রূপ দেখ অতি শোভা। দেব নিরঞ্জন তন মন লোভা॥ 10॥
কামদেব ধর্মরায় সত্তায়ে। দেবী কো তুরতহী ধর খায়ে॥ 11॥
পেট সে দেবী করি পুকারা। সাহব মেরা করো উবরা॥ 12॥
টের সুনী তব হম তহাঁ আয়ে। অষ্টঙ্গী কো বন্দ ছুড়ায়ে॥ 13॥
সতলোক মেঁ কীন্হা দুরাচারি, কাল নিরঞ্জন দিন্হা নিকারি॥ 14॥
মায়া সমেত দিয়া ভগাঈ, সোলহ সঙ্খ কোস দূরী পর আঈ॥ 15॥
অষ্টঙ্গী ঔর কাল অব দোঈ, মন্দ কর্ম সে গএ বিগোঈ॥ 16॥
ধর্মরায় কো হিকমত কীন্হা। নখ রেখা সে ভগকর লিন্হা॥ 17॥
ধর্মরায় কিনহাঁ ভোগ বিলাসা। মায়া কো রহী তব আসা॥ 18॥
তীন পুত্র অষ্টঙ্গী জায়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে॥ 19॥
তীন দেব বিস্তার চলায়ে। ইনমেঁ য়হ জগ ধোকা খায়ে॥ 20॥
পুরুষ গম্য কৈসে কো পাবৈ। কাল নিরঞ্জন জগ ভরমাবৈ॥ 21॥
তীন লোক অপনে সুত দীন্হা। সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লিন্হা॥ 22॥
অলখ নিরঞ্জন সুন্ন ঠিকানা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেদ ন জানা॥ 23॥
তীন দেব সো উনকো ধাবেঁ। নিরঞ্জন কা বে পার না পাবেঁ॥ 24॥
অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা। তীন লোক জিব কীন্হ অহারা॥ 25॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহীঁ বচায়ে। সকল খায় পুন ধূর উড়ায়ে॥ 26॥
তিনকে সুত হৈঁ তীনোঁ দেবা। আঁধর জীব করত হৈঁ সেবা॥ 27॥
অকাল পুরুষ কাহূ নহীঁ চীন্হাঁ। কাল পায় সবহী গহ লীন্হা।28॥
ব্রহ্ম কাল সকল জগ জানে। আদি ব্রহ্ম কো না পহিচানে॥ 29॥
তীনোঁ দেব ঔর ঔতারা। তাকো ভজে সকল সংসারা॥ 30॥
তীনোঁ গুণ কা য়হ বিস্তারা। ধর্মদাস মৈঁ কহোঁ পুকারা॥ 31॥
গুণ তীনোঁ কী ভক্তি মেঁ, ভূল পরো সংসার॥ 32॥
কহৈ কবীর নিজ নাম বিন, কৈসে উতরৈ পার॥ 33॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী নিজের সেবক শ্রী ধর্মদাস সাহেবকে বলেছেন যে, ধর্মদাস! এই সম্পূর্ণ সংসার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিচলিত হয়ে আছে, কেউই পূর্ণ মোক্ষ মার্গের এবং পূর্ণ সৃষ্টি রচনার জ্ঞান জানে না। এই জন্য আমি

তোমাকে আমার দ্বারা রচিত সৃষ্টির কথা শোনাচ্ছি। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তো তত্ত্বজ্ঞান বুঝে যাবে, কিন্তু যারা সমস্ত প্রমাণ দেখেও সত্যকে স্বীকার করবে না, সেই মূর্খ কালের প্রভাবে প্রভাবিত, তারা ভক্তি করার যোগ্য নয়। এখন আমি বলছি তিন দেবতাদের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের) উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? এনাদের মাতা হলেন অষ্টাঙ্গী (দুর্গা) এবং পিতা হলেন জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম, কাল)। সর্ব প্রথম ডিম থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়, তারপর দুর্গার উৎপত্তি হয়, দুর্গার রূপে আসক্ত হয়ে কাল (ব্রহ্ম) অপরাধ (অসভ্য) আচরণ করে, তখন দুর্গা (প্রকৃতি) নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে ঐ ব্রহ্মের খোলা মুখ দিয়ে পেটের ভিতরে প্রবেশ করে আশ্রয় নেয়।

আমি ওখানে গিয়ে যেখানে জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ছিল তখন ভবাণীকে (দুর্গাকে) ব্রহ্মের পেট থেকে বের করে একুশ (২১) ব্রহ্মান্ড সহ দুজন কে ১৬ শঙ্খ ক্রোশ দূরে পাঠিয়ে দিই। জ্যোতি নিরঞ্জন (ধর্মরায়) প্রকৃতি দেবীর (দুর্গা) সাথে ভোগ-বিলাস করে। এই দুই জনের সংযোগে তিন জনের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের) উৎপত্তি হয়। এই তিন জনেরই (রজোগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের) সাধনা করে সকল প্রাণী কাল জালে ফেঁসে আছে। যতক্ষন বাস্তবিক মন্ত্র প্রকৃত সন্তের থেকে পাবে না, পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) কিভাবে হবে?

⇨ **বিঃ.দ্রঃ-** প্রিয় পাঠকগণ বিচার করুন শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের স্থিতি কে অবিনাশী বলে বোঝানো হয়েছিল। সমস্ত হিন্দু সমাজ এখনো পর্যন্ত এই তিন প্রভু কে অজর-অমর এবং জন্ম-মৃত্যু রহিত বলে মেনে আসছে, অর্থাৎ যেখানে এই তিন জনই নশ্বর অর্থাৎ নাশবান। এদের পিতা হলেন কাল রূপী ব্রহ্ম এবং মাতা দুর্গা (প্রকৃতি, অষ্টাঙ্গী) যেগুলি আপনারা পূর্বে দেওয়া প্রমাণ গুলিতে পড়েছেন। এই জ্ঞান আমাদের শাস্ত্রের মধ্যেই বিদ্যমান কিন্তু হিন্দু সমাজের কলিযুগী গুরুদের, ঋষিদের এবং সন্তদের এই জ্ঞান জানা নেই। যে অধ্যাপক পাঠ্যক্রমের (সিলেবাসের) সাথে পরিচিত নয়, সেই অধ্যাপক সঠিক নয় (বিদ্বান নয়), তিনি বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যতের শত্রু।

ঠিক এই প্রকার যে গুরুরা এখনো পর্যন্ত এটা জানে না যে, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের মাতা পিতা কে? সেই গুরু, ঋষি, সন্ত নিঃসন্দেহে জ্ঞান হীন। যার কারণে সকল ভক্ত সমাজকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞান (লোকদের অর্থাৎ গল্প কথা) শুনিয়ে শুনিয়ে অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধ ভক্তি সাধনা করিয়ে পরমাত্মার বাস্তবিক লাভ (পূর্ণ মোক্ষ) থেকে বঞ্চিত করে রাখে, এবং সকলের মানব জন্ম নষ্ট করিয়ে দেয়। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ এরই প্রমাণ দেওয়া আছে যে, যারা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জি বিধিতে পূজা-অর্চনা করে তাদের কোনো লাভ হয় না। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জী পাঁচ বছর বয়সী নিজের লীলাময় শরীরে, ১৪০৩ সাল থেকেই সর্ব শাস্ত্র যুক্ত জ্ঞান নিজের অমৃত বাণীর (কবিরবাণী) মাধ্যমে বলা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অজ্ঞানী গুরুরা এই জ্ঞান ভক্ত সমাজের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি, যা বর্তমানে সর্ব সদগ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কবির্দেব (কবীর প্রভু) তত্ত্বদর্শী সন্ত রূপে স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মই এসেছিলেন।

“আদরনীয় গরীবদাস সাহেবের অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ।”

আদি রমৈণী (সদ গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ৬৯০ থেকে ৬৯২ পর্যন্ত)

আদি রমৈঁণী অদলী সারা। জা দিন হোতে ধুঁধুংকারা ॥ ১॥
সতপুরুষ কীন্হা প্রকাশা। হম হোতে তখত্ কবীর খবাসা ॥ ২॥
মন মোহিনী সিরজী মায়া। সত্পুরুষ এক খ্যাল বনায়া ॥ ৩॥

ধর্মরায় সিরজে দরবানী। চৌসঠ জুগ তপ সেবা ঠাঁনী ॥ ৪॥
পুরুষ পৃথিবী জাকুঁ দীন্হী। রাজ করো দেবা আধীনী ॥ ৫॥
ব্রহ্মাণ্ড ইকীস রাজ তুম্হ দীন্হা, মন কী ইচ্ছা সব জুগ লীন্হা ॥ ৬॥
মায়া মূল রূপ এক ছাজা। মোহি লিয়ে জিনহূঁ ধর্মরাজা॥ ।৭॥
ধর্ম কা মন চঞ্চল চিত ধারয়া। মন মায়া কা রূপ বিচারা ॥ ৮॥
চঞ্চল চেরী চপল চিরাগা। যা কে পরসে সরবস জাগা ॥ ৯॥
ধর্মরায় কীয়া মন কা ভাগী। বিষয় বাসনা সংঙ্গ সে জাগী ॥ ১০॥
আদি পুরুষ অদলি অনরাগী। ধর্মরায় দিয়া দিল সেঁ ত্যাগী ॥ ১১॥
পুরুষ লোক সেঁ দিয়া ঢহাহী। অগম দীপ চলি আয়ে ভাঈ॥ ১২॥
সহজ দাস জিস দীপ রহঁতা। কারণ কৌঁন কৌঁন কুল পন্থা ॥ ১৩॥
ধর্মরায় বোলে দরবানী। সুনো সহজ দাস ব্রহ্ম জ্ঞানী ॥ ১৪॥
চৌসঠ জুগ হম সেবা কীন্হী।পুরুষ পৃথিবী হম কূঁ দীন্হী ॥ ১৫॥
চঞ্চল রূপ ভয়া মন বৌরা। মনমোহিনী ঠগিয়া ভৌঁরা ॥ ১৬॥
সতপুরুষ কে না মন ভায়ে। পুরুষ লোক সে হম চলি আয়ে॥ ১৭॥
অগর দীপ সুনত বড়ভাগী। সহজ দাস মেটো মন পাগী ॥ ১৮॥
বোলে সহজদাস দিল দানী। হম তো চাকর সত্ সহদানী ॥ ১৯॥
সতপুরুষ সেঁ অরজ গুজারুঁ। জব তুমহারা বিবাণ উতারুঁ ॥ ২০॥
সহজ দাস কো কীয়া পীয়ানা। সত্যলোক লীয়া প্রবানা। ॥ ২১॥
সতপুরুষ সাহিব সরবংগী। অবিগত অদলী অচল অভংগী ॥ ২২॥
ধর্মরায় তুম্হরা দরবানী। অগর দীপ চলি গয়ে প্রাণী ॥ ২৩॥
কৌঁন হুকম করী অরজ অবাজা। কহাঁ পঠাবৌ উস ধর্মরাজা ॥ ২৪॥
ভঈ অবাজ অদলী এক সাচা। বিষয় লোক জা তীন্যু বাচা ॥ ২৫॥
সহজ বিমাঁন চলে অধিকাঈ। ছিন মেঁ অগর দীপ চলি আঈ॥ ২৬॥
হমতো অরজ করী অনরাগী। তুম্হ বিষয় লোক জাবো বড়ভাগী॥ ২৭॥
ধর্মরায় কে চলে বিমানা। মানসরোবর আয়ে প্রাণা ॥ ২৮॥
মানসরোবর রহন ন পায়ে। দরৈ কবীরা থাঁনা লয়ে ॥ ২৯॥
বংকনাল কী বিষমী বাটী। তহাঁ কবীরা রোকী ঘাটী ॥ ৩০॥
ইন পাঁচোঁ মিলি জগত বঁধানা। লখ চৌরাশী জীব সন্তানা ॥ ৩১॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মায়া। ধর্মরায় কা রাজ পঠায়া ॥ ৩২॥
যৌহ খোকা পুর ঝূঠী বাজী। ভিসতি বৈকুন্ঠ দগাসী সাজী॥ ৩৩॥
কৃতিম জীব ভুলাঁনেঁ ভাঈ। নিজ ঘর কী তো খবরি ন পাঈ॥ ৩৪॥
সবা লাখ উপজেঁ নিত হংসা, এক লাখ বিনশেঁ নিত অংসা ॥ ৩৫॥
উপতি খপতি প্রলয় ফেরী। হর্ষ শোক জৌঁরা জম জেরী॥ ৩৬॥
পাঁচোঁ তত্ব হৈঁ প্রলয় মাঁহী। সত্ত্বগুণ রজোগুণ তমোগুণ ঝাঁঈ॥ ৩৭॥
আঠোঁ অঙ্গ মিলী হৈ মায়া। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সকল ভরমায়া॥ ৩৮॥
যা মেঁ সুরতি শব্দ কী ডোরী। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড লগী হৈ খোরী॥ ৩৯॥
শ্বাসা পারস মন গহ রাখো॥ খোল্হি কপাট অমীরস চাখো॥ ৪০॥
সুনাউঁ হংস শব্দ সুন দাসা। অগম দীপ হৈ অগ হৈ বাসা ॥ ৪১॥
ভবসাগর জম দণ্ড জমানা। ধর্মরায় কা হৈ তলবাঁনা ॥ ৪২॥
পাঁচোঁ উপর পদ কী নগরী। বাট বিহংগম বঁকী ডগরী॥ ৪৩॥
হমরা ধর্মরায় সোঁ দাবা। ভবসাগর মে জীব ভরমাবা ॥ ৪৪॥

হম তো কহেঁ অগম কী বাণী। জহাঁ অবিগত অদলী আপ বিনানী ॥ ৪৫॥
বন্দী ছোড় হমারা নামম্। অজর অমর হৈ অস্থীর ঠামম্॥ ৪৬ ॥
জুগন জুগন হম কহতে আয়ে। জম জৌঁরা সেঁ হংস ছুটায়ে॥ ৪৭॥
জো কোঈ মানেঁ শব্দ হমারা। ভবসাগর নহীঁ ভরমে ধারা॥ ৪৮ ॥
যা মেঁ সুরতি শব্দ কা লেখা। তন অন্দর মন কহো কীন্হী দেখা॥ ৪৯ ॥
দাস গরীব অগম কী বাণী। খোজা হংসা শব্দ সহদানী॥ ৫০ ॥

উপরে উল্লেখিত অমৃত বাণীর ভাবার্থ, শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেব জী বলছেন যে, পূর্বে এখানে শুধুমাত্র অন্ধকার ছিল এবং পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব জী সতলোকে সিংহাসনের (তখ্ত) উপরে বিরাজমান ছিলেন। আমরা ওখানে চাকর ছিলাম, প্রথমে পরমাত্মা জ্যোতি নিরঞ্জনকে উৎপন্ন করেন। তারপর তার তপস্যার প্রতিফলে একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করেন। তারপর মায়ার (প্রকৃতি/দুর্গা) উৎপত্তি করেন। যুবতী দুর্গার রূপে মুগ্ধ (মোহিত) হয়ে জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) দুর্গার (প্রকৃতি) ইজ্জত নেওয়ার চেষ্টা করে। ব্রহ্ম তার অপরাধের সাজা পায়। তাঁকে সতলোক থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং অভিশাপ দেয় যে, এক লক্ষ সূক্ষ্ম মানব শরীর ধারী প্রাণীদেরকে প্রতিদিন আহার করবে এবং সওয়া লাখ উৎপন্ন করবে। তাই এখানে সমস্ত প্রাণী জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করছে। যদি কেউ পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক শব্দ (প্রকৃত নাম জপের মন্ত্র) আমার (সন্ত গরীবদাস জী) থেকে প্রাপ্ত করে নেয়, তাহলে তাকে কালের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেব। আমার নাম বন্দীছোড়। শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী নিজের গুরুদেব এবং প্রভু কবীর পরমাত্মার আধারে বলছেন যে, প্রকৃত স্বচ্ছ মন্ত্র, অর্থাৎ সত্যনাম এবং সারশব্দ প্রাপ্তি করে নাও, তাহলে পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) হয়ে যাবে। তা না হলে নকল নাম দাতা সন্ত মহন্তদের মিষ্টি কথায় ফেঁসে গিয়ে শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধ সাধনা করে কাল জালে বন্দী হয়ে রয়ে যাবে। তারপর কষ্টের পর কষ্ট অর্থাৎ মহাকষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

সন্ত গরীব দাস জীর অমর গ্রন্থের অধ্যায় "হংস পরম হংস" কথার বাণী নং ৩৭-৪৩ এ বলেছেন যে :-

মায়া আদি নিরঞ্জন ভাঈ, অপনে জায়ে আপৈ খাঈ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চেলা, ওঁ সোহম কা হৈ খেলা॥ ৩৭॥
শিখর সুন্ন মেঁ ধর্ম অন্যায়ী, জিন শক্তি ডায়ন মহল পঠাঈ॥
লাখ গ্রাসৈ নিত উঠ দূতী, মায়া আদি তখত্ কী কুতী॥ ৩৮॥
সবা লাখ ঘড়িয়ে নিত ভাণ্ডে, হংসা উত্পত্তি প্রলয় ডাণ্ডে।
য়ে তীনোঁ চেলা বট পারী, সিরজে পুরুষা সিরজী নারী॥ ৩৯॥
খোকাপুর মেঁ জীব ভুলায়ে, স্বপনা নরক বৈকুন্ঠ বনায়ে।
য়ৌহ হরহট কা কুবা লোঈ, যা গল বন্ধ্যা হৈ সব কোঈ॥ ৪০॥
কীড়ী কুঞ্জর ঔর অবতারা, হরহট ডোরী বন্ধে কোঈ বারা।
অরব অলীল ইন্দ্র হুয়ে হৈঁ ভাঈ, হরহট ডোরী বন্ধে সব আঈ॥ ৪১॥
শেষ মহেশ অরু গণেশ তাঁঈ, হরহট ডোরী বন্ধে সব আঈ।
শুক্রাদিক ব্রহ্মাদিক দেবা, হরহট ডোরী বন্ধে সব খেবা॥
কোটিক কর্তা ফিরতা দেখ্যা, হরহট ডোরী কহূঁ সুন লেখা ॥ ৪২॥
চতুর্ভুজী ভগবান কহাবৈঁ, হরহট ডোরী বন্ধে সব আবৈঁ॥
যৌহ হৈ খোখা পুর কা কূবা, যা মেঁ পড়য়া সো নিশ্চয় মুবা ॥ ৪৩ ॥

জ্যোতি নিরঞ্জনের (কাল বলীর) বশবর্তী হয়ে এই তিন দেবতা (রজোগুন ব্রহ্মা,

সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুন শিব) নিজেদের মহিমা দেখিয়ে সকল জীবকে স্বর্গ-নরক এবং ভবসাগরে (চুরাশি লক্ষ যোনীতে) ভ্রমিত করতে থাকে। জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের মায়া দ্বারা নাগিনীর মতো জীব উৎপন্ন করে। তারপর নিজেই তাদের মেরে ফেলে। যেমন করে নাগিনী নিজের লম্বা লেজ দিয়ে ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী বানিয়ে রাখে। ঠিক তারপর সেই ডিমের ওপর নিজের ফনা মারতে থাকে। যার ফলে অনেক গুলি ডিম এক সাথে ফেটে যায়, এবং তার মধ্যে থেকে বাচ্চা গুলি বেরিয়ে আসার পর নাগিনী তাদের খেয়ে ফেলে। ভাগ্যক্রমে যদি কোনো বাচ্চা নাগিনীর কুণ্ডলীর বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তারাই বেঁচে যায়। তা না হলে কুণ্ডলীর মধ্যে থাকা কাউকেই সে (নাগিনী) ছাড়ে না। যে সমস্ত বাচ্চারা কুণ্ডলীর মধ্যে থাকে, তাদের সবাইকেই খেয়ে ফেলে। যে সাধক ব্রহ্ম (কাল ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন দেবী পূজা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবতারদের ভক্তিতে সীমিত আছে, তারা কালব্রহ্ম রূপী নাগিনীর কুণ্ডলীতে অর্থাৎ জন্ম মরণের চক্রের মধ্যে কাল লোকে থেকে যায়, যাদেরকে কাল জ্যোতি নিরঞ্জন খায়।

মায়া কালী নাগিনী, অপনে জায়ে খাত ।
কুণ্ডলী মেঁ ছোড়ে নহীঁ, সৌ বাতোঁ কী বাত ॥

এই প্রকারে কাল লোকের সর্বত্র কালবলীর জাল বিছিয়ে রেখেছে। এমনকি যদি নিরঞ্জনের ভক্তিও পূর্ণ সন্তের (গুরুর) কাছ থেকে নিয়ে করা হয়, তাহলেও কেউ এই নিরঞ্জনের কুণ্ডলীর (একুশ ব্রহ্মাণ্ডের) বাইরে বের হতে পারবে না স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ আদি মায়া অর্থাৎ দেবী দুর্গাও নিরঞ্জনের কুণ্ডলীর মধ্যে আছে। এ বেচারা অবতার ধারণ করে এখানে আসে, আর জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্রে ভ্রমিত হতে থাকে। এই জন্য বিচার করুন, সোহং জপ যা ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং সুকদেব ঋষি জপ করেছিলেন, তবুও তারা পার হতে পারেনি, কারণ শ্রী বিষ্ণু পুরাণের প্রথম অংশের ১২ তম অধ্যায় ৯৩ শ্লোক অর্থাৎ ৫১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ধ্রুব কেবল মাত্র এক কল্প অর্থাৎ এক হাজার চতুর্যুগ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিল।

এই জন্য তিনিও কাল লোকের মধ্যে রয়ে যায় এবং 'ওঁ নমঃ ভাগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করা ভক্তরাও শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত ভক্তি করছে, তারাও চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনীতে ভ্রমণ করা থেকে রক্ষা পাবে না। এই কথাগুলি পরম পূজ্য কবীর সাহেব জী এবং শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী মহারাজের বাণীই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়।

অনন্ত কোটি অবতার হৈঁ, মায়া কে গোবিন্দ। কর্তা হো হো অবতরে, বহুর পড়ে জম ফন্ধ॥

সতপুরুষ কবীর সাহেব জীর ভক্তিতেই জীব পূর্ণ মুক্ত হতে পারে। যতদিন না জীব সতলোকে ফিরে না যাবে, ততদিন জীবকে কাল লোকে এইভাবে কর্ম করতে হবে এবং নামজপ ও দান ধর্মের কামাই স্বর্গ রূপী হোটেলে গিয়ে সমাপ্ত করে পুনরায় কর্মের আধারে চুরাশী লক্ষ প্রকার প্রাণীর শরীরে কষ্ট পেতে পেতে কাল লোকে ভ্রমিত হতে থাকবে।

মায়া (দুর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়ে কোটি কোটি গোবিন্দ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব) মারা গিয়েছে। ভগবানের অবতার হয়ে এসেছিলেন তারপর কর্ম বন্ধনে বন্দী হয়ে কর্মের দণ্ড ভোগ করতে চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনীতে চলে গিয়েছেন। যেমন, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উপর দেবর্ষি নারদের অভিশাপ লেগেছিল, তাই তিনি শ্রীরামচন্দ্র রূপে অযোধ্যাতে এসেছিলেন, তারপর আবার তিনি অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র রূপে বালীকে বধ করেছিলেন। সেই কর্ম-দন্ড ভোগ করার জন্য শ্রী কৃষ্ণের দ্বাপর যুগে জন্ম হয়। তারপর, সেই বালীর আত্মা শিকারী হয় এবং নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিষাক্ত তীর মেরে তাকে বধ করেন।
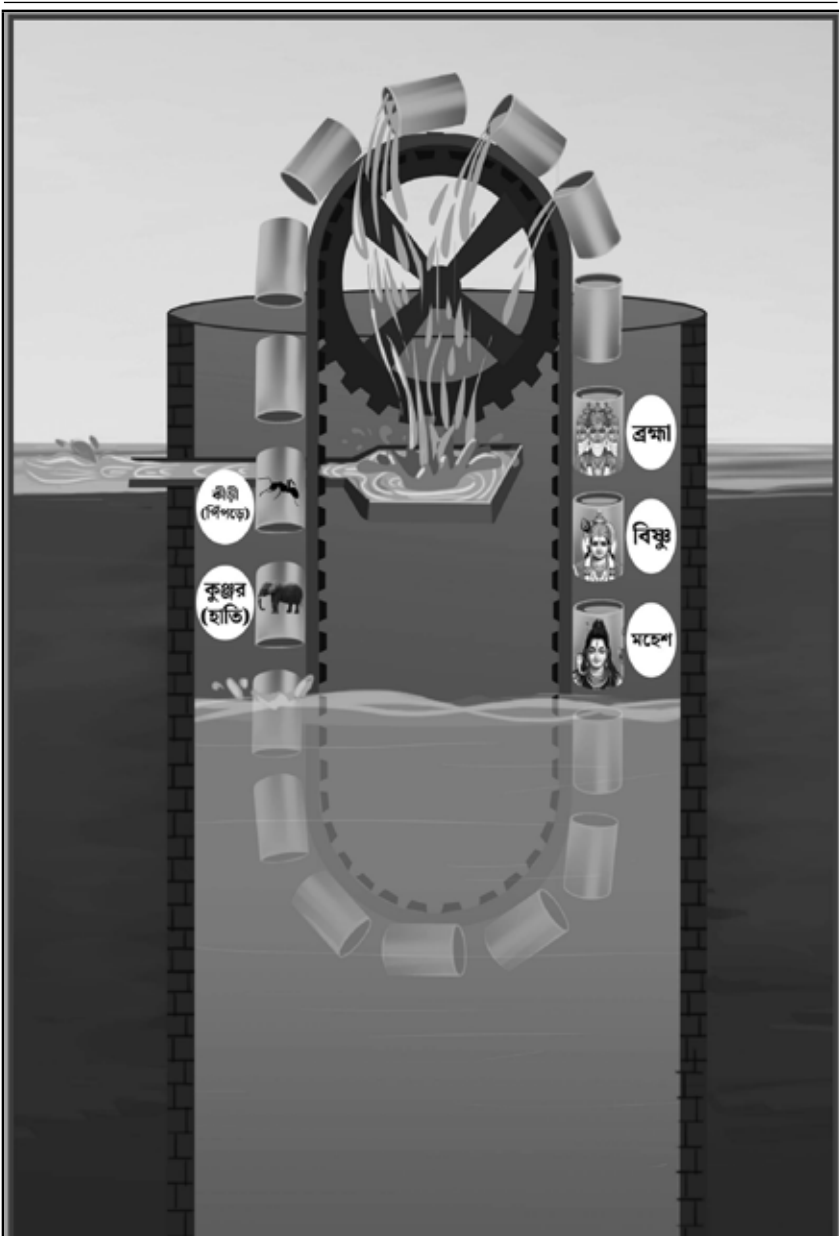
কাল লোকে জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্র (হরহট)

মহারাজ গরীব দাস জী নিজের বাণীতে বলেছেন:-

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মায়া, ঔর ধর্মরায় কহিয়ে।
ইন পাঁচোঁ মিল পরপঞ্চ বনায়া, বাণী হমরী লহিয়ে॥
ইন পাঁচো মিল জীব অটকায়ে, জুগন-জুগন হম আন ছুটায়ে।
বন্দী ছোড় হমারা নামম্, অজর অমর হে অস্থির ঠামম্॥
পীর পৈগম্বর কুতুব ঔলিয়া, সুর নর মুনিজন জ্ঞানী।
যেতা কো তো রাহ ন পায়া, জম কে বন্ধে প্রাণী॥
ধর্মরায় কী ধূমা-ধামী, জম পর জংগ চলাউঁ।
জোরা কো তো জান ন দুঙ্গা, বান্ধ অদল ঘর ল্যাউঁ॥
কাল অকাল দোহূঁ কো মোসূং, মহাকাল সির মুণ্ডু॥
মৈঁ তো তখত হজূরী হুকুমী, চোর খোজ কূঁ ঢূঁঢূ॥
মূল মায়া মগ মেঁ বৈঠী, হংসা চুন-চুন খাঈ।
জ্যোতি স্বরূপী ভয়া নিরঞ্জন, মৈঁহী কর্তা ভাঈ॥
সঁহস অঠাসী দীপ মুণীশ্বর, বন্ধে মুলা ডোরী।
এত্যাঁ মেঁ জম কা তলবানা, চলিয়ে পুরুষ কীশোরী॥
মূলা কা তো মাথা দাঙ্গূ, সতকী মোহর করুঙ্গা।
পুরুষ দীপ কূঁ হংস চলাউঁ, দরা ন রোকন দুংগা॥
হম তো বন্দীছোড় কহাবাঁ, ধর্মরায় হৈ চকবৈ।
সতলোক কী সকল সুনাবাঁ, বাণী হমরী অখবৈ॥
নৌ লখ পট্টন উপর খেলূঁ, সাহদরে কূ রোকূঁ।
দ্বাদস কোটি কটক সব কাটূঁ, হংস পঠাউঁ মোখূঁ॥
চৌদহ ভূবন গমন হৈ মেরা, জল থল মেঁ সরবংগী।
খালিক খলক খলক মেঁ খালিক, অবিগত অচল অভংগী॥
অগর অলীল চক্র হৈ মেরা, জিত সে হম চল আএ।
পাঁচোঁ পর প্রবাণা মেরা, বন্ধি ছুটাবন ধায়ে॥
জহাঁ ওঁকার নিরঞ্জন নাহীঁ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু দেব নহীঁ জাহীঁ।
জহাঁ করতা নহীঁ কাল ভগবানা, কায়া মায়া পিণ্ড ন প্রাণা॥
পাঁচ তত্ত্ব, তীনোঁ গুণ নাহীঁ, জোরা কাল দীপ নহীঁ জাহীঁ।
অমর করূঁ সতলোক পঠাউঁ, তাতেঁ বন্দীছোড় কহাউঁ।

কবীর পরমেশ্বরের (কবির্দেব) মহিমা বলতে গিয়ে, শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেব বলেছেন যে, আমার প্রভু কবীর (কবির্দেব) হলেন বন্দীছোড়। বন্দীছোড় এর ভাবার্থ হল, কালের কারাগার থেকে মুক্তি প্রদানকারী। কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব প্রাণী পাপের কারণে কালের কাছে বন্দী আছে। পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর সাহেব সমস্ত পাপ বিনাশ করে দেন। এই পাপ বিনাশ না ব্রহ্ম, না পরব্রহ্ম আর না ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব করতে পারেন, এনারা কেবল যেমন কর্ম আছে, তেমনিই ফল প্রদান করে থাকেন। এই জন্য যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ এর মন্ত্র নম্বর ৩২ এ লেখা আছে যে, 'কবিরংঘারিরসি' = (কবির্) কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) (অংঘ অরি) পাপের শত্রু 'বম্ভারিরসি = (বম্ভারিঃ) বন্ধনের (অরি) শত্রু অর্থাৎ বন্দীছোড়।

এই পাঁচ জনের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মায়া এবং ধর্মরায়) উপরে সতপুরুষ পরমাত্মা (কবির্দেব) আছেন। যিনি সতলোকের মালিক! এই পরব্রহ্ম-ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং আদি মায়া এনারা সকলেই নাশবান পরমাত্মা। মহাপ্রলয়ে এনারা সকলেই

এনাদের লোক সহ সমাপ্ত (ধ্বংস) হয়ে যায়। সাধারণ জীবের থেকে কয়েক হাজারগুন বেশি আয়ু এনাদের। তবুও যে সময় এনাদের জন্য নির্ধারিত করা আছে তা একদিন অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যাবে। শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী মহারাজ বলেছেন যে:-

শিব ব্রহ্মা কা রাজ, ইন্দ্র গিনতী কহাঁ। চার মুক্তি বৈকুণ্ঠ সমঝ, যেতা লহ্যা॥
সংখ জুগন কী জুনী, উম্র বড় ধারিয়া। জা জননী কুর্বান, সু কাগজ পারিয়া॥
যেতী উম্র বুলন্দ মরৈগা অন্ত রে। সত্গুরু লগে ন কান, ন ভৈঁটে সন্ত রে॥

যতই শঙ্খ যুগ সমান দীর্ঘ আয়ু হোক না কেন তা একদিন তা একদিন অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। যদি সতপুরুষ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর সাহেবের প্রতিনিধি পূর্ণ সন্ত (গুরু), যিনি তিন নামের মন্ত্র (যার মধ্যে একটি ওম্+তত্+সত্ সাংকেতিক আছে) প্রদান করেন এবং তিনি যেন পূর্ণ সন্তের কাছ থেকে নাম দান করার আদেশ পেয়ে থাকেন। তবেই তাঁর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে নামের কামাই করলে, সতলোকের অধিকারী হংস হতে পারবে। সত্য সাধনা বিনা অনেক লম্বা আয়ুও কোনো কাজে আসবে না, কারণ নিরঞ্জনের লোকে শুধুই দুঃখ আর দুঃখ।

কবীর, জীবনা তো থাড়ো হী ভলা, জৈ সত্ সুমরন হোয়।
লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখৈ ধরৈ না কোয়॥

⇨ যদি সত্য সাধনা করা হয় তাহলে অল্প আয়ুই ভাল যদি সত্য সাধনা সৎ পুরুষের না হয় কাল ব্রহ্মের বা দেব দেবীদের পূজা করে অথবা প্রণায়াম ইত্যাদি করে দীর্ঘায়ু যুক্ত হলেও ঐ ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব মোক্ষমার্গে থাকবে না। এতো বেশি আয়ু (শ্রীশিবের মতো) পাওয়া গেলেও একদিন মৃত্যু অবশ্যই হবে। ভুল ভক্তিতে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকেই যাবে। এই রকম আয়ুর লাভ কি?

কবীর সাহেব নিজের (পূর্ণব্রহ্মের) খবর স্বয়ং বলছেন যে, এই পরমাত্মা দেরও উপরে অসংখ্য ভূজার পরমাত্মা সতপুরুষ আছেন। যিনি সতলোকে (সচখন্ড, সতধাম) থাকেন এবং ওনার অন্তর্গত সর্ব লোক [ব্রহ্ম (কালের ২১ ব্রহ্মান্ড এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব শক্তির লোক এবং পর ব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ড এবং অন্য ব্রহ্মান্ড] আছে ওখানে কেবল সতনাম ও সারনামের জপের দ্বারা যাওয়া সম্ভব, যা পূর্ণ গুরুদেবের থেকে প্রাপ্ত করতে হয়। সচ্চখন্ডে যে আত্মা চলে যায়, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

সতপুরুষ (পূর্ণ ব্রহ্ম) কবীর সাহেবই (কবির্দেব) অন্যান্য লোকেও স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন নামে বিরাজমান আছেন। যেমন অলক লোকে অলক পুরুষ ,অগম লোকে অগম পুরুষ এবং অকহ লোকেও অনামী পুরুষ রূপে বিরাজমান আছে। এগুলি তো ওনার উপমাত্মক নাম, কিন্তু ঐ পূর্ণ পুরুষের বাস্তবিক নাম হলো কবির্দেব (ভিন্ন ভাষাতে তাকে কবীর সাহেব বলা হয়)

"আদরনীয় নানক সাহেবের অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনার সংকেত"

(শ্রী নানক সাহেবের অমৃতবাণী, মহলা ১, রাগ বিলাবলু, অংশ ১ (গু, গ্র, পৃ: ৮৩৯

আপে সচু কীয়া কর জোড়ি। অন্ডজ ফোড়ি জোডি বিছোড়॥
ধরতী আকাশ কীয়ে বৈসণ কউ থাউ। রাতি দিনন্তু কীয়ে ভউ-ভাউ॥
জিন কীএ করি বেখণহারা। (৩)
ত্রিতীয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেসা। দেবী দেব উপায়ে বেসা॥ (৪)
পবণ পানী অগনী বিসরাউ। তাহী নিরঞ্জন সাচো নাউ॥
তিসু মহি মনুআ রহিয়া লিব লাঈ। প্রণবতি নানকু কালু ন খাঈ॥ (১০)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল এই যে, প্রকৃত পরমাত্মা (সতপুরুষ) স্বয়ং নিজের হাতে সকল সৃষ্টি রচনা করেছেন। তিনি ডিম বানিয়ে পরে তা ভাঙেন অর্থাৎ, সেই ডিম থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বের হয়। এই পূর্ণ পরমাত্মা সকল প্রাণীদেরকে থাকার জন্য ধরতী, আকাশ, পবন, পানী প্রভৃতি পাঁচ তত্ত্ব রচনা করেন। নিজের দ্বারা রচনা করা সৃষ্টির সাক্ষী তিনি নিজেই। অন্য কেউ তার সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে না। ডিম থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বের হওয়ার পর, তিন দেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি হয় এবং অন্যান্য দেবী দেবতার উৎপন্ন হয়। সেই সাথে অগণিত জীবের উৎপত্তি হয়। তারপর অন্যান্য দেবী দেবতা জীবন চরিত্র এবং অন্যান্য ঋষিদের অনুভব ছয় শাস্ত্র এবং আঠারো পুরাণ রূপে প্রকাশ পায়। পূর্ণ পরমাত্মার প্রকৃত নামের (সত্যনাম) সাধনা অনন্য চিত্তে করলে এবং গুরু মর্যাদার মধ্যে থাকা ভক্তের বিষয়ে শ্রী নানকদেব বলেছেন যে, তাকে কাল কখনো খাবে না।

রাগ মারু (অংশ) অমৃতবাণী মহলা (গু.গ্র-পৃ১০৩৭)

সুনহু ব্রহ্মা, বিসনু, মহেসু উপাএ।
সুনে বরতে জুগ সবাএ॥
ইসু পদ বিচারে সো জনু পুরা। তিস মিলিএ ভরমু চুকাইদা॥ (3)
সাম বেদু, রূগু জুজরূ তথরবণু।
ব্রহমেঁ মুখ মাইআ হৈ ত্রেগুণ॥
তা কী কীমত কহি ন সকৈ। কো তিউ বোলে জিউ বুলাঈদা॥

উপরিক্ত অমৃতবাণীর সারাংশ হল, যে সন্ত পূর্ণ রূপে সৃষ্টি রচনা। শুনিয়ে দেবেন এবং বলে দেবেন যে, ডিম দুই ভাগে ভেঙে গিয়ে কে বের হয়েছে? যিনি ব্রহ্মালোকের শূন্য অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উৎপত্তি করেছেন, সেই পরমাত্মা কে? যিনি ব্রহ্মের (কালের) মুখ থেকে চার বেদ (পবিত্র ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ , সামবেদ ও অর্থববেদ) উচ্চারণ করিয়েছেন, সেই পূর্ণ পরমাত্মা যেভাবে চায়, সেভাবেই প্রত্যেক প্রাণীকে বলায়। এ সমস্ত জ্ঞানকে পূর্ণরূপে বলতে পারবে, এমন সন্তের সন্ধান পেলে তার কাছে যাও এবং যিনি সমস্ত শঙ্কা পূর্ণরূপে নিবারণ করেন। তিনিই পূর্ণসন্ত অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত।

শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নম্বর ৯২৯ শ্রী নানক সাহেব জীর অমৃতবাণী রাগ রামকালী মহলা ১ দক্ষনী ঔমঙ্কার।

ঔ-ওঁকারি ব্রহ্মা উৎপত্তি। ওঅঙ্কারু কীআ জিনি চিত। ঔ-ওঁকারি সৈল জুগ ভয়ে। ঔ-ওঁকারি বেদ নিরময়ে। ঔ-ওঁকারি সবদি উধরে। ঔ-ওঁকারি গুরুমুখি তরে। ওনম অখর সুনহূ বীচারু। ওনম অখরু ত্রিভবন সারু।

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে শ্রী নানক সাহেব জী বলেছেন যে, ওঁ-কার অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালের) থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। কয়েক যুগ আনন্দ ফুর্তি করার পর ওঁ-কার (ব্রহ্ম) বেদের উৎপত্তি করে, যা পরে শ্রী ব্রহ্মা পায়। তিন লোকে ভক্তি করার জন্য কেবল একটি ওম্ মন্ত্রই বাস্তবে জপ করা উচিত। এই ওম্ শব্দকে পূর্ণ সন্তের কাছ্ থেকে উপদেশ নিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ সন্তকে গুরু হিসাবে ধারন করে জপ করলে ,তবেই উদ্ধার হওয়া সম্ভব।

বিশেষ:- শ্রী নানক সাহেব জী তিন মন্ত্রের (ওম +তত্+সত্) বিভিন্ন স্থানে রহস্যময় বর্ণনা দিয়েছেন তা কেবল পূর্ণ সন্তই বুঝতে পারেন এবং তিনি তিন মন্ত্রের জপের বিধি উপদেশীকে বুঝিয়ে থাকেন।

(পৃ: ১০৩৮) উত্তম সতিগুরু পুরুষ নিরালে, সবদি রতে হরি রস মতবালে।
রিধি, বুধি, সিধি, গিয়ান গুরু তে পাইয়ে, পুরে ভাগ মিলাঈদা ॥ ১৫॥
সতিগুরু তে পায়ে বিচারা, সুন সমাধি সচে ঘরবারা॥
নানক নিরমল নাদু সবদ ধুনি, সচু রামৈঁ নামি সমাইদা (১৭) ।

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হলো এই যে, প্রকৃত জ্ঞান প্রদানকারী সদগুরু তো অনন্য। তিনি কেবল নাম জপ'ই করেন ও করান। অন্য কোন হঠ্ যোগ সাধনার কথা বলেন না। যদি আপনি ধন -দৌলত পদ, বুদ্ধি অথবা ভক্তি শক্তি চান, তাহলে সেই ভক্তি মার্গের জ্ঞান পূর্ণ সন্তই পূর্ণ রূপে প্রদান করবেন। এমন পূর্ণ সন্ত বড়ো ভাগ্যের অধিকারী হলেই পাওয়া যায়। সেই পূর্ণ সন্ত বিবরণ দেবেন যে উপরে শূন্য (আকাশে) আমাদের আসল ঘর (সত্যলোক) পরমেশ্বর যা রচনা করে রেখেছেন।

সেখানে একটি বাস্তবিক সারনামের ধুন (আওয়াজ) হয়েই চলেছে। ঐ আনন্দময় অবিনাশী পরমেশ্বরকে সারশব্দের দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়, অর্থাৎ এই বাস্তবিক সুখদায়ী স্থানে নিবাস করা সম্ভব। অন্য কোনো নামে এবং অসম্পূর্ণ গুরুদের দ্বারা সম্ভব নয়।

আংশিক অমৃতবাণী মহলা পহলা (শ্রী গু.গ্র.পৃ:- ৩৫৯-৩৬০)
সিব নগরী মহি আসণি বৈসউ কলপ ত্যাগী বাদং। (১)
সিঙী সবদ সদা ধুনি সোহৈ অহিনিসি পূরৈ নাদম্। (২)
হরি কীরতি রহ রাসি হমারী গুরু মুখ পন্থ অতীতম্ (৩)
সগলী জোতি হমারী সংমিআ নানা বরণ অনেকম্।
কহ নানক সুনি ভরথরী জোগী পারব্রহ্ম লিব একম্। (৪)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল এই যে, শ্রী নানক সাহেব জী বলেছেন যে, হে ভরথরী যোগী জী! আপনার সাধনা তো শিব ভগবান পর্যন্ত সীমিত আছে, যার প্রতিফলে আপনি শিব নগরীতে (লোকে) স্থান পেয়েছেন, আর আপনার শরীরে যে সিঙ্গি শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে তা এই কমল চক্রে এবং টেলিভিশনের মতো প্রত্যেক দেবতার লোক থেকে সেই শব্দ এই শরীরের মধ্যে শোনা যায়। আমি এক পরমাত্মা পারব্রহ্ম অর্থাৎ সবার উর্ধ্বে যে পূর্ণ পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার প্রতি ধ্যান (অনন্য মনে চিন্তা করা) লাগাই ।

আমি লোক দেখানো (ভস্ম লাগানো হাতে লাঠি রাখা) ভক্তি করি না। আমি তো সকল প্রাণীদেরকে এক পূর্ণ পরমাত্মার (সত পুরুষের) সন্তান মনে করি। সব কিছুই ঐ শক্তিতেই চলছে। আমার মুদ্রা তো সত্যনামের জপ গুরুদেবের থেকে প্রাপ্ত করে করতে হয়, এবং ক্ষমা করা আমাদের বেশভূষা। আমি তো পূর্ণ পরমাত্মার উপাসক এবং পূর্ণ সতগুরুদেবের ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ আলাদা।

অমৃতবানী রাগ আসা মহলা ১ (গুরুগ্রন্থ-পৃ:- ৪২০)

॥ আসা মহলা॥ জিনী নামু বিসারিআ দূজৈ ভরমিঁ ভুলাই। মূলু ছোড়ি ডালী লগে কিআ পাবহি ছাঈ॥ ১॥ সাহিবু মেরা একু হৈ অবরু নহী ভাঈ। কিরপা তে সুখু পাইআ সাচে পরথাঈ ॥ ৩॥ গুরু কী সেবা সো করে জিসু আপি করাএ। নানক সিরু দে ছুটীঐ দরগাহ পতি পাএ॥ ৮॥ ১৮॥

উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ হলো এই যে, নানক সাহেব বলেছেন যারা পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম ভুলে গিয়ে অন্য ভগবানের নাম জপ করে ভ্রমিত আছে, তারা তো এমন করছে ঠিক যেমন মূল শিকড় (পূর্ণ পরমাত্মা) কে ছেড়ে দিয়ে ডালে (তিনগুণ রূপী রজোগুন- ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ -বিষ্ণু, তমোগুণ শিবের) জল সেচ (পূজা) করছে। ঐ সাধনাতে কোন প্রকার সুখ প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ ভক্তিরূপী চারা গাছটি শুকিয়ে যাবে গাছের ছায়ায় বসতে পারবে না। এর ভাবার্থ এই হলো যে, শাস্ত্রবিধি রহিত সাধনা

করলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়, যার কোন লাভ নেই। এ কথার প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ ২৪ এর মধ্যে আছে এই পূর্ণ পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য মনমুখী (মনমর্জি) সাধনা ত্যাগ করে সমর্পিত/পূর্ণ গুরুদেবের চরণে সমর্পিত হয়ে প্রকৃত নামের জপ করলেই তবেই মোক্ষ সম্ভব। তা না-হলে মৃত্যুর পর নরকে যেতে হবে।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৮৪৩,৮৪৪)

বিলাবলু মহলা ১॥ মৈঁ মন চাহু ঘণা সাচি বিগাসী রাম। মোহী প্রেম পিরে প্রভু অবিনাসী রাম॥ অবিগতো হরি নাথু নাথহ তিসৈ ভাবৈ সো থীঐ। কিরপালু সদা দইআলু দাতা জীআ অন্দরি তূঁ জীঐ। মৈঁ আধারু তেরা তূ খসমু মেরা মৈ তাণু তকীআ তেরও। সাচি সূচা সদা নানক গুরুসবদি ঝগরু নিবেরও॥ ৪॥ ২॥

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে শ্রী নানক সাহেব বলেছেন যে, অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা নাথেরও নাথ অর্থাৎ দেবতাদেরও দেব সকল প্রভুদের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ,শ্রী শিব এবং ব্রহ্ম ও পর ব্রহ্মের নাথ তিনি অর্থাৎ স্বামী।) আমি তো সত্যনামকে হৃদয়ে স্থাপিত করে নিয়েছি, হে পরমাত্মা! সকল প্রাণীর জীবনের একমাত্র আধার আপনি। আমি আপনার ওপর আশ্রিত; আপনি হলেন আমার মালিক। আপনিই গুরু রূপে এসে সত্য ভক্তির নির্ণায়ক জ্ঞান দিয়ে, সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি সমাপ্ত করে দিয়েছেন অর্থাৎ অবসান/ সমস্ত সন্দেহের সমাধান করে দিয়েছেন।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৭২১, রাগ তিলক মহলা ১)

য়ক অর্জ গুফতম পেশ তো দর কুন করতার। হক্কা কবীর করীম তু বেএব পরবরদিগার। নানক বুগোয়দ জন তুরা তেরে চাকরাঁ পাখাক॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, (হক্কা কবীর) আপনি সত্‌কবীর (কুল কর্তার) শব্দ শক্তিতে রচনাকারী, শব্দ স্বরূপী প্রভু অর্থাৎ সকল সৃষ্টির রচনাকর্তা আপনি বেএব নির্বিকার (পরবরদিগার) সকলের পালনকর্তা দয়ালু প্রভু ও আমি আপনার দাসেরও দাস।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ২৪ রাগ সিরী মহলা ১)

তেরা এক নাম তারে সংসার, মৈঁ ঐহা আস ঐহো আধার।
নানক নীচ কহৈ বিচার, ধানক রূপ রহা করতার॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, যিনি কাশীতে ধানক (তাঁতি) রূপে এসেছিলেন তিনি (করতার) অর্থাৎ সর্ব কলের সৃজনহার। অতি আধীন হয়ে শ্রী নানক সাহেব জী বলেছেন যে, আমি সত্য কথা বলছি যে ,এই ধানক (তাঁতি) অর্থাৎ কবীর জোলা'ই পূর্ণব্রহ্ম (সতপুরুষ)

বিশেষ:- উপরোক্ত প্রমাণ গুলির সাংকেতিক জ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টি রচনা কিভাবে হয়েছে ? এমন পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি করা উচিত, যা ঐ পূর্ণ সন্তের থেকে নাম দীক্ষা নিলে তবেই সম্ভব।

"অন্যান্য সাধু - সন্তদের দ্বারা সৃষ্টির রচনার গল্প কথা"

অন্যান্য সাধু-সন্তদের দ্বারা সৃষ্টির রচনার যে জ্ঞান বলা হয়েছে তা কেমন? কৃপা করে নিচে পড়ুন:- সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাধাস্বামী পন্থের সন্ত এবং ধনধন সদগুরু পন্থদের বিচার:-

পবিত্র পুস্তক "জীবন চরিত্র পরম সন্ত বাবা, জয়মল সিংহ জী মহারাজ" পৃষ্ঠা নং- ১০২ -১০৩ এর মধ্যে 'সৃষ্টি রচনা' (সাবন কৃপাল পাবলিকেশন, দিল্লি।)

"প্রথমে সতপুরুষ নিরাকার ছিলেন ,তারপর তিনি ইজহার (আকারে) আসেন, সাথে সাথেই উপরের তিনটি নির্মল মন্ডল (সতলোক, অলকলোক, অগমলোক) সৃষ্টি

হয়ে যায় এবং প্রকাশ এবং মন্ডল সমূহের নাদ (ধ্বনি) হয়ে যায়।”

পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর) প্রকাশক :- রাধাস্বামী সতসঙ্গ সভা, দয়ালবাগ আগরা সৃষ্টি রচনা পৃষ্ঠা নং- ৮

“সর্বপ্রথম ধুন্দুকার (অন্ধকার) ছিল। তার মধ্যে পুরুষ শূন্য সমাধিতে ছিল। তখন কোন কিছু রচনা ছিল না। তারপর যখন ওনার ইচ্ছা হল তখন শব্দ প্রকট হয়, আর ঐ শব্দ থেকে সবকিছু রচনা হলো। প্রথমে সতলোক এবং তারপর সতপুরুষের কলা থেকে তিন লোক এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুর বিস্তার হয়।

এই জ্ঞান তো এমন, ঠিক যেমন এক সময় একটি ছেলে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায়, তখন তাকে আধিকারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মহাভারত পড়েছেন? ছেলেটি উত্তর দেয় যে, মহাভারত তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছে। আধিকারিক প্রশ্ন করলেন পঞ্চ পান্ডবের নাম বল। ছেলেটি উত্তর দেয়, একজন ভীম ছিল, একজন তার বড় ভাই ছিল, একজন তার থেকে ছোট ভাই ছিল, আর একজন ছিল এবং বাকি অন্যজনের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। উপরোক্ত সৃষ্টি রচনার জ্ঞান ঠিক সেই রকম।

সতপুরুষ এবং সতলোকের মহিমা বর্ণনাকারী পাঁচ নাম (ঔঙ্কার- জ্যোতি নিরঞ্জন- ররংকার -সোহং- সত্যনাম) প্রদানকারী ও তিন নাম (অকালমূর্তি- সতপুরুষ- শব্দ স্বরূপী রাম) প্রদানকারী সন্তদের দ্বারা রচনা করা পুস্তকের কিছু নিষ্কর্ষ :-

সন্তমত প্রকাশ ভাগ ৩ পৃষ্ঠা নং ৭৬-তে লেখা আছে যে, “সচ্চখন্ড অথবা সতনাম হলো চতুর্থ লোক”, এখানে ‘সতনাম’ কে স্থান বলা হয়েছে। এরপর এই পবিত্র পুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৭৯-তে লেখা আছে যে, “এক রাম দশরথের পুত্র, দ্বিতীয় রাম ‘মন’ তৃতীয় রাম হল ‘ব্রহ্ম’, চতুর্থ রাম ‘সতনাম’, ইনিই আসল রাম।” আবার ও পবিত্র পুস্তক সন্তমত প্রকাশ প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা নং ১৭- তে লেখা আছে যে “সেটি সতলোক এবং তাকে সতনাম বলা হয়।” পবিত্র পুস্তক ‘সার বচন নসর ইয়ানি ওয়ার্তিক’ পৃষ্ঠা নং -৩ এ লেখা আছে যে, এখন বোঝা উচিত যে, রাধাস্বামীর পদ হল সবার থেকে উঁচু মুকাম বা ঘর, যাকে সন্তগণ সতলোক, সচ্চখন্ড, সারশব্দ, সতশব্দ, সতনাম এবং সতপুরুষ বলে বর্ণনা করেছে। পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর) আগ্রা থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা নং ৪ এর মধ্যেও উপরোক্ত যথার্থ বর্ণনা আছে। পবিত্র পুস্তক ‘সচখন্ড কী সড়ক’ পুস্তকের পৃষ্ঠা নং. ২২৬ এ “সন্তদের দেশ সচ্চখন্ড অথবা সতলোক,আর তাকেই সতনাম - সতশব্দ - সারশব্দ বলা হয়”।

বিশেষ:- উপরোক্ত ব্যাখ্যা পড়ে এমন মনে হবে, ঠিক যেমন কোন এক ব্যক্তি তার জীবনে কখনো শহর দেখেনি, কখনো গাড়ি দেখেনি বা পেট্রোল দেখেনি, আর ড্রাইভার কাকে বলে তাও জানে না। ঐ ব্যক্তি তার অন্য সাথীদের বলে যে, আমি শহরে যাই, মোটর গাড়িতে বসে আনন্দ করি। তখন তার সাথীরা তাকে জিজ্ঞাসা করে মোটর গাড়ি কেমন ? পেট্রোল কেমন ? ড্রাইভার ও শহর কেমন? ঐ গুরুদেব তখন উত্তর দেয় যে, শহর বলো বা মোটরগাড়ি একই কথা, শহরকেও মোটরগাড়ি বলে, পেট্রোলও মোটর গাড়িকেই বলা হয়, ড্রাইভারকেও মোটরগাড়ি বলা হয়। সড়ক ও মোটরগাড়িকেই বলা হয় ।

আসুন বিচার করি :- সতপুরুষ তো হলেন পূর্ণ পরমাত্মা। সতনাম হল সেই দুই মন্ত্রের নাম, যার মধ্যে একটি ওম্ + তত সাংকেতিক রয়েছে এবং এরপর পূর্ণ গুরু দ্বারা সারনাম সাধককে প্রদান করা হয় । এই সতনাম এবং সারনাম দুটি স্মরণ (জপ) করার নাম। সত লোক হল সেই স্থান যেখানে সতপুরুষ থাকেন। পুণ্যআত্মা গণ আপনারা স্বয়ং নির্ণয় করুন সত্য এবং অসত্যের বিষয়।

কুলের মালিক কে এবং তিনি কেমন?

যে সকল পূণ্যাত্মারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেছেন, তারা সকলেই বলেছেন- সর্বকুলের মালিক এক। তিনি মানুষ সদৃশ্য ও তেজোময় শরীর যুক্ত। তাঁর এক রোমকূপের প্রকাশ কোটি কোটি সূর্য ও চন্দ্রের মিলিত রশ্মির চেয়েও অনেক বেশি। তিনিই নানান রূপ ধারণ করে থাকেন। পরমেশ্বরের বাস্তবিক নাম নিজ নিজ ভাষা অনুযায়ী কবির্দেব (বেদে সংস্কৃত ভাষায়) তথা হক্কা কবীর (শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহেবের পৃষ্ঠা নং- ৭২১ এ আঞ্চলিক ভাষায় লেখা), সত কবীর (শ্রী ধর্মদাস জীর বাণীতে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয়) এবং বন্দীছোড় কবীর (সন্ত গরীবদাস জীর রচিত সদগ্রন্থে, ক্ষেত্রীয় ভাষায়), কবীরা, কবীরণ্ ও খবীরা বা খবীরন্ (পবিত্র কুরআন শরীফ সুরাত ফুরকানি নম্বর ২৫ আয়াত নং. ১৯, ২১, ৫২, ৫৮, ৫৯ -এ আঞ্চলিক আরবি ভাষায় আছে)। এই পূর্ণ পরমাত্মারই উপমাত্মক নাম হল - অনামি পুরুষ, অগম পুরুষ, অলক পুরুষ, সতপুরুষ, অকালমূর্তি, শব্দ স্বরূপী রাম, পূর্ণব্রহ্ম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম ইত্যাদি। যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক নাম বাস্তবে ভিন্ন হয় এবং উপমাত্মক নাম যথা- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার এইগুলি ভিন্ন হয়। যেমন ভারত দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি গৃহ বিভাগটি নিজে নিয়ে নেন। তখন তিনি ঐ বিভাগের কোন কাগজপত্রের ওপর স্বাক্ষর করলে সেখানে গৃহমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করেন এবং নিজের পদ গৃহমন্ত্রী হিসেবেই লেখেন, হস্তাক্ষর একই থাকে। এই প্রকারেই ঈশ্বরীয় সত্ত্বা গুলিকে বুঝতে হবে।

যে সকল সন্ত বা ঋষিদের পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়নি, তারা তাদের অন্তিম অনুভব এটাই জানিয়েছেন যে, প্রভুর কেবল প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, প্রভুকে দেখতে পাওয়া যায় না কারণ, তার কোন আকার নেই এবং শরীরের ভিতর ধ্বনি শুনতে পাওয়া ইত্যাদি হলো প্রভু ভক্তির উপলব্ধি।

এসো বিচার করি :- যেমন কোন অন্ধ ব্যক্তি নিজেকে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন প্রমাণ করার জন্য বলে যে, “আমি দেখি, রাত্রিতে চাঁদের আলো অতি আনন্দদায়ক ও মনমুগ্ধকর হয়”। অন্যান্য অন্ধ শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করল, গুরুজী! চাঁদের আলো দেখতে কি রকম হয়? চতুর অন্ধ উত্তর দেয়, “চাঁদ তো নিরাকার, তাকে আদৌ দেখা যায় না। আবার কেউ বলে সূর্য নিরাকার তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, রবি স্বপ্রকাশিত তাই তার কেবল প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। গুরুজীর কথা মত শিষ্য আড়াই ঘণ্টা সকালে ও আড়াই ঘন্টা সন্ধ্যাবেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তারপর নিজেদের মধ্যে বিচার আলোচনা করল যে, গুরুজী ঠিক বলছেন। কিন্তু আমাদের সাধনা সকাল সন্ধ্যা সম্পূর্ণ আড়াই ঘন্টা করে সম্ভব হয়না তাই হয়তো আমরা সূর্য ও চাঁদ এর প্রকাশকে দেখতে পারছি না। চতুর গুরুর জ্ঞানহীন ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করে ঐ গুরুর অন্ধ শিষ্যের ভুল ব্যাখ্যায় ভ্রমিত হয়ে কোটি কোটি প্রচারক অন্ধ (জ্ঞানহীন) হয়ে গিয়েছে। এরপর কোন চাক্ষুষ্মান ব্যক্তি (তত্ত্বদর্শী সন্ত) তাদেরকে বলে যে, সূর্যের আকার আছে এবং তার থেকেই প্রকাশ নির্গত হচ্ছে। এই প্রকার চাঁদের থেকেও প্রকাশ নির্গত হচ্ছে নেত্রহীনেরা! চাঁদ ছাড়া রাত্রিতে (আলো) প্রকাশ কি করে সম্ভব? যেমন কেউ যদি বলে যে, আমি টিউবলাইট দেখেছি। দ্বিতীয় কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, টিউব দেখতে কেমন হয়, যার আলো (লাইট) আপনি দেখলেন? উত্তর দিল, টিউব নিরাকার তাই দেখা যায় না কেবল প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বিচার করুন, টিউব ছাড়া প্রকাশ হয় কি করে?

যদি কেউ বলে যে, হীরা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। তারপর আবার এও বলে যে হীরাকে চোখে দেখা যায় না তার কেবল প্রকাশ দেখা যায় কারণ হীরা নিরাকার। তবে

সেই ব্যক্তি হীরার সহিত পরিচিত নয়, সে নকল জহুরী সেজে বসে আছে। যারা বলে পরমাত্মা নিরাকার এবং কেবল প্রকাশ দেখতে পাওয়া বা ধুন শুনতে পাওয়া কেই প্রভু প্রাপ্তি বলে মনে করে তারা পূর্ণরূপে প্রভুর সহিত ও ভক্তি দ্বারা অপরিচিত। ঐ চাক্ষুষ্মান ব্যক্তিটি তাকে প্রার্থনা করে বলল, "তুমি কিছুই দেখনি। নিজের অনুগামীদের ভ্রমিত করে দোষী হচ্ছো। তত্ত্বজ্ঞান রূপী নেত্র তোমার গুরুদেবেরও নেই এবং তোমারও নেই। তাই সারা বিশ্বকে ভ্রমিত কোরো না!" এই কথা শুনে সর্বজ্ঞান রূপী নেত্র থাকা অন্ধেরা হাতে লাঠি তুলে নিয়ে বলে, "আমরা সবাই মিথ্যে আর তুই একাই সঠিক!" আজ একই পরিস্থিতির সন্ত রামপাল জী মহারাজের সাথে ঘটছে।

কোন সন্তের মতামত সঠিক এবং কোন সন্তের মতামত ভুল, এই বিবাদের মীমাংসা কিভাবে সম্ভব ? মনে করুন কোন এক অপরাধের বিষয়ে পাঁচ জন উকিল নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করছেন। তাদের মধ্যে একজন বললো যে, এই অপরাধের জন্য সংবিধানের ধারা ৩০১ দিতে হবে, দ্বিতীয় জন বললো ৩০২, তৃতীয় জন বললো ৩০৪, চতুর্থ জন বলোল ৩০৬, ও পঞ্চম জন ৩০৭ ধারাকেই সঠিক বললো।

এই পাঁচজনেরই মতামত সঠিক হতে পারে না। কেবল একজনের কথা সঠিক হতে পারে যদি তার দেওয়া ব্যাখ্যা আমাদের দেশের পবিত্র সংবিধানের সাথে মেলে। ঐ একজনের ব্যাখাও যদি সংবিধানের বিপরীত হয়ে থাকে, তবে পাঁচ জন উকিলই ভুল। এর নির্ণয় দেশের পবিত্র সংবিধান করবে, যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এই প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন বিচারধারার মধ্যে ও ভিন্ন-ভিন্ন সাধনার মধ্যে কোনটি শাস্ত্র অনুকূল এবং কোনটি শাস্ত্র বিরুদ্ধ তার নির্ণয় পবিত্র সদগ্রন্থই করবে, যা সকলের মান্য হওয়া উচিত (এরই প্রমাণ পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ -২৪ এ আছে)।

যে চাক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ (পূর্ণ সন্তরা) সূর্য (পূর্ণ পরমাত্মাকে) দেখেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

ক) শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস সাহেব (খ) শ্রদ্ধেয় দাদু সাহেব জী (গ) শ্রদ্ধেয় মলুক দাস সাহেব জী) ঘ) শ্রদ্ধেয় গরীবদাস সাহেব জী (ঙ) শ্রদ্ধেয় নানক দেব (চ) শ্রদ্ধেয় ঘীসা দাস সাহেব জী প্রমূখ)

(ক) শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস সাহেব (বান্ধবগঢ়,মধ্যপ্রদেশ, যাকে পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মা রূপে মথুরাতে এসে দর্শন দেন ও সতলোকে নিয়ে যান। ওখানে সতলোকে নিজের দুই ভিন্ন রূপ দেখিয়ে, জিন্দা মহাত্মার রূপে পূর্ণ পরমাত্মার সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে গেলেন এবং শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস সাহেবকে বললেন, "আমিই কাশীতে (বেনারসে) নীরু নীমার ঘরে গিয়েছি। সেখানে তাঁতির কাজ করি, শ্রদ্ধেয় শ্রী রামানন্দ জী আমার গুরু।" এই বলে শ্রীধর্মদাসের আত্মাকে পুনরায় শরীরে পাঠিয়ে দেন। শ্রী ধর্মদাসের শরীর দুইদিন ধরে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল। তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরতেই কাশীতে খোঁজ করে দেখতে পান যে, কাশীতে আসা এই তাঁতিই হলেন পূর্ণ পরমাত্মা (সতপুরুষ)। শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস সাহেব পবিত্র কবীর সাগর, কবীর সাখী, কবীর বীজক নামক সদগ্রন্থগুলিতে স্বচক্ষে দেখে এবং পূর্ণ পরমাত্মার পবিত্র মুখ কমল হতে নিঃসৃত অমৃত বচন রূপী বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অমৃত বাণীতে প্রমাণ :-

আজ মোহে দর্শন দিয়ো জী কবীর॥ টেক॥
সত্যলোক সে চল কর আয়ে, কাটন জম কী জঞ্জীর॥ ১॥
থারে দর্শন সে ম্হারে পাপ কটত হৈঁ, নির্মল হোবৈ জী শরীর॥ ২॥
অমৃত ভোজন ম্হারে সতগুরু জীমৈঁ, শব্দ দূধ কী খীর॥ ৩॥
হিন্দু কে তুম দেব কহায়ে, মুসলমান কে পীর॥ ৪॥
দোনোঁ দীন কা ঝগড়া ছিড় গয়া, টোহে না পায়ে শরীর॥ ৫॥

ধর্মদাস কী অর্জ গোসাঁই, বেড়া লঙ্ঘাঈয়ো পরলে তীর॥ ৬॥

(খ) শ্রদ্ধেয় দাদু সাহেব জী (অমৃত বাণীতে প্রমাণ) কবীর পরমেশ্বরের সাক্ষী:-

শ্রদ্ধেয় দাদু সাহেব জী যখন সাত বৎসরের বালক, তখন পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মা রূপে তাকে দেখা দেন এবং সতলোকে নিয়ে যান। তিনদিন পর্যন্ত অচেতন ছিলেন। জ্ঞান ফেরার পর স্বচক্ষে দেখা পরমেশ্বরের মহিমা বহু অমৃত বাণীর মাধ্যমে উচ্চারণ করেন :-

জিন মোকূঁ নিজ নাম দিয়া, সোঈ সতগুরু হমার। দাদূ দূসরা কোঈ নহীঁ, কবীর সৃজনহার॥
দাদূ নাম কবীর কী, জৈ কোঈ লেবে ওট। উনকো কবহূ লাগে নহীঁ, কাল বজ্র কী চোট॥
দাদূ নাম কবীর কা সুনকার কাঁপে কাল। নাম ভরোসে জো নর চলে, হোবে ন বঁকা বাল॥
জো জো শরণ কবীর কে, তির গএ অনন্ত অপার। দাদূ গুণ কীতা কহে, কহত ন আবৈ পার॥
কবীর কর্তা আপ হৈ, দূজা না কোয়। দাদূ পূর্ণ জগৎ কো ভক্তি দৃড়াবত সোয়॥
ঠেকা পূরা হোয় জব, সব কোঈ তজৈ শরীর। দাদূ কাল গঁজে নহীঁ, জপৈ জো নাম কবীর॥
আদমী কী আয়ূ ঘটৈ, তব যম ঘেরে আয়। সুমিরন কিয়া কবীর কা, দাদূ লিয়া বচায়॥
মেট দিয়া অপরাধ সব, আয় মিলে ছিন মাঁহ। দাদু সঙ্গ লে চলে, কবীর চরণ কী ছাঁহ॥
সেবক দেব নিজ চরণ কা, দাদূ অপনা জান। ভৃঙ্গী সত্য কবীর নে, কীন্হা আপ সমান॥
দাদু অন্তর্গত সদা, ছিন-ছিন সুমিরন ধ্যান। বারু নাম কবীর পর, পল পল মেরা প্রাণ॥
সুন-সুন সাখী কবীর কী, কাল নবাবৈ মাথ। ধন্য-ধন্য হো তিন লোক মেঁ, দাদু জোড়ে হাথ॥
কেহরী নাম কবীর কা, বিষম কাল গজরাজ। দাদূ ভজন প্রতাপ সে, ভাগে সুনত আবাজ॥
পল এক নাম কবীর কা, দাদূ মন চিত লায়। হস্তী কে অসবার কো, শ্বান কাল নহীঁ খায়॥
সুমরত নাম কবীর কা, কটে কাল কী পীর। দাদূ দিন দিন উঁচা হোয়ে পরমানন্দ সুখ সীর॥
দাদূ নাম কবীর কী, জো কোঈ লেবে ওট। তিনকো কবহূঁ না লগঈ, কাল বজ্র কী চোট॥
ঔর সন্ত সব কূপ হৈঁ, কেতে ঝরিতা নীর। দাদূ অগম অপার হৈ, দরিয়া সত্য কবীর॥
অবহী তেরী সব মিটৈ, জন্ম মরণ কী পীর। শ্বাস উশ্বাস সুমর লে, দাদূ নাম কবীর॥
কোঈ সর্গুন মেঁ রীঝা রহা, কোঈ নির্গুণ ঠহরায়। দাদু গতি কবীর কী, মোতে কহী না জায়॥

(গ) আদরণীয় মলূক দাস সাহেবের কবির্দেবের সাক্ষী:-

৪২ বৎসর বয়সে শ্রী মলুক দাস সাহেবকে পূর্ণ পরমাত্মা দর্শন দেন এবং তিনি দুই দিন অচেতন থাকার পর নিম্নের বাণী উচ্চরণ করেন।

জপো রে মন সতগুরু নাম কবীর॥ জপো রে মন পরমেশ্বর নাম কবীর। (টেক)
এক সময় গুরু বংশী বজাঈ কালিন্দ্রী কে তীর।
সুর-নর মুনি থক গএ, রুক গয়া দরিয়া নীর॥
কাশী তজ গুরু মগহর আয়ে, দোনোঁ দীন কে পীর॥
কোঈ গাড়ে কোঈ অগ্নি জরাবৈ, ঢুঁঢ়া ন পায়া শরীর।
চার দাগ সে সদগুরু ন্যারা, অজরো অমর শরীর॥
দাস মলূক সলূক কহত হৈঁ, খোজো খসম কবীর॥

(ঘ) শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেবের (ছুড়ানী জিলা-ঝজ্জর, হরিয়াণা) অমৃত বাণীতে প্রভু কবীরের (কবির্দেবের) সাক্ষীর প্রমাণ :-

শ্রদ্ধেয় গরবীদাস সাহেবের আবির্ভাব হয় ১৭১৭ সালে। ১০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৭২৭ সালে নলা নামক একটি মাঠে সাহেব কবীর জীর দর্শন হয়। ১৭৭৮ সালে সতলোকবাসী হন। শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেব তাদের নলা নামক মাঠে অন্যান্য গোয়ালা সাথীদের সঙ্গে গরু চরাচ্ছিলেন। মাঠটি পাশের কবলানা গ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন ছিল।

জিন্দা মহাত্মা রূপে প্রকট হওয়া কবীর পরমেশ্বরকে এক গোয়ালা অনুরোধ করল, "যদি আপনি খাবার গ্রহণ না করেন তবে দুধ পান করুন। কারণ পরমাত্মা বলে দিয়েছিলেন যে, আমি আমার সতলোক নামক গ্রাম থেকে খাবার খেয়ে এসেছি। অনুরোধ করায় পরমেশ্বর কবীর জী বললেন, "আমি কুমারী গাভীর দুধ পান করি"। বালক গরীব দাস এক কুমারী গাভী (যে গাভী এখনও বাচ্চা দেইনি) পরমেশ্বর কবীর জীর কাছে এনে দিয়ে বললেন, বাবাজী! এই কুমারী গাভী কীভাবে দুধ দিতে পারে ? তখন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) কুমারী গাভী বা বাছুরের কোমরে হাত রাখতেই নিজে থেকেই কুমারী গাভীর (অধন্যা ধেনু) থন থেকে দুধ বের হতে লাগল। পাত্র ভরা মাত্রই দুধ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ঐ দুধ পরমেশ্বর কবীর জী পান করলেন এবং কিছুটা প্রসাদ রূপে নিজ সন্তান গরীব দাসকে দিলেন ও সতলোক দর্শন করালেন। কবীর পরমেশ্বর সতলোকে নিজের দুটি ভিন্ন রূপ দেখিয়ে, জিন্দা বাবার রূপে ও কূল মালিকের রূপে সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে গেলেন। এবং বললেন, "আমিই ১২০ বছর পর্যন্ত কাশীতে তাঁতি রূপে ছিলাম। এর আগেও আমি হজরত মহম্মদকে দর্শন দিয়ে ছিলাম। পবিত্র কুরান শরীফে যে কবীরা, কবীরন, খবিরা, খবীরন, আল্লাহু আকবর শব্দ গুলি রয়েছে তা আমাকেই বোঝায়। আমিই শ্রী নানক দেবকে বেঈ নদীর তীরে জিন্দা মহাত্মা রূপে দর্শন দিয়েছিলাম। (মুসলমানদের মধ্যে জিন্দা মহাত্মা হয়ে থাকেন, তারা কালো ওভার কোট অর্থাৎ এক প্রকার লম্বা হাত ওয়ালা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পোশাক পরে থাকেন, মাথায় কালো টুপি পরেন) এবং আমিই বলখ শহরের নরেশ আব্রাহিম সুলতান অধমকে ও শ্রী দাদু জীকে দর্শন দিয়েছিলাম এবং পবিত্র-চার বেদের মধ্যে যে কবির অগ্নি, কবির্দেব (কবিরংঘারিঃ) ইত্যাদি নামগুলি আছে তা আমাকেই বোঝায়।

কবীর, বেদ হমারা ভেদ হৈ, মৈঁ মিলূঁ বেদোঁ সে নাঁহী।
জৌন বেদ সে মৈঁ মিলূঁ, বো বেদ জানতে নাঁহী।

আমিই বেদের পূর্বে সতলোকে বিরাজমান ছিলাম। [গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জর (হরিয়াণা) ঐ জঙ্গলে আজও এক স্মৃতি স্মারক বিদ্যমান আছে, যেখানে সন্ত গরীবদাসের সাথে পূর্ণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছিল।] শ্রদ্ধেয় গরীব দাসের আত্মা নিজ পরমাত্মা কবীর বন্দীছোড়ের সঙ্গে সতলোক চলে যাওয়ার পর সকলে তাকে মৃত মনে করে চিতার উপর তুলে দাহ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। ঠিক ঐ সময় পূর্ণ পরমাত্মা শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেবের আত্মাকে শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং দশ বৎসরের বালক গরীবদাস জীবিত হয়ে গেলেন। পুনরায় জীবিত হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেব স্বচক্ষে দেখা পূর্ণ পরমাত্মার বিবরণ নিজ অমৃতবাণীতে "সদগ্রন্থ" নামক গ্রন্থের রচনা করেন। ঐ অমৃতবাণীতে প্রমাণ:-

অজব নগর মৈঁ লে গয়া, হম কূঁ সদগুরু আন।
ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি, সূতে চাদর তান॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড কা এক রতি নহীঁ ভার।
সতগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, কুলকে সৃজন হার॥
গৈবী খ্যাল বিশাল সতগুরু, অচল দিগম্বর থীর হৈঁ।
ভক্তি হেত কায়া ধর আয়ে, অবিগত সত্ কবীর হৈঁ॥
হরদম খোজ হনোজ হাজর ত্রিবেণী কে তীরে হৈঁ।
দাস গরীব তবীব সতগুরু, বন্দী ছোড় কবীর হৈঁ॥
হম সুলতানী নানক তারে, দাদূ কূঁ উপদেশ দিয়া।
জাত জুলাহা ভেদ নহীঁ পায়া, কাশী মাহে কবীর হুয়া॥

সব পদবী কে মূল হৈঁ, সকল সিদ্ধি হৈঁ তীর।
দাস গরীব সত্পুরুষ ভজো, অবিগত কলা কবীর॥
জিন্দা জোগী জগত্ গুরু, মালিক মুরশদ পীর।
দহুঁ দীন ঝগড়া মন্ডয়া, পায়া নহীঁ শরীর॥
গরীব জিস কূঁ কহতে কবীর জুলাহা। সব গতি পূর্ণ অগম অগাহা॥

উপরোক্ত বাণীতে শ্রদ্ধেয় গরীবদাস সাহেব জী মহারাজ এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাশীতে থাকা তাঁতিই আমাকে নাম দীক্ষা দিয়ে পার করেছেন এবং কাশীর এই তাঁতিই হলেন পূর্ণ ব্রহ্ম (সতপুরুষ)।

পরমেশ্বর কবীর সাহেবই সতলোক থেকে জিন্দা মহাত্মা রূপে এসে আমাকে অদ্ভুত এক নগরীতে (আজব নগর সতলোক) নিয়ে গেলেন। যেখানে কেবল আনন্দ আর আনন্দ রয়েছে, কোনো কিছুর চিন্তা নেই, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরে কষ্ট পাওয়া ইত্যাদির কোনো শোক নেই।

এই কাশীতে তাঁতি রূপে আসা সতপুরুষ ভিন্ন রূপে ভিন্ন সময়ে প্রকট হয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রী আব্রাহিম সুলতান অধম সাহেব, শ্রদ্ধেয় দাদু সাহেব ও শ্রদ্ধেয় নানক দেব কেও সতনাম প্রদান করে পার করেছিলেন। সেই কবির্দেব যার এক রোমকূপে কোটি কোটি সূর্যের সমান প্রকাশ আছে এবং যিনি মানব সদৃশ্য, নিজের অতি তেজোময় বাস্তবিক শরীরের ওপর এক হালকা তেজপুঞ্জের শরীর (ভদ্রাবস্ত্রা অর্থাৎ পোশাক) ধারন করে আমাদের সকলের সামনে মৃত্যুলোকে (মনুষ্য লোকে) এসে দর্শন দেন। কারণ পরমেশ্বরের ঐ বাস্তবিক রূপের প্রকাশ আমাদের চর্মদৃষ্টি সহ্য করতে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় গরীবদাস সাহেব নিজ অমৃতবাণীতে বলেছেন, "সর্বকলা সদগুরু সাহেব কী, হরি আয়ে হরিয়াণে নুঁ"। বাণীটির ভাবার্থ হল, পূর্ণ পরমাত্মা কবীর হরি (কবির্দেব) যেই স্থানে আসবেন ঐ এলাকার নাম হবে হরিয়াণা অর্থাৎ পরমাত্মার আসার পবিত্র স্থান। যে কারণে আশে পাশের সংলগ্ন এলাকাকে- হরিয়াণা (হরআনা) বলতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব প্রান্ত বিভাজিত হওয়ার পর ঐ অঞ্চলের নাম হরিআনা (হরিয়াণা) রাখা হয়। অন্তত ২৩৬ বছর পূর্বে বলা বাণী ১৯৬৬ সালে প্রমাণিত হয় যে, সঠিক সময় এলে এই অঞ্চলটি (যা আগে পাঞ্জাবের অবিভক্ত অংশ ছিল) হরিয়াণা প্রান্ত নামে বিখ্যাত হবে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও রয়েছে।

এই জন্য গুরুগ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৭২১-এর মহলা ১-এ শ্রীনানক দেব নিজ অমৃত বাণীতে বলেছেন-

"হক্কা কবীর করীম তূ, বেএব পরবরদীগার।
নানক বুগোয়দ জনু তুরা, তেরে চাকরাঁ পাখাক।"

এর প্রমাণ গুরু গ্রন্থ সাহিবের রাগ 'সিরী' মহলা ১ পৃষ্ঠা নং ২৪ শব্দ নং ২৯

শব্দ :- **"এক সুআন দুঈ সুয়ানী নাল, ভলকে ভৌঁকহী সদা বিআল।**
কুড় ছুরা মুঠা মুরদার, ধানক রূপ রহা করতার॥ ১॥
মৈ পতি কী পন্দি ন করনী কী কার, উহ বিগড়ৈ রূপ রহ বিকরাল॥
তেরা এক নাম তারে সংসার, মৈঁ ঐহো আস এহো আধার।
মুখ নিন্দা আখা দিন রাত, পর ঘর জোহী নীচ মনাতি॥
কাম ক্রোধ তন বসহ চন্ডাল, ধানক রূপ রহা করতার॥ ২॥
ফাহী সুরত মলুকী বেস, উহ ঠগবারা ঠগী দেস॥
খরা সিয়াণাঁ বহুতা ভার, ধানক রূপ রহা করতার॥ ৩॥
মৈঁ কীতা ন জাতা হরামখোর, উহ কিআ মুহ দেশসা দুষ্ট চোর।

নানক নীচ কহ বিচার, ধানক রূপ রহা করতার ॥ ৪॥

গুরু গ্রন্থ সাহেব, রাগ আসাবরী, মহুলা ১- এর কিছু অংশ :-

সাহিব মেরা একো হৈ। এক হৈ ভাঈ একো হৈ।
আপে রূপ করে বহু ভান্তী নানক বপুড়া এব কহ॥ (পৃ. ৩৫০)
জো তিন কিআ সো সচু থীয়া, অমৃত নাম সদগুরু দিয়া॥ (পৃ. ৩৫২)
গুরু পুরে তে গতি মতি পাঈ(পৃঃ ৩৫৩)
বূড়ত জগু দেখিআ তউ ডরি ভাগে।
সতিগুরু রাখে সে বড় ভাগে, নানক গুরু কী চরণোঁ লাগে (পৃঃ ৪১৪)
মৈঁ গুরু পুছিআ অপণা সাচা বিচারী রাম (পৃ.৪৩৯)

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে শ্রী নানক সাহেব স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, প্রভু (সাহেব) এক জন'ই হোন। শ্রী নানক দেবের, মনুষ্য রূপে ব্যক্ত কোনো এক গুরু ছিলেন। যার বিষয়ে তিনি বলেছেন, "পূর্ণ গুরুর থেকে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে এবং আমার গুরুজী আমাকে (অমৃত মন্ত্র) অমর মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রদানকারী উপদেশ নাম মন্ত্র দিয়েছেন। আমার ঐ গুরুই নানান রূপ। ধারন করে নেন অর্থাৎ তিনি সতপুরুষ, তিনিই জিন্দা রূপ ধারন করে থাকেন। তাঁতি রূপেও তিনিই কাশী নগরীতে বিরাজমান হয়ে সাধারণ ব্যক্তি অর্থাৎ ভক্তের ভূমিকা করেন। শাস্ত্র বিরূদ্ধ পূজা করে, সমস্ত জগৎকে জন্ম-মৃত্যু ও কর্মফলের আগুনে পুড়তে দেখেও নিজের জীবন বৃথা যাওয়ার ভয়ে আমি পালিয়ে এসে আমার গুরুজীর চরনে শরণ নিলাম।"

বলিহারী গুরু আপণে দিউহারী সদবার।
জিন মাণস তে দেবতে কিএ করত ন লাগী বার।
আপীনৈ আপ সাজিও আপীনৈ রচিও নাউ।
দুয়ী কুদরতি সাজীঐ করি আসণু ডিঠো চাউ।
দাতা করতা আপি তূঁ তুসি দেবহি করহি পসাউ।

তুঁ জাণোই সভসৈ দে লৈসহি জিন্দ কবাউ করি আসণু ডিঠো চাউ। (পৃ. 463)

বাণীটির ভাবার্থ হল পূর্ণ পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মার রূপ বানিয়ে বেঈ নদীর ধারে আসেন অর্থাৎ জিন্দা নামে পরিচিত হন এবং নিজেই ব্রহ্মলোক ও পরব্রহ্ম লোকের রচনা করে স্বয়ং নীচের এই দুই লোকের ওপরে সতলোকে সাকার রূপে নিজ আসনে বিরাজমান হয়ে আনন্দের সহিত নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টিকে দেখছেন। আপনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেন না। স্বয়ং প্রকট হন। এরই প্রমাণ যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ এর মন্ত্র নং ৮ এ আছে, যে কবীর মনিষী স্বয়ম্ভু: পরিভূ ব্যবধাতা।

ভাবার্থ হল:- কবীর পরমাত্মা হলেন সর্বজ্ঞ (মনিষী কথার অর্থ সর্বজ্ঞ) ও তিনি স্বয়ং প্রকট হন। তিনি (পরিভূ) সনাতন অর্থাৎ সর্বপ্রথম প্রভু। তিনি সর্ব ব্রহ্মান্ডের (ব্যবধাতা) ভিন্ন-ভিন্ন লোকে অর্থাৎ সর্ব লোকের রচয়িতা।

এহু জীউ বহুতে জনম ভরমিআ, তা সতিগুরু শবদ সুণাইয়া॥ (পৃ. 465)

ভাবার্থ হল:- শ্রী নানকদেব বলছেন, "আমার এই জীবাত্মা বহু সময় ধরে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ভ্রমন করে চলেছিল, এখন পূর্ণ সতগুরু বাস্তবিক নাম প্রদান করলেন। শ্রীনানকদেবেরপূর্বেরজন্ম-সত্যযুগেরাজাঅম্বরীশহলেন,ত্রেতাযুগেরাজাজনক হলেন তারপর শ্রী নানক দেব হলেন। এছাড়া আরও অন্যান্য যোনীর জন্ম তো অগনিত।

"প্রভু কবীর জী শ্রী রামানন্দ জী কে তত্ত্বজ্ঞান বোঝালেন"

পন্ডিত স্বামী রামানন্দ এক বিদ্বান পুরুষ ছিলেন। বেদ ও গীতার মর্মজ্ঞ জ্ঞাতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

"পাঁচ বৎসর বয়সে স্বামী রামানন্দকে গুরু ধারণ করা"

যেই সময় কবীর পরমেশ্বরের (কবির্দেব) নিজ লীলাময় শরীরের বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তিনি গুরু মর্যাদা সুরক্ষিত রাখার জন্য লীলা করেন। কবীর সাহেব আড়াই বৎসর বয়সের একটি বালকের রূপ ধারন করে, ভোরের আলো আঁধারী মুহুর্তে (প্রত্যুষ লগ্নে) পঞ্চ গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ির ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লেন, যে পথ দিয়ে স্বামী রামানন্দ প্রতিদিন স্নান করতে যেতেন। স্বামী রামানন্দ চার বেদের জ্ঞাতা ও পবিত্র গীতার বিদ্বান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। স্বামী রামানন্দের বয়স তখন ১০৪ বৎসর হয়ে গিয়েছিল। কাশীতে- অন্যান্য পন্ডিতদের যে পাখন্ড পূজা চলছিল সেগুলি তিনি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন কারণ স্বামী রামানন্দজী শাস্ত্র অনুকূল সাধনা বলতেন এবং সমগ্র কাশীতে নিজের বাহান্ন দরবার বসাতেন। শ্রী রামানন্দ জী পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদের আধারে যথাযথ বিধিতে সাধনা বলতেন। ওম্ নামের জপ উপদেশ দিতেন।

ঐ দিনেও যখন স্নান করার জন্য পঞ্চ গঙ্গা ঘাটে যান, কবীর সাহেব তখন সিঁড়ির ওপর শুয়ে ছিলেন। ভোরের ব্রহ্ম মূহুর্তের অন্ধকারে শ্রী রামানন্দ, সিঁড়িতে শুয়ে থাকা কবীর সাহেবকে দেখতে পেলেন না, ফলে রামানন্দ জীর পায়ের খড়মে কবীর সাহেবের মাথায় লেগে যায়। বালক রূপে কবীর সাহেব কাঁদতে শুরু করলেন। বালকের কোথাও আঘাত লেগে যায়নি তো! এই ভেবে শীঘ্রই ঝুঁকে দেখলেন এবং আদরের সহিত বালককে ওঠালেন। ঠিক সেই সময় রামানন্দজীর গলার কণ্ঠী (মালা) পরমেশ্বর কবির্দেবের গলায় পড়ে যায়। শ্রী রামানন্দ বললেন পুত্র রাম-রাম বলো। রাম নামে দুঃখ দুর হয়ে যায়, পুত্র রাম-রাম বলো। এই বলে কবীর সাহেবের মাথায় হাত রাখলেন। শিশু রূপে কবীর সাহেব শান্ত হয়ে যায়। তারপর রামানন্দজী স্নান করতে লাগলেন এবং ভাবলেন যে শিশুটিকে আশ্রমে নিয়ে যাব, যারই হোক তার কাছে পৌঁছেদেব। শ্রী রামানন্দ স্নান সেরে দেখলেন শিশুটি সেখানে নেই। কবীর সাহেব সেখান থেকে অন্তর্ধ্যান হয়ে নিজের কুটিরে চলে এলেন। শ্রী রামানন্দ চিন্তা করলেন ছোটো বালক, হয়তো চলে গেছে, এখন তাকে কোথায় খোঁজ করি?

"স্বামী রামানন্দের আশ্রমে কবীর প্রভুর দুই রূপ ধারণ করা"

এক দিন স্বামী রামানন্দ জীর এক শিষ্য কোনো এক স্থানে সৎসঙ্গ করছিল কবীর সাহেবও সেখানে চলে গেলেন। ঐ ঋষি শ্রী বিষ্ণু পুরাণের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। ঋষি বলছিলেন, "ভগবান শ্রী বিষ্ণু সমগ্র সৃষ্টির রচনহার, তিনিই পালন কর্তা, রাম ও কৃষ্ণের অবতার রূপে আসা পরম শক্তিও তিনিই, শ্রী বিষ্ণু হলেন অজন্মা তার কোনো মাতা-পিতা নেই।" কবির্দেব এই সমস্ত চর্চা বসে শুনলেন। সৎসঙ্গ সমাপ্ত হওয়ার পর কবীর পরমেশ্বর বললেন, ঋষি জী আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি? ঋষি জী বললেন, হ্যাঁ পুত্র! বলো। ওখানে শত-শত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। কবির্দেব বললেন, "আপনি বিষ্ণু পুরাণের মধ্যে থেকে সৎসঙ্গ শোনাচ্ছিলেন যে, শ্রী বিষ্ণু হলেন পরমশক্তি, তাঁর থেকেই ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি হয়েছে!" ঋষি বলল, "আমি সৎসঙ্গে যা শোনাই, বিষ্ণু পুরাণে তেমনটাই লেখা আছে । কবীর সাহেব বললেন, ঋষি জী! আমি তো কেবল সন্দেহ নিবারণের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি, দয়া করে ক্ষুদ্ধ হবেন না। একদা আমি শিব পুরাণ শুনছিলাম, তাতে ওই মহাপুরুষ শোনাচ্ছিলেন, "ভগবান শিবের থেকে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে (প্রমাণ, গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত পবিত্র শিব পুরাণ রুদ্র সংহিতার অধ্যায় ৬ ও ৭ এ) কিন্তু দেবী ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে লেখা আছে দেবী হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই

তিনজনের মাতা। এরা তিনজনই নাশবাণ, অবিনাশী নয়।” এই শুনে ঋষি নিরুত্তর হয়ে গেল। ক্রোধিত হয়ে বললেন, তুই কে? কার পুত্র? অন্যান্য ভক্তজনেরা বলতে লাগলো এতো নিরু তাঁতির পুত্র। স্বামী রামানন্দেরই এক শিষ্য (ঋষি) বলতে লাগলো, তোর গলায় কণ্ঠী এলো কিভাবে? (বৈষ্ণব সাধুরা তুলসীর এক মনির মালা, গলায় পরে থাকতেন এর থেকে প্রমাণিত হত যে তারা বৈষ্ণব পরম্পরায় দীক্ষিত।) তোর গুরুদেব কে? কবীর সাহেব বললেন, যিনি আপনার গুরুদেব তিনি আমার গুরুদেব। ঐ ঋষি, ভীষণ ক্রোধিত হয়ে গেল এবং বলল ওহে মূর্খ! তুই অচ্ছুৎ তাঁতির ছেলে, আমার গুরুদেবকে নিজের গুরুদেব বলছিস! জানিস আমার গুরুদেব কে? শ্রী শ্রী ১০০৮ পন্ডিত রামানন্দ জী আচার্য। আর তুই তাঁতির ছেলে, তোর মত অচ্ছুতকে তিনি দর্শনও দেবেন না আর তুই বলছিস গুরুদেবের থেকে নাম দীক্ষা নিয়েছিস! ভাই ভক্তজনেরা দেখে নাও এই মিথ্যাবাদী প্রতারককে। এখনই গুরুদেবের কাছে গিয়ে তোর সমস্ত কাহিনী বলবো। গুরুদেবের সম্মান হানি করছিস। কবীরজী বললেন ঠিক আছে, বলো গুরুদেবকে। ঐ ঋষি গিয়ে স্বামী রামানন্দকে বললেন, গুরুদেব! এক তাঁতির ছেলে আমাদের নাক কাটিয়ে দিয়েছে। সে বলছে যে, স্বামী রামানন্দ আমার গুরুদেব। হে ভগবান! এখন আমাদের বাইরে বের হওয়াও দুষ্কর হয়ে গেল। স্বামী রামানন্দ জী বললেন কাল সকালে ওকে ডেকে নিয়ে এসো। কাল দেখবে, তোমার সামনে আমি ওকে কেমন শাস্তি দেব।

“স্বামী রামানন্দের মনের কথা বলে দেওয়া”

পরদিন সকাল সকাল ১০-১২ জন মুর্খ ব্যক্তিরা কবীর সাহেবকে ধরে এনে স্বামী রামানন্দের সামনে উপস্থিত করে। রামানন্দ স্বামীর সামনে একটি পর্দা দিয়ে দিলেন, এই বোঝানোর জন্য যে, “আমি নীচু জাতির লোকেদের দর্শনও করিনা এবং এই বালক মিথ্যা বলছিল যে, সে আমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে। স্বামী রামানন্দ পর্দার পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কে? আর তোর জাতি কি? তোর পন্থ কি অর্থাৎ তুই কোন পরমেশ্বরের পূজা করিস?”

রামানন্দ অধিকার সুন, জুলহা অক জগদীশ, গরীব দাস বিলম্ব না, তাহি নবাবত শীশ ॥ ৪০৭ ॥
রামানন্দ কূঁ গুরু কহৈ, তনসৈ নহীঁ মিলাত। গরীব দাস দর্শন ভয়ে, পৈড়ে লগী জুঁলাত ॥ ৪০৮ ॥
পন্থ চলত ঠোকর লগী, রাম নাম কহ দীন। গরীব দাস কসর নহীঁ, সীখ লঈ প্রবীন ॥ ৪০৯ ॥
আড়া পড়দা লায় কর, রামানন্দ বূঝন্ত। গরীব কুরঙ্গ ছবি, অধর ডাক কূদন্ত ॥ ৪১০ ॥
কৌনজাতিকূলপন্থহৈ,কৌনতুম্হারানাম।গরীবদাসআধীনগতি,বোলতহৈবলিজাঁব ॥৪১১ ॥

কবীর জী উত্তর দেন :-

জাতহমারী' জগৎগুরু,পরমেশ্বরপদপন্থ।গরীবদাসলিখতপঢ়ৈ,নামনিরঞ্জনকন্ত ॥৪১২॥

রামানন্দজী বললেন -

রৈবালকসূনদুর্বুদ্ধি,ঘটমঠতনআকার।গরীবদাসদর্দলগ্যা,হোবোলেসিরজনহার ॥৪১৩ ॥
তুম মোমিন কে পালবা, জুলহে কে ঘর বাস। গরীব দাস অজ্ঞান গতি, এতা দৃঢ় বিশ্বাস ॥ ৪১৪ ॥
মান বড়াই ছোড় কর, বোলো বালক বৈন। গরীব দাস অধম মুখী, এতা তুম ঘট ফৈন ॥ ৪১৫ ॥
তর্ক তলূ সৈ বোলতে, রামানন্দ সুর জ্ঞান। গরীব দাস কুজাত হৈ, আখর নীচ নিদান ॥ ৪২৩ ॥

পরমেশ্বর কবীর জী (কবির্দেব) প্রেম পূর্বক উত্তর দেন:-

মহকে বদন খুলাস কর, সুন স্বামী প্রবীণ।
গরীব দাস না অভিমান হমারৈ, মৈঁ আজিজ আধীন ॥ ৪২৮ ॥

মৈঁঅবিগত গতি সৈ পরে, চ্যার বেদ সে দূর। গরীব দাস দশৌঁ দিশা, সকল সিন্ধ ভরপুর॥৪২৯॥
সকল সিন্ধ ভরপুর হুঁ, খালিক হমরা নাম। গরীব দাস অজাত হুঁ, তৈঁ জূঁ কহ্যা বলিজাউঁ মৈঁ॥৪৩০॥
জাত পাত মেরে নহীঁ, বস্তী হৈ বিন থাম। গরীব দাস অনিন গতি, তন মেরা বিন চাম॥৪৩১॥
নাদ বিন্দ মেরে নহীঁ, নহীঁ পাঁচ ভৌতিক গাত। গরীব দাস শব্দ সজা, নহীঁ কিসি কা সাথ॥৪৩২॥
সব সঙ্গী বিছরুঁ, আদি অন্ত বহু জাহীঁ। গরীব দাষ সকল বসূঁ, বাহর ভীতর মাহীঁ॥৪৩৩॥
এ স্বামী সৃষ্টা মৈঁ, সৃষ্টি হমারে তীর। গরীব দাস অধর বসূঁ। অবিগত সত্য কবীর॥৪৩৪॥
পৌহমী ধরণি আকাশ মেঁ, মৈঁ ব্যাপক সব ঠৌর। গরীব দাস ন দুসরা, হম সমতুল ন ঔর॥৪৩৬॥
হম দাসন কে দাস হৈঁ, করতা পুরুষ করীম। গরীব দাস অবধূত হম, হম ব্রহ্মচারী সীম॥৪৩৯॥
সুন রামানন্দ রাম মৈঁ, মৈঁ বাবন নরসিংহ। গরীব দাস সর্ব কলা, মৈঁ হী ব্যাপক সরবঙ্গ॥৪৪০॥
হমহী সে ইন্দ্র কুবের হৈঁ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ। গরীব দাস ধর্ম ধ্বজা, ধরণী রসাতল শেষ॥৪৪৭॥
সুন স্বামী সচ ভাখ হুঁ, ঝূঠ ন হমরৈ রিচ। গরীব দাস হম রূপ বিন, ঔর সকল প্রপঞ্চ॥৪৫৩॥
গোতা লাউঁ স্বর্গ মেঁ, ফির পৈঠুঁ পাতাল। গরীব দাস ঢুঁঢ়ত ফিরুঁ, হীরে মানিক লাল॥৪৭৬॥

ইস দরিয়া কঙ্কর বহুত, লাল কহীঁ কহীঁ ঠাম।
গরীব দাস মানিক চুগৈঁ, হমরা মুরজীবা নাম॥ ৪৭৭॥
মন সোচত রামানন্দ, য়হ বালক নহীঁ কোঈ দেব।
গরীব দাস নিত নেম করুঁ, ফির পূছুঁ সব ভেব॥ ৪৭৮॥

যদি আমার জাতি জিজ্ঞাসা করো, তাহলে আমি জগৎ গুরু (বেদে লেখা আছে সকল সৃষ্টিকে জ্ঞান প্রদানকারী জগৎ গুরু-হলেন কবীর প্রভু) আর আমার পন্থ কি? (কোন পরমেশ্বরের মার্গদর্শন করি?) এর উত্তরে কবীর জী বললেন, আমার পন্থ হল পরমেশ্বরের পন্থ। ঈশ, ঈশ্বর, পরমেশ্বর (ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ও পূর্ণব্রহ্ম / ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পরম অক্ষর পুরুষ) আমি ঐ সর্বোচ্চ শক্তি (সুপ্রিম পাওয়ার) পরমেশ্বরের মার্গ দর্শন করতে এসেছি, যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের রচয়িতা ও সকলের ধারন পোষণ কর্তা। বেদে যাকে কবির্দেব, কবিরগ্নি ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

ঈশ বা ক্ষর পুরুষ, ব্রহ্মকে বলা হয়। সে কেবল একুশ ব্রহ্মান্ডের স্বামী। পরব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষকে ঈশ্বর বলা হয়, যে সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ডের স্বামী এবং পরম অক্ষর পুরুষকে পূর্ণব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বলা হয়, যিনি হলেন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী অর্থাৎ সমস্ত কূলের মালিক। উক্ত এই কারণেই কবীর জী স্বামী রামানন্দকে বলেন যে, আমার হল পরমেশ্বর প্রাপ্তি করার পন্থ।

গীতা অধ্যায় ১৫ এর ১৭ নং শ্লোকে লেখা আছে বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর অন্য কেউ এবং তিনিই তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারন পোষণ করেন ও তিনিই অবিনাশী পরমেশ্বর, পরমাত্মা ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। সেই পরমেশ্বরই হলাম আমি। এই কথা শুনে স্বামী রামানন্দ প্রচন্ড ক্রোধিত হয়ে গিয়ে বললেন, আরে অপদার্থ নিষ্কর্মা! তুই একজন নীচ জাতির ছেলে আবার ছোটো মুখে বড়ো বড়ো কথা! তুই নিজেই ভগবান হয়ে গেলি! এই বলে খুব খারাপ গালাগালি দিলেন। কবীর সাহেব বললেন, "হে গুরুদেব! আপনি আমার গুরুজী, আপনি আমাকে গালাগালি দিচ্ছেন তবুও আমি আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু আমি আপনাকে যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য। আমিই হলাম পূর্ণব্রহ্ম, এতে কোনো সংশয় নেই।" এই কথা শুনে রামানন্দ জী বললেন, তুই এইভাবে মানবিনা, দাঁড়া- আজ তোর জন্য অনেক লম্বা গল্প হবে। তুই এভাবে রাজী হবি না! আগে আমি আমার পূজা সেরে নিই। স্বামী রামানন্দ জী বললেন, আমার কিছু নিত্য ক্রিয়া আছে সেগুলি করে নিই, একে ততক্ষন বসিয়ে রাখো, তারপর একে দেখছি।

স্বামী রামানন্দ কি ক্রিয়া করতেন? তিনি ভগবান বিষ্ণুর এক কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করতেন। মূর্তিটি সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠতো। (যেই যেই কর্মকান্ড গুলি করতেন – ভগবানের মূর্তির পূর্বের বস্ত্র খুলে তাকে জল দিয়ে স্নান করিয়ে তারপর ঠাকুরকে স্বচ্ছ কাপড় পরিয়ে তার গলায় মালা দিতেন। তিলক লাগিয়ে, মুকুট পরাতেন)। রামানন্দজী কল্পনা করে ভগবানের কাল্পনিক মূর্তি বানান, ভক্তি (শ্রদ্ধা) ভাবে খালি পায়ে গিয়ে গঙ্গাজল আনেন। মনে মনে এমন ভাবনা বানিয়ে ঠাকুরের মূর্তির কাপড় খুলে স্নান করিয়ে নুতন কাপড় পড়ান এবং তিলক লাগিয়ে মুকুট পরান। কিন্তু আজ মালা (কণ্ঠী) দিতে ভুলে গেলেন। যদি কণ্ঠী না পরায় তাহলে পূজা অসম্পূর্ণ (সম্পূর্ণ নয়)। মুকুট একবার পরালে খোলা যাবে না। যদি মুকুট খোলে তাহলে পূজা খন্ডিত হয়ে যাবে। স্বামী রামানন্দজী নিজেই নিজেকে দোষী মনে করে খুব দুঃখী হচ্ছিলেন। এত বয়স হয়েছে কিন্তু কোন দিনও এমন ভুল হয়নি। হে ভগবান! আজ কি ভুল হয়েছে এই পাপী আত্মার, যদি মুকুট খুলে দিই তাহলে পূজা খন্ডিত। তাই চিন্তা করেন মুকুটের উপর দিয়ে কণ্ঠী পরিয়ে দিই। (সবকিছু কল্পনার মধ্যে হচ্ছিল)। সামনে কোনো মূর্তি নেই। পর্দার অপর দিকে কবীর সাহেব বসে আছেন। মালা মুকুটে আটকে যায় তখন রামানন্দজী চিন্তা করেন এখন কি করি? হে ভগবান! আজ আমার পুরো দিন ব্যর্থ গেল। আজ আমার ভক্তিধন কামাই হল না। (যার পরমাত্মার প্রাপ্তির চাহিদা থাকে, তার যদি কোন নিত্য নিয়মে ভুল বা বাদ পরে যায়, তাহলে সে মনে খুব ব্যথা পায়। যেমন কোন ব্যক্তির (পকেট পকেটমার কেটে নিলে যেমন অবস্থা হয়। প্রভুর আসল ভক্তদেরও তেমন লক্ষন দেখা দেয়।) তখন কবীর সাহেব বললেন, স্বামীজী মালার গাঁট খুলে গলায় পরিয়ে তারপর গাঁট লাগিয়ে দিন। মুকুট নামানোর দরকার হবে না। এইবার রামানন্দ জী কিসের মুকুট নামাতেন আর কোথাকার গাঁট খুলতেন, নিজের হাতে কুঠিরের সামনে লাগানো পর্দা খুলে ফেলে দিলেন ও সকল ব্রাহ্মণ সমাজের সম্মুখে কবীর পরমেশ্বরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রামানন্দজী বললেন, হে ভগবান! আপনার শরীর এত কোমল, যেন তুলো আর আমার শরীর পাথরের মত। এক দিকে রয়েছে প্রভু দাঁড়িয়ে আর অন্যদিকে রয়েছে জাতি-ধর্মের প্রাচীর। কিন্তু প্রভু প্রেমী পুন্য আত্মারা ধর্মের তৈরী করা প্রাচীর ভাঙ্গা শ্রেয় বলে মনে করেন। স্বামী রামানন্দও তাই করলেন। সম্মুখে পূর্ণ পরমাত্মাকে পেয়ে না জাতি দেখলেন আর না ধর্ম দেখলেন আর না ছুঁয়াছুৎ দেখলেন, কেবল আত্ম কল্যান দেখতে পেলেন একেই বলে ব্রাহ্মণ ।

বোলত রামানন্দ জী, হম ঘর বড়া সুকাল।
গরীব দাস পূজা করৈ, মুকুট ফহি জব মাল॥ ৪৭৯॥
সেবা করৌ সম্ভাল কর, সুন স্বামী সুর জ্ঞান।
গরীব দাস সির মুকুট পর , মালা অটকী জান॥ ৪৮০॥
স্বামী ঘুন্ডী খোল কর, ফির মালা গল ডার।]
গরীব দাস ইস ভজন কূঁ, জান সাকৈ করতার॥ ৪৮১॥
ডয়ৌঢী পড়দা দূর কিয়া, লিয়া কন্ঠ লগায়।
গরীব দাস গুজরী বৌহত, জব বেদন বদন মিলায়॥ ৪৮২॥

স্বামী রামানন্দ জী বললেন, হে কবীর প্রভু! আপনি মিথ্যে কেন বললেন? কবীর সাহেব বললেন, কেমন মিথ্যে স্বামীজী ? স্বামী রামানন্দজী বললেন, আপনি বলছিলেন যে, আপনি আমার কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়েছেন। আপনি আমার কাছে নাম উপদেশ কবে নিলেন ? কবীর সাহেব বললেন, একদা আপনি পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন, তখন আমি ওখানে শুয়েছিলাম। আপনার পায়ের খড়মটি আমার মাথার

লেগে যায়, তখন আপনি বলেছিলেন পুত্র! রাম নাম বলো। রামানন্দ জী বললেন- হ্যাঁ এখন কিছুটা মনে পড়েছে। কিন্তু সে তো এক ছোট্টো বালক ছিল (কারণ তখনকার সময় পাঁচ বৎসর বয়সী বাচ্চাদের অনেক বড়ো দেখতে লাগত অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বালকের শরীর ও আড়াই বৎসর বালকের শরীরের মধ্যে দ্বিগুন পার্থক্য হত)। কবীর সাহেব বললেন, দেখুন স্বামী জী! আমি এমন ছিলাম। পাঁচ বর্ষীয় বালকের রূপে কবীর সাহেব স্বামী রামানন্দ জীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং অন্য একটি আড়াই বৎসরের শিশুর রূপ ধারণ করে এক সেবকের বিছানো খাটের ওপর বিরাজমান হয়ে গেলেন। রামানন্দজী ছয়বার এদিকে দেখেন তো ছয়বার ওদিকে দেখেন। চোখে কোনো ধোঁকা হচ্ছে না তো, এই ভেবে চোখ ডোলে নিয়ে আবার দেখলেন। দেখতে দেখতে আবার কবীর সাহেবের ছোট্টো বালক রূপটি উঠে গিয়ে তাঁর পাঁচ বৎসর বয়সী স্বরূপের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। পাঁচ বৎসর বয়সী কবীর সাহেব রয়ে গেলেন।

মন কী পূজা তুম লখী, মুকুট মাল প্রবেশ।
গরীব দাস গতিকো লখৈ, কৌন বরণ ক্যা ভেষ॥ ৪৮৩॥
যহ তো তুম শিক্ষা দঈ, মান লঈ মন মোর।
গরীবদাস তুম কোমল পুরুষ, হমরা বদন কঠোর॥ ৪৮৪॥

তখন রামানন্দ জী বললেন, আমার সংশয় মিটে গেছে। হে পরমেশ্বর! আপনি কোন জাতিতে ও কোন বেশে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে কিভাবে চিনতে পারবো! আমরা অবুঝ প্রাণী, আপনার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে দোষী হয়ে গেলাম, আমাদের ক্ষমা করো পূর্ণ পরমেশ্বর কবির্দেব, আমি আপনার অবুঝ সন্তান।

“স্বামী রামানন্দ জীকে সতলোক দর্শন”

সুন বচ্চা মৈঁ স্বর্গ কী, কৈসে ছোড়ূঁ রীত। গরীব দাস গুদরী লগী, জনম জাত হৈ বীত॥ ৪৮৬॥
চ্যার মুক্তি বৈকুন্ঠ মেঁ, জিন কী মোরৈ চাহ। গরীব দাস ঘর অগম কী, কৈসে পাউঁ থাহ॥ ৪৮৭॥
হিমরূপজহাঁধরণিহৈ,রত্নজডেবৌহশোভ।গরীবদাসবৈকুন্ঠকূঁ,তনমনহমরালোভ॥৪৮৮॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হৈঁ, মোহন মদন মুরার। গরীব দাস মুরলী বজে, স্বর্গলোক দরবার॥ ৪৮৯॥
দুধোঁ কী নদীয়াঁ বগেঁ, সেত বৃক্ষ সুভান। গরীব দাস মন্দল মুক্তি, স্বর্গাপুরী অস্থান॥ ৪৯০॥
রত্ন জড়াউ মনুষ্য হৈঁ, গণ গন্ধর্ব সব দেব। গরীব দাস উস ধাম কী, কৈসে ছোড়ুঁ সেব॥ ৪৯১॥
ঋগ যুজ সাম অথর্ব, গাবৈঁ চারোঁ বেদ। গরীবদাস ঘর অগম কা, কৈসে জানোঁ ভেদ॥ ৪৯২॥
চ্যারমুক্তিচিতবনলগী,কৈসেবঁচূতাহি।গরীবদাসগুপ্তারগতি,হমকূঁদয়োসমঝায়॥৪৯৩॥
স্বর্গ লোক বৈকুন্ঠ হৈ, যাসে পরৈ ন ঔর। গরীবদাস ষটশাস্ত্র, চ্যার বেদ কী দৌড়॥ ৪৯৪॥
চ্যারবেদগাবৈঁইসে,সুরনরমুনিমিলাপ।গরীবদাসধ্রুবপৌরজিস,মিটিগয়েতীনুঁতাপ॥৪৯৫॥
প্রহ্লাদগয়েতিসলোককূঁ,রহেস্বর্গাপুরীমৈঁঝূল।গরীবদাসহরিভক্তিকী,মৈঁবঁচতহূঁধুল॥৪৯৬॥
বৃন্দাবন খেলে সহী রজ কেসর সমতুল। গরীবদাস উস মুক্তি কূঁ, কৈসে জাউঁ ভুল॥ ৪৯৭॥
নারদ ব্রহ্মা জিসে রটেঁ, গাবৈঁ শেষ গণেশ। গরীবদাস বৈকুন্ঠ সে, ঔর পরৈ কো দেশ॥ ৪৯৮॥
সহস্রঅঠাসীজিসেজপৈঁ,ঔরতেতীসোঁসেব।গরীবদাসজাসৈঁপরৈ,ঔরকৌনহৈদেব॥৪৯৯॥
সুনস্বামীনিজমূলগতি,কহসমঝাউঁতোহি।গরীবদাসকালভগবানকূঁরাখ্যাজগৎসমোহি॥৫০০॥

তীন লোক কে জীব সব,বিষয় বাসনা ভ্রমায়া।
গরীবদাস জিন হম কূঁ জপা, তিন কূঁ ধাম দিখায়া॥ ৫০১॥

জো দেখৈগা ধাম কূঁ,সো জানত হৈ মুঝ। গরীব দাস তোসে কহুঁ, সুন গায়ত্রী গুঝ॥ ৫০২॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান কূঁ জহড়ায়ে হৈঁ জীব। গরীবদাস ত্রিলোকে মেঁ, কাল কর্ম ঔর শীব॥ ৫০৩॥
সুন স্বামী তোসে কহুঁ, অগম দ্বীপ কী সৈল। গরীবদাস পূঠে পড়ৈঁ, পুস্তক লাদৈঁ বৈল॥ ৫০৪॥
পৌহমী ধরণি আকাশ থম্ভ, চলঁসী চন্দ্র সুর। গরীবদাস রজ বীরজ কী, কহাঁ রহৈগী ধূর॥ ৫০৫॥

তারায়ণ ত্রিলোক সব, চলসী ইন্দ্র কুবের। গরীবদাস সব জাত হৈঁ, স্বর্গ পাতাল সুমের ॥ ৫০৬ ॥
চ্যার মুক্তি বৈকুণ্ঠ বট, ফনা হুঈ কঈ বার। গরীবদাস সতলোক কো, নহীঁ জানে সংসার ॥ ৫০৭ ॥
কহো স্বামী কিত রহোগে, চৌদহ্ ভুবন বিহণ্ড। গরীবদাস বীজক কহা, চলত প্রাণ ঔর পীন্ড ॥ ৫০৮ ॥
সুন স্বামী এক শক্তি হৈ, অর্ধঙ্গী ওঁকার। গরীবদাস বীজক তহাঁ, অনক লোক সিংঘার ॥ ৫০৯ ॥
জৈসে কা তৈসা রহৈ, প্রলয় ফনা প্রাণ। গরীবদাস উস শক্তি কূঁ, বার বার কুরবান ॥ ৫১০ ॥
কোটি ইন্দ্র ব্রহ্মা জহাঁ, কোটি কৃষ্ণ কৈলাশ। গরীবদাস শিব কোটি হৈঁ, করো কৌন কী আশ ॥ ৫১১ ॥

কোটি বিষ্ণু জহাঁ বসত হৈঁ, উস শক্তি কে ধাম।
গরীবদাস গুল বৌহত হৈঁ, অলফ বস্ত নিহ্কাম ॥ ৫১২ ॥
শিব শক্তি জাসে হুএ, অনন্ত কোটি অবতার ॥
গরীবদাস উস অলফ কূঁ লখৈ সো জানে করতার ॥ ৫১৩ ॥

সতপুরুষ হম স্বরূপ হৈ, তেজ পুঞ্জ কা কন্ত। গরীবদাস গুল সে পরে, চলনা হৈ বিন পন্থ ॥ ৫১৪ ॥
বিনা পন্থ উস কন্ত কে, ধাম চলন হৈ মোর। গরীবদাস গতি না লখি, সংখ স্বর্গ পর ডোর ॥ ৫১৫ ॥

সংখ স্বর্গ পর হম বসৈঁ, সুন স্বামী যহ্ সৈঁন।
গরীবদাস হম সতপুরুষ হৈঁ, য়ৌহ্ গুল ফোকট ফৈঁন ॥ ৫১৬ ॥

জো তৈঁ কহয়া সৌ মৈঁ লহয়া, বিন দেখে নহীঁ ধীজ। গরীবদাস স্বামী কহৈঁ, কহাঁ অলফ বহ বীজ ॥ ৫১৭ ॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড ফণাঁ, অনন্ত কোটি উদগার। গরবীদাস স্বামী কহৈঁ, কহাঁ অলফ দীদার ॥ ৫১৮ ॥
হদ বেহদ না কহীঁ, না কহীঁ থরপী ঠৌর। গরীবদাস নিজ ব্রহ্ম কী, কৌন ধাম বহ পৌর ॥ ৫১৯ ॥
চল স্বামী সর পর চলৈঁ, গঙ্গ তীর সুন জ্ঞান। গরীবদাস বৈকুন্ঠ বট, কোটি কোটি ঘট ধ্যান ॥ ৫২০ ॥
তহাঁ কোটি বৈকুণ্ঠ হৈঁ, নক সরবর সঙ্গীত। গরীবদাস স্বামী সুনো, গএ অনন্ত যুগ বীত ॥ ৫২১ ॥
প্রাণ পিন্ড পুর মেঁ ধসৌ, গয়ে রামানন্দ কোটি। গরীবদাস উস স্বর্গ মেঁ, রহ শব্দ কী ওট ॥ ৫২২ ॥
তহাঁ বহাঁ চিত চক্রিত ভয়া, দেখ ফজল দরবার। গরীবদাস সিজদা কিয়া, হম পায়ে দীদার ॥ ৫২৩ ॥
তুম স্বামী মৈঁ বাল বুদ্ধি, ভর্ম কর্ম কিয়ে নাশ। গরীবদাস নিজ ব্রহ্ম তুম, হমরৈ দৃঢ় বিশ্বাস ॥ ৫২৪ ॥
সুন্ন-বেসুন্ন সে তুম পরৈ, উরৈ সে হমরৈ তীর। গরীবদাস সরবঙ্গ মৈঁ, অবিগত পুরুষ কবীর ॥ ৫২৫ ॥
কোটি কোটি সিজদে করৈ, কোটি কোটি প্রণাম। গরীবদাস অনহদ অধর, হম পরসে তব ধাম ॥ ৫২৬ ॥

সুন স্বামী এক গল গুঝ, তিল তারী পল জোর।
গরীবদাস সর গগন মেঁ, সুরজ অনন্ত করোর ॥ ৫২৭ ॥
শহর অমান অনন্ত পুর, রিমঝিম রিমঝিম হোয়।
গরীবদাস উস নগর কা, মরম ন জানৈঁ কোয় ॥ ৫২৮ ॥

সুন স্বামী কৈসে লখো, কহ সমঝাউঁ তোহে। গরীবদাস বিন পঙ্খ উড়ে, তন পর শীশন হোয় ॥ ৫২৯ ॥
রবনপুরী এক চক্র হৈ, তহাঁ ধনঞ্জয় বায়। গরীবদাস জীতে জন্ম, যাকূঁ লেত সমায় ॥ ৫৩০ ॥
আসন পদম্ লগায় কর, ভিরঙ্গনাদ কো খেঁচ। গরীবদাস অচবন করে, দেবদত্ত কো এঁচ ॥ ৫৩১ ॥
কালী উন কুলিন রঙ্গ, জাকে দো ফুন ধার। গরীবদাস কুরম্ভ সির, তাস করে উদগার ॥ ৫৩২ ॥
চিশ্মেঁ লাল গুলাল রঙ্গ, তীন গিরহ নাভি পেচ। গরীবদাস বহ নাগনী, হৌঁন নদেবৈ রেচ ॥ ৫৩৩ ॥
কুম্ভক রেচক সব করৈ, উন করত উদগার। গরীবদাস উস নাগনী কূঁ, জীতৈ কঈ খিলার ॥ ৫৩৪ ॥
কুম্ভক কর রেচক করে, ফির টুটত হৈ পৌন। গরীবদাস গগন মন্ডল, নহীঁ হোত হৈ গৌন ॥ ৫৩৫
আগে ঘাটি বন্ধ হৈঁ, ইলা-পিঙ্গলা দোয়। গরীবদাস সুযমন খুলৈ, তাস মিলাবা হোয় ॥ ৫৩৬ ॥
গলী গলী গলতান হৈ, শহর সলেমাবাদ। গরীবদাস পল বীচ মেঁ, পূর্ণ করূঁ মুরাদ ॥ ৫৪৭ ॥
সদা আবাদ অমানপুর, চল স্বামী তহাঁ চাল। গরীবদাস প্রলয় অনন্ত, ফির ন ঝম্পে কাল ॥ ৫৫৩ ॥

অমর চীর তহাঁ পহরত হৈ, অমর হংস সুখ ধাম।
গরীবদাস ভোজন অমৃত, চল স্বামী নিজ ধাম ॥ ৫৫৪ ॥
সতলোক কো দেখকর, জানা পরম প্রভু কা ভেব।

গরীব দাস য়হ ধানক হৈ, সব দেবন কা দেব ॥৫৫৫॥
বোলত রামানন্দজী, সুন কবীর করতার। গরীবদাস সব রূপ মেঁ, তুমহিঁ বোলন হার ॥৫৫৬॥
তুমসাহিবতুমসন্ত হো,তুমসদগুরু তুমহংস। গরীবদাসতুমরূপবিন,ঔরনদূজাঅংশ ॥৫৫৭॥
মৈঁভগতামুক্তাভয়া,কিয়াকর্মকুন্দনাশ। গরীবদাসঅবিগতমিলে মেটীমনকীবাস ॥৫৫৮॥
দোহুঁঠৌরহৈএকতূঁ,ভয়াএকসেদোয়। গরীবদাসহামকারণে,উতরে হোমগজোয় ॥৫৫৯॥
নাকী পর ঝাঁখী লগী, ঝাঁখী বীচ দ্বার। গরীবদাস উস মহল চঢ়ে, উতরৈ পরলে পার ॥৫৬২॥
ভালালাগেমিসরীবগে,সুনস্বামীয়হসাচ। গরীবদাসপদমেঁমিলে,মেটেতনকানাচ ॥৫৬৭॥

কবীর সাহেব (কবির্দেব) স্বামী রামানন্দ জীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি পূজা করেন? স্বামী রামানন্দ বললেন, আমি বেদ ও গীতার অনুসারে সাধনা করি। কবীর সাহেব বললেন বেদ ও গীতার অনুসারে সাধনা করে কোন লোকে যাবেন? স্বামীজী বললেন স্বর্গ লোকে যাবো। কবীর পরমেশ্বর বললেন স্বর্গে গিয়ে কি করবেন দাতা? রামানন্দজী বলেন ওখানে অতীব প্রিয়তম শ্রী বিষ্ণু রয়েছেন। তাকে দর্শন করবো আর ওখানে দুধের নদী আছে, কোনো দুশ্চিন্তা কোনো উদ্বেগ নেই। আমি খুব আনন্দে থাকবো। কবীর পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজী স্বর্গে কতদিন থাকবেন?" (বিদ্বান পুরুষ ছিলেন তাই ওনার জ্ঞানও ছিল। দুই মিনিটেই বুঝে যান)

স্বামীজী বললেন, আমার যতটা ভক্তির কামাই আছে ততদিন থাকবো, কবীর সাহেব বললেন, তার পরে কোথায় যাবেন? রামানন্দ জী বললেন, জানিনা কর্মের আধারে কোথায় ও কোন যোনীতে জন্ম হবে তা কে জানে? কবীর সাহেব বললেন, স্বামীজী এমন সাধনা আপনি অসংখ্যবার করেছেন। এর দ্বারা জীবের মুক্তি সম্ভব নয়। আপনি শ্রী বিষ্ণুর সাধনা করে স্বর্গলোকে যেতে চাইছেন! অথচ ব্রহ্মের সাধনা করে ব্রহ্ম লোকে যাওয়া সাধকও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে রয়ে যায়। কারণ, একদিন ঐ ব্রহ্মলোকে তৈরি মহাস্বর্গও বিনষ্ট হয়ে যাবে। গীতার ৮-অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে এই বিবরণ আছে। স্বামীজী বিদ্বান পুরুষ ছিলেন, গীতার শ্লোক কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। "আপনি ঠিক বলেছেন, এমনটাই লেখা আছে", স্বামীজী বললেন। কবীর সাহেব, বললেন তারপর কোথায় থাকবেন? আপনার কৃষ্ণ মুরারীও থাকবে না আর এই ব্রহ্মা লোক, বিষ্ণু লোক ইত্যাদি লোকের সর্ব প্রাণী ও শ্রী বিষ্ণু ইত্যাদি তিন দেবতারাও বিনষ্ট হবে। তারপর আপনি কোথায় থাকবেন গুরুদেব? এইসব শুনে রামানন্দ জী বিচার করার জন্য বিবশ হয়ে যায়। পরমেশ্বর করীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজী গীতার জ্ঞান কে বলেছে? স্বামীজী উত্তর দেন শ্রীকৃষ্ণ বলেছে। পরমেশ্বর কবীর সাহেব বললেন, স্বামীজী সংক্ষিপ্ত মহাভারতের দ্বিতীয় খন্ডে (পৃষ্ঠা নং. ১৫৩১ পুরোনো ও ৬৬৭ নং নতুন-এ) লেখা আছে যে, শ্রী কৃষ্ণ বলছেন হে অর্জুন এখন আর আমার ঐ গীতার জ্ঞান মনে নেই,ঐ জ্ঞান আমি দ্বিতীয়বার শোনাতে পারবো না। পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী এর সর্ব প্রমাণ দেন।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩-তে গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম) বলছেন -

ওম্ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম, ব্যাহরন মাম্ অনুস্মরন্,
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্ ॥ ১৩॥

গীতা বলা ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল বলেছেন যে, (মাম ব্রহ্ম) আমি ব্রহ্মের তো (ইতি) এই (ওম একাক্ষরম) ওম্/ওঁ-এক অক্ষর (যঃ) যে সাধক (অনুস্মরন) স্মরন ক'রে (ব্যাহরন) উচ্চারন করেন (ত্যজম দেহম) শরীর ত্যাগ করা পর্যন্ত অর্থাৎ অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত (প্রয়াত) স্মরণ বা সাধনা করেন (সঃ) ওই সাধকই আমার (পরমাম গতিম) পরমগতিকে (যাতি) প্রাপ্ত করেন।

ভাবার্থ হলঃ- স্ত্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতবৎ প্রবেশ করে ব্রহ্ম অর্থাৎ হাজার বাহু যুক্ত

জ্যোতি নিরঞ্জন কাল বলছে, "আমার (ব্রহ্মের) সাধনা কেবল এক ওম (ওঁ) নামের জপ মৃত্যু পর্যন্ত করা সাধকই আমার দ্বারা হওয়া লাভ প্রাপ্ত করে, আমার ভক্তির অন্য কোনো মন্ত্র নেই। অন্য কোনো মন্ত্রই আমার ভক্তির যোগ্য নয়।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং, ৫,৭ ও ১৩ তে গীতা জ্ঞান দাতা নিজের সাধনা করার বিষয়ে বলেছে, যে সাধক আমার সাধনা ওম্ (ওঁ) নামের স্মরণ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত করবে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। এইজন্য তুই যুদ্ধও কর এবং আমার ওম্ নামের স্মরণও কর, কারণ যুদ্ধ কোলাহল (উচ্চ স্বরে শোরগোল) করে করা হয়, তাই বলেছে যে ওম্ (ওঁ) নামের জপ উচ্চারণ (উচ্চ স্বরে) করতে করতে স্মরণও কর এবং যুদ্ধও কর।

আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৬-এ বলেছে বলা হয়েছে, যে প্রভুকে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করবে সে ঐ প্রভুকেই প্রাপ্ত করবে। গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত তিনটি শ্লোকের মধ্যে ব্রহ্মের থেকে অন্য পূর্ণ পরমাত্মার (পরম দিব্য পুরুষ পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম) বিষয়ে বলছে যে, যদি কেউ তাঁর সাধনা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে তবে সে ঐ পূর্ণ পরমাত্মাকেই (পরমেশ্বরকে) প্রাপ্ত করে। এর দ্বারাই পূর্ণ মোক্ষ এবং সত্যলোক প্রাপ্তি ও পরম শান্তি প্রাপ্তি হয়। এইজন্য ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা (গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-৬৬ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪) আমিও (গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম) ঐ পরমেশ্বরের শরণে আছি।

রামানন্দ জী সর্ব প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে দাঁতের মাঝে আঙুল চেপে ধরলেন সত্যকে স্বীকার করলেন। বললেন পুত্র শাস্ত্রের কথা তুমি ঠিকই বলেছো যেটি সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের কেউ এমন জ্ঞানই দেয়নি, আমরা কি করি ? কবীর সাহেব বললেন পবিত্র গীতাতেই লেখা আছে। অষ্টম অধ্যায়ের ৮, ৯ ও ১০ নং. শ্লোক এবং অধ্যায় নং. ১৮ এর শ্লোক নং.৬২ পড়ে দেখো।

পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদের বক্তা ব্রহ্ম (কাল) বলছেন যে, ঐ পরমাত্মার শরণে যা অর্জুন, তাহলে তোর পুনঃ জন্ম-মৃত্যু হবে না। তার জন্য (অধ্যায় নং. ৪ এর শ্লোক নং ৩৪) ঐ সন্তের খোঁজ কর, যে ঐ পরমাত্মার পরম তত্ত্বকে জানেন। তাঁকে দন্ডবত প্রণাম করে, বিনম্র ও নিষ্কপট ভাবে তাঁর সেবা করো। যখন ঐ তত্ত্বদর্শী সন্ত প্রসন্ন হবেন তখন ওনার কাছ থেকে নাম দীক্ষার জন্য প্রার্থণা করো। তাহলে তোর আর পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু হবে না। পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৫ মন্ত্র নং. ১ থেকে ৪-এ বলেছে যে, এই উল্টো ঝুলানো সাংসার রূপী বৃক্ষের উপরের মূল অংশ টি হলেন আদি পুরুষ অর্থাৎ সনাতন পরমাত্মা, নীচের তিন গুন (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুন শিব) রূপী শাখা আছে। এই পূর্ণ সংসার রূপী বৃক্ষ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনার বিষয়ে আমি (ব্রহ্ম-কাল) জানি না। এইখানে বিচারকালে অর্থাৎ গীতার জ্ঞানে আমি তোকে পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারবো না। এরজন্য কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ কর। (গীতা অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৩৪) তারপর উনি তোমাকে সর্ব সৃষ্টির রচনার জ্ঞান ও সব প্রভুদের স্থিতি সঠিক ভাবে বলে দেবেন। এরপর ঐ পরমেশ্বরের পরমপদ খোঁজ করা উচিত যেখানে গেলে, সাধকের পুনঃরায় জন্ম-মৃত্যু হয় না অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ হয়ে যায়। যেই পরমেশ্বর সংসার রূপী বৃক্ষ অর্থাৎ সব ব্রহ্মান্ডের রচনা করেছেন আমিও (ব্রহ্ম-কাল) ঐ পরমেশ্বরের শরণে আছি, তাই ঐ পরমেশ্বরেরই পূজা করো। স্বামী রামানন্দ জী বললেন, হ্যাঁ লেখা তো তাই রয়েছে-পুত্র! ঠিক এমনটাই আছে। কিন্তু ঐ সতলোকের কথা তো আগে কারোর কাছে শুনিনি, যার কারণ আমার মন বিশ্বাস করতে পারছে না যে এটা সত্যি রয়েছে। কবীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি

কিভাবে সাধনা করেন? স্বামিজী বললেন আমি সম্পূর্ণ শরীরকে সিদ্ধ করে রেখেছি। যোগ অভ্যাসের দ্বারা আমি ভিতরের কমলগুলির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে ত্রিকুটি (ত্রিবেণী) পর্যন্ত পৌঁছে যাই। কবীর সাহেব বললেন, তাহলে আপনি একবার ত্রিবেনী পর্যন্ত পৌঁছান। রামানন্দ জী সমাধিস্থ হলেন (কারণ সমাধি লাগানোর অভ্যাস ওনার প্রতিদিনের ছিল)। ত্রিবেণী পর্যন্ত গিয়ে সেখানে তিনটি পথ ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্রহ্মান্ডে তৈরি ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করতেই তিনটি পথ ভাগ হয়ে যায়। এই প্রকার কুড়িটি ব্রহ্মান্ড পার করে একুশতম ব্রহ্মাণ্ডেও একই ব্যবস্থা রয়েছে। তিনটির মধ্যে একটি রাস্তা সামনে ব্রহ্ম লোকে তৈরি তিনটি গুপ্ত স্থানের দিকে যায়, সেখানে জ্যোতি নিরঞ্জন তিনটি রূপ ধারণ করে থাকে। কবীর সাহেব বললেন, সামনের ব্রহ্মরন্ধ্র তোমার এই নাম জপে খুলবে না। এই ব্রহ্মরন্ধ্র সতনামে খুলবে। কবীর সাহেব নিশ্বাস দ্বারা নিজের সতনামের উচ্চারণ করতেই সামনের দ্বারটি খুলে গেল। কবীর সাহেব বলেন,আসুন এবার আপনাকে কাল ভগবানকে দেখাই, যাকে আপনারা নিরাকার বলেন। গীতায় যে বলেছে, "আমি সকলকে খাব। অর্জুন! আমি কখনও কাউকে দর্শন দিই না, আমি কখনও কারোর সামনে প্রকট হয় না"। কবীর সাহেব বলেন, এবার আপনার সম্মুখে সেই 'কাল' কেই দেখাব। প্রথমে, এক ব্রহ্মাণ্ডে তৈরি গুপ্ত স্থান গুলিকে দেখালেন। কাল সেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিবের রূপ ধারন করে ছিল। তারপর ব্রহ্মলোক পার হওয়ার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে একুশতম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা, যেটি জটা কুন্ডলী সরোবরের উপরে অবস্থিত। সেই রাস্তাটি সর্বদা নিজের নজরে রাখে, যেন কোনো ভাবে কেউ বেরিয়ে না যায়। একুশ ব্রহ্মান্ডের অন্তিমলোকে কাল-ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ) নিজ স্থান রয়েছে। সেখানে কাল নিজের ঐ ভয়ঙ্কর রূপে বসে আছে, যেটি তার বাস্তবিক (আসল) রূপ। কবীর সাহেব বলেন, ঐ দেখ বসে আছে তোমার নিরাকার ভগবান, যাকে তোমরা নিরাকার বলো। (কারণ যোগীরা বেদের আধারে ওম্ নামের সাধনা করে, কিন্তু পরমাত্মা তো পায় না পরিবর্তে সিদ্ধি চলে আসে। সিদ্ধির দ্বারা স্বর্গে চলে যায়, মহা স্বর্গে চলে যায়, তারপর পশু হয়ে জন্ম নেয়। তাই সকলে প্রভুকে নিরাকার বলে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে কখনো দেখা যায় না। অথচ বেদে লেখা আছে ভগবান আকার যুক্ত।) কালের কাছে পৌঁছোতেই সাহেব নিজ সারনামের সাথে সতনামের উচ্চারণ করলেন। তৎক্ষনাৎ কালের মাথা নত হয়ে গেল। কালের মাথার ওপরে সেই দ্বার আছে, যেখানে দিয়ে সতলোকে যাওয়া যায় এবং পরব্রহ্মের লোকে প্রবেশ করা যায়। তারপর এক ভঁওর গুহা (সুড়ঙ্গ) শুরু হয়ে যায়। {এমনই এক ভঁওর গুহা (ঘুনি গুহা) কালের লোকেও রয়েছে}। কালের মাথার ওপর পা রেখে কবীর সাহেবের হংস আত্মারা (নির্বিকারী সাধকেরা) ওপরে যায়। কাল এখানে সিঁড়ির কাজ করে। পরব্রহ্মের লোক পার করে কবীর সাহেব শ্রী রামানন্দ জীর আত্মাকে সতলোকে নিয়ে গেলেন। {সেখানেও একটি ভঁওর গুহা (ঘূর্নি গুহা) রয়েছে}। সতলোকে গিয়ে শ্রী রামানন্দ জী দেখলেন কবীর সাহেব (কবীর্দেব) নিজ বাস্তবিক রূপে বসে আছেন। সেখানে কবীর সাহেবের শরীরের এত তেজ বেশি, যেন এক রোমকূপে কোটি কোটি সূর্য ও কোটি কোটি চন্দ্রের আলো একত্রিত হলে যতটা আলো হয় (কিন্তু গরম নয়) তার চেয়েও অধিক। কবীর সাহেব ওখানে গিয়ে নিজের দ্বিতীয় স্বরূপের ওপর চামর দোলাতে লাগলেন। শ্রী রামানন্দ ভাবলেন যিনি সিংহাসনে বিরাজমান রয়েছেন তিনিই ভগবান এবং কবীর হল এখানকার সেবক (গণ)। কিন্তু এই লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন, পরমাত্মার প্রকাশ অতি তেজময়। এমনটা চিন্তা ভাবনা করতে করতে পরমাত্মার তেজময় রূপটি সিংহাসন

থেকে উঠলেন ও কবীর সাহেবের পাঁচ বৎসরের শিশু রূপটি গিয়ে সিংহাসনে বিরাজমান হলেন। কবীর সাহেবের বাস্তবিক তেজোময় রূপ যেটি দেখছিলেন, সেটি ঐ বালক রূপে কবীর সাহেবের ওপর চামর দোলাতে লাগলো। এরপর কবীর সাহেবের তেজোময় স্বরূপটি পাঁচ বৎসরের বালকটির শরীরে মিলিয়ে গেলেন ও কেবল পাঁচ বৎসরের বালক কবীর সাহেব সিংহাসনে বিরাজমান রইলেন এবং নিজে থেকে চামর দোলা শুরু করলো। তখনই রামানন্দ জীর আত্মা পুনরায় শরীরে ফেরত পাঠিয়ে দেন। ওনার সমাধি ভঙ্গ হয় সামনে দেখলেন কবীর সাহেব পাঁচ বৎসরের শিশু রূপে বসে আছেন। তখন স্বামী রামানন্দ জী বললেন :-

তঁহা বহাঁ চিত চক্রিত ভয়া, দেখ ফজল দরবার।
গরীবদাস সিজদা কিয়া, হম পায়ে দীদার॥ ৫২৩॥
তুম স্বামী মৈঁ বাল বুদ্ধি, ভ্রম কর্ম কিয়ে নাশ।
গরীবদাস নিজ ব্রহ্ম তুম, হমরৈ দৃঢ় বিশ্বাস॥ ৫২৪॥
সুন্ন-বেসুন্ন সে তুম পরৈ, উরৈ সো হমরৈ তীর।
গরীবদাস সরবঙ্গ মেঁ, অবিগত পুরুষ কবীর॥ ৫২৫॥
কোটি কোটি সিজদে করে, কোটি কোটি প্রণাম।
গরীব দাস অনহদ অধর, হম পরসে তব ধাম॥ ৫২৬॥
তুম সাহিব তুম সন্ত হো, তুম সৎ গুরু, তুম হংস।
গরীব দাস তুম রুপ বিন, ঔর ন দূজা অংশ॥ ৫৫৭॥
মৈঁ ভক্তা মুক্তা ভয়া, কিয়া কর্ম কুন্দ নাশ।
গরীবদাস অবিগত মিলে, মেটি মন কী বাস॥ ৫৫৮॥

দোঁহু ঠৌর হৈ এক তুঁ, ভয়া এক সে দোয়। গরীবদাস, হাম কারণে, উতরে হৈ মগ জোয়॥ ৫৫৯॥
বোলত রামানন্দজী, সুন কবীর করতার। গরীবদাস সব রূপ মেঁ, তু হী বোলন হার॥ ৫৬০॥

শ্রী রামানন্দজী বলেন হে পরমেশ্বর! হে কবীর পরমাত্মা! হে কবীর অবতার (সর্ব সৃষ্টির রচনহার) আপনিই সর্ব ব্যাপক পূর্ণ পরমেশ্বর।

দহুঁ ঠৌড় হৈ এক তূঁ ভয়া এক সে দো। গরীব দাস হম কারণে, আয়ে হো মগ জো॥

হে পরমেশ্বর কবীর! আপনি দু'ই জায়গায় সতলোক ও আমার সামনে নিজেকে দুটি ভিন্ন রূপে বানিয়ে আমার মত তুচ্ছ জীবের কাছে এসেছেন।

মৈঁ ভক্তা মুক্তা ভয়া, কর্ম কুন্দ ভয়ে নাশ। গরীবদাস অবিগত মিলে, মিট গঙ্গ মন কী বাঁস॥

স্বামী রামানন্দ জী ১০৪ বৎসরের মহাপুরুষ তিনি পাঁচ বৎসরের বালক কবীর পরমেশ্বর কে বলছেন, আমি আপনার দাস মুক্ত হয়ে গিয়েছি এখন আমার মনের বিভ্রান্তি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। পরমাত্মার বাস্তবিক স্বরূপের দর্শন আমি করে নিয়েছে। পূর্ণ পরমাত্মাই কবীর সাহেব (কবির্দেব)। পবিত্র চারবেদ ও পবিত্র গীতা আপনারই গুনগান করছে। স্বয়ং কবির্দেবও বলেছেন যে :-

বেদ হমারা ভেদ হৈ, মৈঁ না বেদনকে মাঁহী। জিস বেদ সে মৈঁ মিলূঁ বেদ জনতে নাহীঁ॥

ভাবার্থ হল, পবিত্র চার বেদে পরমাত্মারই জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু পূজার বিধি আছে কেবল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) পর্যন্ত। পরমেশ্বর কবীরের (কবির্দেব) পূজার বিধির জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য পবিত্র গীতা তে বলা আছে, ঐ জ্ঞান কোনো তত্ত্বদর্শী সন্ত বলতে পারবেন, যিনি স্বয়ং পরমেশ্বরই হয়ে থাকেন অথবা তাঁর পাঠানো বাস্তবিক প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। ওনার কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করে পূর্ণ মোক্ষ বা পরম শান্তি প্রাপ্ত কর।

❑❑❑

“পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যেও কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বরের) সাক্ষী”

এই প্রকার কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) মুসলমানদের খারাপ বলেননি আর নাই-বা উনি পবিত্র কোরান শরীফকে ভুল বলেছেন। উনি তো কেবল ঐ সমস্ত কাজী মোল্লাদের তিরস্কার করেছেন, যারা সর্ব সমাজকে কোরান শরীফের বাস্তবিক জ্ঞানের বিপরীতে মনমর্জি সাধনা করাচ্ছে।

যেমন পবিত্র বেদের বক্তা কাল ব্রহ্ম বলেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেবের বিষয়ে কেউ কেউ তো তাঁকে জন্ম নিয়ে অবতার রূপে এসেছেন বলে মনে করেন, আবার কেউ তাঁকে কখনো জন্ম না নেওয়া নিরাকার বলে। এই বিষয়ে (ধীরানাম্) তত্ত্বদ্রষ্টা সন্তই বলে দেবেন, আমার (ব্রহ্মের) জানা নেই। (যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র নং ১০)। এরই প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এর মধ্যেও রয়েছে। যতক্ষণ ঐ তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়া যায়, ততক্ষণ জীবের কল্যাণ অসম্ভব। সেই সন্ত এখন এসেছেন, এই তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল জী মহারাজকে জেনে নাও।

“পবিত্র কোরান শরীফের মধ্যে প্রমাণ”

এই প্রকার পবিত্র কোরান শরীফের অধ্যায় সূরত ফুরকানী সং.২৫, আয়াত ৫২ থেকে ৫৯ এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, বাস্তবে (ইবাদহী কবীরা) পূর্ণ পরমাত্মা তো তিনি, যিনি ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করেন এবং সপ্তম দিনে সিংহাসনে গিয়ে বিরাজমান হন। তাঁর খবর কোনো বাখবরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

পবিত্র কোরান শরীফের বক্তা আল্লাহ স্বয়ং কোনো এক কবীর নামক প্রভুর দিকে সংকেত করেছেন এবং বলেছেন পূর্ণ পরমাত্মা কবীরের বিষয়ে আমিও জানিনা, তাঁর বিষয়ে কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তকে (বাখবরকে) জিজ্ঞাসা করো।

কবির্দেবও এটাই বলেছিলেন যে, “আমিই স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা (আল্লাহ কবীর/অকবিরু)। ওনার সঠিক জ্ঞানের বার্তাবাহক রূপে আমি স্বয়ং এসেছি, আমাকে চিনে নাও।” কিন্তু এই রকম ভাবে আচার্যরা পূর্বেও পরমেশ্বরের বাস্তবিক জ্ঞান জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি। তারা বলতেন, “কবীর তো অশিক্ষিত, এ তো সংস্কৃত জানেই না, আমরা শিক্ষিত।” এই সকল কথা শুনে তখনকার সময় ভক্তজনেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ সর্ব সমাজ শিক্ষিত হয়েছে, এখন ঐ পথভ্রষ্টকারী আচার্যদের আর কোনো ফন্দি কাজে আসছে না, পরেও আসবে না।

সল্লি অলা: জ-স-দি মুহম্মদিন ফিল্ অজসাদি অল্লাহুম ম সল্লি অলা কবির (কবীর) মুহম্মিদ ফিল্ কুবূরি ফজাঈল জিক্র (বর্নিত আছে)।

٥- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا
قَالَ عَبْدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَآءِ حَتّٰی یُفْضِیَ اِلَی الْعَرْشِ
مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ۔ رواه الترمذی وهكذا فی المشكوٰة لكن ليس فيها
حسن بل غريب فقط قال القاری و رواه النسائی وابن حبان وعزاه
السيوطی فی الجامع الی الترمذی و رقم له بالحسن وحكاه السيوطی فی
الدر من طريق ابن مردويه عن ابی هريرة وليس فيه ما اجتنبت الكبائر
وفی الجامع الصغير برواية الطبرانی عن معقل ابن يسار لكل شیء مفتاح
ومفتاح السموات قول لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ورقم له بالضعف۔

৫. হুজুরে অক্দস সল্লল্লাহু অলৈহি ব সল্লম ইর্শাদ হৈ যে, কোন মানুষ (বন্দা) এমন নাই যে' লাইলা-হ- ইল্লল্লাহুহ' বলে আর তাঁর জন্য আকাশের দরজা খোলে না। এই কলমা সোজা অর্শ পর্যন্ত পৌছায় শর্ত এই যে কবীরা পাপের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

ফ– এটা কত বড় ফজীলত (নেয়ামত বা গুণ) ও কবুলিয়তের ইন্তিহা (গ্রহণযোগ্যতার সীমা এতটাই) যে, এই কলেমা বরকতময় পথ ধরে আকাশের অন্তিম প্রান্তে মুঅল্লা (মৌলা বা আল্লাহ) পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এখন এটা জানা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, কবীরা নাম যদি গুনাহের সাথেও বলা হয়, তাহলেও সে সুফল থেকে বঞ্চিত হয় না।

মুল্লা অলী কারী রহ: বলেন যে, "কাবাইর সে বচনে কী শর্ত কূবূল কী জল্দী ঔর আসমান কে সব দরবাজে খুলনে কে এতাবর সে হ্যয়, বরনা সবাব ঔর কূবূল সে কবাইর (কবীর) কে সাথ ভী খালী নহীঁ।

বাজ উলেমা এই হাদীসের এই অর্থ করে বলেছেন যে, এমন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মার পুরস্কার হেতু আকাশের সমস্ত দরজা খুলে যাবে।

একটি হাদিসে উল্লেখ করা আছে যে, দুটি কলেমা এমন রয়েছে যার মধ্যে একটির জন্য আকাশের নিচে কোন মুন্তহা নেই। দ্বিতীয়টি আকাশ ও পৃথিবীকে (নিজের নূর অর্থাৎ প্রকাশ অথবা নিজের শক্তি দিয়ে) ভরিয়ে দাও – একটি 'লাইলা-হ-ইল্লাল্লাহু' অন্যটি আল্লাহু আকবর' (কবীর) ।

"পবিত্র বেদে প্রমাণ"

কবির্দেব নিজের জ্ঞানের দূত হয়ে নিজেই আসেন এবং নিজের সঠিক জ্ঞান (বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞান) নিজেই সকলকে করান।

স্বয়ং কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) নিজের অমৃত বাণীতে বলেছেন যে:-

শব্দ :- অবিগত সে চল আএ, কোঈ মেরা ভেদ মর্ম নহীঁ পায়া। (টেক) ন মেরা জন্ম ন গর্ভ বসেরা, বালক হো দিখলায়া। কাশী নগর জল কমল পর ডেরা, বহাঁ জুলহা নে পায়া॥ মাত-পিতা মেরে কুছ নাহীঁ, না মেরে ঘর দাসী, (পত্নি)। জুলহা কা সুত আন কহায়া, জগত করেঁ মেরী হাঁসী ॥ পাঁচ তত্ত্ব কা ধর নহী মেরা, জানুঁ জ্ঞান অপারা। সত্য স্বরূপী (বাস্তবিক) নাম সাহেব (পূর্ণ প্রভু) কা সোঈ নাম হমারা॥ অধর দ্বীপ (উপর সতলোক মেঁ) গগন গুফা মেঁ তহাঁ নিজ বস্তু সারা। জ্যোত স্বরূপী অলখ নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) ভী ধরতা ধ্যান হমারা॥ হাড় চাম লহু না মেরে কোঈ জানে সত্যনাম উপাসী। তারন তরন অভয়পদ দাতা, মৈঁ হূঁ কবীর অবিনাশী।

উপরোক্ত শব্দতে কবীর পরমেশ্বর বলছেন যে, না তো আমার কোনো পত্নী আছে, আর নাই-বা আমার শরীর পাঁচতত্ত্ব (হাড়-চামড়া, লহু অর্থাৎ নাড়ীতন্ত্র দিয়ে তৈরি শরীর) দিয়ে তৈরি। আমি স্বয়ম্ভু এবং কাশীতে লহরতারা নামক সরোবরের জলে পদ্ম ফুলের উপর আমি স্বয়ং প্রকট হয়ে বালক রূপ ধারণ করে ছিলাম। ওখান থেকে আমাকে নীরু নামক জোলা (তাঁতি) তুলে নিয়ে গিয়েছিল। যে বাস্তবিক নাম পরমেশ্বরের অর্থাৎ (বেদের মধ্যে কবির্দেব, গুরুগ্রন্থ সাহেবে হক্কা কবীর এবং কুরআন শরীফে আল্লাহ কবীরন্) সেই নাম আমার'ই। আমি উপরে ঋত্ধামে থাকি এবং তোমাদের ভগবান জ্যোতি নিরঞ্জনও (ব্রহ্ম) আমার'ই পূজা করে।

এরই প্রমাণ সত্যার্থ প্রকাশের সপ্তম সমুল্লাসের (পৃ: ১৫২-১৫৩, দীনানগর পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত) মধ্যেও আছে। স্বামী দয়ানন্দ জী যজুর্বেদ অধ্যায় ১৩ মন্ত্র ৪ এবং ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৪৯ মন্ত্র ১-র অনুবাদ করেছেন। যেখানে বেদের জ্ঞান বলা ব্রহ্মা বলছেন যে, (৫ = ঋকবেদ মন্ত্র ১০ সুক্ত ৪৯ মন্ত্র ১ এবং ৬ = যজুর্বেদ অধ্যায় ১৩ -তে

মন্ত্র ৪-এ) - হে মনুষ্য! যিনি সৃষ্টির পূর্বে সকলের উৎপত্তি করেছেন এবং সকলের স্বামী ছিলেন, এখনো আছেন এবং পরেও থাকবেন, তিনিই সকল সৃষ্টিকে বানিয়ে ধারণ করে রেখেছেন। ঐ সুখ স্বরূপ পরমাত্মার ভক্তি যেমনভাবে আমরা (ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারাও ওনার সাধনা) করছি, সেইভাবে তোমরাও করো।

প্রমাণ -১. পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ২৯ মন্ত্র ২৫ :-

সমিদ্ধোৎঅদ্য মনুষ্য দুরোনে দেবো দেবান্যজসি জাত বেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ২৫॥

সমিদ্ধঃ-অদ্য-মনুষঃ-দুরোণে-দেবঃ-দেবান-যজ্-অসি-জাত-বেদঃ-আ-চ-বহ-মিত্রমহঃ-চিকিত্বান-ত্বম্-দুতঃকবির্-অসি-প্রচেতাঃ।

অনুবাদ :- (অদ্য) আজ বর্তমানে (দুরোণে) শরীর রূপ মহলে দুরাচার পূর্বক (মনুষ্যঃ) মিথ্যা পূজাতে লীন মননশীল ব্যক্তিদের (সমিদ্ধঃ) লাগানো আগুন অর্থাৎ শাস্ত্র বিধির বাইরে বর্তমান পূজা যা হানিকারক সাধকের জীবনকে নষ্ট করে দেয়,যেমন আগুন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। ওই স্থানে (দেবান) দেবতাদের (দেবঃ) দেবতা (জাতবেদঃ) পূর্ণ পরমাত্মা সত্ পুরুষের বাস্তবিক (যজ) পূজা (অসি) করা উচিত (আ) দয়ালু (মিত্রমহঃ) জীবের বাস্তবিক সাথী পূর্ণ পরমাত্মার (চিকিত্বান) সত্য জ্ঞান বা যথার্থ ভক্তির (দূতঃ) সংবাদবাহক রূপে (বহ) আসেন (চ) এবং (প্রচেতাঃ) বোধ করান। (ত্বম্) তিনি নিজে (অসি) ই (কবীরদেব বা কবীর পরমেশ্বর) কবীর পরমাত্মা।
ভাবার্থ:- যে সময় ভক্ত সমাজকে দিয়ে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়ে মনমর্জি আচরণ (পূজা) করানো হয়। ঐ সময় কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তত্ত্বজ্ঞানকে প্রকট করেন।

প্রমাণ:- পবিত্র সামবেদ সংখ্যা ১৪০০ -তে, সংখ্যা নং ৩৫৯ সমবেদ অধ্যায় নং. ৪ এর খণ্ড নং. ২৫ এর শ্লোক নং. ৮ :-

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বাস্য কর্মণী ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ॥ ৪॥

পুরাম্ - ভিন্দুঃ - যুবা - কবির - অমিত - ঔজা - অজায়ত ইন্দ্রঃ - বিশ্বস্য - কর্মণঃ - ধর্তা বজ্রী - পুরুষ্টুতঃ।

শব্দার্থ:- (যুবা) পূর্ণ সমর্থ (কবির) কবির্দেব বা কবীর পরমেশ্বর (অমিত ঔজা) বিশাল শক্তি যুক্ত বা সর্ব শক্তিমান (অজায়ত) সাধারন তেজপুঞ্জের শরীর বানিয়ে (ধর্তা) প্রকট হয়ে বা অবতার ধারণ করে (বজ্রী) নিজের সত্য শব্দ ও সত্য নাম রূপী অস্ত্র দিয়ে (পুরাম্) কাল ব্রহ্ম-র পাপ রূপী বন্ধনের প্রাচীর (ভিন্দুঃ) ভাঙেন বা খণ্ড খণ্ড করেন। (ইন্দ্রঃ) তিনি সর্ব সুখ দায়ক পরমেশ্বর (বিশ্বস্য) সর্ব জগতের সব প্রাণীদের (কর্মণঃ) মন দ্বারা সত্য ভক্তি কর্ম বা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে অনন্য মন দ্বারা ধার্মিক কর্মের দ্বারা সত্য ভক্তিতে (পুরুষ্টুতঃ) স্তুতি উপাসনা করার যোগ্য।

{যেমন বাচ্চা ও বৃদ্ধের সব কাজ করার ক্ষমতা হয় না। যুবা ব্যক্তিই সব ধরনের কাজ করার ক্ষমতা রাখে। এমনই পরব্রহ্ম-ব্রহ্ম-ত্রিলোকের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং অন্য দেবী দেবতাদের কে বাচ্চা ও বৃদ্ধ জান।এই জন্য কবীর পরমেশ্বরকে বেদেই যুবকের উপমা দিয়েছে।}

ভাবার্থ :- যে কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তত্ত্বজ্ঞান সাথে নিয়ে সংসারে আসেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং কালের কর্মরূপী দুর্গকে ভেঙে ফেলে সর্ব সুখ প্রদান করেন এবং তিনি সকলের কাছে পূজার যোগ্য।

সংখ্যা নং ১৪০০ সামবেদ উতাচিক অধ্যায় নং ১২ খণ্ড নং ৩ শ্লোক নং ৫

ভদ্রা বস্ত্র সমন্যাঅবসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্ ।

আ বচ্যা স্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ॥ ৫॥

ভদ্রা-বস্ত্রা-সমন্যা-বসানঃ-মহান্-কবির-নিবচনানি-শংসন্-আবচ্যস্ব-চম্বোঃ-পুয়মানঃ-বিচক্ষণঃ-জাগৃবি-দেব বিতৌ।

অনুবাদ :- বিচক্ষণঃ- চতুর ব্যক্তিরা (আবচ্যস্ব) নিজের বচন দিয়ে পূর্ণ ব্রহ্মের পূজার কথা না বলে, অন্য উপাসনার পথ দর্শন করিয়ে, অমৃতের স্থানে (পুয়মানঃ) অন্য উপাসনা যেমন ভূত-প্রেত পূজা, পিতর-পূজা, তিন গুণের পূজা (রজোগুণ- ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিবশঙ্কর, ব্রহ্ম-কালের পূজা) কে (চম্বোঃ) আদরের সঙ্গে আচমন করে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভুল জ্ঞানকে সমাপ্ত করার জন্য (ভদ্রা) পরম সুখদায়ক (মহান কবির) মহান কবির অর্থাৎ পূর্ণ-পরমাত্মা কবীর (বস্ত্রা) স্বশরীরে,সাধারণ বেশ ভূষাতে (বস্ত্রের অর্থ বেশ ভূষা, সাধুভাষায় একে চোলাও বলা হয়, চোলার অর্থ শরীর। যদি কোন সাধুর মৃত্যু হয় তখন বলে চোলা ছেড়ে চলে গিয়েছে) (সমন্যা) নিজের সতলোকের শরীরের সদৃশ্য অন্য সাধারন শরীর ধারণ করে (বসানঃ) সাধারণ ব্যক্তির মত জীবন ব্যতীত করে কিছু দিন এই সংসারে অতিথির মত থাকেন (নিবচনানি) নিজের কবির বাণী মাধ্যমে সত্যজ্ঞান (শংসন) বর্ণনা করেন। (দেব) পূর্ণ পরমাত্মা তার (বিতৌ) লুকানো সর্গুণ-নির্গুণ জ্ঞান রূপী ধনকে (জাগৃবিঃ) জাগ্রিত করেন।

ভাবার্থ:- শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ সাধনা রূপী পুঁজ (মবাদ) অর্থাৎ ঘাতক সাধনাতে আধারিত ভক্ত সমাজকে কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তত্ত্বজ্ঞান বোঝানোর জন্য এই সংসারে প্রকট হন। ঐ সময় নিজের তেজোময় শরীরের উপর অন্য শরীর রূপী বস্ত্র (হালকা প্রকাশের) পরিধান করে আসেন। (কারণ পরমেশ্বরের বাস্তবিক তেজোময় শরীরকে চর্মদৃষ্টি দিয়ে দেখা সম্ভব নয়।) কিছুদিন সাধারণ ব্যক্তির মত জীবন যাপন করার লীলা করেন এবং পরমেশ্বরকে (নিজেকে) প্রাপ্তি করার সঠিক জ্ঞান প্রকাশ করেন।

ঋকবেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭

শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বহ্নি মরুতো গনেন।
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্তসোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥ ১৭॥
শিশুম্ জজ্ঞানং হর্য তম্ মৃজন্তি সুম্ভন্তি বহিন মরুতঃ গণেন।
কবির্গীর্ভি কাব্যেনা কবির্ সন্ত্ সোমঃ পবিত্রম্ অত্যেতি রেভন॥

অনুবাদঃ- পূর্ণ পরমাত্মা (হর্য শিশুম্) বিলক্ষণ মানুষের বাচ্চা রূপে (জজ্ঞান্ম) জেনে বুঝে প্রকট হন তথা নিজের তত্ত্বজ্ঞানকে (তম্) ওই সময় (মৃজন্তি) নির্মলতার সাথে (শুম্ভন্তি) উচ্চারণ করেন। (বহ্নি) প্রভু পাওয়ার অভিলাষা (মরুতঃ) ভক্ত (গনেন) গনের জন্য (কাব্যেনা) কবিতার দ্বারা (পবিত্রমত্যেতি) অত্যধিক বাণী নির্মলতার সাথে (কবীর গীর্ভি) কবির বাণী দ্বারা (রেভন) উচ্চস্বরে সম্বোধন করে যিনি বলেন (কবির্ সন্ত্ সোমঃ) তিনি অমর পুরুষ - সতপুরুষ অর্থাৎ ঋষি রূপে স্বয়ং কবীরদেবই হন। পরন্তু ওই পরমাত্মাকে না চিনে সাধারন জনসমুদয় কবি বলেন কিন্তু তিনি আসলে পূর্ণ পরমাত্মা তাঁর নাম কবীরদেব।

ভাবার্থ :- ঋগ্বেদ মন্ডল নং. ৯ সুক্ত নং. ৯৬ মন্ত্র ১৬-তে বলা হয়েছে যে, আসুন পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নামটি জানি, এই ১৭ নং মন্ত্রের মধ্যে ঐ পরমাত্মার নাম এবং পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া আছে। বেদের জ্ঞান বলা ব্রহ্ম বলছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব চমৎকার মানব শিশু রূপে প্রকট হয়ে নিজের বাস্তবিক জ্ঞানকে নিজের কবীর বাণী দ্বারা নির্মল জ্ঞান নিজের হংস আত্মাদের অর্থাৎ পূর্ণ্যাত্মা অনুগামীদেরকে কবিতা, প্রবাদ বাক্যের রূপে সম্বোধন করে অর্থাৎ উচ্চারণ করে বর্ণনা করেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সময়ে প্রকট হওয়া পরমাত্মাকে না চিনতে পেরে কেবল ঋষি

অথবা সন্ত অথবা কবি মনে করে নেয়। ঐ পরমাত্মা স্বয়ংও বলেন যে, আমিই পূর্ণব্রহ্ম কিন্তু লোকবেদের আধারে পরমাত্মাকে নিরাকার মনে করে রাখা প্রজাগণ আমাকে চিনতে পারে না। যেমন, গরীব দাস জী মহারাজ কাশী শহরে প্রকট হওয়া, পরমাত্মাকে চিনতে পেরে ওনার মহিমা বলেছেন এবং ঐ পরমেশ্বরের দ্বারা বলা নিজের মহিমার যথাযথ বর্ণনা নিজের বাণীর মধ্যে দিয়েছেন:-

গরীব, জাতি হমারী জগৎ গুরু, পরমেশ্বর হৈ পন্থ।
দাস গরীব লিখ পড়ে নাম নিরঞ্জন কন্ত॥
গরীব, হম হি অলখ অল্লাহ হৈঁ, কুতুব গোস ঔর পীর।
গরীব দাস খালিক ধনী, হমরা নাম কবীর॥
গরীব, ঐ স্বামী সৃষ্টা মৈঁ, সৃষ্টি হমরে তীর।
দাস গরীব অধর বসুঁ, অবিগত সত্ কবীর॥

সবকিছু এতটা স্পষ্ট করে দেওয়ার পরেও পরমেশ্বরকে একজন কবি অথবা সন্ত অথবা ভক্ত বা জোলা (তাঁতি) বলা হত। কিন্তু তিনি পূর্ণ পরমাত্মা ছিলেন। তাঁর বাস্তবিক নাম কবির্দেব। স্বয়ং সত পুরুষ কবীর'ই ঋষি বা সন্ত রূপে থাকেন। এই তত্ত্ব জ্ঞানহীন ঋষি, সন্ত ও গুরুদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সেই সময়কার প্রজাগণ, ঐ সময়ে অতিথি রূপে প্রকট হওয়া পরমাত্মাকে চিনতে পারে নি। কারণ ঐ অজ্ঞানী ঋষি, সন্ত ও গুরুরা পরমাত্মাকে নিরাকার বলতো।

ঋবেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৮

ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ সহস্রণীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
তৃতীয়ম্ ধাম মহিষঃ সিষাসন্তসোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ॥ ১৮॥
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ সহস্রানীথঃ পদবীঃ কবীনাম। তৃতীয়ম্ ধাম মহিষঃ সিষা সন্ত্ সোমঃ বিরাজমানু রাজতি স্তুপ।

অনুবাদ - বেদ বক্তা ব্রহ্ম (কাল) বলছেন, (য) যে পূর্ণ পরমাত্মা বিলক্ষণ বাচ্চা রূপে এসে (কবীনাম্) প্রসিদ্ধ কবির (পদবীঃ) উপাধি প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ এক সন্ত বা ঋষির ভূমিকা করেন,তিনি (ঋষিকৃতা) সাধু রূপে প্রকট হন, প্রভু দ্বারা রচিত (সহস্রনীথঃ) হাজার হাজার বাণী (ঋষিমনা) সাধু স্বভাবের ব্যক্তিদের জন্য অর্থাৎ ভক্তদের জন্য (স্বর্ষাঃ) স্বর্গ তুল্য আনন্দ দায়ক হয়। (সোম) ওই অমর পুরুষ অর্থাৎ সত্পুরুষ (তৃতীয়া) তৃতীয় (ধাম) মুক্তি লোকে বা সতলোকে (মহিষঃ) সুদৃঢ় পৃথিবীকে (সিষা) স্থাপিত করার (অনু) পরে মানব সদৃশ্য সন্ত রূপে (স্তুপ) গম্বুজের মত উচু সিংহাসনের উপরে (বিরাজমানু রাজতি) উজ্জ্বল স্থূল আকারে বা মানব সাদৃশ্য তেজোময় শরীরে বিরাজমান হন।

ভাবার্থ:- মন্ত্র ১৭-তে বলা হয়েছে যে, কবির্দেব শিশুরূপ ধারণ করে নেন এবং লীলা করতে করতে বড়ো হন। কবিতার মাধ্যমে নিজের তত্ত্ব জ্ঞান বর্ণনা করার কারণে, তিনি কবি পদবীও প্রাপ্ত করেন, অর্থাৎ তাঁকে সকলে সন্ত, ঋষি এবং কবি বলেও ডাকতে শুরু করে। বাস্তবে তিনিই হলেন পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব। ওনার দ্বারা রচনা করা অমৃত বাণীকে কবীর বাণী (কবির্বাণী) বলা হয়, যা ভক্তদের জন্য স্বর্গের সমান সুখদায়ী হয়। ঐ পরমাত্মাই তৃতীয় মুক্তিধাম অর্থাৎ সতলোকের স্থাপনা করে স্বয়ং এক গম্বুজের (চূড়ার) মধ্যে সিংহাসনের উপর তেজময় মানব সদৃশ্য শরীরে বিরাজমান আছেন।

এই মন্ত্রে তৃতীয় ধাম বলতে 'সতলোক'কে বলা হয়েছে। যেমন, প্রথমে ব্রহ্মের লোক যেটি ২১ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র নিয়ে তৈরি, দ্বিতীয় হল পরব্রহ্মের লোক

যেটি সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে তৈরি, তৃতীয় হল পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের সতলোক। কারণ পূর্ণ পরমাত্মা সত্যলোকে সতপুরুষ রূপে বিরাজমান হয়ে, নিচের সমস্ত লোকগুলির রচনা করেন। এই জন্যই নিচের লোকগুলির গণনা করা হয়েছে।

চোখে দেখা এই প্রমাণই সন্ত গরীব দাস জী বলছেন যে :-

অর্স কুর্স পর সফেদ গুম্বজ হৈ, জহাঁ সদগুরু কা ডেরা।

ভাবার্থ হল এই যে, ঊর্ধ্ব আকাশের উপর প্রান্তে কবীর পরমেশ্বর এক শ্বেত গম্বুজের মধ্যে থাকেন।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৯

চমুষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপস আয়ুধানি বিভ্রত্।
অপামুর্ভি সচমাণাঃ সমুদ্রং তুরিয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ১৯ ॥
চমুসৎ শ্যেনঃ শকুনঃ বিভৃত্বা গোবিন্দুঃ দ্রপ্স আয়ুধানী বিভ্রৎ।
অপামুর্ভি সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ম্ ধাম মহিষঃ বিবক্তি ॥

অনুবাদ - (চমুসৎ) পবিত্র (গোবিন্দুঃ) কামধেনু রূপী সর্ব মনোষ্কামনা পূর্ণকারী পরমাত্মা কবির্দেব (বিভৃত্বা) সকলকে পালন করেন (শ্যেনঃ) সাদা রং যুক্ত (শকুনঃ) শুভ লক্ষণ যুক্ত (চমুসত) সর্ব শক্তিমান (দ্রপ্সঃ) যেমন দুধ থেকে দই বানানো পদ্ধতি ঠিক সেইরূপ শাস্ত্রানুকূল সাধনা থেকে দই রূপী পূর্ণ মুক্তি দাতা (আযুধানী) তত্ত্বজ্ঞান রূপী কাল জাল বিনাশক ধনুষ যুক্ত, সারঙ্গপাণী প্রভু, (সচমানঃ) বাস্তবে (বিভ্রৎ) সবাইকে পালন পোষণ করেন। (অপামুর্ভিঃ) গভীর জল যুক্ত (সমুদ্রম্) সাগরের মত (গহরা) গভীর বা বিশাল (তুরীয়ম) চতুর্থ (ধাম) লোক বা অনামী লোকে (মহিষঃ) উজ্জ্বল সুদৃঢ় পৃথিবীর উপর (বিবক্তি) পৃথক স্থানে পৃথক ভাবে থাকেন, তাঁর খবর বা সংবাদ কবীর্দেব স্বয়ংই ভিন্ন ভিন্ন করে বিস্তারিত ভাবে দেন।

ভাবার্থ :- মন্ত্র ১৮-তে বলা হয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তৃতীয় মুক্তি ধাম অর্থাৎ সতলোকে একটি গম্বুজের মধ্যে থাকেন। এই ১৯ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত শ্বেত বর্ণের পূর্ণ প্রভু, যিনি কামধেনুর মতো সমস্ত মনোষ্কামনা পূর্ণ করেন। উনিই বাস্তবে সকলের পালনকর্তা। সেই কবির্দেব, যিনি মৃত্যুলোকে শিশুরূপ ধারণ করে আসেন। যেমন দুধ থেকে দই তৈরি করার বিধি আছে, ঠিক তেমন'ই তিনি পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করার সাধনা, শাস্ত্রবিধি অনুসারে বলে দিয়ে পূর্ণ মোক্ষ রূপী দই প্রদানকারী। তত্ত্বজ্ঞান রূপী শাস্ত্র অর্থাৎ ধনুক যুক্ত হওয়ায় তিনি হলেন সারঙ্গপাণী (ধনুকধারী বিষ্ণু)। অর্থাৎ যেমন সমুদ্র হলো সর্বজলের স্রোত, তেমনি পূর্ণ পরমাত্মা থেকেই সকলের উৎপত্তি হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৩-এ বলা হয়েছে যে, সংসার রূপী বৃক্ষকে তত্ত্বজ্ঞান রূপী অস্ত্র দিয়ে কেটে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় সমাপ্ত করার পর, ঐ পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিত। যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনরায় এই সংসারে আর কখনো ফিরে আসে না, অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ হয়ে যায়। যে পরমেশ্বরের থেকে সম্পূর্ণ সংসার রূপী বৃক্ষের প্রবৃতি (শাখা-প্রশাখা) বিস্তারলাভ হয়েছে। সেই পূর্ণ প্রভু চতুর্থ ধাম অর্থাৎ অনামী লোকে থাকেন। যেমন - প্রথমে সতলোক, দ্বিতীয় হল অলখ লোক, তৃতীয় অগম লোক ও চতুর্থ হল অনামী লোক। এইজন্য এই ১৯ নং মন্ত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) অনামী পুরুষ রূপে চতুর্থ ধাম অর্থাৎ অনামী লোকেও অন্য তেজময় রূপ ধারণ করে সেখানে থাকেন।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯, সুপ্ত ৯৬ মন্ত্র ২০:-

মর্যো ন শুভ্রস্তন্বং মৃজানোৎত্যো ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্।

বৃষেব যুথা পরি কোশমর্ষানকনিক্রদচ্চম্বোরুরা বিবেশ॥ ২০॥
মর্য: ন শুভ্রস্তন্বম্ মৃজানঃ অত্যঃ ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্।
বৃষেব যূথা পরিকোশম্ অর্ষন্ কনিক্রদত্ চম্বো: ইরা বিবেশ।

অনুবাদ - পূর্ণ পরমাত্মা কবীরদেব যিনি চতুর্থ ধাম,অর্থাৎ অনামী লোকে ও তৃতীয় ধাম অর্থাৎ সতলোকে থাকেন, ওই পরমাত্মা (ন মর্যঃ) মানুষের মত কিন্তু নাশরহিত অর্থাৎ অমর (মৃজনঃ) নির্মল মুখমণ্ডল যুক্ত আকারে (অত্যঃ) অত্যাধিক (শুভ স্তন্বম্) বিশাল শ্বেত (সাদা) শরীর ধারণ করে উপরের লোকে বিদ্যমান আছেন। ওখান থেকে (সৃত্বা) দ্রুত গতিতে, কাউকে না জানতে দিয়ে সমরূপ পরমাত্মা (ইরা) পৃথিবীর উপর (বিবেশ) অন্য বেশভূষা বা অন্য রূপ (চম্বোঃ) ধারন করে আসেন। সতলোক ও পৃথিবী লোকে লীলা করে (যথা) অনেক সমুদয়কে আসল (সনয়ে) সনাতন পূজার (বৃষেব) বর্ষা করেন। (ন ধনানাম্) ওই রাম নামের ভক্তি ধনের কামাই নির্ধনকে (কনিক্রদৎ) হাল্কা আওয়াজে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা মনে মনে উচ্চারণ করে পূজা করান, যাতে অসংখ্য অনুগামীদের সমস্ত সংঘ পূর্বের সুখ সাগর রূপী অমৃত মনি প্রাপ্ত করে অর্থাৎ সতলোকের প্রাপ্তি হয়।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) উপরের তৃতীয় ধাম অর্থাৎ সত্যলোকে থাকেন, এবং ঐ পরমেশ্বরই ভিন্ন মনুষ্য রূপ ধারণ করে চতুর্থধাম অর্থাৎ অনামী লোকে থাকেন। পরমাত্মা মনুষ্যের মতোই সুন্দর মুখমন্ডল যুক্ত শ্বেত শরীর যুক্ত আকার রূপে এখানে পৃথিবী লোকেও আসেন এবং নিজ বাস্তবিক পূজা বিধির জ্ঞান করিয়ে বহু জনসমূহকে অর্থাৎ সংঘকে সত্যভক্তির ধনে ধনী করেন। অসংখ্য অনুগামীদের সংঘকে সত্য ভক্তির পূণ্যফল উপার্জন করিয়ে পূর্বের সেই সুখময় লোক, পূর্ণ মুক্তির রত্ন ভান্ডার অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্তি করান।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৭
(সন্ত রামপাল দাস দ্বারা ভাষা ভাষ্য)

যোৎথর্বাণং পিত্তরং দেববন্ধুম্ বৃহস্পতিম্ নমসাব চ গচ্ছাৎ।
ত্বম্ বিশ্বেষাম্ - জনিতা যথা সঃ কবির্দেবঃ ন দভায়ত্- স্বধাবান্॥ ৭॥ ।

যঃ - অথর্বানম্ - পিত্তরম্ - দেববন্ধুম্ - বৃহস্পতিম্ - নমসা - অব - চ - গচ্ছাত্ - ত্বম বিশেযাম্ - জনিতা - যথা - সঃ - কবির্দেবঃ - ন - দভায়ৎ - স্বধাবান।

অনুবাদ - (যঃ) যিনি (অথর্বাণম্) অচল বা অবিনাশী (পিত্তরম্) জগৎ পিতা (দেববন্ধুম) ভক্তের বাস্তবিক সাথী বা আত্মার আধার (বৃহস্পতিম) সব থেকে বড় স্বামী অর্থাৎ জ্ঞানদাতা জগৎগুরু (চ) তথা (নমসা) বিনম্র পুজারী বিধিমত সাধক সুরক্ষার সাথে (গচ্ছাৎ) যাঁরা সতলোকে চলে গিয়েছেন, তিনি তাঁদেরকে সতলোকে নিয়ে গিয়েছেন। (বিশ্বেযাম্) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের (জনিতা) রচয়িতা (ন দভায়ৎ) কালের মত ধোঁকা (ঠকায়না) না দেওয়া (স্বধাবান) স্বভাব বা গুণের (যথা) যেমনকার তেমন (সঃ) তিনি (ত্বম) আপনি (কবির্দেবঃ কবির্/ দেবঃ) কবীর পরমেশ্বর বা কবির্দেব।

ভাবার্থ:- যে পরমেশ্বরের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রবিণম্, ত্বমেব সর্বম্ মম্ দেব দেব॥ যিনি অবিনাশী সকলের মাতা পিতা এবং ভাই ও সখা ও জগৎ গুরুরূপে সকলকে ভক্তি প্রদান করে সতলোকে নিয়ে যান, কালের মত প্রতারণা না করা, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকারী হলেন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)।

❑❑❑

“কবীর সাহেব চার যুগেই আসেন”

সতগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, চারোঁ যুগ প্রবান।
ঝুঠে গুরুবা মর গএ, হো গএ ভূত মসান।

“সত্যযুগে কবির্দেব (কবীর সাহেব) সতসুকৃত নামে প্রকট হয়েছিলেন।”

তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে শ্রদ্ধালু ভক্তরা বলেন যে জোলা (তাঁতি) রূপে কবীর জী বিক্রমী সংবত ১৪৫৫ (সন ১৩৯৮) তে কাশীতে এসেছিলেন। বেদে বর্ণিত কবির্দেব ঐ কাশীর জোলা (তাঁতি) কিভাবে পূর্ণ পরমাত্মা হতে পারে?

এই বিষয়ে দাসের (সন্ত রামপাল দাস) প্রার্থনা এই যে, এই পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব কবীর পরমেশ্বর বেদের জ্ঞান থেকেও পূর্বে সতলোকে বিদ্যমান ছিলেন। এবং নিজের বাস্তবিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য উনি চারযুগে নিজেই প্রকট হয়েছেন। সত্যযুগে সতসুকৃত নামে, ক্রেতা যুগে মুনিন্দ্র নামে, দ্বাপর যুগে করুণাময় নামে, এবং কলিযুগে ওনার বাস্তবিক কবির্দেব (কবীর প্রভু) নামে প্রকট হয়েছেন। এছাড়াও তিনি অন্য রূপ ধারণ করে যে কোন সময় প্রকট হয়ে নিজের লীলা করে অন্তর্ধ্যান হয়ে যান।ঐ সময় লীলা করতে আসা পরমেশ্বরকে শ্রদ্ধালু ভক্তরা চিনতে পারেনা। কেননা সকল সন্ত ও মহর্ষিরা প্রভুকে নিরাকার বলে এসেছেন। আসলে পরমাত্মা সাকার। তার শরীর মানুষের মতো। কিন্তু পরমাত্মার শরীর নাড়ি ও পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা গঠিত নয়, একটি নূর তত্ত্ব দ্বারা গঠিত। পূর্ণ পরমাত্মা যখন ইচ্ছা তখন প্রকট হতে পারেন। উনি কখনো মায়ের গর্ভে জন্ম নেন না, কারণ উনি সর্বসৃষ্টির মালিক। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জী (কবির্দেব) সত্য যুগে সতসকৃত নামে প্রকট হয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি গরুড়, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিব শঙ্করকে সত্য জ্ঞান বুঝিয়েছিলেন। শ্রী মনু মহর্ষিকেও তত্ত্বজ্ঞান বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমনু পরমেশ্বরের জ্ঞানকে অসত্য মেনে শ্রী ব্রহ্মার কাছ থেকে বেদ জ্ঞান শুনে নিজেই নিষ্কর্ষ বের করে তাতে দৃঢ় থাকেন। এবং পরমেশ্বর সতসুকৃত জীর উপহাস করতে থাকেন। বলতে লাগলেন যে, "আপনি তো সর্ব বিপরীত জ্ঞান বলছেন।” এইজন্য পরমেশ্বর সতসুকৃত জীর নাম 'বামদেব" বা “বামদেব ঋষি” রাখলেন। (বাম - এর অর্থ হল উল্টো,বিপরীত,যেমন বাঁ হাত কে বায়া অর্থাৎ উল্টোহাত বলা হয়,আর ডান হাতকে সোজা হাত বলা হয়।)

এই প্রকার সত্য যুগে পরমেশ্বর কবির্দেব যিনি (সতসুকৃত নামে এসেছিলেন) ঐ সময়ের সাধক ও ঋষিদের বাস্তবিক জ্ঞান বোঝাতেন। কিন্তু তারা স্বীকার করেননি, বরং সতসুকৃত নামের বদলে পরমেশ্বরকে বামদেব নামে ডাকতেন।

এইজন্য যজুর্বেদ অধ্যায় ১২ মন্ত্র ৪ এ বিবরণ আছে যে, যজুর্বেদের বাস্তবিক জ্ঞানকে বামদেব ঋষি ভালো বুঝেছিলেন ও অন্যদের বুঝিয়েছিলেন।পবিত্র বেদের জ্ঞানকে বোঝার জন্য দয়া করে বিচার করুন :- যেমন যজুর্বেদ একটি পবিত্র পুস্তক,এর বিষয়ে কোন কোন সংস্কৃত ভাষাতে বিবরণ আছে, যজুঃ বা যজুম ইত্যাদি শব্দ লেখা আছে। তাহলেও তা যজুর্বেদ-ই বোঝায়। এরকমই পরমাত্মার আসল নাম কবির্দেব। একে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে কবীর সাহেব, কবির পরমেশ্বর বলা হয়েছে। কোন কোন শ্রদ্ধালু ভক্তজনের মনে প্রশ্ন আসে,কবিরকে কিভাবে কবীর বলেছেন? ব্যাকরণের দৃষ্টি থেকে কবিঃ-এর অর্থ সর্বজ্ঞ হয়। দাসের প্রার্থনা এই যে, প্রত্যেক শব্দের কোনো না কোনো অর্থ তো হয়ই। রইলো কথা ব্যাকরণের।তো ভাষা

প্রথম আসে, কারণ বেদ বাণী প্রভু দ্বারা বলা হয়েছে এবং ব্যাকরণ পরে ঋষিদের দ্বারা তৈরি হয়েছে। এটা ত্রুটি যুক্ত হতে পারে। বেদের অনুবাদে বিভিন্ন ভাষায় ব্যাকরণে অসঙ্গত এবং বিরুদ্ধ ভাব আছে। কারণ বেদবাণী মন্ত্রের দ্বারা পদ্য আকারে নির্মিত। যেমন পলবল শহরকে আশে-পাশের লোকেরা পরবর বলে। যদি কেউ বলে পলবল কে পরবর কিভাবে বলা হলো? এইরকমই কবিরকে কবীর কিভাবে বলা হয়েছে, এটা কেবল বলার জন্য। যেমন ক্ষেত্রীয় ভাষাতে পলবল শহরকে পরবর বলা হয়, সেই রকমই। কবির কে কবীর বলা হয়। প্রভু ঐ একই। মহর্ষি দয়ানন্দ জী "সত্যার্থ প্রকাশ" সমুল্লাস ৪ পৃষ্ঠা নং-১০০ (দয়ানন্দ মঠ দীনানগর পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত)তে "দেবৃকামা"- এর অর্থ দেবরের কামনা করেছে। দেবৃ-কে পুরো 'র'লিখে "দেবর" করেছে। কবির্ কে কবির আবার অন্য ভাষাতে কবীর লিখতে বা বলতে কোন আপত্তি বা ব্যাকরনের ত্রুটি নেই। পূর্ণ পরমাত্মা'ই কবির্দেব এই প্রমাণ যজুর্বেদ অধ্যায় ২৯ মন্ত্র নং. ২৫ এবং সামবেদ সংখ্যা ১৪০০ তেও আছে, যা নিম্নে দেওয়া হলঃ-

যজুর্বেদে অধ্যায় নং. ২৯ শ্লোক নং. ২৫

(সন্ত রামপাল দাস দ্বারা ভাষাভাষ্য)

সমিদ্ধোৎঅদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্বম্ দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ॥ ২৫॥

সমিদ্ধ :- অদ্য - মনুষঃ - দুরোণে - দেবঃ - দেবান্ - যজ্ - অসি - জাতবেদঃ - আ - চ - বহ্ - মিত্রমহঃ - চিকিত্বান্ - ত্বম্ - দূতঃ - কবির্ - অসি - প্রচেতাঃ

অনুবাদ - (অদ্য) আজ বা বর্তমানে (দুরোনে) শরীর রূপ মহলে দুরাচার পূর্বক (মনুষঃ) মিথ্যা পূজাতে লীন মননশীল ব্যক্তিগনকে (সমিদ্ধঃ) লাগানো আগুন অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি ছাড়া বর্তমানের পূজা ক্ষতিকারক, সেই স্থানে (দেবান) দেবতাদের (দেবঃ) দেবতা (জাতবেদঃ) পূর্ণ পরমাত্মা সত্ পুরুষের বাস্তবিক (যজ) পূজা (অসি) হওয়া উচিত। (আ) দয়ালু (মিত্রমহঃ) জীবের বাস্তবিক সাথী পূর্ণপরমাত্মা নিজেই (চিকিত্বান) তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ সত্য, সঠিক ভক্তিকে (দূতঃ) সংবাদবাহক রূপে (বহ্) নিয়ে আসেন (চ) তথা (প্রচতাঃ) বোধজ্ঞান করান (ত্বম), তিনিই (কবিরসি) কবীরদেব বা কবীর পরমেশ্বর।

ভাবার্থ - যে সময় পূর্ণ পরমেশ্বর প্রকট হন ওই সময় সর্ব ঋষি ও সাধু শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জী আচরণ বা পূজার দ্বারা সমস্ত ভক্ত সমাজকে মার্গ দর্শন করান। তখন পরমেশ্বর নিজের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের বার্তাবাহক হয়ে স্বয়ং কবির্দেব অর্থাৎ কবীর প্রভুই আসেন।

সংখ্যা নং. ১৪০০ সামবেদ উতার্চিক অধ্যায় নং ১২ খন্ড নং ৩ শ্লোক ৫

(সন্তরাম পাল দাস দ্বারা ভাষ্য) :-

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্য দেবা জ্ঞানো মহান কবির্নিব চনানি শংসন।
আ চস্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষনো জাগৃবির্দেববীতৌ॥

ভদ্রা - বস্ত্রা - সমন্যা - বসানঃ - মহান্ - কবির - নিবচনানি - শংসন্ - আবচ্যস্ব - চস্বো:পুয়মানঃ - বিচক্ষণ: - জাগৃবি - দেব বিতৌ ।

অনুবাদ – (বিচক্ষণ:) চতুর ব্যক্তিরা (আবচ্যস্ব) নিজের বচন দ্বারা বলে আমরা যে প্রবচন করছি তা অনুসরন করো। চতুর ব্যক্তিরা পূর্ণ ব্রহ্মের পূজা না বলে অন্য

উপসনার মার্গদর্শন করিয়ে অমৃতের স্থানে (পূয়মানঃ) আন উপসনা রূপী পূজ (মবাদ) (যেমন ভূত পূজা, পিতর পূজা, তিনগুন (রজোগুন-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন-বিষ্ণু, তমোগুন-শিব, শংঙ্কর) তথা কাল পর্যন্ত পূজা কে (চম্বো) আদরের সহিত আচমন করাচ্ছেন। তখন শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভুল জ্ঞান কে সমাপ্ত করার জন্য (ভদ্রা) পরম সুখ দায়ক (মহান কবির) মহান কবির অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা কবীর (বস্ত্রা) স্বশরীরে সাধারন বেশ ভূষায় (বস্ত্রের অর্থ বেশ ভূষা, সন্ত মতে চোলাও বলা হয়। চোলার অর্থ শরীর, যদি কোন সন্তের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে বলে চোলা ছেড়ে গিয়েছেন)(সমন্যা) নিজের সতলোকের শরীরের মত অন্য হালকা তেজপুঞ্জের শরীর ধারন করে (বসানঃ) সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করে অতিথির মত কিছুদিন এই সংসারে বাস করে (নিবচনানি) নিজের কবীর বাণী-লোক গীত ইত্যাদির মাধ্যমে সতজ্ঞান (শংসন) বর্ণনা করে (দেব) পূর্ণ পরমাত্মা (বিতৌ) লুকানো সর্গুন নির্গুন জ্ঞান রূপী ধনকে (জাগৃবিঃ) জাগ্রিত করেন।

ভাবার্থ:- যেমন যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১-এ বলা হয়েছে যে,অগ্নেঃ তনুঃ অসি = পরমেশ্বর সশরীর যুক্ত। বিষ্ণুবে ত্বা সোমস্য তনুঃ অসি = ঐ অমর প্রভুর পালন পোষণ করার জন্য অন্য শরীর আছে, যিনি অতিথি রূপে কিছুদিন সংসারে আসেন,তত্ত্বজ্ঞানের অজ্ঞান নিদ্রাতে শুয়ে থাকা প্রভু প্রেমিকদের জাগান। ঐ প্রমাণ এই মন্ত্রে আছে যে, কিছু সময়ের জন্য পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দের অর্থাৎ কবীর প্রভু নিজের রূপ পাল্টে সামান্য ব্যক্তির রূপ ধরে পৃথিবী মন্ডলের উপর প্রকট হন এবং কবির্নিবচনানি শংসন্ অর্থাৎ কবির্বাণী বলেন। যার মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান কে জাগান এবং ঐ সময় মহর্ষি উপাধি প্রাপ্ত চতুর প্রাণী মিথ্যা জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্ত্রবিধি অনুসার সত্য সাধনা রূপী অমৃতের স্থানে শাস্ত্র বিরুদ্ধ মবাদ (পুঁজ) কে শ্রদ্ধার সাথে পূজা করতে থাকেন। ঐ সময় পূর্ণ পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকট হয়ে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনার জ্ঞান প্রদান করেন।

যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১

অগ্নেঃ তনুঃ অসি। বিষ্ণুবে ত্বা সোমস্য তনুঃ অসি। বিষ্ণবে ত্বা অতীথেঃ অতীথ্যম্অসি। বিষ্ণবে ত্বা শ্যেনায়, ত্বা সোম ভৃতে বিষ্ণবে ত্বা অগ্নয়ে ত্বা রায়ঃ পোষদে বিষ্ণবে ত্বা। (১)

অনুবাদ :- এই মন্ত্রতে পরমেশ্বরের দুইটি স্থিতির বর্ণনা আছে। একটি স্থিতিতে পরমেশ্বর উপরের লোকে তেজোময় শরীর যুক্ত। দ্বিতীয় স্থিতিতে পরমেশ্বর ঋষি অথবা সন্তের বেশভূষায় সাধারণ ব্যক্তির মতো শরীর ধারণ করে সকল আত্মাদের কে সামলান। যেমন অতিথি অথবা মেহমান আসে। অতিথি-এর ভাবার্থ হল এই যে যার আসার তিথি পূর্ব নির্ধারিত হয় না। ওই পরমাত্মার অতিথিরূপে আসারও দুটি কারণ অর্থাৎ স্থিতি আছে যেমন :-

১. পরমাত্মা কিছু সময় সংসারের মধ্যে থেকে সাধারণ ব্যক্তির মতো জীবন যাপন ক'রে নিজের তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেন। যেমন পরমেশ্বর কবীর রূপে প্রকট হয়ে বানারস (কাশী) শহরে ১২০ বছর ছিলেন। হঠাৎ পদ্মফুলের উপর শিশু রূপে প্রকট হন, তারপর লীলা করতে করতে একশো কুড়ি বছর এই সংসারে অতিথি রূপে থেকে সশরীরে সতলোকে (নিজ স্থানে) চলে যান। দ্বিতীয় স্থিতি এইরকম যে, "পরমাত্মা হঠাৎ সাধু-সন্ত অথবা ঋষি রূপে অথবা অন্য সাধারণ মানব রূপে প্রকট হয়ে নিজের বিশেষ ভক্তকে দর্শন দেন। তাকে তত্ত্বজ্ঞান বোঝান এবং নিজের সতলোক দর্শন করিয়ে পুণরায় ছেড়ে দেন। তারপর সেই পরম ভক্ত ওই পূর্ণ পরমাত্মার চোখে দেখা মহিমার বর্ণনা করতে থাকে। একে বাজপাখি অথবা অলল পক্ষীর মত ক্রিয়া বলা

হয়েছে। যেমন বাজপাখি অতি দ্রুত অন্য পাখির উপর আক্রমণ করে এবং তাকে নিয়ে শীঘ্রই চলে যায়। একইভাবে এক অলল (আকাশের বায়ুতে থাকা পাখি) পক্ষীর সাথে এর তুলনা করা হয়েছে। যে খুব দ্রুত নিচে চলে আসে এবং হাতিদেরকে তুলে শীঘ্রই আকাশে উড়ে যায়। যেমন পরমাত্মা হঠাৎ প্রকট হয়ে নানক দেবকে বেঈ নদীতে দেখা দেন এবং ওনাকে সচখণ্ড অর্থাৎ সতলাকের দর্শন করিয়ে তৃতীয় দিনে হঠাৎ পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়ে যান। এরপর সন্ত নানক দেব পূর্ণ পরমাত্মার স্বচক্ষে দেখা মহিমা, তাঁর অমৃতবাণীতে গুরুগ্রন্থ সাহেব-এর মহলা-পহলা-তে বিদ্যমান আছে। একইরকম ভাবে ১৭২৭ সালে সন্ত গরীব দাস জী মহারাজকে ‘হরিয়াণা’ প্রান্তের ‘ঝজ্জর’ জেলার অন্তর্গত ‘ছুড়ানি’ গ্রামের ‘নলা’ নামক ক্ষেতে পরমেশ্বর জিন্দা মহাত্মা (একজন সন্ত) রূপে এসে দর্শন দিয়েছিলেন। সতলোক দেখিয়ে ওই দিনই পুনরায় পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর সন্ত গরীব দাস সাহেব জী চোখে দেখা পরমাত্মার মহিমার বিবরণ বর্ণনা করেছেন। যা ওনার অমৃতবাণীতে সদগ্রন্থ “বাণী গরীবদাস”-তে বিদ্যমান আছে। একই ভাবে সন্ত দাদু সাহেব জী-কেও দর্শন দিয়েছিলেন। সন্ত মুলুক দাস সাহেবকেও দর্শন দেন। হজরত মহম্মদ সাহেবকে দর্শন দেন। রাজা আব্রাহিম অধম সুলতানকে দর্শন দেন। অন্য আরও অনেক মহাত্মাগণকে পূর্ণ প্রভু অতিথি রূপে এসে দ্বিতীয় বিধিতে দর্শন দেন এবং নিজের যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান (তত্ত্ব জ্ঞান) প্রচার করেন এবং নিজের আত্মাগণের কল্যাণ করেন। আচার্য স্বামী রামানন্দ জী-কে দর্শন দেন এবং ওনাকেও সতলোকের দর্শন করান। আচার্য স্বামী রামানন্দ জী স্বচক্ষে দেখা পূর্ণ পরমাত্মা করীব জীর মহিমা বর্ণনা করেছেন।

দোহূ ঠৌর হৈ এক তু ভয়া এক সে দো। হে কবীর হম কারণে আয়ে হো মগ জোয়।

স্বামী রামানন্দ জী বললেন, হে কবীর পরমেশ্বর! আপনি উপরে তেজোময় শরীরে এবং এখানেও দুই জায়গায় তো আপনিই বিদ্যমান! আমাদের জন্য আপনি এতটা রাস্তা অতিক্রম করে এসেছেন।

(অগ্নেঃ) স্বপ্রকাশিত পরমেশ্বর (তনুঃ) সশরীর (অসি) যুক্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর তেজোময় শরীর সহিত আছেন। (বিষ্ণবে) পালন পোষণ করার জন্য অর্থাৎ সর্বলোকের আত্মাগণের প্রয়োজনীয়তা পূর্তির জন্য (ত্বা) ওই (সৌমস্য) অমর পুরুষের অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মার (তনুঃ) শরীর (অসি) বিদ্যমান। সোমপুরুষ অর্থাৎ অমর প্রভু তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের পালন-পোষণ করেন। তিনি অতিথি রূপে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ হঠাৎ প্রকট হন। {যার আগমনের তিথি পূর্ব নির্ধারিত হয় না, তাকে অতিথি বা মেহমান বলা হয়।} (ত্বা) ওই পরমেশ্বরের (বিষ্ণবে) তিন লোকে প্রবেশ করে পালন পোষণ করার জন্য আগমন হয়ে থাকে। (অতিথি) অতিথি রূপে প্রকট পরমেশ্বর (অতিথ্যম্) অতিথিয়ন অর্থাৎ পূজার যোগ্য (অসি) হন। (ত্বা) ওই পরমাত্মার আগমন (বিষ্ণবে) পালন করার জন্য (সোমভৃতে) অমর সুখ প্রদান করার জন্য অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ মার্গ প্রদান করে ভক্তি রূপী অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করার জন্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক তো (ত্বা) ওই পরমাত্মার আগমন (বিষ্ণবে) কিছু সময় সংসারে ব্যতীত করার জন্য অর্থাৎ সংসারে মানুষের মতো লীলা করে জীবন যাপন করে পূণ্যাত্মাগণকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করার জন্য এবং সকল সুবিধা প্রদান করার জন্য হয়ে থাকে। যেমন পরমেশ্বর চার যুগে লীলা করার জন্য শিশু রূপে প্রকট হয়ে সময় অনুসারে সাধারণ ব্যক্তির মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কিছু

সময় সংসারে থাকেন। কলিযুগে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর নামে কাশী শহরে পদ্ম ফুলের উপর ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকট হয়েছিলেন এবং ১২০ বছর পর্যন্ত থেকেছেন।তারপর সশরীরে সতলোকে ফিরে গেছেন। দ্বিতীয়ত (ত্বা) ওই পরমাত্মার আগমন (শ্যেমান) শ্যেন পাখির মত শীঘ্র ফিরে যাওয়ার জন্য হয় যেমন বাজ পাখী ও অলল পাখী নিজের আহারের জন্য দ্রুত আক্রমণ করে এবং তাকে ধরে শীঘ্রই ফিরে যায়। এইভাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরমাত্মা অজ্ঞান নিদ্রায় শুয়ে থাকা ব্যক্তিদেরকে জাগানোর জন্য হঠাৎ প্রকট হন। নিজের বিশেষ ভক্তদেরকে তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ দেন। তাদেরকে নিজের সাথে নিজের নিজধাম সতলোকে নিয়ে যান। ওখানে সমস্ত দৃশ্য দেখিয়ে ভক্তকে পুনরায় পৃথিবী লোকের উপর ছেড়ে দেন। তারপর ওই পরমাত্মা প্রাপ্ত ভক্ত নিজ চোখে দেখা পরমাত্মার মহিমার বর্ণনা করতে থাকে। যেমন সন্ত নানক জী-কে বেঈ নদীতে দর্শন দেন। ওনাকে সচ্চখণ্ড অর্থাৎ সতলোকে নিয়ে যান। তিনদিন পর ওই নদীতে পুনরায় ছেড়ে দেন। যেমন সন্ত গরীব দাস জীর সাথে হরিয়ানা প্রান্তের ঝজ্জর জেলার ছুড়ানি গ্রামে এসে সাক্ষাৎ করেন এবং ওনাকে সতলোকে নিয়ে যান এবং কিছু ঘন্টা পর পুনরায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেন। উপরোক্ত দুজন মহত্মাই পরমেশ্বরের মহিমা নিজ চোখে দেখা স্থিতি বর্ণনা করেছেন। যা দুজন সন্তের অমৃত বাণীতে বিদ্যমান আছে। (ত্না) ওই সমর্থ পরমেশ্বরের লীলা এই যে তিনি (অগ্নয়ে) স্বপ্রকাশিত থাকার জন্য লীলা করেন। (ত্বা) ওনার (বিষ্ণবে) সমস্ত লোকে প্রবেশ করে পালন-পোষণ করার জন্যই আগমন হয়ে থাকে। (রায়া পোষদে) ওই কুল মালিক হলেন সকলের পালন কর্তা। সমস্ত লীলা নিজের প্রাণীদের সমৃদ্ধি করার জন্যই করেন।

পবিত্র ঋগ্বেদের নিম্নের মন্ত্রেও পরিচয় দিয়ে বলেছে পূর্ণ পরমাত্মা শিশু রূপ ধারণ করে কিছু সময়ের জন্য সংসারে লীলা করতে আসেন। ওই পূর্ণপরমাত্মার লালন-পালন (অধন্য ধেনবঃ) কুমারী গাভী দ্বারা হয় এবং লীলা করতে করতে বড় হয়ে সতলোক প্রাপ্তির অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ মার্গের তত্ত্বজ্ঞান (কবির্গির্ভিঃ) কবীর বাণী দ্বারা কবিতার মাধ্যমে বলেন। যার কারণ তাকে প্রসিদ্ধ কবি বলা হয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং কবীরদেব। পূর্ণ পরমাত্মা তৃতীয় মুক্তি ধামে সতলোকে থাকেন।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯ এবং সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭-১৮

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯

অভী ইমং অধন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম। সোম মিন্দ্রায় পাতবে॥ ৯॥

অভী-ইমম্-অধন্যা উত শ্রীনন্তি ধেনবঃ শিশুম্ সোমম্ ইন্দ্রায় পাতবে॥ ৯॥

অনুবাদ:- (উত) বিশেষ করে (ইমম) এই (শিশুম্) বালক রূপে (সোমম্) পূর্ণ পরমাত্মা অমর প্রভুর (ইন্দ্রায়) সুখ সুবিধা অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া দ্বারা শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই (পাতবে) বৃদ্ধির জন্য (অভি) পূর্ণ ভাবে (অধন্যাঃ ধেনবঃ) কুমারী গায় এর দুধ দ্বারা (শ্রীণন্তি) পালিত হয় (যে গাই কোনোদিন ষাঁড়ের সংস্পর্শে আসেনি)।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা অমর পুরুষ যখন লীলা করার জন্য বালক রূপ ধারণ করে স্বয়ং প্রকট হন তখন কুমারী গাভী নিজের থেকে দুধ দেয়। তার দ্বারাই প্রভুর লালন পালন হয়।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭

শিশুম্ যজ্ঞানম্ হর্য তম্ মৃজন্তি শুম্ভন্তি বহ্নিমরুতঃ গণেন।
কবির্গীর্ভি কাব্যেনা কবির্ সন্ত্ সোমঃ পবিত্রম্ অত্যেতি রেভন॥ ১৭॥

অনুবাদ :- পূর্ণ পরমাত্মা (হর্য শিশুম) মানুষের বাচ্চার রূপে (যজ্ঞানম) জেনে বুঝে প্রকট হন এবং নিজের তত্ত্বজ্ঞান কে (তম) ওই সময় (মৃজন্তি) নির্মলতার সাথে (শুম্ভন্তি) উচ্চারন করেন। (বহিন) প্রভু প্রাপ্তির জন্য বিরহের আগুনে জ্বলা ভক্ত (গনেন) সমুহের জন্য (মরুতঃ) বাতাশের মত শীতল (কাব্যেনা) কবিতা দ্বারা (পবিত্রম অত্যেতি) অত্যাধিক নির্মলতার সাথে (কবির গীর্ভি) কবির বাণী (রেভন) উচ্চ স্বরে সম্বোধন করে বলেন (কবির সন্ত্ সোম:) ওই অমর পুরুষ অর্থাৎ সত পুরুষই সন্ত অর্থাৎ ঋষি রূপে স্বয়ং কবীরদেবই হন। কিন্তু ওই পরমাত্মাকে না চিনতে পেরে কবি বলতে লাগে।

ভাবার্থ :- বেদ জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলছেন যে, নিঃসন্দেহে মানবের বাচ্চা রূপে প্রকট হয়ে পূর্ণ পরমাত্মা কর্বিদেব কবির্গির্ভিঃ অর্থাৎ কবীরবাণী দ্বারা নির্মল জ্ঞান নিজের হংস আত্মাদের বা পুণ্য আত্মাদের কবিরূপে কবিতা ও লোকোক্তি দ্বারা উচ্চারণ করে বর্ণনা করেন। উনি স্বয়ং সতপুরুষ কবীর পরমেশ্বরই হন।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৮

ঋষিমনা য ঋষিকৃত স্বর্ষাঃ সহস্রণীথঃ পদবীঃ কবিনাম।

তৃতীয়ম্ ধাম্ মহিষ: সিষা সন্ত্ সোমঃ বিরাজমানু রাজতি স্টুপ্॥ ১৮॥

অনুবাদ :- বেদ বক্তা ব্রহ্ম বলছেন (য) যে পূর্ণ পরমাত্মা মানুষের বাচ্চা রূপে এসে (কবীনাম্) প্রসিদ্ধ কবির (পদবী) উপাধি প্রাপ্ত করে অর্থাৎ সাধু, সন্ত, ঋষিদের মত অভিনয় করে, ওই(ঋষিকৃত) সন্ত রূপে প্রকট প্রভু দ্বারা রচনা করা (সহস্রণীথঃ) হাজার হাজার বাণী (ঋষিমনা) সন্ত স্বভাবের ব্যক্তি অর্থাৎ ভক্তদের জন্য (স্বর্ষাঃ) স্বর্গ তুল্য আনন্দ দায়ক হয়। (সোম) সন্ত রূপে প্রকট ওই অমর পুরুষই কবির্দেব। এই পূর্ণ প্রভু (তৃতীয়া) তৃতীয় (ধাম) মুক্তি ধামে অর্থাৎ সত্ লোকের (মহিষঃ) সুদৃঢ় পৃথিবীকে (সিষা) স্থাপিত করে (অনু) মানব সাদৃশ্য সন্ত রূপে (স্টুপ) গুম্বজের উপর উঁচু সিংহাসনে মানব সদৃশ্য (বিরাজমনু রাজতি) উজ্জ্বল স্থুল আকারে বিরাজমান।

ভাবার্থ:- মন্ত্র ১৭ তে বলেছে কবির্দেব শিশু রূপ ধারণ করে লীলার মাধ্যমে বড় হন। কবিতার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করার কারণে কবি উপাধি প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ সাধারণ জনসমুদয় তাঁকে কবি বলতে শুরু করে। বাস্তবে তিনি পূর্ণ পরমাত্মা কবীর প্রভু। ওনার দ্বারা রচিত অমৃতবাণী কবীর বাণী (কবির্গিরঃ অর্থাৎ কবির্বাণী) বলা হয়। যা ভক্তদের কাছে স্বর্গতুল্য সুখদায়ক হয়। ঐ পরমাত্মা তৃতীয় ধাম অর্থাৎ সত লোকের স্থাপনা করে গুম্বদ বা গম্বুজের উপর সিংহাসনে তেজোময় মানব সদৃশ্য শরীরে বিরাজমান আছেন।

এই মন্ত্রে তৃতীয় ধাম সতলোককে বলা হয়েছে। যেমন এক ব্রহ্মলোক যা ২১ টি ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত, দ্বিতীয় পরব্রহ্মের লোক যা সাতসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত তৃতীয় পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের ঋত্ধাম অর্থাৎ সতলোক।

"ত্রেতা যুগে কবির্দেব (কবীর সাহেব) মুনিন্দ্র নামে প্রকট হয়েছিলেন"
"নল ও নীলকে শরণে নেওয়া"

ত্রেতাযুগে স্বয়ম্ভু (যিনি স্বয়ং প্রকট হন) কবির্দেব কবীর পরমেশ্বর রূপান্তর করে মুনিন্দ্র ঋষি নামে প্রকট হয়েছিলেন। অনল অর্থাৎ নল এবং অনিল অর্থাৎ নীল নামে দুই মাসতুতো ভাই ছিল। তাদের মাতা পিতার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। নল ও নীল

দুইজনে শারীরিক ও মানসিক রোগে অত্যাধিক কষ্ট পাচ্ছিল। সর্ব ঋষি সন্তের কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু সর্বঋষি ও সন্তরা বলেছিলেন যে, এটা তোমাদের প্রারব্ধ পাপকর্মের ফল, এটা ভোগ করতেই হবে। এর কোন সমাধান নেই। দুই ভাই নিরাশ হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল।

একদিন দুই ভাইয়ের মুনিন্দ্র নামে প্রকট পূর্ণ পরমাত্মার সৎসঙ্গ শোনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। সৎসঙ্গ শোনার পর দুজনে পরমেশ্বর কবির্দেব (কবীর সাহেব) অর্থাৎ মুনিন্দ্র ঋষির চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে। পরমেশ্বর মুনিন্দ্র ঋষি তাদের মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখতেই তাদের অসাধ্য রোগ ছুমন্ত্র হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা সুস্থ হয়ে যায়।এমন অদ্ভুত চমৎকার দেখে তারা প্রভুর চরণ ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে আর বলে, আজ আমরা আসল প্রভু পেয়ে গেছি। যার খোঁজ এতদিন করছিলাম। এরপর নল ও নীল মুনিন্দ্র জীর কাছে নাম উপদেশ নিয়ে ওনার সাথেই থাকতে লাগে। পূর্বে জলের সহজ লভ্যতার জন্য নদীর ধারে সন্ত সমাগম বা সৎসঙ্গ করা হতো। নল এবং নীল দুজনে প্রভুপ্রেমী ও অত্যন্ত সরল মনের আত্মা ছিল। পরমাত্মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সেবাও করত খুব। সৎসঙ্গের দিনে (সমাগমে) যে সমস্ত বৃদ্ধ, রোগী, বিকলাঙ্গ ভক্তজন আসত নল ও নীল তাদের থালা-বাসন,কাপড় পরিষ্কার করে দিত। কিন্তু ছিল খুবই সাদাসিধা। জিনিসপত্র ধোয়ার সময় সৎসঙ্গে শোনা প্রভুর চর্চায় বিভোর হয়ে যেত। আর ধোয়া কাপড়চোপড়,বাসনপত্রের প্রতি লক্ষ্য না থাকায় তা নদীর জলে ডুবে যেত। কারোর চারটি জিনিস নিয়ে গেলে ফেরত দিত দুটি। ভক্তজন বলত, ভাই তোমরা সেবা তো করছো অনেক,কিন্তু আমাদের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। হারানো জিনিসপত্র আমরা কোথা থেকে পাব। তোমরা আমাদের সেবা ছেড়ে দাও, আমরা নিজেদের সেবা নিজেরাই করে নেব। এই কথা শুনে নল ও নীল কান্না শুরু করে দিত। আর বলত আমাদের সেবা থেকে বঞ্চিত করো না। তোমাদের জিনিস আর কখনো হারাবো না। কিন্তু আবার প্রভু চার্চায় লেগে যেত, জিনিসপত্র পূর্বের ন্যায় জলে ডুবে যেত। ভক্তজনরা মুনিন্দ্র ঋষির কাছে প্রার্থনা করেন যে, হে গুরুদেব! দয়া করে নল-নীল কে বোঝান। সেবা করতে মানা করলে কান্না শুরু করে। কিন্তু আমাদের অর্ধেক জিনিস নদীতে ফেলে আসে। নদীর তীরে সৎসঙ্গে শোনা প্রভুর চর্চায় বিভোর হয়ে যায়,আর জিনিসপত্র নদীতে ডুবে যায়। মুনিন্দ্র জী দুই একবার তো তাদের বোঝান। কিন্তু তারা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। বলে,সাহেব আমাদের সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন না। মুনিন্দ্র সাহেব জী বললেন, "পুত্র! খুব সেবা করো, আজ থেকে তোমাদের হাতে কোন বস্তু,তা সে লোহা হোক, কিংবা পাথর, জলে ডুববে না।" মুনিন্দ্র সাহেব তাদেরকে এই আশীর্বাদ দিলেন।

আপনারা রামায়ণে শুনেছেন, একসময় সীতা-মাতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে যায়। ভগবান রামচন্দ্র জানেন না কে সীতাকে হরণ করেছে। শ্রীরামচন্দ্র চারিদিকে খোঁজ করতে থাকেন। হনুমান জী খোঁজ করে বলেন যে, লঙ্কাপতি রাবণ (রাক্ষস) সীতা মাতাকে বন্দী করে রেখেছে। খবর পেয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের কাছে শান্তি দূত পাঠান এবং প্রার্থনা করেন সীতাকে ফিরিয়ে দিতে,কিন্তু রাবণ মানে না। অবশেষে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। তখন সমস্যা দেখা দেয় লঙ্কায় যাওয়া নিয়ে, সেনারা এত বিশাল সমুদ্র পার হবে কিভাবে?

ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তিন দিন পর্যন্ত হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সমুদ্রের

কাছে প্রার্থণা করেন। কিন্তু সমুদ্রের কোন পরিবর্তন না দেখে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে অগ্নিবান দ্বারা জ্বালাতে চাইলেন। তখন সমুদ্র ভয়-ভীত হয়ে ব্রাহ্মণের রূপ ধরে ভগবান রামচন্দ্রের সামনে এসে বলেন, হে ভগবান! সকলের নিজের একটা মর্যাদা আছে। আমাকে জ্বালিও না। আমার ভিতরে না জানি কত জীবজন্তু বাস করে। আপনি আমাকে জ্বালিয়ে দিলেও আমাকে পার করতে পারবেন না। কারণ এখানে খুব গভীর গর্ত হয়ে যাবে, যা আপনি কখনো পার করতে পারবেন না।

ব্রাহ্মণ বেশে সমুদ্র বললেন, ভগবান! এমন একটা উপায় বার করুন যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, আমার মর্যাদাও রক্ষা পায়। আর আপনার সেতু তৈরি হয়ে যায়। তখন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সমুদ্র কে জিজ্ঞাসা করেন, তা কি করে সম্ভব তখন ব্রাহ্মণ রূপে থাকা সমুদ্র বললেন যে, আপনার সেনাতে নল আর নীল নামে দুই সৈনিক ভাই আছে। তাদের কাছে তাদের গুরুদেবের দেওয়া এমন একটি শক্তি আছে যে, তাদের হাত থেকে পাথরও জলে ফেলে দিলে ভাসে, প্রত্যেক বস্তু তা সে লোহা হোক না কেন জলে ডোবে না। শ্রী রামচন্দ্র নল ও নীল ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে কি এমন শক্তি আছে? নল ও নীল বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ! আমাদের হাতে পাথরও জলে ডোবে না। রামচন্দ্র বলেন, পরীক্ষা করা হোক।

নির্বোধ নল ও নীল চিন্তা করে,আজ সকলের সামনে আমাদের অনেক মহিমা হবে। ঐ দিন তারা নিজেদের গুরুদেবকে স্মরণ করে না। ভাবে, শ্রীরামচন্দ্র ভাববেন যে, তাদের কাছে কোন শক্তি নেই,এরা তো অন্য কারো কাছে শক্তি চাইছে। তারা পাথর উঠিয়ে জলে ফেলতেই তা ডুবে যায়। অনেক চেষ্টা করল কিন্তু তাদের ফেলা পাথর ভাসলো না। তখন রামচন্দ্র সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে (এমন ভাব করেন যেন সমুদ্র মিথ্যা কথা বলছে) বলেন, এদের কাছে তো কোন শক্তি নেই। তখন সমুদ্র নল ও নীল কে বলেন, হে মূর্খ! আজ তোমরা তোমাদের গুরুদেবকে স্মরণ করোনি। তোমরা তোমাদের গুরুদেব কে স্মরণ করো। তখন নল-নীল নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে গুরুদেবকে (মুনিন্দ্র জীকে) স্মরণ করে। তখন সদগুরু মুনিন্দ্র জী সেখানে উপস্থিত হয়ে যান। শ্রী রামচন্দ্র বলেন, হে ঋষিবর! আমার দুর্ভাগ্য যে আপনার সেবকদের হাতে পাথর ভাসছে না। মনিন্দ্র সাহেব বললেন, আজ থেকে ওদের হাতে ভাসবেও না। কারণ ওদের মনে অহংকার এসে গেছে। সদগুরুর বাণী প্রমাণ করে :-

গরীব, জৈসে মাতা গর্ভ কো, রাখে জতন বনায় ।
ঠেস লগে তো ক্ষীন হোবে, তেরী এইসে ভক্তি জায়।

ঐদিন থেকে নল ও নীলের শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। শ্রী রামচন্দ্র মুণিন্দ্র সাহেব কে বলেন যে, হে ঋষিবর! আমি খুব বিপদে পড়েছি, কৃপাকরে কোন ভাবে সেনা ওপারে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। যদি আপনি আপনার সেবককে শক্তি দিতে পারেন তাহলে আমাকেও একটু দয়া করুন। মুনিন্দ্র সাহেব বললেন, সামনে যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে আমি ঐ পাহাড়ের চারিদিকে রেখা টেনে দিয়েছি রেখার মাঝখানের পাথর জলে ডুববে না। শ্রী রামচন্দ্র পরীক্ষা করার জন্য একটি পাথর আনিয়ে জলে রাখলেন,সেটি ভাসতে লাগলো। নল ও নীল কারিগরও (শিল্পী কার) ছিল। হনুমান প্রতিদিন ভগবানকে স্মরণ করতেন। উনি নিজের দৈনিক ক্রিয়া চালু রাখার জন্য পাথরের উপর রাম রাম লিখতে থাকেন, আর পাহাড় ভেঙে নিয়ে আসতে থাকেন। নলও নীল তা জোড়া লাগিয়ে পুল (সেতু) বানায়। এইভাবে সেতু তৈরি হয়। ধর্মদাস জী বলেন:-

রহে নল নীল জতন কর হার, তব সতগুরু সে করী পুকার।
জা সত্ রেখা লিখী অপার, সিন্ধু পর শিলা তিরানে বালে।
ধন-ধন সতগুরু সত কবীর, ভক্ত কী পীর মিটানে বালে॥

কেউ বলে হনুমান পাথরের উপরে রামের নাম লিখে দিয়েছিল, সেই জন্য পাথর জলে ভাসছিল । কেউ বলে নল ও নীল পুল তৈরী করেছিল। কেউ বলে শ্রীরাম পুল তৈরী করেছিল। কিন্তু এই সত্য কথা এই রকম, যেমন আপনাকে উপরে বলা হয়েছে ।

সত্ কবীর কি সাখী॥ পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮২
পীব্ পিছান কো অঙ্গ :-

কবীর, তীন দেব কো সব কোঈ ধ্যাবৈ, চৌথে দেব কা মরম ন পাবৈ।
চৌথাছাড়পঞ্চমকোধ্যাবৈ,কহৈকবীরসোহমপরআবৈ॥৩॥
কবীর, ওঁকার নিশ্চয় ভয়া, য়হ কর্তা মত জান।
সাচা শব্দ কবীর কা, পরদে মাঁহী পহচান॥ ৫11
কবীর, রাম কৃষ্ণ অবতার হৈঁ, ইনকা নাঁহী সংসার।
জিন সাহেব সংসার কিয়া, সো কিন্হুঁ ন জন্ম্যা নার॥ 7॥
কবীর, চার ভূজা কে ভজন মেঁ, ভূলি পরে সব সন্ত।
কবিরা, সুমিরো তাসু কো, জাকে ভুজা অনন্ত ॥ ২৩॥
কবীর, সমুদ্র পাট লঙ্কা গয়ে, সীতা কো ভরতার।
তাহি অগস্ত মুনি পীয় গয়ো, ইনমেঁ কো করতার॥ ২৬॥
কবীর, গোবর্ধনগিরি ধারয়ো কৃষ্ণজী, দ্রোনাগিরি হনুমন্ত।
শেষ নাগ সব সৃষ্টি সহারী, ইনমেঁ কো ভগবন্ত॥ ২৭॥
কবীর, কাটে বন্ধন বিপতি মেঁ, কঠিন কিয়া সংগ্রাম।
চিন্হোঁ রে নর প্রাণীয়াঁ, গরুড় বড়ো কী রাম॥ ২৮॥
কবীর,কহ কবীর চিত চেতহুঁ, শব্দ করৌ নিরুবার।
শ্রী রাম কী করতা কহত হৈঁ, ভূলি পরয়ো সংসার॥ ২৯॥
কবীর,জিনরামকৃষ্ণবনিরঞ্জনকিয়ো,সোতোকরতান্যার।
অন্ধা জ্ঞান ন বূঝঈ, কহৈ কবীর বিচার॥ ৩০॥

“দ্বাপর যুগে কবির্দেব (কবীর সাহেব) করুণাময় নামে প্রকট হয়েছিলেন।”

পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব) দ্বাপর যুগে করুণাময় নামে প্রকট হয়েছিলেন। ঐ সময় বাল্মিকী জাতিতে জন্ম সুদর্শন সুপচ (অনুসূচিৎ জাতির) করুণাময় প্রভুর শিষ্য ছিলেন। এই সুপচ সুদর্শনই পান্ডবদের যজ্ঞ সফল করেছিল। ঐ যজ্ঞ না তো শ্রীকৃষ্ণের ভোজন করাতে সফল হয়েছিল, না তেত্রিশ কোটি দেবতা, না আঠাশি হাজার ঋষি,বারো কোটি ব্রাহ্মণ,নয় নাথ,না চুরাশি সিদ্ধিপ্রাপ্ত ঋষিদের ভোজন খাওয়াতে। ভক্ত সুদর্শন বাল্মিকী পূর্ণ গুরু করুণাময় জীর কাছ থেকে বাস্তবিক তিন মন্ত্র প্রাপ্ত করে মর্যাদায় থেকে সত্য সাধনা করতেন।

“দ্বাপর যুগে ইন্দ্রমতি কে শরণে নেওয়া”

দ্বাপর যুগে চন্দ্র বিজয় নামের এক রাজা ছিল। তার পত্নী ইন্দ্রমতি খুব ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। সাধু মহাত্মা দের খুব আদর যত্ন করতেন। তিনি একজন গুরুদেবের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলেন।গুরুদেব বলেছিলেন একাদশীর ব্রত, মন্ত্র জপ করতে। ইন্দ্রমতি খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে ভক্তি করতেন। ওনার গুরুদেব বলেছিলেন,পুত্রী! সাধু-সন্তদের সেবা করা উচিত। সন্তকে ভোজন করালে অনেক পুণ্য হয়। সন্তদের ভোজন করালে তুই পরের জন্মেও রানী হবি এবং স্বর্গ প্রাপ্তি করবি। তাই রানী প্রতিদিন একজন সন্তকে ভোজন করানোর সিদ্ধান্ত নেন। রানী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আমি প্রতিদিন প্রথমে একজন সাধুকে ভোজন করাব, তারপর আমি ভোজন করব। এতে আমার মনে থাকবে আমি কখনো ভুলে যাবো না। তাই প্রতিদিন প্রথমে একজন সাধুকে ভোজন করাতেন, পরে তিনি ভোজন করতেন। এইভাবে বছর পেরিয়ে গেল।

একসময় হরিদ্বারে কুম্ভ মেলার সংযোগ হয়। ত্রিগুনের সমস্ত উপাসক কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নানের জন্য (পরভী নেওয়ার জন্য) প্রস্থান করে। এই কারণে কয়েক দিন ভোজন করানোর জন্য রানী কোন সন্ত পান না। রানী ইন্দ্রমতিও প্রতিজ্ঞাবসত ভোজন করেননি। চতুর্থ দিনে রাণী ইন্দ্রমতি দাসীকে বলেন,“দেখ তো কোথাও কোন সন্ত আছে কিনা। না হলে আজ তোর রানী আর জীবিত থাকবে না। আমি মরে গেলেও কোন সন্তকে ভোজন না করিয়ে খাব না।” দীন দয়াল প্রভু কবীর পরমেশ্বর নিজের পূর্বের ভক্তকে শরণে নেওয়ার জন্য না জানি কোন কারণ বানায়। দাসী ছাদের উপরে উঠে দেখে সাদা কাপড় পরা একজন সাধু এইদিকে আসছে, দাসী তাড়াতাড়ি নিচে এসে রানীকে বলে, রানী মা! একজন সাধু এই দিকে আসছে। রানী বললেন, তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আয়। দাসী মহল থেকে বাইরে গিয়ে সাধুকে প্রার্থনা করে বলে, হে মহাত্মা জী! আমার রানী মা আপনাকে ডেকেছে। করুণাময় সাহেব বলেন যে, রানী মা কেন ডেকেছেন? তার সাথে আমার কি সম্পর্ক? দাসী সমস্ত কিছু খুলে বলে। করুণাময় সাহেব বলেন, যদি রানীর প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে এখানে আসতে বল। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তুই দাসী আর সে রানী। আমি ভিতরে গেলে যদি বলে তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে? তাছাড়া রাজা যদি কিছু বলে। সন্তকে অনাদর করলে অনেক পাপ হয়। দাসী ভিতরে গিয়ে রানীকে সব কথা বলে। রানী বলেন, দাসী! আমার হাত ধর, আমি নিজে যাচ্ছি। সাধু বাবার কাছে গিয়ে রানী দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলেন, হে পরবর্দিগার ভগবান! ইচ্ছা তো করে কাঁধে বসিয়ে প্রভুকে নিয়ে যাই। করুণাময় সাহেব বললেন, পুত্রী! আমি এটাই দেখতে চাইছিলাম। শুধু নিয়ম পালনের জন্য ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করছিস, না ভক্তির জন্য? রানী নিজের হাতে রান্না করে করুণাময় সাহেবকে খাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। করুণাময় সাহেব বলেন, পুত্রী! আমার এই শরীর খাওয়ার জন্য নয়। রানী বলেন, তাহলে আমিও অন্ন গ্রহন করব না। তখন করুণাময় সাহেব অন্ন গ্রহন করেন। কেননা সমর্থ তাকে বলে যিনি যা চান তাই করতে পারেন। করুণাময় রূপে প্রকট কর্বিদেব (কবীর সাহেব) রানীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই যে সাধনা করছিস, তা কে বলেছে? রানী বলেন, এ আমার গুরুদেবের আদেশ। তোর গুরুদেব আর কি কি আদেশ দিয়েছেন। একাদশী ব্রত, মন্দিরে ও তীর্থে যাওয়া, শ্রাদ্ধ করা, সাধু সন্তদের সেবা করা ইত্যাদি। করুণাময় সাহেব বলেন, তুই যে সাধনা করছিস তাতে মৃত্যুর পর স্বর্গ, নরক, আর ৮৪ লক্ষ যোনীর কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবি না। রানী বলেন,

মহারাজ! সকল সন্ত নিজের নিজের প্রভুত্ব দেখাতে চায়। আমার গুরুদেবের বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন না। আমি মুক্ত হই বা না হই।

এখন করুণাময় সাহেব চিন্তা করেন, এই ভোলা আত্মা কে কিভাবে বোঝায়? মরতে পারে, কিন্তু যে সাধনা করছে তা ছাড়তে পারবে না। করুণাময় সাহেব বললেন, পুত্রী! যা তোর ইচ্ছা তাই কর। আমি কি তোর গুরুদেব কে গালি দিয়েছি? না কোন নিন্দা করেছি? আমি তো শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি মার্গ বলছি। এই সাধনায় তুই পার হতে পারবি না। আর না তোর ভবিষ্যতে আসন্ন কোন বিপদ কাটবে। আর শোন আজ থেকে তৃতীয় দিনে তোর মৃত্যু হবে, না তোর গুরুদেব বাঁচাতে পারবে,আর না তোর এই নকল সাধনা তোকে বাঁচাতে পারবে। (যখন মৃত্যুর কথা আসে তখন সবাই ভয় পায়) রানী চিন্তা করে সন্তরা তো মিথ্যা কথা বলে না। এমন তো নয় যে সত্যিই আমি পরশু মারা যাব? এই ভয়ে রানী করুণাময় সাহেব কে জিজ্ঞাসা করে, আমার প্রাণ কি বাঁচতে পারে? কবীর সাহেব (করুণাময়) বলেন, হ্যাঁ বাঁচতে পারে, যদি তুই আমার কাছে উপদেশ নিয়ে আমার শিষ্য হয়ে সদভক্তি করিস, পুরনো পূজা ত্যাগ করিস, তাহলে তোর প্রাণ বাঁচতে পারে। আমি শুনেছি গুরু পাল্টাতে নেই, তাতে পাপ লাগে। করুণাময় সাহেব বলেন, না পুত্রী! এটা তোর ভুল ধারণা (ভ্রম)। এক ডাক্তারের কাছে রোগ ঠিক না হলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাবি না? একজন পঞ্চম শ্রেণীর মাস্টার হয়,অন্যজন উচ্চ শ্রেণীর মাস্টার হয়। পুত্রী! সারা জীবন কি পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়ে থাকবি। পরের শ্রেণীতে যেতে হলে আগের শ্রেণিকক্ষ ছাড়তে হবে। এখন তোকে উচ্চ শিক্ষা নিতে হবে। আমি তোকে পড়াবো। এমনিতে তো মানতো না, কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে ইন্দ্রমতি চিন্তা করে, যদি সন্তের কথা না শুনি আর সত্যই যদি আমার মৃত্যু হয়। এই চিন্তা করে রানী বলে, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। করুণাময় সাহেব ইন্দ্রমতি কে নাম উপদেশ দিয়ে বলেন, তৃতীয় দিনে কাল আমার রূপ ধরে তোকে নিতে আসবে। তুই কিছু বলবি না, আমি যে নাম দিয়েছি তা দুই মিনিট পর্যন্ত জপ করে ওর দিকে তাকাবি। গুরুদেবের দর্শন মাত্রই শীঘ্রই তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত। এটা কেবল এবারকার মতো আমার আদেশ। রানী বললেন, ঠিক আছে গুরুদেব।

রানী মৃত্যুর ভয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্ত্র জপ করছিল। তৃতীয় দিনে করুণাময় সাহেবের রূপ ধরে কাল আসে। ইন্দ্রমতি- ইন্দ্রমতি বলে ডাকে। ইন্দ্রমতি তো ভয়েই ছিল। তাই কালের দিকে না তাকিয়ে মন্ত্র জপ করতে লাগে। দুই মিনিট পরে যখন তাকালো কালের স্বরূপ পাল্টে গেছে, করুণাময় সাহেবের রূপ বদলে কালের বাস্তবিক রূপ হয়ে গেছে। কাল বুঝতে পারে এর কাছে কোন শক্তি যুক্ত মন্ত্র আছে। তখন কাল চলে যায় এই বলে যে,তোকে পরে দেখছি। এইবার তো বেঁচে গেলি। রানী আনন্দে সবাইকে বলতে লাগে, আজ আমার মৃত্যু ছিল। কাল আমাকে নিতে এসেছিল। রাজাকেও বলে, আমার গুরুদেব আজ আমাকে রক্ষা করেছে। কাল আমাকে নিতে এসেছিল। রাজা বলেন, তুমি তো নাটক করতে থাকো। কাল এলে কি তোমাকে ছেড়ে দিত? সন্ত জী তোমাকে বোকা বানিয়েছে। রানী রাজার কথায় কান না দিয়ে আনন্দে বিছানায় শুয়ে পরে। কিছুক্ষণ পর সাপ হয়ে কাল আবার আসে, আর রানীকে ছোবল মারে। রানী যন্ত্রনায় চিৎকার করে ওঠে। আমাকে সাপে কামড়েছে। দাসী রা দৌড়ে আসে। দেখে জল বের হওয়া একটি ছিদ্র দিয়ে সাপটি বেরিয়ে গেল। নিজের গুরুদেবকে স্মরণ করতে করতে রানী অজ্ঞান হয়ে যায়। করুণাময় সাহেব ওখানে

প্রকট হয়ে যান। লোকেদের দেখানোর জন্য মন্ত্র বলেন। (উনিতো বিনা মন্ত্রেও জীবিত করতে পারেন, মন্ত্রের কোন দরকার পড়ে না) রানী ইন্দ্রমতিকে জীবিত করে দেন। রানী ভগবানকে (করুণাময় জীকে) ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, হে বন্দীছোড়! যদি আজ আমি আপনার শরণে না থাকতাম তাহলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।কবীর পরমেশ্বর বলেন, কালকে আমি তোর ঘরে ঢুকতেও দিতাম না। তোর উপর হামলাও করতে পারত না। কিন্তু তোর বিশ্বাস হতো না। তুই ভাবতি তোর উপর কোন বিপদ ছিল না। গুরুদেব আমাকে ভ্রমিত করে নাম দিয়েছে। এইজন্য তোকে বিশ্বাস করানোর জন্য এই ঘটনার প্রয়োজন ছিল। না হলে তোর বিশ্বাস হতো না।

ধর্মদাস য়হাঁ ঘনা অন্ধেরা, বিন পরিচয় জীব জম কা চেরা॥

করুণাময় সাহেব বলেন, এখন আমি যখন চাইবো তখন তোর মৃত্যু হবে। গরীব দাস জী বলেন :-

গরীব, কাল ডরৈ করতার সে, জয় জয় জয় জগদীশ।
জৌরা জৌরী ঝাড়তী পগ রজ ডারে শীশ॥

এই কাল কবীর পরমেশ্বর কে ভয় পায়। আর মৃত্যু কবীর সাহেবের জুতা পালিশ করে অর্থাৎ চাকর তুল্য । জুতার ধুলো নিজের মাথায় নিয়ে বলে, আপনার ভক্তদের কাছে আমি যাব না।

গরীব, কাল জো পীসৈ পীসনা, জৌরা হৈ পনিহার।
য়ে দো অসল মজদুর হৈ, মেরে সাহেব কে দরবার॥

এই কাল ব্রহ্ম ২১ ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পিতা। এ আমার কবীর সাহেবের আটা পেশায় করা অর্থাৎ পাক্কা চাকর। আর (জৌরা) মৃত্যু কবীর সাহেবের জল ভরে অর্থাৎ একজন বিশেষ দাসী। এই দুজন কবীর পরমেশ্বরের দরবারে আসল মজদুর (চাকর)। কিছুদিন পরে করুণাময় সাহেব আবার আসেন। রানী ইন্দ্রমতি কে সতনাম দেন।

আবার কিছুদিন পরে করুণাময় সাহেব রানী ইন্দ্রমতির অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখে সারনাম প্রদান করেন। শব্দের উপলব্ধি করান। কবীর পরমেশ্বর সময়ে সময়ে দর্শন দিতে আসতেন। তখন ইন্দ্রমতি প্রার্থনা করতেন, প্রভু আমার স্বামীকেও বোঝান। উনি আপনার শরণে আসলে আমার জীবন সফল হয়ে যাবে। কবীর সাহেব রাজা চন্দ্র বিজয় কে প্রার্থনা করেন, আপনিও নাম দীক্ষা নিয়ে নিন। এই সংসার দুই দিনের আনন্দ ফুর্তি। পরে ৮৪ লক্ষ যোনীতে চলে যেতে হবে। রাজা চন্দ্র বিজয় বলেন,ভগবান আমি নাম নেব না। আর আপনার শিষ্যাকে বাধাও দেব না। সে চাইলে সমস্ত ধন-সম্পত্তি দান করে দিতে পারে, চাইলে সৎসঙ্গ করতে পারে,আমি বাধা দেব না। কবীর সাহেব বলেন, কেন নাম উপদেশ নেবেন না। রাজা বলেন, আমাকে বিভিন্ন জায়গায় রাজা মহারাজাদের সভায় (পার্টিতে) যেতে হয়। করুণাময় (কবীর সাহেব) বলেন, তাতে নাম নিতে কি বাধা? পার্টিতে গেলে কাজু কিসমিস, ফল, দুধ, শরবত খান কিন্তু মদ (মদিরা) পান করবেন না। কারণ মদ্যপান করা মহাপাপ। কিন্তু রাজা তাতে কর্ণপাত করেনি।

রানীর প্রার্থণাতে করুণাময় সাহেব রাজাকে আরো বোঝান। নাম বিনা জীবন ব্যর্থ যাবে। আপনি নাম নিয়ে নিন। রাজা বলেন, গুরুজী আমাকে নাম নিতে বলবেন না। আপনার শিষ্যাকে আমি বাধা দেব না। সে যখন ইচ্ছা সৎসঙ্গ করাতে পারে। ভোজন-

ভান্ডারা করাতে পারে। সাহেব বলেন, পুত্রী! এই দুই দিনের সুখ দেখে রাজার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তুই নিজের কল্যাণ কর। এই সংসারে কেউ কারো স্বামী নয়, কেউ কারো স্ত্রী নয়। পূর্ব জন্মের সংস্কারের কারণে দুই দিনের সম্পর্ক। তুই নিজের কর্ম কর। এখন ইন্দ্রমতি ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা হয়ে গেছে। কোথায় চল্লিশ বছর বয়সে মারা যেত। যখন শরীর আর চলছে না, তখন একদিন করুণাময় সাহেব বললেন, ইন্দ্রমতি সতলোকে যেতে চাস? ইন্দ্রমতি বলে, আমি তৈরি প্রভু!। সাহেব বলেন, তোর নাতি -পুত্রের বা এই সংসারের উপর কোন মায়া নেই তো? রানী বলে, না গুরুদেব। আপনি এমন নির্মল জ্ঞান দিয়েছেন, এই নোংরা লোকে আর কি ইচ্ছা করব? তখন করুণাময় সাহেব বললেন, চল পুত্রী। রানী প্রাণ ত্যাগ করল। পরমেশ্বর কবীর (করুণাময়) বন্দীছোড় রানী ইন্দ্রমতির আত্মাকে উপরে নিয়ে গেলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডেই একটি মানসরোবর আছে। সেখানে আত্মাকে স্নান করিয়ে কিছু সময়ের জন্য রাখা হয়। সেখানে কবীর পরমেশ্বর পূর্ণ গুরুর স্বরূপে প্রকট থাকেন। পরমেশ্বর কবীর বন্দীছোড় জী আবার ইন্দ্রমতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সংসারে যদি তোর কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে আবার জন্ম নিতে হবে। মনে কোন ইচ্ছা থাকলে সতলোকে যেতে পারবি না। ইন্দ্রমতি বলল, প্রভু! আপনি তো অন্তর্যামী। কোন ইচ্ছা নেই। আপনার চরণে থাকতে চাই। কিন্তু মনে একটি শঙ্কা আছে। আমার যে স্বামী ছিল, সে আমাকে কখনো কোনো ধার্মিক কাজে বাধা দেয়নি। যদি সে মানা করে দিত তাহলে আমি আপনার চরণে থাকতে পারতাম না। আমার উদ্ধার হতো না। ওনার এই শুভ কর্মে সহযোগ করার জন্য যদি কোন ফল হয় তাহলে তাকে দয়া করো দাতা। পরমেশ্বর কবীর জী দেখলেন যে, এই ভোলা মেয়ে স্বামীর জন্য পুনরায় কালজালে আটকে যাবে। সাহেব বললেন, ঠিক আছে পুত্রী। এখন তুই দুই চার বছরের জন্য এখানেই থাক।

দুই বৎসর পরে রাজারও মৃত্যুর দিন আসে। যেহেতু নাম নিয়ে রাখেনি, যমদূত সামনে এসে দাঁড়ায়। রাজা ভয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। যমদূতরা তার গলা চেপে ধরে। তখন রাজার পায়খানা প্রস্রাব বের হয়ে যায়। করুণাময় সাহেব রানী কে বলেন, দেখ তোর রাজার কি অবস্থা হচ্ছে! মানসরোবর থেকে পরমেশ্বর কবীর জী রানীকে দেখালেন। এই সবকিছু দেখে রানী বললেন, হে প্রভু! সৎকর্মের সহযোগে যদি কোন ভালো ফল হয় তাহলে দয়া করো দাতা। এখনো রানীর একটু মমতা বেঁচে ছিল। রানী আবার কালের জালে ফাঁসতে যাচ্ছে দেখে, পরমেশ্বর মানসরোবর থেকে রাজা ইন্দ্র বিজয়ের মহলে গেলেন। সেখানে রাজা অচেতন হয়ে পড়েছিল। কবীর সাহেবকে আসতে দেখে যমদূতরা আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল। চন্দ্র বিজয়ের জ্ঞান ফিরলো। দেখলেন সামনে করুণাময় সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। কেবল চন্দ্র বিজয়ই দেখতে পাচ্ছিল অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। চন্দ্রবিজয় সাহেবের পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন প্রভু! আমার প্রাণ বাঁচান। রাজা বুঝতে পেরেছে, এখন তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই বারবার বলতে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দাও প্রভু, আমার প্রাণ বাঁচাও। কবীর সাহেব বললেন, রাজন! আগেও যা বলেছি, এখনো তাই বলবো। নাম নিতে হবে। রাজা বললেন, নাম নিয়ে নেব, এখনই নাম নিয়ে নেব। কবীর সাহেব নাম উপদেশ দিলেন, এবং বললেন, এখন আমি তোকে আরো দুই বছর আয়ু দেব, এর মধ্যে যদি একটি শ্বাসও খালি যায় তাহলে কর্মদণ্ড থেকেই যাবে।

কবীর, জীবন তো থোড়া ভলা, জৈ সত সুমিরন হো।

লাখ বর্ষ কা জীবনা,লেখে ধরে না কো॥

শুভ কর্মে সহযোগিতা করার ফলে,আর দুই বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি করার ফলে,তিন নাম প্রদান করে কবীর সাহেব রাজা চন্দ্র বিজয়কেও পার করে দিলেন। বলো কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) কি জয়। বন্দীছোড় কী জয়।

পরমেশ্বর কবির্দেব শ্রদ্ধালুদের আয়ু বাড়িয়ে দেন। এবং তার পরিবারেরও রক্ষা করেন। উপরোক্ত এই প্রমাণ অনেক পূর্বের। বর্তমানে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে না। বর্তমানে কবীর পরমেশ্বরের শক্তিতে সদগুরু রামপাল জী মহারাজ দ্বারা ভক্তদের আয়ু বাড়ানো ও কষ্ট নিবারনের কিছু প্রমাণ পড়ুন এই পুস্তকের পথভ্রষ্টের মার্গ দর্শন নামক লেখনীতে।

"কলিযুগে কবীর সাহেব (কবির্দেব) নামে প্রকট হয়েছিলেন"

কলিযুগে কবীর সাহেব (কবির্দেব) নামে প্রকট হয়েছিলেন। বিক্রমী সংবত -১৪৫৫ (সন ১৩৯৮) জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন ভোর বেলা ব্রহ্মমূহুর্তে পূর্ণ পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব) স্বয়ং নিজ মূল স্থান সতলোক থেকে এসে কাশীতে লহরতারা সরোবরের মাঝে পদ্মফুলের উপর এক শিশুরূপ ধারন করেন। প্রথমে আপনাদের নীরু-নীমার বিষয়ে বলি নীরু-নীমাকে ছিলেন? দ্বাপর যুগে নীরু নীমা সুদর্শন সুপচ এর মাতা পিতা ছিলেন। ঐ সময় তারা কবীর সাহেবের কথা স্বীকার করেনি। অবশেষে সুর্দশন জী করুণাময় রূপে আসা কবীর সাহেবকে প্রার্থনা করেছিলেন, হে প্রভু! আপনি আমাকে উপদেশ দিয়ে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন। আপনার কাছে আজ পর্যন্ত কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ আপনি সর্ব মনস্কামনা পূর্ণ করে দিয়েছেন। যে বাস্তবিক ভক্তি ধন তাও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কিন্তু দাসের এক প্রার্থনা, উচিত মনে করলে স্বীকার করবেন। আমার মাতা-পিতার যদি কোনো জন্মে মানব শরীর প্রাপ্ত হয়, তাহলে ওদের শরণে নিও প্রভু। এরা খুবই পুণ্যাত্মা কিন্তু আজ এদের বুদ্ধি বিপরীত হয়ে গিয়েছে। ওনারা পরমাত্মার কথা বা বাণী শুনতে চাইছে না। কবীর সাহেব বললেন চিন্তা করিস না, তা না হলে তুই মাতা পিতার মোহতে এখানেই ফেঁসে যাবি। সময় আসতে দে, ওদেরও সামলে নেব। কাল জাল থেকে পার করবো। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে সতলোকে যা। সুদর্শন জী সতলোকে চলে যান।

সুদর্শনের মাতা পিতার আত্মা কলিযুগে নীরু নীমার জন্মের আগে ব্রাহ্মণের ঘরে দুইবার জন্ম নিয়েছিল। ঐ সময় উনি নিঃসন্তান ছিলেন। পরে তৃতীয় মানব জন্ম কাশীতে হয়। তখনও নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী (গৌরীশঙ্কর আর সরস্বতীর নামে) ছিলেন। নীরু ও নীমা গৌরীশঙ্কর ও সরস্বতী নামে ব্রাহ্মন জাতিতে ছিলেন। তারা ভগবান শিবের পূজা করত। ভগবান শিবের মহিমা শিব পুরান থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভক্ত আত্মাদের শোনাতেন। কারো কাছ থেকে টাকা পয়সা নিত না। এতো ভালো আত্মা ছিলেন যে, যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় দান করত সেখান থেকে নিজের খাবার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকি অংশ দিয়ে ভান্ডারা করে দিত।

অন্য স্বার্থপর ব্রাহ্মণরা গৌরীশঙ্কর ও সরস্বতীকে ঈর্ষা (হিংসা) করত। কারণ গৌরীশঙ্কর নিঃস্বার্থে কথা করত। পয়সার লোভে ভক্তদের ভ্রমিত করত না, যার কারণে প্রশংসার পাত্র ছিলেন। ওদিকে মুসলমানরা জানতে পারে যে, নীরু নীমাকে কোন হিন্দু ব্রাহ্মণ পছন্দ করতো না এবং তাই তারা এক ঘরে হয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানরা এই সুযোগের সদ্ ব্যবহার করে বলপূর্বক গৌরীশঙ্করকে মুসলমান বানায়।

মুসলমানরা নিজেদের এঁঠো জল ওদের ঘরে ছিটিয়ে দেয় এবং মুখেও ঢেলে দেয়, কাপড়-চোপড়ে জলের ছিটে দেয়। তখন হিন্দু ব্রাহ্মনরা বলে এখন ওরা মুসলমান হয়ে গেছে। আজ থেকে আমাদের সঙ্গে ওদের ভ্রাতৃত্ব (সামাজিক কাজ) বন্ধ।

"নীরু- নীমার জুলাহা উপাধি এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তি"

বেচারা গৌরীশঙ্কর ও সরস্বতী নিরূপায় হয়ে যায়। মুসলমানরা পুরুষের নাম নীরু আর স্ত্রীর নাম নীমা রাখেন। পূর্বে ওদের কাছে যে পূজা বা ধার্মিক কার্য করে অর্থ আসতো, তাতে তাদের সংসার চলে যেত। যদি কোনো টাকা-পয়সা বেঁচে যেত, তাহলে তা কোন রকম দুর্ব্যবহার না করে, তাঁরা ভান্ডারা করিয়ে দিত। কিন্তু এখন পূজা অর্চনা করে জীবিকার পথ বন্ধ। কোন পূজা বা ধার্মিক কার্য আসে না। তখন চিন্তা করে, এখন কি কাজ করি? নীরু কাপড় বোনার এক খাড্ডী লাগান। আর তাঁতির (জুলাহ) কাজ শুরু করে দেন। কাপড় বুনে সংসার চালাতে লাগলেন। এখনও সংসারের খরচ করে বেঁচে থাকা ধন দিয়ে ভান্ডারা করাতেন। হিন্দু ব্রাহ্মনরা নীরু-নীমাকে গঙ্গা ঘাটে স্নান করা বন্ধ করে দেয়। বলে যে, এখনে মুসলমানদের স্নান করা নিষিদ্ধ।

গঙ্গা নদীর ঢেউয়ে উপচে পড়া জলে কাশীর এক লহরতারা নামের খুব বড় সরোবর (ঝিল)ভরে থাকত। খুব সুন্দর নির্মল জলে পরিপূর্ণ সরোবরে পদ্ম ফুল ফুটে ছিল। সন ১৩৯৮ (বিক্রমী সংবত ১৪৫৫) জ্যেষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিন ব্রহ্ম মূহুর্তে (সূর্য উদয়ের প্রায় দেড় ঘন্টা আগে) নিজের সতলোক (ঋত ধাম) থেকে সশরীরে এসে পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব) বালকরূপে লহর তারা সরোবরে কমল ফুলের উপর বিরাজমান হন। ঐ লহর তারা সরোবরে নীরু নীমা ভোর বেলা ব্রহ্ম মুহুর্তে (ভোরে) প্রতিদিন স্নান করতে যেতেন। (ব্রহ্ম মুহুর্ত অর্থাৎ সূর্য উদয়ের দের ঘন্টা পূর্বে) ওই দিন এক খুব তেজ পুঞ্জের চমকদার গোলা (বালক রূপে পরমেশ্বর কবীর সাহেব তেজোময় শরীর যুক্ত এসেছিলেন, দূরের কারণ শুধু প্রকাশ পুঞ্জই দেখা গিয়েছিল) উপর থেকে (সতলোক থেকে) এসে পদ্মফুলের উপর স্থির হয়ে যায়, সমস্ত লহর তারা সরোবর আলোতে ঝলমল করে উঠলো। পরে তা এক কোনায় গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দৃশ্যকে স্বামী রামানন্দজীর এক শিষ্য ঋষি অষ্টানন্দজী নিজের চোখে দেখেন। প্রতিদিন ঋষি অষ্টানন্দ স্নান করার জন্য ওই লহর তারা ঝিলের একান্ত স্থানে যেতেন। ওখানে নিজের সাধনা ও গুরুদেব যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তা জপ করতেন, সেই সাথে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করতেন। স্বামী অষ্টানন্দজী এত তেজোময় প্রকাশ (যাতে চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল) দেখে ভাবতে লাগলেন, এ আমার ভক্তির উপলব্ধি! না চোখের ভুল! এই মনে করে গুরুদেবের কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করতে যান।

শ্রদ্ধেয় রামানন্দ জীকে ঋষি অষ্টানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, হে গুরুদেব! আজ আমি এমন তেজ প্রকাশ দেখেছি, যা জীবনে কখনও দেখিনি। সর্ব বৃত্তান্ত বলেন, আকাশ থেকে এক প্রকাশ পুঞ্জ আসে। আমি যখন তা দেখি, আমার চোখ ওই তেজ প্রকাশ সহ্য করতে পারে না, তাই চোখ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বন্ধ চোখে এক শিশু রূপ দেখতে পাই। (যেমন সূর্যের দিকে দেখার পরে সূর্যকে এক গোল আগুনের গোলা দেখা যায় তেমনই বালক দেখা দেয়) এ কি আমার ভক্তির কোনো উপলব্ধি না দৃষ্টি দোষ ছিল? স্বামী রামানন্দজী বললেন, পুত্র! এমন লক্ষন তখন হয়, যখন উপরের লোক থেকে কোনো অবতার আসে বা কোথাও প্রকট হয়। কোন মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে লীলা করবে। (কারণ এই ঋষিদের এতটাই জ্ঞান যে, অবতার মায়ের পেটে জন্ম নেয়) যতটা ঋষির জ্ঞান ছিল তা দিয়ে তিনি শিষ্যের শঙ্কা সমাধান করে দেন।

নীরু ও নীমা, প্রতিদিনের মতো ঐ দিনও স্নান করতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় নীমা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন যে, হে প্রভু! হে ভগবান শিবজী! (মুসলমান হয়ে গেলেও এতদিনের সাধনা মন থেকে ভুলতে পারেনি) তোমার ঘরে কি আমাদের জন্য একটি সন্তান কম পড়ে গিয়েছে? আমাদের একটি সন্তান দাও দাতা, যাতে আমাদের জীবনটাও সফল হয়ে যায়। এই সব বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ওনার স্বামী নীরু বললেন, নীমা প্রভুর ইচ্ছায় প্রসন্ন থাকাই আমাদের জন্য ভালো। যদি এমন করে কাঁদতে থাকিস, তাহলে তোর শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। চোখেও ভালো দেখতে পারবি না। আমাদের ভাগ্যে সন্তান নেই। এই সব কথা বলতে বলতে লহরতারা সরোবর পৌঁছে যায়। তখন অল্প অন্ধকার ছিল। নীমা স্নান করে বাইরে এসে কাপড় পাল্টায় আর নীরু দীঘিতে নেমে ডুব মেরে স্নান করতে শুরু করে। নীমা কাপড় ধোয়ার জন্য দ্বিতীয়বার দীঘির জলের কাছে যায় তখন আলো ফুটে গিয়েছে। সূর্য উদয় হচ্ছে, এমন সময় নীমা দেখে জলের মধ্যে পদ্মফুলের উপর কোন কিছু নড়ছে। কবীর সাহেব বাচ্চার রূপে এক পায়ের আঙ্গুল মুখে দিয়ে অন্য পা দোলাচ্ছিলেন। প্রথমে নীমা ভেবেছিল কোন সাপ নয় তো! আমার স্বামীর দিকে আসছে। তাই ধ্যান দিয়ে দেখতেই বুঝতে দেরি হয় না যে, এতো কোন বাচ্চা হবে। বাচ্চাটাও পদ্ম ফুলের উপর। স্তম্ভিত হয়ে স্বামীকে বলে, দেখো দেখো বাচ্চা ডুবে যাবে! বাচ্চা ডুবে যাবে! নীরু বলে, কি বুদ্ধু (বোকা) বাচ্চার জন্য তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস। জলের ভিতরেও বাচ্চা দেখতে পাচ্ছিস? নীমা বলে সামনে পদ্মফুলের উপর দেখ। নীমার আবেগ পূর্ণ তেজ আওয়াজে প্রভাবিত হয়ে, যে দিকে হাতের সংকেত করছিল নীরু ওদিকে দেখে। একটি পদ্ম ফুলের উপর এক নবজাত শিশু শুয়ে আছে। নীরু ঐ বাচ্চাকে ফুল সহ উঠিয়ে এনে নীমার কোলে দিয়ে স্নান করতে থাকে। নীরু স্নান করে আসে। নীমা বাচ্চা রূপে আসা পরমেশ্বরকে খুব আদর করতে ছিল আর শিব প্রভুর খুব প্রশংসা ও স্তুতি করছিল। ভগবান আমার অনেক বৎসরের মনস্কামনা পূর্ণ করে দিয়েছে। আজ হৃদয় থেকে প্রভুকে ডেকে ছিলাম তাই আজই প্রভু আমার ডাক শুনেছে।

যে কবীর পরমেশ্বরের নাম নিলে আমাদের হৃদয়ে এক বিশেষ শিহরণ হয়, তার প্রেমে লোম লোম খাড়া হয়ে যায়, আত্মা আবেগে ভরে ওঠে। আর যে মাতা, বোন বুকে লাগিয়ে পুত্রের মত স্নেহ করে সেই মাতা বোন কতটা আনন্দ পায় তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যেমন কোন বোবা ব্যক্তি গুড় খেয়ে অন্যকে তার আনন্দ বলতে বা বোঝাতে পারে না, একমাত্র যে খায় সেই জানে। যেমন মা সন্তানকে স্নেহ করে সেইরূপ শিশু রূপধারী পরমেশ্বরকে কখনো বুকে জড়িয়ে ধরছিল, কখনো মুখে চুমু খাচ্ছিল আর বার বার মুখের দিকে দেখছিল। এদিকে নীরু স্নান সেরে সরোবর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। কেননা মানুষেরা সমাজের দিকে লক্ষ করে চলে। সমাজে প্রচলিত ধারার সাথে তাল মিলিয়ে না চললে সমাজ মেনে নেবে না। তাই নীরু বিচার করে যে, এখনো মুসলমানদের সহিত আমার তেমন বিশেষ সম্পর্ক নেই, আর হিন্দুরা আমাকে হিংসা করে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমাকে মুসলমান বানিয়েছে। আমার কোন সাথী নেই। আজ যদি আমি এই বাচ্চাকে নিয়ে যাই। তাহলে জিজ্ঞাসা করবে, বল ওর মাতা পিতা কে ওরা কোথায় থাকে? তুই কারো বাচ্চা চুরি করে এনেছিস। ওর মাতা পিতা কান্না কাটি করছে, বল ওর মাতা পিতা কোথায়, আমি কি উত্তর দেব? কিভাবে বলব? পদ্ম ফুলের উপর পেয়েছি, বললে ও কেউ বিশ্বাস করবে না। এই সব বিচার করে নীরু বলে, নীমা এই বাচ্চাকে এখানে রেখে দাও। নীমা বলে, আমি এই বাচ্চাকে ছাড়তে পারব না। আমার প্রাণ

চলে যাবে, আমি ছট্‌ফট্ করে মরে যাব। না জানি এই বালক আমার উপর কোন যাদু করেছে। আমি একে ছাড়তে পারব না। নীরু নীমাকে সব কথা বোঝায়। আমাদের সাথে এমন হতে পারে। নীমা বলে এই বাচ্চার জন্য আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব কিন্তু একে ছাড়তে পারব না। নীরু, নীমার নির্বোধের মত আচারণ দেখে চিন্তা করে এ পাগল হয়ে গেছে। সমাজের ভয়ও নেই। নীরু নীমাকে বলে আজ পর্যন্ত তোমাকে প্রত্যেক কথা আমি শুনেছি। কারণ আমাদের সন্তান না থাকার কারণে তুমি যাতে দুঃখী না হও। তুমি যা বলেছো আমি তা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু আজ তোমার কোন কথা শুনব না। এই বালককে এখানে রেখে দাও। নাহলে তোমাকে এখন দুই থাপ্পড় লাগাব। ঐ মহাপুরুষ প্রথমবার পত্নীর দিকে হাত উঠায়। তখন শিশুরূপে কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) বলে, নীরু আমাকে ঘরে নিয়ে চলো। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। শিশুরূপী পরমেশ্বরের বচন শুনে নীরু ভয় পেয়ে যায়। এ বালক কোন দেবতা বা সাধু-সন্ত হবে অথবা কোন সিদ্ধ পুরুষ হবে। নিজের উপর কোন সংকট না আসে। তাই চুপচাপ চলে যায়।

যখন বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে আসে তখন গ্রামের লোকেরা শিশুর রূপ দেখে জিজ্ঞাসা করা ভুলে যায় যে, শিশুটিকে কোথায় পেয়েছো, কোত্থেকে এনেছো? কাশীর শহরে স্ত্রী ও পুরুষেরা শিশুকে দেখতে এসে বলে এ- কোন দেবতা মনে হচ্ছে এত সুন্দর শরীর। এমন জ্যোর্তিময় বাচ্চা আগে তো কখনো দেখি নি। কেউ বলে এ ব্রহ্মা বিষ্ণু- মহেশ এর মধ্যে কোন প্রভু হবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বলে এ'তো কোন উপরের লোক থেকে আসা কোন শক্তি, কেউ বলে এ কোন দেবদূত হবে, এমন সব সমালোচনা করছিল।

গরীব, চৌরাসী বন্ধন কাটন, কীনী কলপ কবীর।
ভবন চতুর্দশ লোক সব, টুটে জম জঞ্জীর॥৩৭৬॥
গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড মেঁ, বন্দী ছোড় কহায়।
সো তৈ এক কবীর হৈঁ, জননী জন্যা ন মায়॥৩৭৭॥
গরীব, শব্দ স্বরূপ সাহিব ধনী, শব্দ সিন্ধ সব মাঁহি।
বাহর ভীতর রমি রহ্মা, জহাঁ তহাঁ সব ঠাঁহি॥৩৭৮॥
গরীব, জল থল পৃথিবী গগন মেঁ, বাহর ভীতর এক।
পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর হৈঁ অবিগত পুরুষ অলেখ॥৩৭৯॥
গরীব, সেবক হোয় করি উতরে, ইস পৃথিবী কে মাঁহি।
জীব উধারন জগৎগুরু, বার বার বলি জাঁহি॥৩৮০॥
গরীব, কাশীপুরী কস্ত কিয়া, উতরে অধর অধার।
মোমন কূঁ মুজরা হুবা, জঙ্গল মেঁ দীদার॥৩৮১॥
গরীব, কোটি কিরণ শশি ভান সুধি, আসন অধর বিমান।
পরসত পূরণ ব্রহ্ম কূঁ, শীতল পিন্ডরু প্রান॥৩৮২॥
গরীব গোদ লিয়া মুখ চুম্বি করি, হেম রূপ ঝলকন্ত।
জগর মগর কায়া করৈ, দমকৈঁ পদম অনন্ত ॥৩৮৩॥
গরীব, কাশী উমটি গুল ভয়া, মোমন কা ঘর ঘের। কোঈ
কহে ব্রহ্মা বিষ্ণু হৈঁ, কোঈ কহে ইন্দ্র কুবের॥৩৮৪॥
গরীব, কোঈ কহে ছল ঈশ্বর নহী, কোঈ কিন্নর কহলায়।

কোঈ কহৈ গন ঈশ কা, জ্যুঁ জ্যুঁ মাত রিসায়॥৩৮৫॥
গরীব, কোঈ কহৈ বরুন ধর্মরায় হৈ, কোঈ কোঈ কহতে ঈশ।
সোলহ্ কলা সুভাঁন গতি, কোঈ কহৈ জগদীশ॥৩৮৬॥
গরীব, ভক্তিমুক্তি লে উতরে, মেটন তীনুঁ তাপ।
মোমন কে ডেরা লিয়া, কহৈ কবীরা বাপ॥৩৮৭॥
গরীব, দুধ ন পবৈ ন অন্ন ভখৈ, নহীঁ পলনে ঝুলন্ত।
অধর অমান ধিয়ান মেঁ, কমল কলা ফুলন্ত॥৩৮৮॥
গরীব, কাশী মেঁ অচরজ ভয়া, গঙ্গ জগত কী নীন্দ।
ঐসে দুলহে উতরে, জ্যুঁ কন্যা বর বীন্দ॥৩৮৯॥
গরীব, খলক মূলক দেখন গয়া, রাজা প্রজা রীত।
জম্বূদীপ জিহাঁন মেঁ. উতরে শব্দ অতীত॥৩৯০॥
গরীব, দুনী কহৈ যোহ দেব হৈ, দেব কহত হৈ ঈশ।
ঈশ কহৈ পারব্রহ্ম হৈ, পুরণ বীসবে বীস॥৩৯১॥

পরমেশ্বর কবীর জী অনাদি পরম গুরু। তিনি রূপ পরিবর্তন করে সন্ত ঋষি বেশে বিভিন্ন সময়ে (স্বয়ম্ভু) স্বয়ং প্রকট হন। কালের দূত (সন্ত) দ্বারা বিগড়ানো তত্ত্ব জ্ঞানকে অর্থাৎ ভ্রমিত করা জ্ঞানকে ঠিক করেন। কবীর সাহেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি দেবতাদের, ঋষি মুনি ও সন্ত কে বিভিন্ন সময়ে নিজের সতলোক থেকে এসে নাম উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় গরীব দাস মহারাজ নিজের বাণীতে লিখেছেন, যা কবীরজী স্বয়ং বলেছিলেন :-

আদি অন্ত হমরা নহীঁ, মধ্য মিলাবা মূল।
ব্রহ্মা জ্ঞান সুনাঈয়া, ধর পিন্ডা অস্থূল॥
শ্বেত ভূমিকা হম গএ, জহাঁ বিশ্বম্ভর নাথ।
হরিয়ম্ হীরা নাম দে, অষ্টকমল দল স্বাঁতি॥
হম বৈরাগী ব্রহ্ম পদ সন্যাসী মহাদেব।
সোহম্ মন্ত্র দিয়া শঙ্করকূঁ করত হমারী সেব॥
হম সুলতানী নানক তারে, দাদু কূঁ উপদেশ দিয়া।
জাতি জুলাহা ভেদ ন পায়া, কাশী মাহে কবীর হুআ॥
সতযুগ মেঁ সতসুকৃত কহ টেরা, ত্রেতা নাম মুনিন্দ্র মেরা।
দ্বাপর মেঁ করুণাময় কহলায়া, কলিযুগ মেঁ নাম কবীর ধরায়া॥
চারোঁ যুগ মেঁ হম পুকারেঁ, কুক কহেঁ হম হেল রে।
হীরে মানিক মোতী বরসেঁ, য়ে জগ চুগতা ঢেল রে।

উপরোক্ত বাণীতে প্রমাণ হয় যে, কবীর পরমেশ্বরই অবিনাশী পরমাত্মা। তিনি অজর ও অমর। পরমাত্মা চার যুগে স্বয়ং অতিথি রূপে কিছু সময়ের জন্য এই সংসারে এসে, নিজের সদভক্তি মার্গ পূণ্যাত্মাদের প্রদান করেন।

❑❑❑

পূর্ণ সন্তের পরিচয়

(পবিত্র সদগ্রন্থ গুলি থেকে পূর্ণ সন্তের পরিচয়)

❖ বেদ, গীতা প্রভৃতি পবিত্র সদ গ্রন্থের মধ্যে প্রমাণ আছে যে, যখন যখন ধর্মের হানি ঘটে অথবা অধর্মের বৃদ্ধি হয় এবং বর্তমানের নকল সন্ত, মহন্ত ও গুরু দ্বারা ভক্তি মার্গের প্রকৃত রূপকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। ঠিক সেই সময় পরমেশ্বর স্বয়ং এসে অথবা নিজের পরম জ্ঞানী সন্তকে পাঠিয়ে প্রকৃত সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা ধর্মের পুনস্থাপনা করেন। তিনি ভক্তিমার্গকে শাস্ত্র অনুসারে বোঝান। তাঁর পরিচয় এই যে, বর্তমানের ধর্মগুরুরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ হয়ে রাজা এবং প্রজাদেরকে ভুল বুঝিয়ে ভ্রমিত করে তাঁর উপর অত্যাচার করাবে।

কবীর সাহেব নিজের বাণীতে বলেছেন যে :-

জো মম সন্ত সত উপদেশ দৃঢ়াবৈ (বলবৈ), বাকে সঙ্গ সভি রাঢ় বঢ়াবৈ।
যা সব সন্ত মহঁতন কী করণী, ধর্ম দাস মৈঁ তো সে বর্ণী॥

কবীর সাহেব নিজের প্রিয় শিষ্য ধর্মদাসকে এই বাণীর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমার যে সন্ত সত ভক্তি মার্গের বিষয়ে বলবেন, তাঁর সঙ্গে সকল সন্ত ও মহন্তরা ঝগড়া করবে। এগুলি তাঁর পরিচয় হবে।

❖ দ্বিতীয় পরিচয় এই যে, সেই সন্ত সকল ধর্ম ধর্মগ্রন্থের পূর্ণ জ্ঞানী হবেন।

এর প্রমাণ গরীব দাস জী মহারাজের বাণী থেকে -

সতগুরু কে লক্ষণ কহূঁ মধূরে বৈন বিনোদ।
চার বেদ ষট শাস্ত্র, কহৈ অঠারা বোধ॥

সতগুরু গরীবদাস জী মহারাজ নিজের বাণীতে পূর্ন সন্তের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেছেনে যে, তিনি চার বেদ, ছয়টি শাস্ত্র, আঠারোটি পুরাণ সহ অন্যান্য সকল গ্রন্থের পূর্ণ জ্ঞানী হবেন, অর্থাৎ ঐ সমস্ত গ্রন্থের সত্যসার বের করে জনতাকে বলবেন, যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ২৫, ২৬ এর মধ্যে লেখা আছে যে, বেদের অসম্পূর্ণ বাক্য অর্থাৎ সাংকেতিক শব্দ এবং এক-চতুর্থাংশ শ্লোকগুলিকে সম্পূর্ণ করে বিস্তারিত ভাবে বলবেন, সেইসাথে তিন সময়ের পূজার বিধি বলবেন। সকালে অর্থাৎ প্রাতঃকালে পূর্ণ পরমাত্মার পূজা, দুপুরে বিশ্বের সকল দেবতাদের সৎকার এবং সন্ধ্যা আরতী আলাদাভাবে বলবেন, তিনি জগতের উপকারী সন্ত হবেন।

যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ২৫

সন্ধিছেদ: অর্দ্ধ ঋচৈঃ উক্থানাম্ রূপম্ পদৈঃ আপনোতি নিবিদঃ।
প্রণবৈঃ শস্ত্রাণাম্ রূপম্ পয়সা সোমঃ আপ্যতে ॥ ২৫॥

অনুবাদ :- যে সন্ত (অর্দ্ধ ঋচৈঃ) বেদের অর্ধেক বাক্য অর্থাৎ সাংকেতিক শব্দকে পূর্ণ করে (নিবিদঃ) পরিপূর্ণ করেন, (পদৈঃ) শ্লোকের চতুর্থ ভাগকে অর্থাৎ আংশিক বাক্যকে (উকথানম) স্তোত্র এর (রূপম) রূপে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ আংশিক বিবরণকে পূর্ণ রূপে বোঝেন ও বোঝান, (শস্ত্রানাম) শস্ত্র চালনাকারী ব্যক্তি তাকে (রূপম) পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেন, ঐইরূপ পূর্ণ সন্ত (প্রণবৈঃ) ওঁম-কার অর্থাৎ ওঁম - তৎ-সত্ মন্ত্রকে পূর্ণ রূপে বুঝে ও বুঝিয়ে (পয়সা) দুধ থেকে জল ছাঁকেন অর্থাৎ দুধ- জলে মিশে থাকলেও জল থেকে দুধকে আলাদা হওয়ার মত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, যাতে (সোমঃ) অমর পুরুষ অর্থাৎ অবিনশ্বর পরমাত্মাকে (আপ্যতে) প্রাপ্ত করা যায়। ওই পূর্ণ সন্ত বেদকে ভালোভাবে জানেন- এমন বলা হয়।

ভাবার্থ :- তত্ত্বদর্শী সন্ত তিনি হন, যিনি বেদের সাংকেতিক শব্দগুলিকে পূর্ণ করে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। তিনি বেদকে ভালোভাবে জানেন বলে পরিচিত হন।

যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ২৬

সন্ধিচ্ছেদ: - অশ্বিভ্যাম্ প্রাতঃ সবনম্ ইন্দ্রেন ঐন্দ্রম্ মাধ্যন্দিনম্
বৈশ্বদৈবম্ সরস্বত্যা তৃতীয়ম্ আপ্তম্ সবনম॥ ২৬॥

অনুবাদ :- ওই পূর্ণ সন্ত (গুরু) তিন সময়ের সাধনা করতে বলছেন। (অশ্বিভ্যাম) সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত এক দিনের আধারে, প্রথম- (ইন্দ্রেন) শ্রেষ্ঠত্ব থেকে সর্ব দেবতাদের মালিক পূর্ণ পরমাত্মার (প্রাতঃসবনম) পূজা প্রাতকালে করতে বলা হয়েছে, যা (ঐন্দ্রম্)পূর্ণ পরমাত্মার জন্য হয়। দ্বিতীয়-(মাধ্যন্দিনম) দিনের মাঝখানে করতে বলা হয়েছে যা (বৈশ্বদৈবম) সর্ব দেবতাদের সৎকার সম্বন্ধীয় (সরস্বতা) অমৃত বাণী দ্বারা করতে বলা হয়েছে তথা (তৃতীয়ম)- তৃতীয় (সবনম) পূজা সন্ধ্যার সময় (অপ্তম) প্রাপ্ত করে অর্থাৎ যিনি তিন সময়ের সাধনা ভিন্ন ভিন্ন করে করার কথা বলেন তিনিই জগতের উপকারী সন্ত।

ভাবার্থঃ- যে পূর্ণ সন্তের বিষয়ে মন্ত্র নং ২৫ এ বলা হয়েছে যে, তিনি প্রতিদিন তিনবার (প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়) করে সাধনা করার জন্য বলবেন। সকালে তো পূর্ণ পরমাত্মার পূজা, দুপুরে সকল দেবতাদের সৎকার এবং সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা আরতী প্রভৃতি অমৃতবাণীর দ্বারা করার জন্য বলে থাকেন। তিনি সম্পূর্ণ সংসারের উপকার করার জন্য বলে থাকেন।

যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ৩০

সন্ধিচ্ছেদ:- ব্রতেন দীক্ষাম্ আপ্নোতি দীক্ষয়া আপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধাম আপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যম্ আপ্যতে॥ ৩০॥

অনুবাদ :- (ব্রতেন) খারাপ অভ্যাসের ব্রত রেখে অর্থাৎ ভাঙ, মদ, মাংস, তামাক আদির সেবন (খাওয়া) থেকে সংযম রাখা সাধক (দীক্ষামু) পূর্ণ গুরুর দ্বারা দীক্ষাকে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় বা পূর্ণ গুরুর শিষ্য হয়। (দীক্ষয়া) পূর্ণ গুরুর দীক্ষিত শিষ্য থেকে (দক্ষিণাম) দান (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয়। সন্ত তার কাছ থেকে দক্ষিণা নেয়, যে দান দক্ষিণা ধর্ম করে তার থেকে (শ্রদ্ধাম) শ্রদ্ধা (আপোতি) প্রাপ্ত হয় (শ্রদ্ধয়া) শ্রদ্ধাতে ভক্তি করলে (সত্যম) চিরকাল সুখ ও পরমাত্মা বা অবিনাশী পরমাত্মাকে (অপ্যতে) প্রাপ্ত হয়।

ভাবার্থঃ- পূর্ণ সন্ত তাকেই শিষ্য বানায়, যে সদাচারী থাকে। অখাদ্য পদার্থের সেবন বা নেশা জাতীয় বস্তু সেবন না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। পূর্ণ সন্ত তাঁর থেকেই দান গ্রহন করেন, যিনি ওনার শিষ্য হয়ে যান। তারপর গুরুদেবের থেকে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে দান-দক্ষিনা করে। তার ফলে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সাথে সত্যভক্তি করলে অবিনাশী পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষলাভ হয়। পূর্ণ সন্ত কখনো ভিক্ষা বা চাঁদা নেন না।

কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।
গুরুবিন দোনোঁ নিস্ফল হৈ, পুছো বেদ পুরাণ॥

তৃতীয় পরিচয় :- পূর্ণ সন্ত তিন প্রকারের মন্ত্র (নাম) তিন বারে উপদেশ দেবেন। যার বর্ণনা কবীর সাগরের পৃষ্ঠা ২৬৫ বোধ সাগরে লেখা ও গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ ও সামবেদ সংখ্যা নং ৮২২ এ লেখা আছে।

কবীর সাগরে অমর মূল বোধ সাগর পৃষ্ঠা ২৬৫ :-

তব কবীর অস কহেবে লীন্হা, জ্ঞানভেদ সকল কহ দীন্হা॥
ধর্মদাস মৈঁ কহো বিচারী, জিহিতে নিবহে সব সংসারী॥
প্রথমহি শিষ্য হোয় জো আঈ, তা কহেঁ পান দেহু তুম ভাঈ॥ ১॥
জব দেখহু তুম দৃঢ়তা জ্ঞানা, তা কহেঁ কহু শব্দ প্রবানা॥ ২॥
শব্দ মাঁহি জব নিশ্চয় আবৈ, তা কহে জ্ঞান অগাধ সুনাবৈ॥ ৩॥

দ্বিতীয় বার আবার বলেছেন:-

বালক সম জাকর হৈ জ্ঞানা। তাসোঁ কহহু বচন প্রবানা॥ ১॥
জা কো সুক্ষ্ম জ্ঞান হৈ ভাঈ, তা কো স্মরণ দেহু লখাঈ॥ ২॥
জ্ঞান গম্য জা কো পুনি হোঈ। সার শব্দ জা কো কহ সোঈ॥ ৩॥
জা কো হোএ দিব্য জ্ঞান প্রবেশা, তাকো কহে তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশা॥ ৪॥

উপরোক্ত বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, সদগুরু (পূর্ণ সন্ত) তিন স্থিতিতে সারনাম পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন এবং চতুর্থ স্থিতিতে সারশব্দ প্রদান করে থাকেন, কারণ "কবীর সাগর" এর মধ্যে প্রমাণ তো অনেক পরে দেখেছিলাম, কিন্তু উপদেশ বিধি অনেক আগে থেকেই পূজ্য দাদা গুরুদেব এবং পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী আমাদের পূজ্য গুরুদেবকে প্রদান করেছিলেন; যার কারণে প্রথম থেকেই আমাদের তিনবারে নামদীক্ষা দিয়ে আসছেন।

আমাদের পূজ্য সদগুরুদেব রামপাল জী মহারাজ প্রথমবার শ্রী গনেশ, শ্রী ব্রহ্মা-সাবিত্রী, শ্রী লক্ষ্মী-বিষ্ণু, শ্রী শঙ্কর-পার্বতী এবং মাতা দুর্গা দেবীর বীজ মন্ত্র জপ করতে দেন। যাঁদের নিবাস আমাদের মানব শরীরে অবস্থিত বিভিন্ন চক্রের মধ্যে। যেমন, মূলাধার চক্রের মধ্যে শ্রী গণেশ, স্বাদ চক্রের মধ্যে ব্রহ্মা-সাবিত্রী, নাভি চক্রের মধ্যে বিষ্ণু-লক্ষ্মী, হৃদয় চক্রের মধ্যে শঙ্কর-পার্বতী এবং কণ্ঠ চক্রের মধ্যে মাতা দুর্গাদেবী নিবাস করেন। আর এই সমস্ত বীজ মন্ত্রই দেবী-দেবতাদের আদি-অনাদি নাম মন্ত্র। যার বিষয়ে বর্তমানের গুরুদের কোনো জ্ঞান নেই, সদগুরুদেব রামপাল জী প্রদত্ত এই সমস্ত মন্ত্রের জপে এই পাঁচটি চক্র খুলে যায়। এই চক্রগুলি খোলার পরেই মানব, ভক্তি করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

সদগুরু গরীব দাস জী নিজের বাণীতে প্রমাণ দিয়েছেন যে :-

পাঁচ নাম গুঝ গায়ত্রী আত্ম তত্ব জগাও। ওঁ কিলিয়ম্ হরিয়ম্, শ্রীয়ম্, সোহম্ ধ্যাঁও॥

ভাবার্থ - পাঁচ নাম যা গুঝ গায়ত্রী, এগুলির জপ করে, আত্মাকে জাগ্রত করো। দ্বিতীয় বারে দুই অক্ষরের মন্ত্র জপ করতে দেন, যার মধ্যে একটি ওম্ অন্যটি তত্ (যা গুপ্ত, কেবল উপদেশীকে বলা হয়) যেটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে জপ করতে দেওয়া হয়। তৃতীয়বারে সারনাম প্রদান করেন, যা সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত আছে।

"তিনবারে নাম জপের মন্ত্র দেওয়ার প্রমাণ"

অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩

ওঁ, তত্, সত্, ইতি, নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ,স্মৃতঃ,
ব্রাহ্মণা, তেন, বেদাঃ, চ, যজ্ঞাঃ, চ, বিহিতাঃ, পুরা॥ ২৩।

অনুবাদ:- (ওঁ) ব্রহ্মোর, (তত্) এটা পরব্রহ্মোর সাংকেতিক মন্ত্র এবং (সত) পূর্ণব্রহ্মোর সাংকেতিক মন্ত্র। (ইতি) এমন এই(ত্রিবিধ) তিন প্রকারের (ব্রহ্মণঃ)পূর্ণ পরমাত্মার নাম(স্মৃতঃ) সুমিরণের (নির্দেশঃ) সংকেত দেওয়া হয়েছে (চ) আর (পুরা) সৃষ্টির আদিকালে (ব্রাহ্মণাঃ) বিদ্বানগণ বলেছেন যে (তেন) ওই পূর্ণ পরমাত্মার দ্বারা (বেদাঃ) বেদ (চ) তথা (যজ্ঞাঃ) যজ্ঞাদি (বিহিতাঃ) রচনা হয়েছে।

সংখ্যা নং- ৮২২ সামবেদ উতার্চিক অধ্যায় ৩ খন্ড নং ৫ শ্লোক নং ৮
(সন্ত রামপাল দাস দ্বারা ভাষা-ভাষ্য) :-

মনীষিভি: পবতে পূর্ণ্য কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাম্ অসিষ্যদত্।
ত্রিতস্য নাম জনযম্মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ুম্ সস্থ্যায় বর্ধয়ন॥ ৮॥

মনীষিভি :- পবতে - পূর্ণ্য- কবির্ - নৃভি :- যত :- পরি - কোশান্ - অসিষ্যদৎ - ত্রি - তস্য - নাম - জনযন্ - মধু - ক্ষরন : - ন - ইন্দ্রস্য - বায়ুম - সখায় - বর্ধয়ন।

শব্দার্থ:- (পূর্ণ্য) সনাতন অর্থাৎ অবিনাশী (কবীর্নিভিঃ) কবীর পরমেশ্বর মানব রূপ ধারন করে অর্থাৎ গুরু রূপে প্রকট হয়ে (মনীষিভিঃ) শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয় - থেকে চাওয়া ভক্ত আত্মাদেরকে (ত্রি) তিন (নাম) মন্ত্র অর্থাৎ নাম উপদেশ দিয়ে (পবতে) পবিত্র করে (জনয়ন) জন্ম আর (ক্ষরণ) মৃত্যু থেকে (ন) বাঁচান, তথা সংস্কার বসত (তস্য) তার (বায়ুম্) প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসকে গুনে দেওয়া হয়, পরমাত্মাকে (সখায়) বন্ধু মনে করে (কোশান্) নিজের ভান্ডার থেকে (পরি) পূর্ণ রূপে শ্বাস (বর্ধয়ন) বাড়িয়ে দেন। (যত) যার জন্য (ইন্দ্রস্য) পরমেশ্বরের (মধু) বাস্তবিক আনন্দকে(অসিয়্যদতং) নিজের আর্শিবাদের প্রসাদ থেকে প্রাপ্ত করান।

ভাবার্থ:- এই মন্ত্রের মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবীর অর্থাৎ কবীর মানব শরীরে গুরু রূপে প্রকট হয়ে প্রভু প্রেমী আত্মাদের তিন নামের জপ দিয়ে সত্যভক্তি করান এবং ঐ মিত্র ভক্তদেরকে পবিত্র করে নিজের আশীর্বাদ দিয়ে পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি করিয়ে পূর্ণ সুখ প্রদান করেন। সাধকের আয়ু বাড়িয়ে দেন। এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ আছে যে, ওম্-তত্-সত্ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ এর ভাবার্থ হল পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করার জন্য ওম্ (১) তত্ (২) সত্ (৩) এই মন্ত্রগুলি নাম জপ করার নির্দেশ আছে। এই নামগুলি তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে প্রাপ্ত করো। তত্ত্বদর্শী সন্তের বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ এ বলা হয়েছে এবং গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১ এবং ৪ এ তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয়ের বিষয়ে বলেছে। ওখানে বলা হয়েছে যে, তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান জানার পর পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনরায় এই সংসারে আর ফিরে আসেনা অর্থাৎ পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়ে যায়। ঐ পূর্ণ পরমাত্মা থেকে এই সংসারের রচনা হয়েছে।

বিশেষ :- উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পবিত্র চারটি বেদও সাক্ষী দেয় যে, পূর্ণ পরমাত্মাই পূজার যোগ্য, ওনার বাস্তবিক নাম কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) এবং তিন মন্ত্রের নাম জপ করেই পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) হয়।

ধর্মদাসকে তো পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী স্বয়ং সার শব্দ দিতে মানা করে দিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন যে, যদি সার শব্দ কোনো কালের দূতের হাতে পড়ে যায়, তো তাহলে বিচলী পীঢ়ীর (মধ্য কলিযুগীয় সময়কালীন) হংস আত্মারা পার হতে পারবে না। যেমন কলিযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রথম পীঢ়ীতে আসা ভক্তরা অশিক্ষিত ছিলেনএবং কলিযুগের শেষে অন্তিম পীঢ়ীতে ভক্তরা কৃতঘ্নী হয়ে যাবে এবং এখন বর্তমানে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বতন্ত্র হওয়ার পর থেকে বিচলী পীঢ়ী আরম্ভ হয়েছে। ১৯৫১ সালে সতগুরু রামপাল জী মহারাজকে পাঠানো হয়েছে, এখন সমস্ত ভক্ত জনেরা শিক্ষিত। সকল প্রকার শাস্ত্র আমাদের কাছেই বিদ্যমান। এখন এই সত মার্গ - সত সাধনা সম্পূর্ণ সংসারে ছড়িয়ে পড়বে এবং নকল গুরু এবং সন্ত, মহন্তরা মুখ লুকিয়ে বেড়াবে। এই জন্য কবীর সাগর, জীব ধর্ম বোধ, বোধ সাগর, পৃষ্ঠা নং ১৯৩৭ তে লেখা আছে:-

ধর্ম দাস তোহি লাখ দুহাঈ, সার শব্দ কহীঁ বাহর নহীঁ জাঈ।
সার শব্দ বাহর জো পরি হৈ, বিচলী পীঢ়ী হংস নহীঁ তরি হৈ॥

পুস্তক “ধনী ধর্মদাস জীবন দর্শন এবং বংশ পরিচয়” পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬ এ লেখা আছে যে, ধর্মদাসের ১১-তম প্রজন্ম (পীঢ়ী) গদি (দায়িত্বভাব) পায়নি, সেই মহন্তের নাম ছিল “ধীরজ নাম সাহেব” যিনি কবর্ধাতে থাকতেন। ওনার পর ১২ তম পীঢ়ী মহন্ত 'উগ্র নাম সাহেব” দামাখেড়াতে নিজেই গদ্দী স্থাপনা করে নিজেই মহন্ত হয়ে বসে পড়েন। এনার পূর্বে দামাখেড়াতে কোনো গদ্দি ছিল না, এই সমস্ত প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সম্পূর্ণ বিশ্বতে সন্ত রামপাল জী মহারাজ ব্যতিত বাস্তবিক ভক্তিমার্গের জ্ঞান কারো কাছে নেই। সন্ত রামপাল জী মহারাজ নিজের প্রবচনের মধ্যে বার বার বলেন যে, সকল প্রভু প্রেমী ভক্তদের কাছে এই প্রার্থনা যে, আমাকে প্রভুর পাঠানো দাস মনে করে নিজেদের কল্যান করান।

য়হ সংসার সমঝদা নাহীঁ, কহন্দা শ্যাম দোপহরে নুঁ।
গরীবদাস য়হ বক্ত জাত হৈ, রোবোগে ইস পহরে নুঁ॥

১২-তম্ পন্থ (গরীবদাস জীর পন্থ, কবীর সাগরে লেখা আছে। কবীর চরিত্র বোধ পৃষ্ঠা ১৮৭০) বিষয়ে কবীর সাগরে বাণী পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭ এ লেখা আছে।

সংবত্ সত্রাসৈ পচহত্তর হোঈ,তা দিন প্রেম প্রকটেঁ জগ সোঈ।
সাখী হমারী লে জীব সমঝাবে, অসংখ্য জন্মঠৌর নহীঁ পাবে।
বারবেঁ পন্থ প্রগট হৈ বাণী, শব্দ হমারে কী নির্ণয় ঠানী।
অস্থির ঘর কা মরম ন পাবৈঁ, য়ে বারা পন্থ হমহী কো ধ্যাবৈঁ।
বারবেঁ পন্থ হম হী চলি আবৈঁ, সব পন্থ মেটি এক হী পন্থ চলাবেঁ।
ধর্মদাস মোরী লাখ দোহাঈ, সার শব্দ বাহর নহীঁ জাঈ।
সার শব্দ বাহর জো পরহী, বিচলী পীঢ়ী হংস নহীঁ তরহীঁ।
তেতিস অর্ব জ্ঞান হম ভাখা, সার শব্দ গুপ্ত হম রাখা।
মূল জ্ঞান তব তক ছুপাঈ, জব লগ দ্বাদস পন্থ মিট জাঈ।

এখানে সাহেব কবীর জী নিজের শিষ্য ধর্মদাসকে বুঝিয়েছেন যে, সংবত ১৭৭৫ এ আমার জ্ঞানের প্রচার হবে যা ১২ তম পন্থ হবে। ১২ তম পন্থে আমাদের বাণী প্রকট হবে, কিন্তু সঠিক ভক্তি মার্গ থাকবে না। তারপর ১২-তম পন্থে আমি নিজেই চলে আসবো, আর সমস্ত পন্থকে মিটিয়ে কেবল একটি পন্থ চালাবো, কিন্তু ধর্মদাস! তোমার কাছে লাখ লাখ বার শপথ (সৌগন্ধ) করে বলছি, এই সারশব্দ কোনো কুপাত্রকে কখনো দেবেনা, তা না হলে কলিযুগের মধ্যকালীন (বিচলী পীঢ়ী) হংস আত্মারা পার হতে পারবে না, এই জন্য যতদিন না ১২-তম পন্থ মিটে গিয়ে এক পন্থ না চলবে, ততোদিন এই মূলজ্ঞান লুকিয়ে রাখবো।

সন্ত গরীবদাস জী মহারাজের বাণীতে নামের মাহাত্ম্য :-

নাম অভয়পদ উঁচা সন্তোঁ, নাম অভয়পদ ঊঁচা।
রাম দুহাঈ সাচ কহত হুঁ, সতগুরু সে পুছা॥
কহৈ কবীর পুরুষ বরিয়ামঁ, গরীবদাস এক নৌকা নামঁ॥
নাম নিরঞ্জন নীকা সন্তোঁ, নাম নিরঞ্জন নীকা।
তীর্থ ব্রত থোথরে লাগে, জপ তপ সংজম ফীকা।
গজ তুরক পালকী অর্থা, নাম বিনা সব দানঁ ব্যর্থা।
কবীর, নাম গহে সো সন্ত সুজানা, নাম বিনা জগ উরঝানা।
তাহি না জানে এ সংসারা, নাম বিনা সব জম কে চারা॥

(সন্ত নানক সাহেবের বাণীতে নামের মাহাত্ম্য)

নানক নাম চঢদী কলাঁ, তেরে ভানে সরবত দা ভলা।

নানক দুখিয়া সব সংসার, সুখিয়া সোয় নাম আধার।
জাপ তাপ জ্ঞান সব ধ্যান, ষট শাস্ত্র সিমরত ব্যাখান।
জোগ অভ্যাস কর্ম ধর্ম সব ক্রিয়া, সকল ত্যাগ বন মধ্য ফিরিয়া॥
অনেক প্রকার কিএ বহুত যত্না, দান পুণ্য হোমৈ বহু রত্না।
শীশ কটায়ে হোমৈ কর রাতি, ব্রত নেম করে বহু ভাঁতি॥
নহীঁ তুল্য রাম নাম বিচার, নানক গুরু মুখ নাম জপিয়ে একবার॥

(পরম পূজ্য করীর সাহেব (কবীর দেব) এর অমৃতবাণী)

সন্তো শব্দঈ শব্দ বখানা॥ টেক॥ শব্দ ফাঁস ফঁসা সব কোঈ শব্দ নহীঁ পহচানা। প্রথমহিঁ ব্রহ্ম স্বঁ ইচ্ছা তে পাঁচৌ শব্দ উচারা। সোহং, নিরঞ্জন, ররংকার শক্তি ঔর ওঁকারা। পাঁচৌ তত্ত্ব প্রকৃতি তিনোঁ গুণ উপজায়া॥ লোক দ্বীপ চারোঁ খান চৌরসী লখ বনায়া॥ শব্দই কাল কলন্দর কহিয়ে শব্দই ভর্ম ভুলায়া॥ পাঁচ শব্দ কী আশা মেঁ সর্বস মূল গঁবায়া। শব্দই ব্রহ্ম প্রকাশ মেঁট কে বৈঠে মূঁদে দ্বারা॥ শব্দই নিরগুণ শব্দই সরগুণ শব্দই বেদ পুকারা॥ শুদ্ধ ব্রহ্ম কায়া কে ভীতর বৈঠ করে স্থানা। জ্ঞানী যোগী পন্ডিত ঔ সিদ্ধ শব্দ মেঁ উরঝানা॥ পাঁচই শব্দ পাঁচ হৈঁ মুদ্রা কায়া বীচ ঠিকানা। জো জিহংসক আরাধন করতা সো তিহি করত বখানা॥ শব্দ নিরঞ্জন চাঁচরী মুদ্রা হৈ নৈনন কে মাঁহী। তাকো জানে গোরখ যোগী, মহাতেজ তপ মাঁহী॥ শব্দ ওঙ্কার ভূচরী মুদ্রা ত্রিকুটী হৈ স্থানা। ব্যাস দেব তাহি পহিচানা চাঁদ সূর্য তিহি জানা। সোহং শব্দ অগোচরী মুদ্রা ভঁবর গুফা স্থানা। শুকদেব মুনী তাহি পহিচানা সুন অনহদ কো কানা॥ শব্দ ররঙ্কার খেচরী মুদ্রা দসবেঁ দ্বার ঠিকানা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ আদি লো ররঙ্কার পহিচানা॥ শক্তি শব্দ ধ্যান উনমুনী মুদ্রা বসে আকাশ সনেহী। ঝিলমিল ঝিলমিল জোত দিখাবে জানে জনক বিদেহী॥ পাঁচ শব্দ পাঁচ হৈঁ মুদ্রা সো নিশ্চয় কর জানা। আগে পুরুষ পুরান নি:অক্ষর তিনকী খবর ন জানা॥ নৌ নাথ চৌরাসী সিদ্ধি লো পাঁচ শব্দ মেঁ অটকে। মুদ্রা সাধ রহে ঘট ভীতর ফির ওন্ধে মুখ লটকে॥ পাঁচ শব্দ পাঁচ হৈ মুদ্রা লোক দ্বীপ যমজালা। কহৈঁ কবীর অক্ষর কে আগে নি:অক্ষর কা উজিয়ালা॥

যেমন এই শব্দের মধ্যে "সন্তো শব্দই শব্দ বখানা"-তে লেখা আছে যে, সকল সন্তজন শব্দের (নামের) মহিমা শোনায়। পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর সাহেব জী বলেছেন যে, শব্দ সত পুরুষেরও আছে, যা সতপুরুষের প্রতীক এবং জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালের) প্রতীকও শব্দই, যেমন জ্যোতি নিরঞ্জনের শব্দ যা চাঁচরী মুদ্রাকে প্রাপ্ত করায়, এটি গোরক্ষনাথ যোগী অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করে প্রাপ্ত করেছে, যা সাধারণ ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে, আর তারপর গোরক্ষনাথ কাল পর্যন্ত সাধনা করে সিদ্ধ লাভ করেন; কিন্তু মুক্ত হতে পারেনি। যখন কবীর সাহেব সত্যনাম এবং সারনাম প্রদান করলেন, তখন গোরক্ষনাথ কালের থেকে মুক্ত হলেন, এই জন্য জ্যোতি নিরঞ্জন নামের জপ করা ব্যক্তিরা কালের জাল থেকে মুক্ত হতে পারবে না অর্থাৎ সত্যলোকে যেতে পারবে না। ওঙ্কার (ওম্) শব্দের জপ করে সাধক ভূঞ্চরী মুদ্রা স্থিতিতে চলে আসে, এই সাধনা ঋষি বেদ-ব্যাস করেছিলেন আর কাল জালে রয়ে গিয়েছিলেন। সোহং নামের জপে অগোচরী মুদ্রার স্থিতি হয়ে যায়, আর কাল লোকে বানানো ভঁবর গুহাতে পৌঁছে যায়। এই সাধনা সুখদের ঋষি করেছিলেন, যার প্রতিফলে কেবল মাত্র শ্রী বিষ্ণুর লোকে বানানো স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন। ররংকার শব্দ খৈঁচরী মুদ্রা স্থিতিতে দশম দ্বার (সুষ্মণা) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ তিনজনই ররংকার-কেই সত্য মনে করে কালের জালের মধ্যে ভ্রমিত হয়ে রয়ে যায়, শক্তি (শ্রীয়ম্) শব্দ উনমনী মুদ্রাকে প্রাপ্ত করায়, যা রাজা জনক প্রাপ্ত করেছিল, কিন্তু মুক্তি হয়নি। কিছু সন্ত পাঁচ নামের মধ্যে শক্তির জায়গায় সত্যনামকে জুড়ে দিয়েছে, অথচ সত্যনাম কোনো জপ নয়। এটি তো শুধুমাত্র

প্রকৃত (সাচ্চা) নামের দিকে ইশারা করে, যেমন সত্যলোককে সচ্চখণ্ডও বলা হয়, ঠিক এমনটাই সত্যনাম বা সাচ্চানাম। কেবল সত্যনাম-সত্যনাম জপ করার জন্য নয়। এই পাঁচ শব্দের সাধনা করা নয়জন নাথ এবং চুরাসি জন সিদ্ধ পুরুষও এই পর্যন্তই সীমিত থাকে এবং শরীরের মধ্যেই (ঘট মেঁ) ধ্বনি শুনে- শুনে আনন্দ নিতে থাকে। বাস্তবে সত্যলোক স্থান তো শরীর (পিণ্ড) থেকে (অণ্ড) ব্রহ্মাণ্ড থেকেও (পারে) দূরে অবস্থিত। এই জন্য তো মায়ের গর্ভে ফিরে আসে (উল্ট ভাবে ঝুলে থাকে) অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট সমাপ্ত হয়নি। এই (ঘট) শরীরের মধ্যে যা কিছুই উপলব্ধি হবে, তা সবকিছু কাল (ব্রহ্ম) পর্যন্ত'ই সীমিত, কারণ পূর্ণ পরমাত্মার নিজ স্থান (সত্যলোক) এবং তাঁর নিজের শরীরের প্রকাশ তো ব্রহ্ম-পরব্রহ্ম প্রভৃতির থেকেও অধিক এবং বহু দূরে অবস্থিত। তার জন্য তো পূর্ণ সন্তই সম্পূর্ণ সাধনা বলবেন, যা এই পাঁচ নাম (শব্দ) থেকে ভিন্ন।

সন্তো সতগুরু মোহে ভাবৈ, জো নৈনন অলখ লখাবৈ।
ঢোলত ঢিগৈ না বোলত বিসরৈ,সত উপদেশ দৃঢ়াবৈ॥
আঁখ না মুঁদৈ কান না রুদৈঁ, না অনহদ উরঝাবৈ।
প্রানপূঞ্জ ক্রিয়াওঁ সে ন্যারা, সহজ সমাধি বতাবৈ॥

ঘট রামায়নের লেখক আদরণীয় তুলসীদাস সাহেব জী হাথরস ওয়ালা স্বয়ং বলেছেনঃ- (ঘট রামায়ণ প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা নং ২৭)

পাঁচোঁ নাম কাল কে জানৌ তব দানী মন সঙ্কা আনৌ।
সুরতি নিরত লৈ লোক সিধাউঁ, আদি নাম লে কাল গিরাউঁ।
সতনাম লে জীউ উবারী, অস চল জাউঁ পুরুষ দরবারী॥
কবীর, কোটি নাম সংসার মেঁ। ইনসে মুক্তি ন হো।
সার নাম মুক্তি কা দাতা, বাকো জানে ন কোএ॥
পুরা সতগুরু সোয়ে কহাবৈ, দোয় অখর কা ভেদ বতাবৈ।
এক ছুড়াবৈ এক লখাবৈ, তো প্রাণী নিজ ঘর জাবৈ॥

গুরু নানক জীর বাণীতে তিন নামের প্রমাণ :-

জৈ পণ্ডিত তু পঢ়িয়া, বিনা দুউ অক্ষর দুউ নামা।
পরণবত নানক এক লংঘাএ, জে কর সচ সমাবা।
বেদ কতেব সিমরিত সব সাঁসত, ইন পঢি মুক্তি ন হোঈ।
এক অক্ষর জো গুরু মুখ জাপৈ, তিস কি নির্মল হোঈ॥

ভাবার্থ:- গুরু নানক জী মহারাজ নিজের বাণী দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, পূর্ণ সতগুরু তিনি, যিনি দুই অক্ষরের জপের বিষয়ে জানেন। যার মধ্যে একটি কাল ও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, আর অন্যটি পরমাত্মাকে দেখায়, আর তৃতীয় যে একটি অক্ষর আছে, তা পরমাত্মার সাথে সাক্ষাৎকার করায়।

সন্ত গরীব দাস জী মহারাজের অমৃতবাণীতে শ্বাসের মাধ্যমে নাম জপ করার প্রমাণ:-

গরীব, স্বাঁসা পারস ভেদ হমারা, জো খোজে সো উতরে পারা।
স্বাঁসা পারা আদি নিশানী, জো খোজে সো হোএ দরবানী।
গরীব,স্বাঁসা হী মেঁ সার পদ, পদ মেঁ স্বাঁসা সার।
দম দেহী কা খোজ করো, আবাগমন নিবার॥
গরীব, স্বাঁস সুরতি কে মধ্য হৈ, ন্যারা কদে নহীঁ হোয়।
সতগুরু সাক্ষী ভূত কুঁ, রাখো সুরতি সমোয়॥
গরীব, চার পদার্থ উর মেঁ জোবৈ, সুরতি নিরতি মন পবন সমোবৈ।
সুরতি নিরতি মন পবন পদার্থ (নাম) করো ইব্তর য়ার॥

দ্বাদস অন্দর সমোয় লে. দিল অন্দর দীদার॥
কবীর কহতা হুঁ কহি জাত হুঁ, কহুঁ বজাকর ঢোল।
স্বাস জো খালী জাত হৈ, তীন লোক কা মোল॥
কবীর মালা স্বাঁস উস্বাঁস কী,ফেরেঙ্গে নিজ দাস।
চৌরাসী ভ্রমে নহীঁ, কটেঁ কর্ম কী ফাঁস॥

গুরু নানক দেব জীর বাণীতে প্রমাণ:-

চহউঁ কা সঙ্গ, চহউঁ কা মীত, জামৈ চারি হটাবৈ নিত।
মন পবন কো রাখৈ বন্দ, লহে ত্রিকুটি ত্রিবেণী সন্ধ॥
অখন্ড মণ্ডল মেঁ সুন্ন সমানা, মন পবন সচ্চ খন্ড টিকানা॥

পূর্ণ সতগুরু তিনি হন, যিনি তিন বারে নাম দীক্ষা দেন, আর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাথে সুমিরনের বিধি বলবেন, তখনই জীবের মোক্ষ (মুক্তি) সম্ভব। যেমন পরমাত্মা সত্য, ঠিক তেমনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার এবং মোক্ষ প্রাপ্ত করার বিধিও আদি অনাদি এবং সত্য, যা কখনো বদলায় না। গরীব দাস্ জী মহারাজ নিজের বাণীতে বলেছেন:-

ভক্তি বীজ পলটৈ নহীঁ, যুগ জাঁহী অসংখ।
সাঁঈ সির পর রাখিয়ো, চৌরাসী নহীঁ শঙ্ক॥
ঘীসা আএ একো দেশ সে, উতরে একো ঘাট।
সমঝোঁ কা মার্গ এক হৈ, মূর্খ বারহ বাট॥
কবীর ভক্তি বীজ পলটৈ নহীঁ, আন পড়ৈ বহু ঝোল।
জৈ কাঞ্চন বিষ্টা পরৈ, ঘটে ন তাকা মোল॥

অনেক মহাপুরুষ সত্যনামের বিষয়ে জানে না। তাঁরা মনমতো নাম দেয় যাতে না সুখ হয় না মুক্তি পায়। কেউ বলে তপ হবন, যজ্ঞ ইত্যাদি করো। আবার কোন মহাপুরুষ চোখ, কান আর মুখ বন্ধ করে ভিতরে ধ্যান লাগানোর কথা বলে, যা তাদের মনমুখী সাধনার প্রতীক। কবীর সাহেব, সন্ত গরীবদাস জী মহারাজ, গুরু নানকদেব ইত্যাদি পরম সন্ত এই সকল ক্রিয়া করতে নিষেধ করেছে একমাত্র সত্য নাম জপ করতে বলেছে।

একজন নস্ত্রেদামস নামক ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন। যার সকল ভবিষ্যৎবাণী গুলি সত্য হচ্ছে, যেগুলি প্রায় চারশো বছর পূর্বে লেখা এবং বলা হয়েছিল। উনি বলেছিলেন যে, সন ২০০৬ একজন হিন্দু সন্ত প্রকট হবেন অর্থাৎ সংসারে ওনার চর্চা শুরু হবে, ঐ সন্ত না তো মুসলমান হবেন, না খ্রীষ্টান হবেন; তিনি কেবল হিন্দুই হবেন, ওনার দ্বারা বলা ভক্তি মার্গ সকলের থেকে ভিন্ন এবং তথ্যের উপর আধারিত হবে। ওনাকে জ্ঞানে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। সন্ ২০০৬ এ ওই সন্তের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হবে। (রামপাল জী মহারাজের জন্ম সন্ ১৯৫১-তে হয়েছিল। ৮-ই সেপ্টেম্বর ২০05 সালের জুলাই মাসে সন্ত জীর বয়স ঠিক ৫৫-বছর পূর্ণ হয়েছিল, যা ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে একদম সঠিক।) ঐ হিন্দু সন্তের দ্বারা বলা জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সংসার স্বীকার করবে। ঐ হিন্দু সন্তের অধ্যক্ষতায় সমগ্র সংসারে কেবল ভারতবর্ষের শাসন হবে, এবং ঐ সন্তের আজ্ঞায় সমস্ত কার্য সম্পন্ন হবে। ওনার আকাশ ছোঁয়া মহিমা হবে। নস্ত্রেদামস দ্বারা বলা সাংকেতিক মহাপুরুষ হলেন সন্ত রামপাল জী মহারাজ, যিনি সন্ ২০০৬-এ বিখ্যাত হয়েছিলেন। যদিও অজ্ঞানীরা তাকে মিথ্যা দোষ দিয়ে প্রসিদ্ধ করেছিল, কিন্তু সন্তের মধ্যে কোনো দোষ নেই। উপরোক্ত লক্ষনগুলি যা বলা হয়েছে তা সবকিছু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল জী মহারাজের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

❑❑❑

"সন্তকে দূঃখী করার সাজা"

শ্রদ্ধেয় গরীবদাস সাহেবের জন্ম হরিয়ানার ঝজ্জর জেলার অন্তর্গত পবিত্র গ্রাম ছুড়ানীতে, শ্রী বলরাম জী ধনখড়ের (জাট) ঘরে হয়। ১৭২৭ সালে পূর্ণব্রহ্ম কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) সতলোক (ঋতধাম) থেকে সশরীরে এসে আপনাকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং আপনার জীব আত্মাকে সত্যলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে গরীব দাস জী মহারাজের পরিবার পরিজনেরা ওনাকে মৃত মনে করে ওনার শরীরকে সৎকারের জন্য চিতার উপরে তুলে দিয়েছিল। ঠিক ঐ সময় কবির্দেব আপনার জীবাত্মাকে পুনরায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। তারপর শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জীও স্বচক্ষে দেখা পরম পূজ্য কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বর) মহিমা প্রতিটি মানুষকে শোনাতে শুরু করেন। যে কোনো দুঃখী প্রাণী যখন আপনার থেকে নাম - উপদেশ প্রাপ্ত করে, তখনই সে সুখী হয়ে যায়। আপনার বেড়ে চলা মহিমা এবং তত্ত্বজ্ঞানের সামনে অন্যান্য গুরুদের (আচার্যদের) অজ্ঞানতার মুখোশ খুলে যাওয়াতে আশে-পাশের সমস্ত নকল অজ্ঞানী গুরুরা (আচার্যরা) আপনার প্রতি অত্যধিক ঈর্ষ্যা করতে লাগে। আশে পাশের গ্রামের প্রধান প্রধান চৌধুরীদের (মোড়ল-মাতব্বরদের) ভুল বুঝিয়ে ভ্রমিত করে দেয়, যার কারণে আশে-পাশের গ্রামের সাধারণ ব্যক্তিরা কবীর প্রভুর প্রিয় পুত্র শ্রদ্ধেয় গরীব দাসজীকে ঘৃণা করতে লাগে।

দিল্লীর বাজীদপুর গ্রামে আপনার একজন শিষ্য ছিল। তাঁর প্রতিও তার গ্রামের লোক ঈর্ষা করতো। ঐ শিষ্যের প্রার্থনায় আপনি কিছুদিনের জন্য বাজীদপুর গ্রামে রয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় পঙ্গপালের দল এসে আশে-পাশের অঞ্চলের সমস্ত বাজরা ফসল নষ্ট করে দেয়, কিন্তু আপনার সেবকের ফসলে কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। সমস্ত গ্রামবাসী সন্ত গরীব দাস জী মহারাজের মহিমায় অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং জ্ঞান স্বীকার করে নিজেদের আত্ম কল্যান করালেন।

আপনার আদেশে আপনার ভক্ত ঐ বাজরা সম্পূর্ণ গ্রামে বিতরণ করে দিয়েছিল এবং গরীব দাস জী মহারাজের বার-বার মানা করা সত্ত্বেও কিছু বাজরা মহারাজ জীর গরুর গাড়ীতে তুলে দেয় এবং বললেন, প্রত্যক মাসের পূর্ণিমাতে আপনি তো ভাণ্ডারা করান, ঐ সেবাতে আপনার এই দাসেরও দান হয়ে যাবে। ভক্তের শ্রদ্ধা রেখে আপনি তাকে স্বীকৃতি প্রদান করলেন (শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জীর চারপুত্র এবং দুই কন্যা সন্তান রূপে ছিল এবং প্রায় ১৩০০ একর জমির মালিকও ছিলেন)। ঐ গরুর গাড়িতে বসে আপনি ছুড়ানী গ্রামের দিকে রওনা দিলেন। এমন সময় যখন কাণৌঁদা গ্রামের কাছে গরুরগাড়ী পৌঁছলো, তখন রাস্তাতে আগে থেকেই সুপরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে স্বার্থপর গুরুরা (আচার্যরা) সন্ত গরীব দাসজী মহারাজকে ঘিরে ফেলে। তারপর সমস্ত বাজরা লুট করে নেন এবং তারাই সেই গ্রামের চৌধুরী (প্রধান) ছাজুরাম ছিক্কারাকে খবর দিয়ে দেয় যে, তারা হিন্দু ধর্মের দ্রোহীকে ধরে রেখেছে। চৌধুরী ছাজুরাম জীর আদেশে গরীব দাসজী মহারাজকে বাজারে বেঁধে রেখেছিল। চৌধুরী ছাজুরাম ছিক্কারা জী সরকারের তরফ থেকে কিছু প্রশাসনিক অধিকার পেয়েছিল। ছয় মাসের সাজা, পাঁচশো টাকা জরিমানা এবং মহাদোষীকে কাঠে বন্দী করে রাখা প্রভৃতি সম্মিলিত ছিল।

ঐ ধর্মের অজ্ঞানী ঠিকেদাররা (গুরুরা-আচার্যরা) আগে থেকেই মিথ্যা কথা বলে ভ্রমিত করে চৌধুরী ছাজুরাম ছিক্কারা জী দ্বারা ঐ পরম শ্রদ্ধেয় গরীব দাসজী মহারাজকে কাষ্ঠে বন্দী করে দেয় (কাঠে বন্দী করা, এটি কারাগারের এক প্রকার কঠিন সাজা ছিল, দুটি পায়ের হাঁটুর উপরে দুটি কাঠের মোটা দন্ড বেঁধে দিয়ে হাত দুটিকে পিছন দিক দিয়ে বেঁধে দেওয়া হতো, যার কারণে ব্যক্তিটি কখনো বসতে পারতো না, পা ফুলে

যেত)। গরুর গাড়িটি পুনঃরায় খালি অবস্থায় বাজীদপুর গ্রামে ফিরে যায়, যা কাণোঁদা গ্রাম থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে ছিল। এই খবর জানতে পেরে বাজীদপুর গ্রামের কিছু মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিরা ততক্ষনাৎ কর্ণোঁদা গ্রামে পৌঁছে যায় এবং চৌধুরী ছাজুরাম জীর কাছে প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে অনেক বোঝান যে, ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, ইনি পরমশক্তি সম্পন্ন। আপনি ওনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। চৌধুরী ছাজুরাম জী অত্যন্ত পবিত্র আত্মা এবং খুব দয়ালু খুব নম্র হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ঐ স্বার্থপর ও প্রভুত্বের লোভী গুরুরা (আচার্যরা) ঐ পুণ্য আত্মা শ্রী ছাজুরাম ছিক্কারা জীকে মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে পরমাত্মার প্রিয় পুত্র শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজের প্রতি অত্যাধিক বিদ্বেষ ভাব তৈরী করে দিয়েছিল। যার কারণে চৌধুরী ছাজুরাম জী বিনা কারণে না জেনে সরাসরি সাজা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। বাজীদপুর গ্রামের ভক্তদের প্রার্থনা মেনে নিয়ে শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজকে ছেড়ে দেন। শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী সাহেবজী কোনো কিছু না বলে নিজের গ্রাম ছুড়ানীতে চলে আসেন। কিছুদিন পর চৌধূরী ছাজুরাম জী খুব সকালে পায়খানা করতে (ফ্রেশ হতে) পুকুর পাড়ে যায়। তখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুজন লোক এসে তার দুই হাত কেটে দিয়ে ওনার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দৃশ্য পুকুরপাড়ে উপস্থিত ব্যক্তিরাও দেখতে পায়। অনেক চিকিৎসা করার পরেও যন্ত্রনা এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। কিছুদিন পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রনায় খুব চিৎকার করতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি ওনাকে বলেন, ঐ সন্ত গরীবদাস জী মহারাজের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উনি খুব দয়ালু। পরিবারের লোকেরা চৌধূরীকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে ছুড়ানী গ্রামে নিয়ে যায়। শ্রী ছাজুরাম জী ওখানে যেতেই শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজের চরণে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সন্ত গরীবদাস জী মহারাজ আর্শীবাদ ও নাম উপদেশ দেন এবং আজীবন ভক্তি করতে বলেন। চৌধূরী ছাজুরাম জী বলেন, দাতা! আপনার বিষয়ে আমাকে অত্যাধিক ভ্রমিত করে রাখা হয়েছিল।

আমি জানতাম না আপনি পূর্ণ পরমাত্মা এসেছেন। শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী বললেন, আমি পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব (কবির্দেব) জোলার (তাঁতির) পাঠানো দাস। ওনারই শক্তিতে আপনি ঠিক হয়েছেন। আমি আপনাকে কোনো অভিশাপ দিইনি। আপনার কর্মফল'ই আপনি পেয়েছেন। যদি এখানে না আসতেন, তাহলে আপনার পরিবারের উপরও পাপের প্রভাব ছিল, এখন তাও আর থাকবে না, কারণ আপনি উপদেশ নিয়ে নিয়েছেন। চৌধূরী ছাজুরাম জী নিজের পুরো পরিবারকে উপদেশ দেওয়ায়। আজও ঐ পুণ্যাত্মা ছাজুরাম জীর বংশধরেরা শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজের পরম্পরাগত পূজা করে আসছে। এরকম প্রায় হাজারটি পরিবার ওখানে বসবাস করে, যাদেরকে "ছাজুবাড়া" বলা হয়, কারণ:-

তুমনে উস দরগাকা মহল না দেখা। ধর্মরায়কে তিল-তিল কা লেখ॥
রাম কহৈ মেরে সাধ কো, দুঃখ না দিজো কোএ ।
সাধ দুঃখায় মৈঁ দু:খী, মেরা আপা ভী দু:খী হোয়॥
হিরণ্যকশিপু উদর (পেট) বিদারিয়া, মৈঁহী মারয়া কংশ।
জো মেরে সাধু কো সতাবৈ, বাকা খো দূঁ বংশ॥
সাধ সতাবন কোটি পাপ হৈ, অনগিন হত্যা অপরাধ।
দুর্বাসা কী কল্প কাল সে, প্রলয় হো গএ যাদব॥

উপরোক্ত বাণীর মধ্যে সদগুরু গরীবদাস জী সাহেব প্রমাণ দিয়েছেন যে, পরমেশ্বর বলেন, আমার সন্তকে কখনো দুঃখী করো না। যে আমার সন্তকে দুঃখী করে, বুঝবে, সে আমাকেও দুঃখী করে। যখন আমার ভক্ত প্রহ্লাদকে দুঃখী করা হয়েছিল, তখন আমি হিরণ্যকশিপুরের পেট চিরে দিয়েছিলাম এবং আমিই কংসকে বধ করেছিলাম।

যে আমার সাধুকে দুঃখী করবে, আমি তার বংশ শেষ করে দেব। এইজন্য সাধু-সন্তকে কষ্ট দিলে কোটি-কোটি পাপ লাগে, অগণিত হত্যা করলে যেমন পাপ হয়। এই অজ্ঞানী লোকেরা পরমাত্মার সংবিধানের সাথে পরিচিত নয়। এইজন্য ভয়ংকর ভুল করে ফেলে আর পাপের সাজা ভোগ করতে থাকে। সাধুকে কষ্ট দিলে নিম্নের সাজা প্রাপ্ত হয়।

যদি কোন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে পরের জন্মে সেই অন্য ব্যক্তি দ্বারা নিজের মৃত্যু হয়ে গেলে, তা পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু সাধু-সন্তকে কষ্ট দিলে তার খুব কঠিন সাজা (দণ্ড) প্রাপ্ত হয়, যা অনন্ত জন্ম ধরেও শেষ হয় না। সতগুরু নিজের বাণীতে বলেন যে :-

অর্ধমুখী গর্ভবাস মেঁ হরদম বারম্বার, জূনী ভূত পিশাচ কী, জব লগ সৃষ্টি সংহার।

এমন অপরাধ করা ব্যক্তিদেরকে পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর যোনীতে বার-বার মায়ের গর্ভে ফেলে দেয়, অর্থাৎ তারা জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই বারংবার মারা যায়, আর যতদিন না পর্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় না হয়ে যায়, ততদিন পর্যন্ত ভূত-পিশাচের যোনীতে ও মায়ের গর্ভে মহা কষ্টে থাকে, যা খুবই দুঃখদায়ী হয়। আর ততদিন পর্যন্ত তার ক্ষমা হয় না, যতদিন না সেই দুঃখী হওয়া সন্ত স্বয়ং ক্ষমা করে না দেন।

একবার দুর্বাসা ঋষি অহংকার বশত অম্বরীষ ঋষিকে মারার জন্য নিজের শক্তির প্রভাবে একটি সুদর্শন চক্র ছেড়ে দিয়েছিল। সুদর্শন চক্রটি অম্বরীষ ঋষির চরণ ছুঁয়ে দুর্বাসা ঋষিকে মারার জন্য দুর্বাসা ঋষির দিকে ফিরে আসে। দুর্বাসা ঋষি বুঝতে পারেন যে, আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু বেশি সময় হাতে নেই দেখে; দুর্বাসা ঋষি সুদর্শন চক্রের আগে আগে পালাতে লাগলেন। পালাতে পালাতে শ্রী ব্রহ্মার কাছে গেলেন আর বললেন, হে ভগবান! কৃপা করে আপনি আমাকে এই সুদর্শন চক্রের হাত থেকে বাঁচান। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, ঋষি জী! এটা আমার সামর্থ্যের বাইরে। নিজের মাথার উপর থেকে আপদ সরিয়ে দিয়ে বললেন যে, আপনি ভগবান শংকরের কাছে যান, উনিই আপনাকে বাঁচাতে পারেন। এই কথা শুনেই দুর্বাসা ঋষি ভগবান শংকরের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং বললেন, হে ভগবান! কৃপা করে আপনি আমাকে এই সুদর্শন চক্রের হাত থেকে রক্ষা করুন। এই কথা শুনে ভগবান শিবও ব্রহ্মার মতো আপদ বিদায় করার জন্য বললেন যে, আপনি শ্রীবিষ্ণু ভগবানের কাছে যান, উনিই আপনাকে বাঁচাতে পারেন। কোন উপায় না দেখে দুর্বাসা ঋষি ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, হে ভগবান! আপনি আমাকে এই সুদর্শন চক্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন, তা না হলে এ আমাকে কেটে মেরে ফেলবে। এ কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন, হে ঋষি জী! এই সুদর্শন চক্র কেন আপনাকে মারতে চাইছে? দুর্বাসা ঋষি উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তারপর শ্রীবিষ্ণু বললেন, হে দুর্বাসা ঋষি! যদি আপনি অম্বরীষ ঋষির চরণ ধরে ক্ষমা চান, তাহলে এই সুদর্শন চক্র আপনার প্রাণ ভিক্ষা দিতে পারে; অন্যথায় আমি কেন, কোনো দেবতাও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না! এর অন্য কোন বিকল্পই নেই। "মরতা ক্যায়া নহীঁ করতা!" অর্থাৎ "দায় পড়লে সবকিছুই সম্ভব"। তখন দুর্বাসা ঋষি ফিরে এসে অম্বরীষ ঋষির চরণ জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন আর হৃদয় থেকে ক্ষমা চাইলেন। তখন অম্বরীষ ঋষি সুদর্শন চক্র নিজের হাতে ধরে নিয়ে দুর্বাসা ঋষিকে দিয়ে বললেন যে, সন্ত ঋষিদের সাথে কখনো এমন দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়। এর পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হয়।

শ্রী কৃষ্ণ গুরু কসনী হুই ঔর বাঁচেগা কোন॥

যখন শ্রীকৃষ্ণের গুরু শ্রী দুর্বাসার মতো ঋষিদের এমন অবস্থা হয়েছে, তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে রক্ষা পাবে?

❑❑❑

"পথ হারা পথিকের পথের সন্ধান"

"ভক্ত সমাজ প্রভুর আসল ভক্তি থেকে অনেক দূরে"

"সতলোক আশ্রম করোঁথা, জেলা-রোহতক, হরিয়াণা-তে কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বর) প্রকট দিবস উপলক্ষে পাঁচ দিবসীয় (১৮ থেকে ২২ জুন ২০০৫) সত্সঙ্গ সমারহে ভক্ত বসন্ত সিংহ সৈনী নিজের কাহিনী বলেন, কৃপা করে নিম্নে তা পড়ুন:-

"প্রভু পিপাসু ভক্ত বসন্ত সিংহ সৈনীর বাস্তবিক মার্গ দর্শন"

আমি বসন্ত সিংহ সৈনী, বর্তমানে আমি হরিয়াণার রোহতক জেলার, গন্ধরা গ্রামের নিবাসী। আমার পুরানো ঠিকানা - এস ১৬১ পান্ডব নগর, নিকটবর্তী মাদর ডেয়রী, যমুনা পার্ক, দিল্লী-৯২। আমাদের পরিবারের উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু পরমাত্মাকে পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা এবং দুঃখ নিবারনের জন্য সন্ত ও মহন্তদের সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক রাখতাম। কিন্তু কোন জায়গায় আমার দুঃখ নিবারন হয়নি। অবশেষে এক বিখ্যাত সন্ত আসারাম বাপুর সঙ্গে দেখা করি। তখন দিল্লীতে আসারাম বাপুর প্রায় এক হাজারের মত শিষ্য ছিল। যার কারণে খুব কাছ থেকে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আমি আমার দুঃখ ও পরমাত্মাকে পাওয়ার ইচ্ছা তার সামনে প্রকট করি। শ্রী আসারাম বাপু আমাকে ৭ মন্ত্র (ঔম গুরু, হরি ওম্, ওঁ য়েং নমঃ, ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নম ভগবতে বাসুদেবায়, হ্রীংরামায় নমঃ ও গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি) দিয়ে বলে, এর মধ্যে যে কোন একটি মন্ত্র বেছে নাও এবং সোহং মন্ত্র শ্বাসের দ্বারা একশো বার বাইরে ও একশো বার ভিতরে জপ করবে। একাদশী ও পূর্ণীমার ব্রত, সোমবারের ব্রত এবং অষ্টমীর ব্রত করতে বলে। যত বেশি সম্ভব ত্রিবন্ধ প্রানায়াম ও সিদ্ধাসনে বসে ধ্যান লাগানো ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করতে বলে। আমি মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে মহাত্মাজীর সামনে কেঁদে বলি "আমার জ্যাঠার মৃত্যু ৪০ বৎসর পূর্বে হয়েছে কিন্তু তিনি অনেক বড় প্রেত হয়ে গিয়েছে। ঐ প্রেত আমার দুই ভাইকে মেরে ফেলেছে, আট দশটি মহিষকে মেরেছে, পাঁচ-ছয়টি গাভীকে মেরেছে। পশুদের কোন বাচ্চা জীবিত থাকে না। বাড়িতে প্রায়ই অসুখ বিসুখ লেগে থাকে। দুঃখের জন্য কোন কাজ কর্মও হয় না, হলেও তা চলতেও দেয় না। এখন ওই প্রেত বলছে, তোর পিতাকে নিয়ে যাব। আমি বাপুজীর কাছে প্রার্থনা করি, গুরুজী! আমাকে বাঁচান। কিন্তু ৬ মাসের ভিতর ওই প্রেত আমার পিতাকে নিয়ে যায়। বাপুজী বলে, যা হবার তা তো হবেই। গৃহপালিত পশু, ধন হানী ও শরীরিক কষ্ট এই সবই পাপের ভোগ, ইহা জীবের ভাগ্যে লেখা থাকে। তাই পাপের ফল ভুগতেই হবে। তুমি ভক্তি করো! পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য ভক্তিতে লেগে থাকো। বাপুজী বোঝানোর পরে আমি পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য তন-মন-ধন (বসন্ত দাস) দিয়ে ভক্তি করতে থাকি। সর্বপ্রথম শ্রী আসারাম বাপুর দিল্লীর আশ্রমে ৪০ দিনের অনুষ্ঠান মহন্ত নরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পরামর্শে করি। পরে আসারাম বাপুর পংচেড় আশ্রমে রতলামে মধ্যপ্রদেশে মহন্ত কাকাজীর দ্বারা ছয়টি অনুষ্ঠান করি। তাঁর পরে আর দুইটি অনুষ্ঠান গুজরাটের সমরবর্তী আমদাবাদ আশ্রমে মৌন মন্দিরে করি। ওখানে শ্রী আসারাম বাপুর সহিত ভালভাবে কথা বলার সুযোগ পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, বাপুজী যে পরমাত্মার জন্য আমি তথা সর্ব ভক্ত সমাজ ভক্তিতে লেগে আছি সেই পরমাত্মা কে? তিনি কেমন? তিনি কোথায় থাকেন? কৃপা করে বলুন।

এই কথা শুনে বাপুজী বলে তুমি ভক্তিতে লেগে থাক! সব জানতে পারবে। আর বলে প্রতি দিন গীতার এক অধ্যায় পাঠ করবে। যদি আমার দর্শন করার ইচ্ছা হয়, তাহলে এক বিশেষ ক্রিয়া বলছি। তিন দিন পর্যন্ত এক রুমে বন্ধ থাকবে। রুমে

বন্ধ হওয়ার এক দিন পূর্বে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত পায়খানা প্রস্রাব করে রুমে বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর তিন দিন পর্যন্ত আর আহার করবে না আর কামরার বাইরে আসবে না। কামরার ভিতরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে আর ত্রাটক (তন্ত্র ক্রিয়া) করবে। বাড়ীতে গিয়ে এই ক্রিয়া আমি তিনবার করি কিন্তু বাপুজীর দর্শন হয়নি। অনুষ্ঠানের সময় জীবন মৃত্যুর খেলায় শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবুও পরমাত্মা প্রাপ্তির আশায় ভক্তিতে লেগে থাকি।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রোহতকের কাঠমন্ডীতে সন্ত রামপাল দাস মহারাজের সত্সঙ্গ শুনি। ওখানে মহারাজ জী তত্ত্বজ্ঞানের আধারে গীতাকে বোঝান। তখন গীতা পড়ে চিন্তা করতে থাকি, গীতায় কি লেখা আছে আর বাপুজী কি করতে বলেছে? আমরা হয়তো সত্যি সত্যিই ভগবানের জ্ঞানের বিরুদ্ধে সাধনা করছি! সন্ত রামপাল জী মহারাজের বলা গীতা জ্ঞানের অনুবাদ যখন বুঝতে পারলাম, তখন আমার অন্তর আত্মা কাতরে কেঁদে উঠলো। তখন’ই সিদ্ধান্ত নিই বাপুজীর সঙ্গে দেখা করে এই সমস্ত সন্দেহ দূর করা দরকার। আমি আসারাম বাপুর কাছে গীতা নিয়ে যাই এবং গীতা খুলে সব সন্দেহ নিবারনের জন্য প্রার্থণা করি। কিন্তু বাপুজী কোন শঙ্কার সমাধান করেনি। তখন আমি বলি বাপু জী! আপনি যখন পরমাত্মার বিষয়ে জানেন না, তখন ভক্ত সমাজকে কেন ভ্রমিত করছেন! তখন বাপুজী আমার দিকে তাকিয়ে বলে তুই কি জানিস ভক্তির বিষয়ে। আমি ওখান থেকে উঠে পড়ে অসহায় বালকের মতো কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে চলে আসি।

পরমাত্মা প্রাপ্তি না হওয়ায় তথা হঠযোগ, ব্রত, উপাসনা করে শরীর এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, মৃত্যুকে চোখের থেকে সামনে দেখতে থাকি। তারপরেও অন্য সাধু-সন্তের (রাধাস্বামী পন্থ, ধন-ধন সতগুরু, শ্রী সতপাল জী মহারাজ, শ্রী বালযোগেশ্বর, দিব্য জ্যোতি, ব্রহ্মাকুমারী, নিরংঙ্কারী মিশন, মথুরার জয়গুরুদেব প্রমুখদের) কাছে ছুটে যাই। কিন্তু যে নির্ণায়ক জ্ঞান শ্রী রামপাল জী মহারাজ বলেছিলেন, তা উপরোক্ত কোনো সাধু-সন্ত বা পন্থদের কাছে নেই। আমি অনুশোচনায় ভুগতে থাকি এবং মনে-মনে চিন্তা করতে থাকি, বর্তমান পৃথিবীতে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়েছে এমন কি কোনো সন্ত নেই! পরমাত্মা কে? কোথায় থাকেন? তাঁর উত্তর কেউ কি জানে না! এই বিচার করে রাতের পর রাত কাঁদতে থাকি। সাধু-সন্তদের উপর থেকে আমার বিশ্বাস টুকুও উঠে গিয়েছিল। শ্রী আসারামের মত সুপ্রসিদ্ধ সন্ত যখন শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমর্জি সাধনা করছেন ও করাচ্ছেন, তখন অন্যান্য সাধু-সন্তদের উপর কিভাবে বিশ্বাস করি! সন্ত রামপাল জী মহারাজ জ্ঞান তো শ্রেষ্ঠ দিচ্ছেন, কিন্তু এনার কাছে জনসমূহ তো (লোকজন) বেশি নেই! তাই ইনি পূর্ণ সন্ত কি করে হতে পারেন? এমন সন্দেহ মনে আসতে থাকে। কিছু দিন পরে আমাদের গ্রামে সন্ত রামপাল জী মহারাজের এক শিষ্যের সঙ্গে দেখা হয়। আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সে আমাকে দ্বিতীয়বার পরমাত্মা স্বরূপ পূর্ণ সন্ত রামপাল জী মহারাজের সতসঙ্গে নিয়ে যায়। আমি এক ঘন্টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ শুনি আর তারপর কাঁদতে কাঁদতে মহারাজ জীর কাছে গিয়ে দেখা করি। মহারাজ জী আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি যে সন্তের কাছে যাও, তাঁরা সবাই শাস্ত্র বিরুদ্ধ নিজের ইচ্ছামত সাধনা করে এবং করায়। মনে হল এই সবকিছুই যেন তিনি আগে থেকেই জানতেন, তারপর সন্ত রামপাল জী মহারাজ আমাকে নিজের চরনে বসিয়ে আমার সমস্ত সন্দেহের সমাধান করে দেন।

তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল জী মহারাজ বলেন, পবিত্র গীতা অধ্যায় ৯ মন্ত্র ২৫ এ পিতর পূজা অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করতে মানা করা হয়েছে। অন্য দেবী-দেবতাদের পূজা যারা

করে, তাদেরকে গীতার মধ্যে মন্দ বুদ্ধির বলা হয়েছে (প্রমাণ, গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র ১২ থেকে ১৫ ও ২০ থেকে ২৩)। কিন্তু শ্রী আসারাম 'শ্রাদ্ধ মহিমা' নামক এক পুস্তকে শ্রাদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ বিধির কথা লিখেছে। সন্ত শ্রী আসারাম সবরমতি আহমদাবাদ আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্রিকা" ঋষি প্রসাদ অঙ্ক -১৩৫" মার্চ ২০০৪ এ লেখা আছে যে, যারা ভূতের পূজা করে বা পিতর পূজা করে বা অন্য দেবী-দেবতাদের পূজা করে তারা কি হবে, পড়ুন পত্রিকার পরবর্তী অঙ্কে.....। পরবর্তী অঙ্কের পত্রিকা "ঋষি প্রসাদ অঙ্ক-১৩৬" এপ্রিল ২০০৪ পৃষ্টা নং ১৯ এ লেখা আছে যে, যারা ভূতের পূজা করে তারা ভুত লোককে প্রাপ্ত করবে, যারা পিতর পূজা করে তারা পিতর লোক প্রাপ্ত হবে এবং শ্রী কৃষ্ণের পূজারী শ্রী কৃষ্ণের বৈকুন্ঠ লোক প্রাপ্ত করবে।

বিচার করুণ:- শ্রী আসারাম দ্বারা রচিত 'শ্রাদ্ধ মহিমা' নামক পুস্তকে পিতর পূজার ভাল বিধি লেখা আছে।

কৃপা করে ভাবুন :- যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলে গভীর কুয়াতে পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। আবার ওই ব্যক্তিই কুয়াতে পড়ার পরামর্শ দিয়ে বলছে যে, কুয়াতে পড়রার জন্য একটি ভালো বিধি বলছি। দুই পা উপরে তুলে চোখ বন্ধ করে একবারে লাফিয়ে পড়ো। এটাই গভীর কুয়াতে পড়ে মরার শ্রেষ্ঠ বিধি। যে এই কর্ম করবে না, সে অপরাধী।

এখন আপনারা বিবেচনা করুন, এই ব্যক্তি কি সত্ হতে পারেন? এই ভূমিকাই শ্রী আসারাম করছেন। এক দিকে তো বলছেন, পিতর ও ভূত পূজা করলে তাকেই পিতর বা ভূত লোকে যেতে হবে। যেখানে ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট ভোগ করতে হয়। অপর দিকে তাদেরকে আবার শ্রাদ্ধ কর্ম দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। আরো একটি বিচারের বিষয় হল এই যে, যখন আমাদের মাতা-পিতা জীবিত ছিল, তখন তারা প্রতিদিন অন্তত দুইবার করে খাবার খেত। এখন তারা মৃত্যুর পরে শ্রী গীতা জ্ঞানের বিরুদ্ধে সাধনা করার ফলস্বরূপ, ভূত ও পিতর যোনী প্রাপ্ত করেছে। এখন তাদের মাত্র একদিন শ্রাদ্ধ করলে তারা কিভাবে তৃপ্ত হবেন? বাকি ৩৬৪ দিন কি খাবেন? এর জন্য কেবল সন্ত ও গুরুরাই দোষী, যারা সহজ সরল মানুষদেরকে ভ্রমিত করে শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধ সাধনা করিয়ে দুঃখদায়ী যোনীতে যেতে বাধ্য করছে। শ্রী আসারাম শিবের উপসনার মন্ত্র (ওঁ নমো শিরায়) আর শ্রী বিষ্ণুর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) দেন। এগুলি ছাড়াও হরি ওম্, ওঁ গুরু আদি নমঃ প্রভৃতি নামের মধ্যে যে কোন একটি নাম নিজের পছন্দ মত বেছে নিতে বলেন। আর বলেন, সোহং কে দুই ভাগ করে শ্বাস দ্বারা স্মরণ করবে। এই সব ক্রিয়ার কোন প্রমাণ শাস্ত্রে নেই।

বিচার করুন :- যদি কোন রুগী পেটে ব্যথার জন্য ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে বলে যে, ডাক্তার বাবু! আমার পেটে খুব ব্যথা করছে। তখন ডাক্তার যদি চিকিৎসার জন্য ৫/৬ প্রকারের ট্যাবলেট সামনে রেখে বলে তোমার যে ট্যাবলেট পছন্দ হয় সেটি তুলে খেয়ে নেও। তাহলে সেই ডাক্তার কেমন?

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৮ মন্ত্র ১৩ তে বলেছে,

ঔম্ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম, ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্য
প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্॥ 3॥

গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল বলেছেন (মাম্ ব্রহ্ম) আমি ব্রহ্ম এর তো (ইতি) এই (ঔম্ একাক্ষরম) ঔম্ এক অক্ষর (ব্যাহরন) উচ্চারন ক'রে (অনুস্মরন) স্মরণ করে (য:) যে সাধক (ত্যজন দেহম) শরীর ত্যাগ করে অর্থাৎ অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত

(প্রয়াতি) স্মরণ অর্থাৎ সাধনা করে (স:) সেই সাধক আমার (পরমাম্ গতিম্) পরম গতিকে (যাতি) প্রাপ্ত করে।

ভাবার্থ এই যে, শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মত প্রবেশ করে ব্রহ্ম অর্থাৎ হাজার বাহুযুক্ত জ্যোতি নিরঞ্জন কাল বলেছেন যে, আমার সাধনার এক মাত্র মন্ত্র হল ওম্, এই নাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যে সাধক জপ করবে, সে আমার থেকে হওয়া লাভ প্রাপ্ত করবে। অন্য কোন ভক্তি বা মন্ত্র আমার নেই এবং গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র ১৮ তে নিজের গতিকেও অতি জঘণ্য (অনুত্তমাম্) বলেছেন। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৯ মন্ত্র ২০ থেকে ২৫ এ বলেছেন যে, যিনি তিন বেদে (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ) বর্ণিত বিধিতে আমার পূজা করে বা অন্য দেবী দেবতার পূজা করে, তারা জন্ম-মৃত্যু ও স্বর্গ-নরক ভোগ করতে থাকে। যেমন, ভূত -পিতরের পূজা (শ্রাদ্ধ) করা ব্যক্তি ভূত বা পিতর হয়ে ভূত লোক বা পিতর লোক প্রাপ্ত করে। ভূতের পূজা করা ব্যক্তি (তেরো দিনের শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, অস্থি তুলে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া, পিন্ড দান করা প্রভৃতি ভূতের পূজা) ভূত লোকে চলে যায়। পরে পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকবে। এই পূজা অবিধি পূর্বক,অজ্ঞানতা পূবর্ক মনমর্জী (মনের ইচ্ছা) আচরন। তাই সর্ব সাধনা ব্যর্থ। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র ২৩-২৪ ।

বিশেষ:- এখানে চতুর্থ অথর্ববেদের বিবরণ এই জন্য নেই, কারণ ওখানে পূজার বিধি কম সৃষ্টি রচনার জ্ঞান অধিক আছে। তাই গীতা অধ্যায় ১৮ মন্ত্র ৬২ -তে বলেছে যে, ঐ পরমাত্মার শরণে যা তাহলে তোর পূর্ণ মুক্তি হবে অর্থাৎ পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত করবি। এছাড়া গীতা অধ্যায় ১৫ মন্ত্র ৪ এ বলেছেন যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত পাওয়ার পরে তাঁর বলা শাস্ত্র অনুসারে সাধনা করা উচিত। যাতে সাধকের আর পুনরায় জন্ম-মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ অনাদি মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। (গীতা জ্ঞান দাতা কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ-ব্রহ্ম বলেছেন যে) আমিও ঐ আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি।

সন্ত রামপাল জী মহারাজ বলেছেন যে, অন্য সকল সন্তরা বলে, যে পাপের ফল ভাগ্যে লেখা আছে, তা জীবকে ভুগতেই হয়। ভক্তি করে যেতে হবে, তাহলে পরের জন্ম সুখময় হবে।

অনুগ্রহ করে বিচার করুন :- যদি কোনো ব্যক্তি তার পায়ে কাঁটা ফুটে যাওয়ার কারণে কষ্ট পায় এবং সেই কষ্ট নিবারনের জন্য কাউকে প্রার্থনা করে বলে যে, হে ভাই! আমার পায়ের কাঁটা বের করে দাও। আর সে যদি উত্তর দেয়, কাঁটা পায়ের মধ্যেই থাকতে দাও বের করা যাবে না, জুতা পরে নাও ভবিষ্যতে আর কাঁটা ফুটবে না। ওই ব্যক্তি কি তাহলে সঠিক পরামর্শ দিচ্ছেন! পায়ে কাঁটা ফুটে থাকলে তো জুতা পরাই যাবে না। প্রথমে কাঁটা বের করতে হবে, তাহলে ভয়ে জুতা পরবে, যাতে ভবিষ্যতে পায়ে কাঁটা না ফোটে। ঠিক তেমন পূর্ণ সন্তের শরণে আসলে পাপ রূপী কাঁটা সমাপ্ত হয়ে যায়। পরে সাধক পূর্ণ প্রভুর শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা রূপী জুতা এই ভয়ে পরবে যে, ভবিষ্যতে যাতে পাপ রূপী কাঁটা কষ্ট দিতে না পারে।

সকল সাধু-সন্তরা, পবিত্র গীতার অনুবাদে অর্থের অনর্থ করে রেখেছে। গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র ১৮ ও ২৪ এর অনুবাদে 'অনুত্তমাম্' শব্দের অর্থ অতি উত্তম করে রেখেছে। অধ্যায় ১৮ মন্ত্র ৬৬ -তে 'ব্রজ' শব্দের অর্থ আসা করেছে। যেখানে 'অনুত্তম্' শব্দের প্রকৃত অর্থ অতি নিকৃষ্ট হয় এবং 'ব্রজ' শব্দের অর্থ যাওয়া হয়। তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে এবং অজ্ঞানী গুরুদের কথায় সর্ব ভক্ত সমাজ শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত সাধনা করে মানব জীবন ব্যর্থ করছে (পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র ২৩-২৪)। সর্ব পবিত্র

ধর্মের পবিত্র আত্মারা তত্ত্বজ্ঞানের সাথে অপরিচিত। যার কারণে, নকল গুরু, সন্ত, মহন্ত ও ঋষিদের প্রভাব বেশি ছিল। যখন পবিত্র ভক্ত সমাজ অধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পরিচিত হয়ে যাবে, তখন নকল সন্ত, গুরু, আচার্যদের মুখ লুকানোর জন্য কোনো জায়গা থাকবে না।

উপরোক্ত সকল সত্য প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে আমি এবং আমার পরিবারের সকল সদস্য সন্ত রামপাল জী মহারাজের শ্রীচরনে আসি। আমার গোটা পরিবারে কারো কোনো রোগ ব্যাধি নেই, তাই বর্তমানে আমার কোন দুঃখ নেই। যে ভূত আমার পরিবারের সদস্যদেরকে যেকোনো সময়ে মেরে ফেলতো অথবা কোনো গৃহপালিত পশুকে মেরে ফেলতো এবং আমাদের কাজ কর্ম করতে দিত না, সেই ভূত শুধু আমাদের বাড়ি ছেড়েই নয়, আমাদের গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। যারা এখনও আসারাম জীর শিষ্য হয়ে আছে। ওখানে গিয়ে ভূত বলে বসন্তের ঘরে পরমাত্মার নিবাস হয়ে গেছে, ওখানে আমি আর যেতে পারছি না। সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে উপদেশ নেওয়ার পরে আমরা সবাই সুস্থ ও সুখী জীবন-যাপন করছি। আমাদের পরিবারের এবং আত্মীয়দের মধ্যে প্রায় দুই শত সদস্য শ্রী রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নিজের জীবনের কল্যাণ করছে, যারা পূর্বে আসারামের জীর শিষ্য ছিল। শ্রী রামপাল জী মহারাজের জ্ঞান বুঝে প্রায় দশ হাজার আসারামের শিষ্য নাম দীক্ষা নিয়েছে। তারাও আমার মতো দুঃখী ছিল। সর্ব ভক্ত সমাজের কাছে প্রার্থনা, পরমাত্মা স্বরূপ শ্রী রামপাল জী মহারাজের চরনে এসে নিজের জীবনকে সুখী করুন এবং আত্মার কল্যাণ করুন।

ভক্ত বসন্ত দাস,
মোবাইল নং- ৯৭২৮০৪৫৮১১

"আজ শাস্ত্র সম্মত সদ্ ভক্তি পেয়ে সপরিবারে সুখী হয়েছি"

আমি ভক্তিমতি মুক্তা দাসী। করণদিঘি, জেলা উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমি আগে সকল দেব দেবীর পূজা করতাম। এছাড়া একাদশী ও নানা ধরনের ব্রত-উপবাস করতাম। আমাদের বাড়িতে ৪৬ বছরের পুরানো কালী পুজো হতো। এত সব কিছু করার পরও আমার মনে শান্তি ছিল না। আমার সবসময় মনে হতো যে, আমি সঠিক ভক্তি করছি না! আর মনে হতো, এমন কি কোনো সাধনা আছে, যা করলে জরা মরন ও ৮৪ লক্ষ যোনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? এত নিয়ম ও পূজা করার পরও আমার পরিবারে কোনো সুখ ছিল না। এরই মধ্যে আমার বড় মেয়ের একটি অসুখ ধরা পড়ে, যার নাম প্যাংক্রিয়াটাইটিস (Pancreatitis)। ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি (AIIMS) হায়দ্রাবাদে ডাক্তার দেখানো, হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সব জায়গাতেই বলেছিল যে, এই অসুখ ঠিক হওয়ার নয়। ডাঃ বলেন, এই অসুখ ভবিষ্যতে ক্যানসারে পরিনত হবে। ৬ মাস পর পর গিয়ে ডাঃ দেখাতে হত। এতে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসার উন্নতিও তেমন হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন আমাদের দোকানে কিছু ভক্ত ভায়েরা গুরুজীর "জ্ঞান গঙ্গা" "জীবনের পথ" ইত্যাদি পুস্তক সেবা করতে আসে। সেই পুস্তক গুলি পড়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সঠিক ভক্তিবিধি ও সঠিক সাধনার কথা জানতে পারি, পরমাত্মা কে? কিভাবে তার ভক্তি করতে হয়? আরো জানতে পারি যে, আমরা যে সব ব্রত-উপবাস করছি, তা সব ভুল। শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভুল সাধনা করার জন্যই আমাদের এত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনা সইতে হচ্ছে! এরপর আমরা যোগাযোগ করি নাম দীক্ষা নেওয়ার জন্য।

১০ এপ্রিল ২০২২-এ আমরা নাম দীক্ষা নিই সন্তরামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে। গুরুদেবের শরণে আসার দুই-চার মাস পরেই আমরা একটি বড় ধরনের লাভ পাই। আমার বড় মেয়ের হঠাৎ করেই প্যাংক্রিয়াটাইটিস- এ ভীষন ব্যথা শুরু হয়, যা সহ্য করার মতো নয়। তখন আমি গুরুজীর কাছে প্রার্থণা করলাম। আর গুরুদেব সন্ত রামপাল জী মহারাজের কৃপায় সাথে সাথে আমার মেয়ের ব্যথা কমে যায়। তার পর দুই মাস পরে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে জানতে পারি যে, আমার বড় মেয়ের যে প্যাংক্রিয়াটাইটিস হয়েছিল, সেটা ঠিক হয়ে গেছে। সব রিপোর্ট Normal আছে। এই ভাবে অনেক ছোটো খাটো লাভ পাই যা লিখে শেষ করা যাবে না। এখন আমাদের সব ঋণও শোধ হয়ে গিয়েছে ও ব্যবসায় খুব উন্নতি হয়েছে। পরিবারে সুখ-শান্তি ফিরে এসেছে।

আমাদের দীক্ষা নেওয়া বেশি দিনও হয়নি, কিন্তু তাও আমরা এতো গুলো লাভ পেয়েছি। আমাদের গুরুদেব সন্ত রামপাল জী মহারাজ আমাদের কোনো মনমুখী সাধনা করতে বলেন না। তিনি গীতা, বেদ, পুরান বাইবেল, কোরান ও গুরুগ্রন্থ সাহেবে যা লিখিত আছে তা সঠিক ভাবে মেনে চলতে বলেন। আমি জানি আমার মত এই সংসারে অনেক দুঃখী মানুষ আছে, যারা আমার মত বিভিন্ন দরজায় দরজায় ঘুরেও সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন না, তাদেরকে জানা দরকার। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমার সকল ভাই বোনেদের কাছে তথা বিশ্ববাসীর কাছে অনুরোধ করছি যে, আমাদের গুরুজী সন্ত রামপাল জী মহারাজের শরণে এসে শাস্ত্র সম্মত ভক্তি করে সপরিবারে নিজের জীবনের কল্যান করুন।

অদ্ভুত করিশ্মা

পূজনীয় গুরুদেব জী দন্ডবত প্রণাম।

আমি আমার পরিবার সহিত আনন্দ পূর্বক জানাতে চাই। জানুয়ারী ২০০০ এর প্রারম্ভে আপনার প্রবচন/সত্সঙ্গ তাজপুর গ্রাম, দেহলী শ্রী মুরারী ভক্তের বাড়ীতে চলতেছিল। অন্য এক ভক্তের মেয়ে আমার স্ত্রী বিমলা দেবী কে বলে, কাকীমা, আমাদের পাশের গ্রামে সতসঙ্গ হচ্ছে। যদি আপনি ঐ মহরাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নেন, তাহলে তোমার অসাধ্য রোগ (শির দাঁড়ার মেরুদণ্ড হাড়ের এক ইঞ্চি দূরত্বর ফাঁকা জায়গা) ঠিক হতে পারে। তখন আমার স্ত্রী ঐ মেয়েকে বলে যখন অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ সেন্টার অব সাইন্স দিল্লীতে আড়াই বৎসর চিকিৎসা করেও কোনো সমাধান হয়নি। সেখানে ঐ নামে বা শব্দে এমন কি শক্তি আছে যে আমার অসাধ্য রোগ ঠিক হয়ে যাবে? অনেক সময় পর্যন্ত দুই জনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। অবশেষে আস্তে আস্তে হেঁটে সত্সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরম পূজ্য সন্ত রামপালজী মহারাজের প্রবচন/অমৃত বাণী শুনে অসম্পূর্ণ 'ভক্তির তার' পুনঃ বন্দীছোড়ের সঙ্গে জুড়ে যায়। আর আড়াই বৎসরের চিকিৎসায় ব্যর্থ হওয়া আসাধ্য রোগ মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে নাম সুমিরনে ঠিক হয়ে যায়। পূর্বে ডাক্তাররা উঠতে বসতে বারণ করেছিল। এখনো চিকিৎসার প্রেশক্রিপশনে লেখা আছে। এক্সরে ও আছে তাতে ফাঁকা জায়গা ক্লিয়ার দেখা যায়। আমার স্ত্রীর প্রধান সমস্যা ছিল বসে পায়খানা করতে পারতো না এবং হাত ধোয়ার সময় ১০/১৫ মিনিট কাঁদতো, কারণ বেশি ঝুঁকলে বেশি ব্যথা হত। এখন পরম পূজনীয় রামপাল জী মহারাজের আর্শীবাদে আমার স্ত্রী এখন ৫০ কিলো ওজন তুলতে পারে। বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। আমি আমার প্রিয় পাঠক ভক্ত সমাজের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি পরমেশ্বর স্বরূপ সন্ত রামপাল জী মহারাজ যিনি কবীর জী'র (পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেবের) বিশেষ কৃপা

পাত্র। তাই আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছে শাস্ত্রানুকূল নাম-দীক্ষা প্রাপ্ত করে সপরিবার নিজের কল্যাণ করুন এবং পূর্ণ মোক্ষ লাভ করে সতলোক প্রাপ্ত করুন।

আপনার সেবক- নাথুরাম
গ্রাম-ছাবলা, দিল্লী। ৯৮১১৯৫৭৯১২

"সন্ত এই রূপ হয়"

আমি শশী প্রভা প্রধান শিক্ষিকা (প্রিন্সিপাল) সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডিপানা-জেলা-জীন্দ এ কর্মরত আছি। আমি আমার বাড়ির ঝগড়া ও মানসিক অশান্তির কারণ ৩৫ বৎসর ধরে দুঃখী ছিলাম। স্বামী মারপিট ঝগড়া করে মাসিক বেতন কেড়ে নিত। মোট কথা তাঁর দ্বারা যতটা সম্ভব ততটা দুঃখ দিত। ৬০ বিঘা জমির মালিক হয়েও আমাকে কুকুরের মত খেতে দিত। আমি আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সাহায্য চাই। সমাজের পঞ্চায়েতের কাছে ও প্রার্থনা করি কিন্তু কেউ আমার কথা শোনে না। শুনেছি সন্ত খারাপ কার্যকে ঠিক করে দেন। তাই আমি অনন্দপুর (বীনা) মধ্যপ্রদেশে এক গুরুর কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিই। কিন্তু বাড়িতে অশান্তি থেকে যায়। মেয়েদের পড়াশুনা পরমাত্মার দয়ায় নিজের ক্ষমতায় করাই। কিন্তু মেয়েদের বিবাহ হচ্ছিল না। পিতা সম্বন্ধ খোঁজা বন্ধ করে দেয়। এই সব দুঃখের কারণ বালাজী যাই। বগড় (রাজস্থান), ধৌলী ধার, হিমাচল প্রদেশে যাই। পীর, ফকির, গুরুদ্বারের সাহায্য নিই। বাড়ীতে যখন একলা থাকতাম তখন কাঁদতাম আর বলতাম পরমাত্মা নেই। অত্যাচার আর অবিচার সহ্য করতে করতে আমি পাগলের মত হয়ে যাই।

পরে এক দিন এই দুঃখী আত্মা পরমাত্মার দরবার পর্যন্ত পৌছায় যায় যে সমস্ত দুঃখ নিবারন করে। আমার প্রতিবেশীর ঘরে পাঠ হয়। আমার প্রতিবেশী আমাকে প্রসাদ নেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে। ওখানে গেলে চর্চা শুরু হয়। পাঠের বিষয়ে বলে এ পরমাত্মার সত্য বাণী, এতে দুঃখ দূর হয়। কিন্তু এ পাঠ সন্ত রামপালজী মহারাজের আজ্ঞা অনুসার করলে লাভ হয়। অন্য কে দিয়ে পাঠ করলে লাভ হয় না। যেমন রাজা পরীক্ষিত কে কথা শুনানোর সময় কোন ঋষি পাঠ করার (কথা করার) সাহস করে নাই কারণ তাঁরা অধিকারী ছিল না। তাঁরা জানত সপ্তম দিনে পরিনাম ফল আসবেই। সেই জন্য স্বর্গ থেকে ঋষি সুখদেব ঋষি এসে রাজা পরীক্ষিত কে নাম উপদেশ দিয়ে ৭ দিন পর্যন্ত কথা শোনায়। তখন রাজা পরীক্ষিতের কিছুটা শান্তি হয়। বর্তমানে কেহ বাস্তবিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত নয়। তাই যে কোন ব্যক্তি পাঠ করে দেয় তাতে সাধকের কোন লাভ হয় না। ঐ বোন যার সঙ্গে আমারা চর্চা হচ্ছিল সে শ্রী রামপাল জী মহারাজের সত্সঙ্গ শুনত। অশিক্ষিত হয়েও শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য আমাকে শোনায়। আমি প্রধান শিক্ষিকা হয়েও আশ্চর্য হয়ে যাই। এমন মনে হচ্ছিল পরমাত্মা আমার হাত ধরতে আসছে। ঐ বোন বলে আমার গুরুদেব দুঃখ দূর করে দেয়। তখন আমি বলি আমাকে তোমার গুরুদেবের দর্শন করাতে পারবে। পরমাত্মার দয়ায় পরের দিন আমি সন্ত রামপালজী মহারাজকে সাধারন বেশ ভূষায় একটি চেয়ারে বসা পাই। আমি জানতাম না সন্ত কেমন হয়। তার মহিমা কেমন হয়। যে যত বড় হয় সে ততই সাধারণ হয়। আমার স্থান তো পৃথিবীরও নীচে। আমি পরমাত্মার মহিমা কি বুঝব। আমার গুরুদেব আমার কথা শুনে বলে আপনি নাম উপদেশ নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। পরের দিন আমাকে নাম উপদেশ দেন। এক মাসের ভিতরে মেয়ের বিবাহ হয়। আমার মনে হচ্ছিল আশ্চর্য কিছু হচ্ছে। যে স্বামী সম্বন্ধ ঠিক করতে যেত না,

সেই আজ মেয়ের বিবাহ দিচ্ছে। কিছু দিন পরে আমার বড় মেয়ের পেটে টিউমার দেখা দেয়। কোন সন্তান না থাকায় চিন্তা হয়। আমি আমার ছেলেকে বলি, চলচ্চিত্রে তো দেখেছো, ডাক্তার ভিতরে অপারেশন করে আর বাইরে পরমাত্মার প্রার্থনা চলে। আর ঐ ব্যক্তি ঠিক হয়ে যায়। ছেলে আমার কথায় রাজি হয়ে যায়। আমি তাজপুর (দিল্লী) সগুরুদেবের সতসঙ্গে সেবা করার জন্য চলে যাই। ওখান থেকে আমি মেয়ের কাছে হাসপাতালে যাই। অপারেশন হয়। ক্যান্সারের যে ভয় ছিল তাও ভালো হয়। পরে মেয়ে গর্ভবতী হয়। এর মধ্যে জামাইয়ের মোটর সাইকেলের সঙ্গে এক ট্রাক্টরের দূর্ঘটনার খবর আসে। আমি আমার গুরুদেব ছাড়া কিছুই বুঝি না। মালিকের যত মহিমা গাই তা কম। দেড় মাসের ভিতর জামাই ঠিক হয়ে বাড়ি আসে। দুনিয়া কি বুঝবে। আমার প্রার্থনা পরমাত্মাই শোনে।

যে দিন আমি সদ ভক্তির উপদেশ নিয়েছি ঐ দিন নকল সন্তদের ফটো উঠানে ফেলে স্বহা করে দিয়েছি ঐ দিন থেকে আমার জীবন রূপী গাড়ি লাইনের উপর দিয়ে চলা শুরু করেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ এ আমি আমার নিজের চোখে ৪/৫ টার সময় একটি ভয়ানক আকৃতি দেখি। ঐ ব্যক্তি এতটা ভয়ঙ্কর ছিল যে যদি আমি নাম উপদেশ না নিতাম তাহলে আমার হার্ট এ্যাটাক হত। কিন্তু ঐ সময় আমি ভয় পাইনি কিন্তু এতটা বুঝতে পেরেছিলাম ওটা যম দূত ছিল। পরের দিন আমি গুরুজীকে বলি। গুরুদেব স্পষ্ট করে দেয় ঐ দিন আমার শ্বাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি পরমাত্মা স্বরূপ সদগুরুদেবের দয়ায় জীবিত আছি। গুরুদেবের কৃপায় ছোট মেয়ের বিবাহ এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলে সাথে গত বছর হয়েছে। দুই তিনবার আমার চাকরী চলে যাওয়ার মত পরিস্থিতি হয়েছিল। কিন্তু আমার পরমাত্মা আমাকে সামলান এবং দুই বার প্রমোশন দেয়। সন্ত রামপালজী মহারাজ বলে রাজা ও প্রভুর সন্তান। ওখানে প্রভুর শক্তি কাজ করে। পরমেশ্বর নিজের ভক্তের জন্য রাজাকে প্রেরণা করে সব কিছু পাল্টে দেয়। লোকে দেখে রাজা করছে। আসলে করে পরমাত্মা। আপনারা আমার সদগুরু রামপালজীর শরনে এসে দেখুন কর্ম রূপী কাঁটা এমন ভাবে বের করবে যেমন আমার করেছে। পরমাত্মা সত্যই অসহায়কে সহায়তা করেন, আত্মার ডাক (প্রার্থনা) শোনে। আমার সাথে এই কয়েক বৎসরে যা হয়েছে তা একমাত্র পরমাত্মাই করতে পারেন। আমার গুরুদেবের মহিমা বর্ণনা করা শব্দ আমার কাছে নেই। গুরুদেব স্বয়ং কবীর সাহেবের অবতার। যদি কেউ পরমাত্মার দর্শন করতে চান তাহলে সতলোক আশ্রমে অবশ্যই আসবেন। আমার মত ক্ষুদ্র জীবকে যে ভাবে রক্ষা করেছেন তা অকল্পনীয়। হে গুরুদেব! আমি আপনার কাছে ঋণী, কোন শব্দে আপনার মহিমা গাইব? এই শব্দ পাঠক বর্গ নিজের হৃদয়ে লাগান আর সদগুরুর লাভ প্রাপ্ত করুন।

তুচ্ছ প্রাণী-ভগমতি শশী প্রভা

মোবাইল-৮০৫৯৭০৯৮১৯

“পরমেশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন”

আমি ভক্ত সুরেন্দ্র দাস, গ্রাম গান্ধারা, তহশিল সাপলা, জেলা রোহতক - এর নিবাসী। আমার বয়স ৩১ বৎসর। ছোটবেলা থেকে আমি পরমাত্মার খোঁজে পরম্পরাগত পূজা (মন্দিরে যাওয়া, ব্রত রাখা, শ্রাদ্ধ করা ইত্যাদি) করতাম কিন্তু শারীরিক কষ্ট আর মানসিক অশান্তি লেগেই ছিল। তবুও পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস এবং পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার জন্য ভক্তিতে লেগে থাকতাম। ১৯৯৫ সালে সন্ত আসারাম বাপুর কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে বাপুজীর উপদেশ মতো তন, মন ধন দিয়ে ভক্তি শুরু করি। কিন্তু

তাতেও আমার শারীরিক কষ্ট দূর হয়নি। এবং কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও হয়নি। আসারাম বাপুর কথামত প্রতিদিন ২৫০ গ্রাম দুধ সকালে আর ২৫০ গ্রাম দুধ সন্ধ্যায় পান করতাম। আরো বলেছিল তোমার মন্ত্রে যত অক্ষর আছে তত লক্ষ বার মন্ত্র জপ করবে এবং সমাধি অভ্যাস করবে। এই অনুষ্ঠান ৪০ দিনের ছিল। আমি এই ধরনের চৌদ্দ অনুষ্ঠান করি। একবার আমি বাপুজীর সত্সঙ্গে শুনেছিলাম যে সাতদিন পর্যন্ত অনাহারে থেকে সমাধি লাগিয়ে মন্ত্র জপ করলে তথা প্রাণায়ম করলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। আমি এই কথাকে সত্য মনে করে, সাতদিন উপবাস থেকে ঐ অনুষ্ঠান করি। কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তির জায়গায় না খেয়ে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে যাই। আর প্রাণায়াম করায় মানসিক ভারসাম্য খারাপ হয়ে যায় অর্থাৎ আমি পাগলের মত হয়ে যাই। ইতিমধ্যে আমার উপর সদগুরু সন্ত রামপালজী মহারাজের কৃপা দৃষ্টি হয়। সেপ্টেম্বর ২০০০ সনে পূজ্য গুরুদেব সন্ত রামপালজী মহারাজের দয়ায় নাম উপদেশ প্রাপ্ত হয়। উপদেশ নিতেই আমার মনে হল আমার জীবন প্রদীপে কেউ তেল ঢেলে দিয়েছে আর আমার জীবন প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠে।পূর্ণ সন্ত পাপ কর্মকে সমাপ্ত করতে পারেন। তাঁর প্রমাণ আমার জীবনে স্পষ্ট রূপে ঘটে। মে মাসের ২০০৪ সালে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গবাদে গুরুজীর (রামপালজী মহারাজের) সৎসঙ্গের জন্য টেন্ট (সায়মানা/তাবু) সেবা করার সময় ২৫ ফুট উপর থেকে পাথুরে (পাথরের মাটি) মাটিতে পড়ে যাই। মনে হয় কালের ইচ্ছা অন্য কিছু ছিল। আমার শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে যায়। আর আমার শরীরের নীচের অংশ অসাড় (প্যারালাইসিস্) হয়ে যায়। ঐ সময় গুরুদেব সন্ত রামপালজী মহারাজকে স্মরণ করি। আমার গুরুদেবের দয়ায় দুই পা তখন ঠিক মত কাজ করতে লাগে।

গরীব, কাল ডরৈ করতার সে, জৈ জৈ জগদীশ।
জৌরা জৌরী ঝাড়তী, পগ রজ ডারৈ শীশ॥

পরে আমাকে ঔরঙ্গবাদের প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওখানে ডাক্তার ডি.জি. পট্ট বর্ধন আমার শরীর পরীক্ষা করে শিরদাঁড়ার হাড়ের এক্সরে করেন। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার আশ্চার্য হয়ে বলে, আপনার শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে এক টুকরো হাড় আলাদা হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার বার বার আমার পায়ে হাত লাগিয়ে দেখে বলে আপনার উপর পরমাত্মার অসীম কৃপা। আপনার পা ঠিক মত কাজ করছে। কারণ রিপোর্ট অনুসার আপনার কোমরের নীচের অংশ অকেজ হওয়ার কথা ছিল। ঐ হাসপাতালে তিন দিন ভর্তি থাকি। তাঁর পর ছুটি নিয়ে বাড়ি (হরিয়াণা) ফিরে আসি। এবং রোহতকে প্রসিদ্ধ হাড়ের ডাক্তার চাড্ডাকে দেখাই। ডাক্তার চাড্ডা আমার রিপোর্ট দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি কিভাবে চলাফেরা করছেন। রিপোর্ট অনুসার আপনার প্যারালাইজড হওয়ার কথা। ডাক্তার চাড্ডা আবার রঙিন এক্সরে করে এবং বলে অপারেশন ছাড়া চিকিৎসা সম্ভব নয়। যে স্থিতিতে হাড় দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই থামিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে, যাতে পরে আর হাড় না ভাঙে। হাড়ের শক্তি বাড়ানোর জন্য ইনজেকশন্ দেওয়া শুরু করে। তিন মাসে পুরা ইনজেকশন লেগে যায়। তখন বলে অপারেশন করতেই হবে। তা না হলে বাকি হাড়ও ভেঙে যাবে। অপারেশনের জন্য দুই লক্ষ টাকা লাগবে। রিপোর্ট এর অনুসার তিন মাসের ভিতর তোমার মৃত্যু হওয়ার কথা। আজ পরমাত্মার কৃপায় তুমি বেঁচে আছো। অপরেশনের খরচ দুই লক্ষ টাকা দেওয়ার মত সামর্থ আমার ছিল না। তাই আমি অন্য ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যাই। তিনিও আমার রিপোর্ট দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। এবং বলেন অপারেশন ছাড়া কোন চিকিৎসা নেই। আপনি কিভাবে চলাফেরা করছেন। আপনার তো প্যারালাইজড হওয়া কথা। অবশেষে নিরূপায় হয়ে সদগুরু শ্রীরামপাল জী মহারাজের চরণে প্রার্থণা করি। তখন

আমার পূজ্য গুরুদেব আমাকে দয়া করেন। আমার মাথায় হাত রেখে বলে পুত্র তুমি ভালো হয়ে যাবে। আজ যদি পরমেশ্বরের শরণে না থাকতে তাহলে তোমাকে ভুগে মরতে হত। কারণ তোমার আয়ু ছিল না। তুমি আর একবার ডাক্তারকে দেখাও। আমি গুরুজীর আদেশ অনুসার পরের দিন ডাক্তারকে দেখাই। ডাক্তার আমার এক্সরে করে এবং রিপোর্ট দেখে আশ্চার্য হয়ে বলে, আপনার যে হাড় ভাঙা ছিল তাহা উপরে উঠে কিভাবে জোড়া লেগেছে। ডাক্তার বলে, আপনার হাড় এমন অবস্থায় ছিল যেমন কোন উঁচু পাহাড়ে গাড়ি ওঠার সময় (খুব ঢালু রাস্তায় উপরে ওঠার সময়) ইঞ্জিন যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে গাড়ি নিচে না আসার জন্য গাড়িকে প্রথম গিয়ারে দিয়ে চাকার নিচে কাঠ বা পাথর দিয়ে আটকাতে হবে যাতে গাড়ি স্থির থাকে। আপনার হাড় ও ঐ গাড়ির মত ছিল। যে ভাবে হাড় উপরে উঠে জোড়া লেগেছে তা ডাক্তারের ইতিহাসের বাইরে। তখন আমি বুঝতে পারি কোন শক্তি তো আছে যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। যদি অপারেশন করতাম তাহলে অপারেশনে ঐ ফাঁকা জায়গায় কোন পদার্থ ভরে দিত। যদি কোন কাজ কর্ম কর তাহলে আবার পূর্বের অবস্থা। বিছানায় পড়ে ভুগে মরতে হবে। ডাক্তার বলে বুঝতে পারছি না এটা কি করে সম্ভব হল। তখন আমি বলি পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর সাহেবের স্বরূপ পরমাত্মা পূজ্য গুরুদেব সন্ত রামপালজী মহারাজ আমার পাপ কর্ম কেটে নিজের কোটা থেকে আয়ু বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এবং আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন।

'জো মেরী ভক্তি পিছোড়ী হোই তো হমরা নাম ন লেবে কোই'

এখন আমি সুস্থ আছি। এবং সদগুরুদেবের চরণে আত্ম কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থে সেবা করছি। ৫০ কেজি ওজন নিজে উঠায়ে নিয়ে যাই। আমার গুরুদেবের বাস্তবিক উদ্দেশ্য ভক্তি করিয়ে জীবকে বিকার রহিত করে নিজের ঘর সতলোকে নিয়ে যাওয়া। এখানের সাংসারিক সুখ তো আমার গুরুদেব ফ্রিতে দেন। কারণ জীব যাতে ভক্তিতে লেগে থাকে। সর্ব সমাজের কাছে প্রার্থনা আমার গুরু দেবেরর শ্রী চরণে এসে সদভক্তি করে সাংসারিক সুখের সাথে সাথে আত্ম কল্যাণের মার্গ প্রাপ্ত করুন। সত্ সাহিব।

বিশেষ - ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২-এ পূর্ণ পরমাত্মা বলছেন যে, শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করা সাধক, তুই সম্পূর্ণ ভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর অর্থাৎ সন্দেহ রহিত হয়ে আমার ভক্তি কর আমি তোর অসাধ্য রোগকে সমাপ্ত করে দেব। যদি তোর আয়ু শেষ হয়ে যায় তাহলে ১০০ বৎসর আয়ু প্রদান করব। উপরোক্ত কথা প্রভুর সামর্থতা প্রমাণ করে।

ভক্ত সুরেশ দাস। -

"পরমাত্মা অন্ধকে দৃষ্টি দান করেন এবং তাঁকে সর্ব সুখী করেন"

আমার নাম ইতু লেট। আমার গ্রাম স্বাদীনপুর, জেলা বীরভূম, আমি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। ২০২১- সালের জুলাই মাসে আমি সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নামদীক্ষা নিয়েছিলাম। তার পূর্বে আমি বিভিন্ন দেবী-দেবতার পূজা করতাম। আমি ইস্ট রূপে শ্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা করতাম। এছাড়া আমি কীর্তন গানও করতাম। একদিন আমি সন্ত রামপাল জী মহারাজের সৎসঙ্গ শুনে আশ্চর্য হয়ে যাই! তিনি প্রমাণ সহিত দেখাচ্ছিলেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নশ্বর! এদেরও জন্ম- মৃত্যু হয়! এই ত্রিদেবের জননী হলেন মা দূর্গা, যা আজ পর্যন্ত কোনো সাধু-সন্ত বা কীর্তনীয়া বলেননি। ওনার এই প্রমাণিত সত্য জ্ঞান দেখে আমি ওনার থেকে দীক্ষা গ্রহণ করি।

সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছে থেকে নাম দীক্ষা নেওয়ার পর আমি অনেক প্রকার লাভ পেয়েছি। সব থেকে বড়ো লাভ এই যে, আমি পূর্ণ পরমাত্মাকে পেয়ে গিয়েছি। এছাড়া শারীরিক লাভও আমি অনেক পেয়েছি। আমার শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হতো। কোনো কাজ করতে গেলেই মনে হত বুকে কিছু একটা বেঁধে রয়েছে, যেটা আমাকে স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে দিত না। শ্বাস নিতে গেলেই বুকে প্রচন্ড ব্যথার অনুভূতি হত। সন্ত রামপাল জী মহারাজের শরণে আসার পর সেই শ্বাসকষ্ট আর আমার নেই। তৃতীয় লাভ, একবার আমাদের অঞ্চলে (গ্রামে) ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার প্রতিবেশীদের সাথে সাথে আমারও ডায়রিয়া হয়েছিল এবং সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল কিন্তু সন্তু রামপাল জী মহারাজের দেওয়া অমৃত জল ও প্রসাদ খেয়ে আমার সেই রোগ নির্মূল হয়। আমাকে আর হাসপাতাল যেতে হয়নি।

এছাড়াও আমার একটি স্ত্রীরোগের সমস্যা ছিল, যা ঔষুধ দ্বারাও ভালো হয়নি, সেই সমস্যা সন্ত রামপালজী মহারাজের অসীম কৃপায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমার জীবনে সবথেকে বড়ো চমৎকার এটাই যে, সন্ত রামপাল জী মহারাজ আমার চক্ষু আমাকে দান করেছেন। হঠাৎই আমার বাঁদিকের চোখের দৃষ্টি চলে যায় কোনো কিছুই আমি বাঁ চোখে দেখতে পেতাম না। একটা ঘরের মধ্যে দরজা, লাইট বন্ধ করে দিলে যেরুপ অন্ধকার দেখায় ঠিক তেমনই আমি ওই চোখে শুধু অন্ধকার দেখতাম। লোকাল হাসপাতালে আমাকে Prescription -এ প্রতিবন্ধি লিখে পাঠিয়ে দেয়। আমার মাথার শুধু বাদিকে ও চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হতো। বসে বসে কাঁদতাম ব্যথাতে। একদিন একটা দাদা আমাকে নেপালে যেতে পরামর্শ দেন চিকিৎসার জন্য। সেই মতো আমি রানী হাসপাতালে (private hospital) আমার চোখ দেখালে, তারাও বুঝতে পারেনি যে, আমার চোখে ঠিক কী হয়েছে। তারা আমাকে "বিরাট আঁখা হাসপাতালে"র Adress দিয়ে দেয়। সেখানে রেটিনার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার-"Dr. Lalit Agrobal" আমার চোখ দেখেন। কিন্তু তিনিও বুঝতে পারেন না যে, চোখের সমস্যাটা কোথায়! আঘাত লেগেছে না অন্য কিছুতে এই সমস্যা হয়েছে। আমার চোখ কিছুটা বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছিল। আমার এই অবস্থা দেখে D-Lalit Agrabal তার থেকে Senior-ডাক্তারকে জানায়। তিনিও দেখে আশ্চর্য হয়ে যান এবং বলেন যে, চোখে প্যারালাইসিস হয়েছে। Senior Doctor তিনদিন ইনজেকশন দেওয়ার কথা বলেন। আর এটাও জানায়, এতে ভালো না হলে M.R.I করতে হবে। ইনজেকশনে ব্যথা ও প্যারালাইসিস ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু দৃষ্টি ফিরে না আসায় ডঃ শেষ পর্যন্ত M.R.l এর কথা বলেন। অন্ততপক্ষে আধ ঘন্টা আমার M.R.I চলে। আমি গুরুজীর ওপর বিশ্বাস রেখে Blood Report ও MRl Report নিম্নে ডাক্তারকে দেখাই। চোখ ও ব্রেনের Report সম্পূর্ণ Normal আসে আর রক্তের Reportও Normal আসে। কিন্তু তবুও চোখে দেখতে পেতাম না। সন্ত রামপাল জী মহারাজের দেওয়া ভক্তি করতে করতে আমার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। সন্ত রামপাল জী মহারাজের কৃপায় আজ আমাকে কোনো ওষুধ খেতে হয় না। আমি অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছি সন্তু রামপাল জী মহারাজের কৃপায় । আমরা শুনেছি পরমাত্মা অন্ধকে চক্ষু প্রদান করেন, মৃতকে জীবিত করেন, বাঝা-কে পুত্র দান করেন। এটা শধু শোনা কথা নয় আজ সন্ত রামপাল জী মহারাজ তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাই সকল ভাই-বোনের কাছে আমার প্রার্থনা, তারা যেন খুব শীঘ্রই সন্ত রামপাল জী মহারাজের শরণে এসে নামদীক্ষা নিয়ে নিজের মানব জীবনের কল্যাণ করে। কারণ

সন্ত রামপাল জী মহারাজ পূর্ণ পরমাত্মা, যিনি বর্তমানে এই পৃথিবীতে বিরাজমান।

"প্রভু শুনেছে গরিবের কথা"

আমি কর্মবীর পুত্র শ্রী খাশীরাম। গ্রাম ভরান, জেলা রোহ্তকের স্থায়ী নিবাসী। প্রথমে আমি ও আমার পুরা পরিবার সন ১৯৮৬ সালে বাবা নিরঙ্কারী হ্রদেব সিংহ মহারাজের থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলাম। তখন আমি, মা, বোনেদের চুড়ি পড়ানোর কাজ করতাম। আর্থিক স্থিতি ভালোই ছিল। ধীরে ধীরে আর্থিক স্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। আর কিছু দিন পরে আমার স্ত্রীর শরীরে বিভিন্ন প্রকারের রোগ বাসা বাঁধে। পিত্ত থলিতে পাথর ও বাবাশির রোগ খুব দুঃখী করতে লাগে। অপারেশনের জন্য বিশ হাজার টাকা লাগবে বলেছে। কিন্তু আমার ঘরে ঐ সময় ২০ হাজার টাকা তো দূরের কথা ২০ হাজার শস্য দানা (খাবার দানা গম বা চাউল) ও ছিল না। তখন আমার ও শ্বাসের (হাঁপানি) অসুখ ছিল। আমি ও আমার স্ত্রী কষ্টের কথা চর্চা করতে করতে একটি অটো গাড়িতে বসে বাসস্টান্ডে যাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী বলে টাকা তো নেই আর অপারেশন না হলে বাঁচব না। কিভাবে অপারেশন হবে? ঐ অটো রিক্সায় এক বোন বসে ছিল সে আমাদের সমস্ত কথা শুনে বলে আপনারা করৌথা চলে যান। ওখানে এক মহারাজ আছে তিনি আপনাদের ওষুধ ফ্রীতে দিয়ে দেবেন। আমার স্ত্রী ভগতমতি মেবা দেবী ২৯ ০৯ ২০০৩ - এ সতলোক আশ্রম করৌথা যায় এবং সর্ব অসুখ ও ঘরের পরিস্থিতির কথা সত্ গুরুদেব রামপালজী মহারাজকে বলেন। সদ্ গুরুদেব সমস্ত কথা শুনে বলে, পুত্রী! এখানে ওষুধ দেওয়া হয় না। শুধু মাত্র আত্মা কল্যাণের জন্য ভক্তি মার্গ ও ভক্তি করার বিধি পবিত্র গীতা ও বেদের আধারে শাস্ত্র অনুকূল জ্ঞান দেওয়া হয়। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের কৃপায় শুধু মন্ত্র জপ করলে সর্ব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। মূল লাভ তো জন্ম - মৃত্যুর রোগ থেকে মুক্ত হওয়া। সমাজ সুধার ও অন্য সুখ শান্তি ফ্রিতে প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা রাম নামের ওষুধ দিয়ে আমার পুরো পরিবারকে কৃতার্থ করছেন। এখন আমি প্রেম পূর্বক জীবন যাপন করছি। সমস্ত রোগ (অসুখ) শুধু নাম মন্ত্র জপে আর গুরুদেবের আশীর্বাদে সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ ঠিক হয়ে যায়। আমি বন্দীছোড় সদগুরু দেবের কাছে প্রার্থণা করি হেগুরু দেব! যে সুখ শান্তি আমাকে দিয়েছেন। সবাইকে সেইরূপ কৃপা করুন।

ভক্ত কর্মবীর দাস পুত্র ঘাসীরাম
গ্রাম- ভরানা, জেলা- রোহ্তক।
ভক্ত ডা. ওমপ্রকাশ হুড্ডা মো:- ৯৮১৩০৪৫০৫০

"ভগবানের রহমতে বেঁচে গেল ছেলের জীবন"

আমার নাম মোহাম্মদ সিরাজ খান। আমি জেলা-গয়া (বিহার) থেকে এসেছি। ইসলামিক পরিবারে জন্মগ্রহণ হওয়ায় আমিও আমার পূর্বপুরুষদের মতো ভক্তি ক্রিয়া করতাম। যেমন নামাজ পড়া, বকরীদ উদযাপন, মহরম উদযাপন করা ইত্যাদি। সন্ত রামপাল জী মহারাজের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে, আমি ও আমার পরিবার মুসলিম ধর্ম অনুসারে দু'জন পীরকে নিজের গুরু ধারণ করেছিলাম। আমি তাঁদের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত ভক্তি ক্রিয়া করতাম।

যে মুসলিম পীরের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম তার কথা আমাদের কাছে ভুল মনে

হতে লাগলো। তারপর সন্ত রামপাল জী মহারাজের একজন শিষ্যের সাথে আমাদের দেখা হয় এবং তার সাথে আমাদের জ্ঞান চর্চা প্রায়শই হতে থাকতো। এই কথোপকথন এক মাস ধরে আমাদের চলতে থাকে। আমি আমার জ্ঞান বলতাম, আর ভক্ত জী তাদের গুরুজীর বলা জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করত। তারা যখন অসুর নিকন্দন রমৈনী (দুপুরের আরতি) এবং সন্ধ্যার আরতি করতেন, আমরাও তা শুনতাম। সেই ভক্ত জী সন্ত রামপাল জী মহারাজের জয় ধ্বনি দিতেন আর সেইসাথে আমিও সন্ত রামপাল জী মহারাজের জয় ধ্বনি দিতাম। “সন্ত রামপাল জী মহারাজ জী কি জয়”, “কবীর সাহেব কি জয়” এবং আমি যখন সেই জয়-ধ্বনি দিতাম, তখন আমি ভিতর থেকে অনুভব করতাম যে আমি অনেক শক্তি পাচ্ছি।

একদিন আমি যখন ডিউটিতে ছিলাম, দেখি একটা কবির পন্থী বই নিচে পড়ে আছে। বাড়িতে এনে সেই বই পড়া শুরু করলে সন্ত রামপাল জী মহারাজের শিষ্য বললেন, সত সাহেব ভাই! আপনি কোন বই পড়ছেন? আমি আপনাকে আমার একটি বই জ্ঞান গঙ্গা দিচ্ছি, আপনি এটি পড়ুন এবং এটাকে একটি সাধারণ বই বলে মনে করবেন না। সন্ত রামপাল জী, আল্লাহ্ রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। আমি আমার অন্তর আত্মা দিয়ে অনুভব করেছিলাম যে, ভক্ত জী যা বলছেন তা ঠিক। আমি সেই বইটি বাড়িতে নিয়ে এসে একটু একটু করে পড়তে শুরু করলাম। যদিও আমি ঠিকমতো পড়তে জানতাম না, কিন্তু আমি যখন বসে বসে দেখতে লাগলাম, তখন আমার স্ত্রী-সন্তান আমাকে দেখে হাসতে লাগলেন এবং বললেন, বাবা! তুমি কখনো কিছু পড়োনি, আজ তুমি একটা বই পড়ছো। এই করে আস্তে আস্তে আমি বই পড়া শুরু করলাম। প্রথমে আমি সৃষ্টি রচনা পড়ি তারপর ভাবলাম এত ভালো জ্ঞান কোথায় লুকিয়ে ছিল। এই বলে আমি মনে মনে কাঁদতে লাগলাম। দু-একদিন পর হঠাৎ আমার ছেলের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেল। বইটি পড়ার সময় আমি আমার স্ত্রীকে বললাম যে, সন্ত রামপাল জী মহারাজের একজন ভক্ত আমাকে বইটি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ভাই, আপনি যদি ছোট বা বড় কোন সমস্যায় পড়েন, তবে আপনি সন্ত রামপাল জী মহারাজকে প্রণাম করুন এবং প্রার্থনা করুন। আপনার কাজ হয়ে যাবে। তাই আমি “জ্ঞান গঙ্গা” বইতে থাকা গুরুজীর ছবির কাছে প্রণাম করে প্রার্থণা করলাম, এবং 10 মিনিটের মধ্যে আমার সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের ঈশ্বর-আমাদের আল্লাহ্ তো ইনি, যিনি আমার সন্তানকে 10 মিনিটের মধ্যে সুস্থ করে দিয়েছেন। সেই মুহুর্তে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এখন আমরা সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছে যাব, তাতে দুনিয়া যাই বলুক না কেন! সন্ত রামপাল জী মহারাজের শিষ্য আমাকে একটি মেমরি কার্ড দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সন্ত রামপাল জী মহারাজের সৎসঙ্গ ছিল। আমরা তা শুনতে শুরু করলাম। তারপর কিছুদিন পর সন্ত রামপাল জী মহারাজের বারবালা আশ্রমে গিয়ে আমরা নাম-দীক্ষা গ্রহণ করি।

সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেওয়ার পর আমরা অনেক প্রকার লাভ পেয়েছি। যেমন, আমার স্ত্রী পাইলস্ রোগে ভুগছিল, ঈশ্বর তাও সুস্থ করে দিলেন। আমার নাম-দীক্ষার নেওয়ার পর, আমার স্ত্রী আমার ওপর রেগে গিয়ে রেললাইনে আত্মহত্যা করতে যায়। তখন আমি প্রণাম স্থলে দন্ডবৎ প্রণাম (সেজদা) করলাম এবং আল্লাহের (পরমাত্মার) কাছে প্রার্থনা করলাম, হে দাতা! এই বান্দার

(দাসের) সম্মান তোমার হাতে। আমার ছোট ছোট বাচ্চা আছে। আমার ভক্তিমতির কিছু হলে এই দাসের কোনো সম্মান থাকবে না। এখন শুধু আপনিই জানেন পরমাত্মা! তারপর কিছুক্ষণ পর দেখলাম, আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরাপদে ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। তখন আমি বললাম, ক্ষমা আমার কাছে নয়, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। এইভাবে, ভগবান আমার ভক্তিমতিকে সদবুদ্ধি দিলেন এবং তার জীবন রক্ষা করলেন। আমার এক ছেলে প্রতিদিন প্রনাম স্থলের কাছেই ঘুমাতো। সকালে যখন আমার মেয়ে সেখানে ঝাড়ু দিতে গিয়েছিল, সে দেখল আমর ছেলে যেখানে ঘুমাতো, সেখানে গুরুজীর ছবির সামনে একটি ফনা ওয়ালা সাপ কুঁকড়ে মরে পড়ে আছে। ঈশ্বর আমাদের সন্তানকেও বাঁচিয়ে নিয়েছেন, নাহলে কি হতো কে জানে! আমার বড় সন্তানের পেটে পাথর হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা আল্ট্রাসাউন্ডে জানিয়েছিলেন, অপারেশনের মাধ্যমেই তাকে সুস্থ করা সম্ভব। কিন্তু আমরা যখন সন্ত রামপাল জী মহারাজের আশ্রমে প্রার্থনা করি, তখন আমার সন্তানের সেই পাথর কোনো অপারেশন ছাড়াই পুরোপুরি সেরে যায়।

নাম দীক্ষা নেওয়ার আগে আমার অনেক ধরনের নেশার সমস্যা ছিল, অর্থাৎ আমি প্রচুর পরিমানে নেশা করতাম। আমি মদ, গাঁজা, ভাং, বিড়ি ও সিগারেটও পান করতাম। পরিবারের সবাইকে কষ্ট দিতাম এবং নিজেও কষ্টে ছিলাম। কিন্তু সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম-দীক্ষা নেওয়ার পর পরমাত্মা আমাকে নেশার আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন এবং আমাকে এবং আমার পরিবারকে অনেক সুখ দিয়েছেন। পরমাত্মার রহমতে আজ আমরা জমিও কিনেছি। আমাদের গুরুজী সন্ত রামপাল জী মহারাজ আমাদেরকে মুসলমান থেকে হিন্দুতে রূপান্তরিত করেন না, তবে আমাদের ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসারে ভক্তির সঠিক বিধি প্রদান করেন এবং আমাদেরকে সদ্ ভক্তির পথে চালনা করেন।

আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনারাও নিকটতম নামদান কেন্দ্রে যান এবং সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা গ্রহণ করুন এবং ভক্তির সঠিক বিধি প্রাপ্ত করে আপনার কল্যাণ সাধন করুন।

(মোহম্মদ সিরাজ খান, গয়া (বিহার

যোগাযোগের নম্বর:- ৭০৩৩৮৩৩৩৭৫

"পূর্ণ পরমাত্মা (সদগুরু) পরমায়ু বাড়িয়ে দিলেন"

আমার নাম বাবু দাস প্রহ্লাদ ভাই প্যাটেল, গ্রাম-পলিয়াদ, তহসিল-কালোল, জেলা-গান্ধীনগরের বাসিন্দা। সদগুরু রামপাল জী মহারাজের শরণে আসার পর আমার পরিবার আর্থিক সংকটে ভুগছিল। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমরা রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতাম। আমরা উমিয়া মাতা এবং গায়ত্রী মাতার অনেক পূজা করতাম। এত পূজা-অর্চনা করা সত্ত্বেও আমাদের দুঃখের কোনো শেষ ছিল না। আমরা একবার আমাদের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে দর্শনের জন্য মাতা অম্বাজী তীর্থে গিয়েছিলাম। যেখানে আমরা "জ্ঞান গঙ্গা" নামে একটি বই পেয়েছিলাম, যা পড়ে আমরা বুঝতে পারলাম, শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি কি? তার সম্পর্কে সত্য তথ্য পাই এবং আমাদের পুরো পরিবার 04-11-2010 তারিখে সদ্ গুরুদেবের শরণ গ্রহণ করি। গোঝারিয়া গ্রামে আমার একটি

আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান আছে। 01-11-2012 তারিখে, আমি এবং আমার বড় ছেলে রবি, সন্ধ্যার সময় একটি মোটরসাইকেলে করে আমাদের দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিল। তখন হঠাৎ করে আমাদের গ্রামের সীমানায় রাস্তার মাঝখানে একটি শূকর চলে আসে এবং আমাদের মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা লাগে, যার কারনে আমি মোটর সাইকেল থেকে লাফিয়ে পড়ে মাইল স্টোনের পাথরের সাথে ধাক্কা খাই এবং আমার মাথায় পাথরের আঘাত লেগে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পাশ দিয়ে যাওয়া গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রামীণ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে উপস্থিত চিকিৎসকরা আমার নাড়ি পরীক্ষা করে আমাকে মৃত ঘোষণা করেন। আমার ছেলে হরিয়াণায় সতগুরু রামপাল জী মহারাজের কাছে ফোনে প্রার্থনা করেছিল এবং বলেছিল যে আমার বাবাকে মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে! তখন গুরুজী বললেন, "ওকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাও, পরমাত্মা দয়া করবেন। ওর কিছু হবে না।" সেখান আমার ছেলেরা আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে গান্ধী নগরের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসকরা এমন পেশেন্ট নিতে অস্বীকার করেন। পরে আমার ছেলেরা সদগুরু রামপাল জী মহারাজের জয়ধ্বনি দিয়ে আমাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যায় যেখানে পথে আমার শরীরে প্রাণ ফিরে আসে এবং আমাকে অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ দীপক মালহোত্রা আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন এবং চারটি অপারেশনের নির্দেশ দেন। যার প্রথম অপারেশনটি তিন ঘন্টা ধরে হয়েছিল কারণ আমার মাথার খুলিটি ছোট ছোট টুকরো হয়ে গিয়েছিল। গুরুজী স্বয়ং এসে আমার অপারেশন করেন যেটা তিন ঘন্টা ধরে চলার কথা, সেটা মাত্র ৪৫ মিনিটে করে দেন। তারপর তিনি আমাকে হাসপাতালের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আজ পর্যন্ত আমাকে দ্বিতীয়বার আর অস্ত্রোপচার করাতে হয়নি। এটি পরমেশ্বরের একটি মহান অলৌকিক ঘটনা এবং সতগুরু রামপাল জী মহারাজ আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। আজ আমাদের পুরো পরিবার সতগুরু রামপাল জী মহারাজের প্রদত্ত জ্ঞান অনুসারে ও শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি করছে।

বলো সতগুরু দেবের জয়।

নাম:- বাবু দাস প্রহ্লাদ ভাই প্যাটেল, গ্রাম:- পলীয়াড়,
তহসিল-কালোল, জেলা-গান্ধী নগর, গুজরাট,
মোবাইল নম্বর :- ৯৯১৩২৯৫৬১৮

"ভূত-প্রেতের প্রভাব এবং আর্থিক সংকটের হাত থেকে আমার পরিবারকে রক্ষা করেছেন"

আমার নাম সরস্বতী দাসী, আমি এবং আমার পরিবার সন্ত রামপাল জী মহারাজের শরণে আসার পূর্বে, আমরা সমস্ত প্রকার পুজা-পাঠ করতাম। দেবী-দেবতাদের এতো পূজা-পাঠ করার পরেও আমরা কোনো রকম লাভ পাচ্ছিলাম না। আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল পেতে থাকি। আমরা সমস্ত দেবী-দেবতার পূজা করতে করতেও খুবই দুঃখী ছিলাম। আমার মায়ের উপর ভুত-প্রেতের প্রভাব ছিল। আমরা সমস্ত রকম ডাক্তার, ওঝা, কবিরাজ, গুনীন দেখিও আমার মায়ের সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি।

আমার বাবা টিভিতে সমস্ত ধরনের সাধু-সন্তের সৎসঙ্গ প্রবচন শুনতেন। এমনই একদিন সাধু-সন্তের প্রবচন শুনছিলেন। টিভি চ্যানেল পাল্টাতে পাল্টাতে হঠাৎ সাধনা টিভিতে সন্ত রামপাল জী মহারাজের সৎসঙ্গ চলে আসে। সৎসঙ্গের মধ্যে

তিনি বলছিলেন যে, যারা তিন দেবী-দেবতার ভক্তি করে তাদের স্বপ্নেও সুখ হয় না। সন্ত গরিব দাস জী নিজের বাণীতে বলেছেন, তিন দেব কি ভক্তি মে, ভুল পড়ো সংসার। কহে কবীর নিজ নাম বিনা কেসে উতরে পার। সন্ত রামপাল জী মহারাজ গীতা থেকে প্রমাণ দেখাচ্ছিলেন যে, "যে সাধক দেবী-দেবতাদের পুজো করে তারা মানুষের মধ্যে নিচ, অসুর স্বভাবের দুষকর্মকারী, গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন, তারা আমারও ভক্তি করে না।" আমরা তখন রামপাল জী মহারাজের এই কথায় আশ্চর্য হলাম আর ওনার সৎসঙ্গ প্রতিদিন সাধনা টিভিতে দেখতে শুরু করলাম এবং সমস্ত প্রমাণ দেখে বিশ্বাস হল যে, সন্ত রামপাল জী মহারাজ ঠিক কথা বলছেন। তাই ওনার কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেয়ার কথা চিন্তা করছিলাম। তখন আমার বাবা সন্ত রামপাল জী মহারাজের আশ্রম বরবালায় গিয়ে নাম দীক্ষা নিয়ে আসেন এবং সন্ত রামপাল জী মহারাজের সতসঙ্গে প্রভাবিত হয়ে আমরাও ২০১৩ সালে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করি। সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার আগেই ওনার সৎসঙ্গ শুনতে শুনতেই আমার মায়ের কিছু কিছু লাভ প্রাপ্ত হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। যখন নাম দীক্ষা নিলেন তখন আমার মা একদম সুস্থ হয়ে গেলেন। আর আজ অব্দি কোনরকম ওষুধ খেতে হয় না, এবং ভূত-প্রেতের ওঝা, কবিরাজের কাছেও যেতে হয়নি। সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে আমরা এখন অনেক সুখে আছি। আমাদের অনেক লাভ হয়েছে। আমার বাবার মাথায় উপর ৩৫ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা ছিল। এদিকে আমাদের আর্থিক স্থিতি একদমই ভালো ছিল না। সেই ঋণ গুরুজীর শরণে আসার পর, ওনার কৃপায় সম্পূর্ণ শোধ হয়ে যায়। আমরা আগে খুবই কষ্ট করতাম তবুও আমাদের বাড়িতে টাকা পয়সার অভাব রয়েই যেত। এছাড়া আমাদের বাড়িতে যত রকমের অসুবিধা ছিল তা সব সদগুরু রামপাল জী মহারাজের দয়ায় সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন সন্ত রামপাল জী মহারাজের দয়ায় খুব ভালোভাবে আমাদের জীবন নির্বাহ হয়। আমাদের এখন কোন রকম দুঃখ-কষ্ট নেই, সন্ত রামপাল জী মহারাজের দয়ায় আজ আমার দুই দিদির সম্পূর্ণ যৌতুক মুক্ত বিবাহ হয়েছে। তারাও নিজেদের নিজেদের সংসার নিয়ে খুব সুখী আছে এবং সতভক্তি করছে। সন্ত রামপাল জী মহারাজের অসীম দয়ায় এখন আমাদের কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট নেই। আমি সমস্ত ভক্ত সমাজের কাছে প্রার্থনা করছি, ঠিক যেমন আমি ও আমার পরিবার খুবই দুঃখী ছিলাম। একই রকম ভাবে আজ যে সমস্ত মানুষজন আর্থিক, শারীরিক ও সামাজিক ভাবে দুঃখী আছেন, আপনারাও সন্ত রামপাল জী মহারাজের মঙ্গল প্রবচন শুনুন। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সন্ত রামপাল জী মহারাজের সৎসঙ্গ প্রবচন শুনুন, জ্ঞান বুঝুন তারপর সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের ও পরিবারের জীবন সফল করুন।

য়ে সংসার সমঝদা নাঁহী, কহন্দা শ্যাম দুপহরে নূঁ।
গরীবদাস য়ে বক্ত জাত হৈ, রোবেগা ইস পহরে নূঁ॥

॥ সত্ সাহেব॥

❑❑❑

"কবীর সাহেবের সহিত কালের বার্তালাপ"

পরমেশ্বর যখন সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করে নিজ লোকে বিশ্রাম করতে লাগেন। আমরা সকল আত্মারা তখন কালের ব্রহ্মাণ্ডে থেকে নিজের কর্মদণ্ড ভোগ করে খুব দুঃখী রইতে লাগলাম। সুখ ও শান্তির খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকি। আর নিজ ঘর সতলোকের কথা মনে করতে থাকি এবং সেখানে যাওয়ার জন্য ভক্তি আরম্ভ করি। কেউ চার বেদ কণ্ঠস্থ করে, কেউ তপ করে জীবন কাটিয়ে দেয় আবার কেউ হবন (যজ্ঞ) করে, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি ক্রিয়া প্রারম্ভ করে দেয়। কিন্তু নিজের ঘর সতলোকে যেতে পারে না। কারণ, উক্ত ক্রিয়াগুলি করার ফলে পরের জন্মে সুখ সমৃদ্ধির জীবন প্রাপ্ত করে (যেমন রাজা, মহারাজা, বড় ব্যবসায়ী, অফিসার, আধিকারিক, দেব-মহাদেব, স্বর্গ-মহাস্বর্গ ইত্যাদি), পুনরায় চুরাশি লক্ষ যোনী ভুগতে থাকে এবং খুব দুঃখী হয়ে পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থণা করতে থাকি যে, হে দয়ালু! আমাদের নিজের বাড়ির রাস্তা দেখান। আমরা হৃদয় দিয়ে আপনার ভক্তি করছি। আপনি আমাদের দর্শন দিচ্ছেন না কেনো?

কবীর সাহেব, ধর্মদাস জীকে এই সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে বলছেন, ধর্মদাস! জীবেদের এই আর্তনাদ শুনে আমি সতলোক থেকে জোগজীতের রূপ ধরে কালের লোকে এসেছি। তখন একুশ তম্ ব্রহ্মাণ্ডে কাল নিজ লোকে তপ্ত শিলার উপরে জীবকে ভেজে তার সুক্ষ্ম শরীর থেকে গন্ধ বের করছিল। তখন আমি সেখানে পৌঁছতেই জীবের জ্বালার কষ্ট সমাপ্ত হয়ে যায়। তারা আমাকে দেখে বললো, হে পরমপুরুষ! আপনি কে? আপনার দর্শন মাত্র আমাদের বড়োই সুখ-শান্তির আভাস হচ্ছে। তখন আমি বলি, আমি পারব্রহ্ম পরমেশ্বর কবীর। তোমরা সকল জীবেরা আমার লোক থেকে এসে এই কাল ব্রহ্মের লোকে ফেঁসে গিয়েছো। এই কাল (ব্রহ্ম) প্রত্যেকদিন এক লক্ষ মানবের সুক্ষ্ম শরীর থেকে গন্ধ বের করে খায়, তারপর নানা-প্রকার যোনীতে কর্মদণ্ড ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেয়। তখন জীবাত্মা বলতে থাকে যে, হে দয়ালু পরমেশ্বর! আমাদের এই কালের কারাগার থেকে বের করুন। আমি বললাম, এই ব্রহ্মাণ্ড, কাল তিনবার ভক্তি করে আমার কাছ থেকে প্রাপ্ত করেছে। যে সকল বস্তু তোমরা এখানে ব্যবহার করছো, তা সবই কালের। তোমরা সবাই স্বেচ্ছায় ঘোরার জন্য এখানে এসেছিলে। এই জন্য তোমাদের উপর কাল ব্রহ্মের প্রচুর ঋণ জমে গিয়েছে, এই ঋণ আমার আসল নাম ছাড়া সমাপ্ত শোধ হবে না।

যতদিন পর্যন্ত তোমরা ঋণমুক্ত হবে না, ততদিন কাল ব্রহ্মের কারাগার থেকে বাইরে যেতে পারবে না। এর জন্য তোমাদেরকে আমার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে ভক্তি করতে হবে। তারপর আমি তোমাদেরকে কালের লোক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। আমরা এই সকল বার্তালাপ করছিলাম, ইতিমধ্যে কাল ব্রহ্ম প্রকট হয় এবং ক্রোধিত হয়ে আমার উপর আক্রমন করে। আমি নিজ শব্দশক্তি দ্বারা তাকে মুর্ছিত করে দিই। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরলে, আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগে আর বলে, আপনি আমার বড় ভাই, আর আমি ছোট, আমাকে দয়া করুন। বলুন, আপনি আমার লোকে কেন এসেছেন? তখন আমি কাল পুরুষকে বলি, কিছু জীবাত্মারা ভক্তি করে নিজ ঘর সতলোকে যেতে চায়। কিন্তু তারা সদ্ ভক্তি মার্গ পাচ্ছে না। তাই ভক্তি করার পরেও তারা এই লোকেই থেকে যায়। আমি জীবাত্মাদের সদ্ ভক্তি মার্গ বলে দিতে এবং তোর আসল পরিচয় দেওয়ার জন্য এসেছি যে, তুই

হলি কাল। তুই প্রত্যেকদিন এক লক্ষ জীবের আহার করিস ও সোয়া লক্ষ উৎপন্ন করিস এবং স্বয়ং ভগবান হয়ে বসে আছিস। আমি আত্মাদের বলবো যে, তোমরা যার ভক্তি কর সে ভগবান নয়, সে কাল! তখন কাল বলে, "যদি আপনি সর্ব আত্মাদের সতলোকে নিয়ে যান তাহলে আমার খাবারের কি হবে? আমি না খেতে পেয়ে মারা যাব। আপনার কাছে আমার প্রার্থণা যে, তিন যুগে কম সংখ্যক জীব নিয়ে যাবেন এবং কাউকে আমার পরিচয় দেবেন না যে, আমি কাল, আমি সকলকে খেতে এসেছি। তারপর যখন কলিযুগ আসবে তখন যত খুশি জীবেদের নিয়ে যাবেন।" আমি তাতে সম্মতি দিই। আর এই ভাবে কৌশলে শর্ত সাপেক্ষে কাল আমার (কবীর সাহেব) থেকে বচন প্রাপ্ত করে নেয়।

কবীর সাহেব ধর্মদাস জীকে বলছেন যে, আমি সত্য যুগে, ত্রেতা যুগে ও দ্বাপরযুগেও এসেছিলাম এবং বহু জীবকে সতলোক নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু কাউকে কালের ভেদ (পরিচয়) বলিনি। এখন আমি কলিযুগে এসেছি এবং কালের সাথে আমার বার্তা হয়েছে, কাল ব্রহ্ম আমাকে বললেন যে, আপনি আপনার সর্ব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে দেখে নিন কিন্তু আপনার কথা কেউ শুনবে না। প্রথমত, আমি জীবকে ভক্তি করার যোগ্যই রাখিনি, তাদেরকে বিড়ি, সিগারেট, মদ, মাংস ইত্যাদির প্রতি আসক্তির বদ অভ্যাস করিয়ে, তাদের প্রবৃত্তি নষ্ট করে দিয়েছি। জীবাত্মাদের বিভিন্ন প্রকার পাখন্ড পূজায় লিপ্ত করে রেখেছি। দ্বিতীয়ত, আপনি যখন নিজের জ্ঞান সকলকে দিয়ে নিজের লোকে ফিরে যাবেন, তখন আমি (কাল) আমার দূত পাঠিয়ে আপনার পন্থের অনুরূপ ১২ -টি পন্থ চালিয়ে দিয়ে সবাইকে ভ্রমিত করে দেব। মহিমা বলবে সতলোকের, জ্ঞান বলবে আপনার অথচ নাম জপ করবে আমার। পরিণাম স্বরূপ আমারই ভোজন হবে। এই কথা শুনে কবীর সাহেব বললেন, তুই তোর চেষ্টা কর, আমি সতমার্গ বলে দিয়েই ফিরবো। আর আমার জ্ঞান যে শুনবে সে তোর চালাকিতে কখনো ফাঁসবে না।

সদগুরু কবীর সাহেব বলেন, হে নিরঞ্জন! আমি চাইলেই তোর সব খেলা সেকেন্ডের মধ্যেই সমাপ্ত করে দিতে পারি। কিন্তু এমন করলে আমার বচনভঙ্গ হবে। এই চিন্তা করে আমার প্রিয় হংস আত্মাদেরকে যথার্থ জ্ঞান দিয়ে, শব্দের বল প্রদান করে, তাদেরকে সতলোকে নিয়ে যাব আরও বললেন যে :-

সুনো ধর্মরায়া, হম সঙ্খোঁ হংসা পদ পরসায়া।
জিন লীন্হা হমরা প্রবানা, সো হংসা হম কিএ অমানা॥

(পবিত্র কবীর সাগরে জীবকে ভ্রমিত করার জন্য তথা নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা।)

দ্বাদস পন্থ করূঁ মৈঁ সাজা, নাম তুমহারা লে করূঁ অবাজা।
দ্বাদস যম সংসার পঠহো, নাম তুম্হারে পন্থ চলৈহো॥
প্রথম দূত যম প্রগটে জাঙ্গ, পিছে অংশ তুমহারা আঙ্গ॥
য়হী বিধি জীবনকো ভ্রমাউঁ, পুরুষ নাম জীবন সমঝাউঁ॥
দ্বাদস পন্থ নাম জো লৈহে, সো হমরে মুখ আন সমৈ হৈ॥
কহা তুমহারা জীব নহীঁ মানে, হমারী ঔর হোয় বাদ বখানৈ॥
মৈঁ দৃঢ় ফন্দা রচী বনাঙ্গ, জামেঁ জীব রহে উরঝাঙ্গ॥
দেবল দেব পাষাণ পূজাঙ্গ, তীর্থব্রত জপ-তপ মন লাঙ্গ॥

যজ্ঞ হোম অরু নেম অচারা, ঔর অনেক ফঁন্দ মেঁ ডারা।
জো জ্ঞানী জাও সংসারা, জীব ন মানৈ কহা তুম্হারা॥

(সতগুরু বচন)

জ্ঞানী কহে সুনো অন্যাঈ, কাটো ফঁন্দ জীব লে জাঈ॥
জেতিক ফঁন্দ তুম রচে বিচারী, সত্য শবদ তৈ সবৈ বিন্ডারী॥
জৌন জীব হম শব্দ দৃঢ়াবৈ, ফাঁন্দ তুমহারা সকল মুকাবৈ॥
চৌকা কর প্রবানা পাঈ, পুরুষ নাম তিহি দেউঁ চিন্হাঈ॥
তাকে নিকট কাল নহীঁ আবৈ, সন্ধি দেখী তাকহঁ সির নাবৈ॥

উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়, কাল ভগবান অনেক পন্থ চালিয়েছেন। তাদের কাছে কবীর সাহেবের দ্বারা বলা সত্ ভক্তি মার্গ নেই। এরা সব কাল প্রেরিত। বুদ্ধিমান লোকের উচিত ভেবে চিন্তে বিচার করে ভক্তি মার্গ গ্রহণ করা। কারণ মানুষ জন্ম বারবার হয় না। কবীর সাহেব বলেছেন:-

কবীর, মানুষ জন্ম দুর্লভ হৈ, মিলে ন বারম্বার।
তরুবর সে পত্তা টূট গিরে, বহুর ন লগতা ডার॥

❑❑❑

“বিশ্ব বিজেতা সন্ত”

(সন্ত রামপালজী মহারাজের অধ্যক্ষতায় হিন্দুস্থান বিশ্ব ধর্মগুরু রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।)

“সন্ত রামপাল জীর বিষয়ে নাস্ত্রেদমস এর ভবিষ্যৎ বাণী”

ফ্রান্স দেশের নাস্ত্রেদমস নামক এক প্রসিদ্ধ ভবিষ্যৎ বক্তা ১৫৫৫ সালে এক হাজার শ্লোক সমন্বিত ভবিষ্যতের সাংকেতিক সত্য ভবিষ্যৎবাণী লিখেছেন। এক শত শ্লোকের মোট ১০ অংশ বলেছেন। এই ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যে আজ পর্যন্ত সর্ব ভবিষ্যৎবাণী সিদ্ধ (ফলিভুত) হয়েছে। ভারতবর্ষে সিদ্ধ হওয়া ভবিষ্যৎবাণী গুলির মধ্যে :-

১. ভারতের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী খুব প্রভাবশালী ও দক্ষ হবে। (এই ভবিষ্যৎ বাণী স্বর্গীয় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির দিকে সংকেত করে) এবং তাঁর মৃত্যু নিকটতস্থ্ দেহরক্ষী দ্বারা হবে বলে লেখা ছিল। যা সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে।

২. ওনার পরে তাঁর পুত্র উত্তরাধিকারী হবে এবং সে খুব কম সময় পর্যন্ত রাজত্ব (শাসন ভার সামলাবে) করবে, এবং আকস্মিক মৃত্যু প্রাপ্ত হবে। যা সত্য সিদ্ধ হয়েছে। (পূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় শ্রী রাজীব গান্ধীর বিষয়ে)

৩. সন্ত শ্রী রামপালজী মহারাজের বিষয়ে নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যৎবাণী, যা বিস্তারিত ভাবে নিম্নে দেওয়া হল-

(ক) নাস্ত্রেদমস, নিজ ভবিষ্যৎ বাণীর পঞ্চম শতকের শেষের দিকে এবং ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে লিখেছেন যে, আজ অর্থাৎ ১৫৫৫ সাল থেকে ঠিক ৪৫০ বৎসর পর ২০০৬ সালে এক হিন্দু সন্ত (শায়রণ) প্রকট হবেন এবং সর্ব জগতে তাঁর চর্চা হবে। ওই সময় ওই ধার্মিক সন্তের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে হবে। পরমেশ্বর নাস্ত্রেদমসকে সন্ত রামপালজী মহারাজের মধ্যবয়সী শরীরের সাক্ষাৎ করিয়ে চলচিত্রের মত সর্ব ঘটনা দেখিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্রী নাস্ত্রেদমস ১৬ তম শতাব্দকে প্রথম শতক বলেছেন। এই প্রকার পঞ্চম শতক অর্থাৎ ২০ তম শতাব্দ হয়। নাস্ত্রেদমস জী বলেছেন, ওই ধার্মিক হিন্দু নেতা অর্থাৎ সন্ত (CHYREN-শায়রণ) পঞ্চম শতকের শেষ বর্ষে অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে ঘরে ঘরে সৎসঙ্গ করা ত্যাগ করে অর্থাৎ চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে আসবেন এবং নিজের অনুগামীদের শাস্ত্রবিধি অনুসার ভক্তি মার্গ বলবেন। ওই মহান সন্তের বলা মার্গে চললে অনুগামীদের অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আর ভৌতিক লাভ হবে। ওই তত্ত্বদ্রষ্টা হিন্দু সন্ত দ্বারা বলা শাস্ত্র প্রমাণিত তত্ত্বজ্ঞান বুঝে পরমাত্মা প্রেমী ভক্তরা এমন ভাবে আচম্বিত হবে যেমন, কেউ গভীর নিদ্রা থেকে হঠাৎ যখন জেগে ওঠে। ওই তত্ত্বদ্রষ্টা হিন্দু সন্তের দ্বারা ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করা আধ্যাত্মিক বিপ্লব ২০০৬ সাল পর্যন্ত চলবে। ততক্ষনে বহু সংখ্যায় পরমাত্মা প্রেমী ভক্তরা তত্ত্ব জ্ঞান বুঝে গিয়ে অনুগামী হয়ে সুখী হয়ে যাবে। তারপর ওই সন্ত ওই স্থানেরও চৌকাঠ পেরিয়ে আসবেন। তারপর ২০০৬ সাল থেকে স্বর্ণ যুগ প্রারম্ভ হবে।

বিঃদ্রঃ- প্রিয় পাঠকগণ! কৃপা করে পড়ুন নিম্নের ভবিষ্যৎ বাণী, যেটি ফ্রান্স দেশের অধিবাসী শ্রী নাস্ত্রেদমস করছিলেন। তাঁর বিষয়ে মাদ্রাসের এক জ্যোতিষ শাস্ত্রী কে.এস.কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন, শ্রী নাস্ত্রেদমস দ্বারা ১৫৫৫ সালে লেখা ভবিষ্যৎবাণীর যথার্থ অনুবাদ “১৯৯৮ সালে মহারাষ্ট্রের এক জ্যোতিষ শাস্ত্রি করবেন। ওই জ্যোতিষ শাস্ত্রী নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যৎ বাণীর সংকেতিক ভাষার স্পষ্টিকরন করে তাতে লেখা ভবিষ্যৎ ঘটনার সঠিক অর্থ দিয়ে নিজের গ্রন্থ প্রকাশিত করবেন।” কৃপা করে ওই জ্যোতিষ শাস্ত্রীর যথার্থ অনুবাদ, অনুবাদ কর্তার নিজের ভাষায় পড়ুন:-

১) (পৃষ্ঠা নং. ৩২, ৩৩) :- দাঁড়াও স্বর্ণযুগ (রামরাজ্য) আসছে। এক মধ্যবয়সী উদার মহাক্ষমতার অধিকারী শুধু ভারতেই নয় সর্ব পৃথিবীর উপর স্বর্ণ যুগ নিয়ে আসবেন এবং নিজের সনাতন ধর্ম পুনঃস্থাপন করে যথার্থ ভক্তি মার্গ বলে দিয়ে সর্ব শেষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করবেন। তারপর ব্রহ্মদেশ, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা নেপাল, তিব্বত (তিবেত), আফগানিস্থান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশেও তিনি সর্বভৌম ধার্মিক নেতা হবেন। ক্ষমতাধারী চণ্ডাল চতুরদের উপর তাঁর প্রভাব হবে। এই নেতা (শায়রণ) বিশ্বের সকলের কাছে বোকা মনে হবে, শুধু দেখতে থাকুন।

২. (পৃষ্ঠা নং. ৪০-এ লেখা আছে):- দাঁড়াও রামরাজ্য (স্বর্ণযুগ) আসছে। জুন, সাল ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকা বিবর্তনের দ্বারা স্বর্ণ যুগের উত্থান (প্রারম্ভ) হবে। হিন্দুস্থানে উদিত মুক্তিদাতা শায়রণ পৃথিবীতে সুখ, সমৃদ্ধি শান্তি প্রদান করবে। শ্রী নাস্ত্রেদমস নিঃসন্দেহে বলছে যে, প্রকট হওয়া শায়রণ (CHYREN) এখন জ্ঞাত নেই, কিন্তু তিনি খ্রিস্টান অথবা মুসলমান একেবারেই নয়। তিনি হিন্দুই হবেন এবং আমি নাস্ত্রেদমস তাঁর জন্য এখন বুক ফুলিয়ে গর্ব করছি। কারণ, ওই দিব্য স্বতন্ত্র সূর্য শায়রণের উদয় হতেই বিদ্বান নামে পরিচিত পূর্বের মহান নেতাদের ব্যর্থ হয়ে তাঁর সামনে নম্র হতে হবে। ওই হিন্দুস্থানী মহান তত্ত্বদ্রষ্টা সন্ত সকলকে অভূতপূর্ব রাজ্য প্রদান করবেন। তিনি সমান আইন, সমান নিয়ম তৈরী করবেন, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে, ধনী-গরিবের মধ্যে, জাতি ও ধর্মের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখবেন না, কারো প্রতি অন্যায় হতে দেবেন না। ওই তত্ত্বদর্শী সন্তকে সর্ব জনতা বিশেষ ভাবে সম্মান করবে। মাতা-পিতা তো সম্মানীয় (আদরনীয়) হয় কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার ভিত্তিতে ওই শায়রণ (তত্ত্বদর্শী সন্ত) -এর পৃথক শ্রদ্ধার স্থান হবে। নাস্ত্রেদমস স্বয়ং জ্যু বংশের ও ফ্রান্স দেশের নাগরিক ছিলেন। নাস্ত্রেদমস খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি নিঃসন্দেহে বলছেন যে, প্রকট হওয়া শায়রণ একমাত্র হিন্দুই হবে।

৩. (পৃষ্ঠা নং. ৪১) :- সকলকে সমান আইন, নিয়ম, অনুশাসন পালন করিয়ে সত্য পথে চলনা করবেন। আমি (নাস্ত্রেদমস) একটি কথা নির্বিবাদে সিদ্ধ করছি ওই শায়রণ (ধার্মিক নেতা) নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করবেন। তিনি সত্য মার্গ দর্শনকারী মুক্তিদাতা, এশিয়া ভূ-খন্ডে যেই দেশের নাম মহাসাগরের (হিন্দু মহাসাগর) নামে আছে। ওই নামের দেশেই (হিন্দুস্থানে) জন্ম নেবেন। তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান ও জ্যু হবেন না, তিনি নিঃসন্দেহে হিন্দুই হবেন। অন্যান্য পূর্ববর্তী ধার্মিক নেতাদের থেকে অধিক বুদ্ধিমান এবং অজেয় হবেন। (নাস্ত্রেদমস ভবিষ্যৎবাণীর শতক ৬ শ্লোক ৭০ -তে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত বলেছেন) তাঁকে সকলে স্নেহ করবে। তাঁর প্রভাব সর্বত্র থাকবে। তার প্রতি ভীতিও থাকবে। কেউ অন্যায় কর্ম করতে চাইবেনা। ওই সন্তের নাম ও কীর্তি ত্রিভুবনে ছড়াবে অর্থাৎ আকাশ অতিক্রম করে সেখানেও তাঁর মহিমার প্রভাব হবে। এখনও পর্যন্ত অজ্ঞানের গাঢ় নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকা সমাজকে তত্ত্বজ্ঞানের আলো দিয়ে জাগিয়ে তুলবে। সর্ব মানব সমাজ তাড়াহুড়ো করে জাগ্রত হবে। তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে ভক্তি সাধনা করবে। সর্ব মানব সমাজকে দিয়ে সত্য সাধনা করবেন । যার কারণে, সর্ব সাধকদের নিজ আদি অনাদি স্থান (সত্যলোক) নিজের পূর্বপুরুষের কাছে নিয়ে গিয়ে সেখানে স্থায়ী বাসস্থান দেবেন (উত্তরাধিকারী করবেন)। এই নিষ্ঠুর ভূমি (কাল লোক) থেকে মুক্ত করাবেন, এই শব্দ বলে উঠবেন।

৪. (পৃষ্ঠা নং. ৪২, ৪৩) :- এই হিংস্র ক্রুরচন্দ্র (মহাকাল) কে? কোথায় থাকে?

তা ওই শায়রণই (তত্ত্বদর্শী সন্ত) বলবেন। ওই ক্রুরচন্দ্রের হাত থেকে শায়রণ CHYREN - জীবকে মুক্ত করাবেন। শায়রণের (তত্ত্বদর্শী সন্ত) রাজত্বকলে এই ভূ -লোকের পবিত্র ভূমিতে (হিন্দুস্থান) স্বর্ণ যুগের অবতরণ হবে, তারপর তা সারা বিশ্বে ছড়াবে। ওই বিশ্বনেতা ও তাঁর সদগুণের মহিমার গুণগান তার চলে যাওয়ার পরেও গাওয়া হবে। তাঁর মনের শালীনতা, বিনম্রতা, উদারতার এমন হৈ চৈ পড়ে যাবে, যার প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। এর আগে প্রকাশিত শতক ৬ শ্লোক ৭০-এর শেষে পংক্তিতে উল্লেখ আছে, সে নিজের শব্দ (কথা) নিজেই বলে ওঠে এবং শায়রণ বলছেন,"শায়রণ নিজের বিষয়ে মাত্র তিনটি শব্দ বলেন" এক বিজয়ী-জ্ঞাতা এর সাথে অন্য কোন বিশেষণ যুক্ত করলে আমি মঞ্জুর করবো না। (এই পৃষ্ঠা-৪২ এর চারটি বাণী হলো শতক ৬ শ্লোক ৭১) হিন্দু শায়রণ নিজ জ্ঞান দিয়ে উজ্জ্বল সর্বোত্তম উচ্চ স্বরূপের বিধান (তত্ত্বজ্ঞান) পুনরায় শর্তহীন ভাবে প্রকাশ করবেন। (Chyren will be chief of the world, Loved feared and unchallenged) মানব সংস্কৃতি নির্দোষ ভাবে সাজিয়ে তুলবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন এই বিষয়ে কেউ জানে না কিন্তু নিজের সময় মত নরসিংহ যেমন হঠাৎ প্রকট হয়েছিল, তেমনই ওই বিশ্বের মহান নেতা (Great Chyren) নিজের তর্কশুদ্ধ, ত্রুটি হীন আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর ভক্তি তেজ দ্বারা খ্যাত হবেন। আমি (নাস্ত্রেদমস) আশ্চার্য হচ্ছি। আমি না তাঁর দেশ (যেখান থেকে অবতারিত হবেন অর্থাৎ সতলোক দেশ) জানি আর না তাকে জানি, আমি তাকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মহিমা শব্দে আবদ্ধ করে নাজির করতে পারবো না। তাকে আমি Great Chyren (মহান ধার্মিক নেতা) বলি। নিজের ধর্ম বন্ধুদের (সাথী) বর্তমান সমস্যা থেকে, করুন অবস্থা থেকে, অস্থির জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান কে সূর্যের মত উদয় করে, নিজের ভক্তি তেজ দিয়ে জগতের মুক্তিদাতা ৫ ম (পঞ্চম) শতকের (২০ শতকের অন্তিম বর্ষে) শেষে ১৯৯৯ অর্ধবয়সী বিশ্বের মহান নেতা তেজস্বী সিংহ মানব (Great Chyren) উদ্বিগ্ন অবস্থায় চৌকাট লঙ্ঘন করে আমার (নাস্ত্রেদমস) মনের ভেদ নিচ্ছে। আর আমি তাঁকে স্বগত জানিয়ে বিস্মিত হচ্ছি, উদাসীন হচ্ছি, কারণ তার সম্পর্কে জগতের জ্ঞান না হওয়ার কারণে, আমার শায়রণ (তত্ত্বদর্শী সন্ত) উপেক্ষার পাত্র হচ্ছে।

আমার (নাস্ত্রেদমস) চিন্তা ভেদক ভবিষ্যৎবাণীর এবং ঐ বৈশ্বিক সিংহ মানবের উপেক্ষা করো না। তাঁর প্রকট হওয়ার পর তাঁর তেজস্বী তত্ত্বজ্ঞান রূপী সূর্য উদয় হওয়ায় আদর্শবাদী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পুনরুত্থান হবে এবং স্বর্ণ যুগের প্রভাত শতক ৬ -এ ১৫৫৫ সাল থেকে ৪৫০ বর্ষ পর অর্থাৎ ২০০৬ -তে (১৫৫৫ + ৪৫০ = ২০০৫ -এর পর অর্থাৎ ২০০৬-এ) প্রারম্ভ হবে। এই কৃতার্থ শুরুর (নাস্ত্রেদমস) আমি দৃষ্টান্ত হচ্ছি।

৫. (পৃষ্ঠা নং. ৪৪, ৪৫, ৪৬) :- (নাস্ত্রেদমস শতক ১ শ্লোক ৫০-এ পুনঃ প্রমাণিত করেছেন) তিন দিক দিয়ে সাগরে ঘেরা দ্বীপে (হিন্দুস্থান দেশ) ওই মহান সন্তের জন্ম হবে। ওই সময় তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানের অন্ধকার থাকবে। নৈতিকতার পতন ঘটে হাহাকার লেগে যাবে। ওই শায়রণ (ধার্মিক নেতা) গুরুবর অর্থাৎ গুরু দেবকে স্বামী (শ্রেষ্ঠ) মেনে নিজে সাধনা করবেন ও করাবেন। ওই ধার্মিক নেতা (তত্ত্বদর্শী সন্ত) নিজের ধর্ম বলে অর্থাৎ ভক্তির শক্তি দিয়ে এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব রাষ্ট্রকে নতমস্তক করাবেন। এশিয়ায় তাকে বাধা দেওয়া অর্থাৎ তার প্রচার প্রসারে বাধা দেওয়া পাগলামি করা হবে। (শতক ১ শ্লোক ৫০-এ)

(নোট:- নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণী ফ্রান্স দেশের ভাষায় লেখা ছিল। পরে এক পাল ব্রন্টন নামক ইংরেজ এই নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যৎবাণী "সেঞ্চুরী গ্রন্থ" -কে

কিছু বছর ফ্রান্সে থেকে বুঝে নিয়ে তারপর ইংরেজী ভাষায় লেখেন। তিনি গুরুবর শব্দটিকে গুরুবার (বৃহস্পতি) অর্থাৎ থ্রাস ডে মনে করে লিখে দেন যে, তিনি (শায়রন) বৃহস্পতিবারকে নিজ পূজার আধার করবেন। আসলে গুরুবর শব্দের অর্থ হলো, সর্ব গুরুদেবের মধ্যে যিনি একমাত্র তত্ত্বজ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ এবং গুরুকে মূখ্য মেনে সাধনা করতে হয়। বেদ ভাষায় বৃহস্পতির ভাবার্থ হল সর্বোচ্চ স্বামী অর্থাৎ পরমেশ্বর। বৃহস্পতির দ্বিতীয় অর্থ জগৎ গুরুও হয়। জগতগুরু ও পরমেশ্বর দুইই বৃহস্পতির বোধ করায়)

তিনি মধ্য বয়সে তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞানী হয়ে ত্রিখন্ডে কীর্তিমান হবেন। আমাকে (নাস্ত্রেদমস) তাঁর নতুন সাধনামন্ত্র এমন নিপীড়ক মনে হচ্ছে, যেমন সাপকে বস করার গাড়ড়ু মন্ত্র মহাবিষধর সাপকেও বশ করে নেয়। তিনি নতুন উপায়, নতুন আইন তৈরি করা দার্শনিক দুনিয়ার সামনে প্রকাশিত হবে। তাকেই আমি (নাস্ত্রেদমস) বিস্মিত হয়ে "গ্রেট শায়রণ" বলছি। তাঁর জ্ঞানের দিব্য তেজের প্রভাবে ওই দ্বীপে (ভারতবর্ষে) আক্রমনাত্মক ঝড়ে তোলপাড় হয়ে যাবে অর্থাৎ অজ্ঞানী সন্ত দ্বারা বিদ্রোহ হবে। তা শান্ত করার উপায়ও তিনিই জানবেন। যেমন উৎপীড়ক সর্পিনিকে বশ করা হয়। তিনি সিংহের ন্যায় শক্তিশালী ও তেজপুঞ্জ যুক্ত ব্যক্তিত্বের হবে। আমি নাস্ত্রেদমস এটি স্পষ্ট শব্দে বলছি যে, তিনি কুণ্ডলিনী শক্তি ধারণ করে আছেন। পরবর্তীতে স্পষ্ট শব্দ এই যে, যে সময় ওই শায়রণ যে মহাসাগরে দ্বীপকল্প রয়েছে ওই দেশের নামে মহাসাগরেরও নাম আছে (হিন্দু মহাসাগর)। বিশেষত্ব হবে যে, ওই দেশের ভুজঙ্গ সর্পিনী শক্তির (কুণ্ডলিনী শক্তি) পূর্ণ পরিচয় True Master হবেন। ওই Chyren (মহান ধার্মীক নেতা) উদার স্বভাবের, কৃপালু, দয়ালু, দৈদ্বিপ্যামাণ, সনাতন সম্রাজ্যের অধিকারী, আদি পুরুষের (সতপুরুষ) অনুগামী হবে। তাঁর সত্ত্বায় সর্বভৌম নিয়ন্ত্রণ হবে। এবং তাঁর মহিমা, উপায় গুরু শ্রদ্ধা, গুরু ভক্তি অর্থাৎ গুরু ছাড়া কোন সাধনা সফল হয় না। এই সিন্ধান্তকে দৃঢ় করবে। তত্ত্বজ্ঞানের সত্সঙ্গ করে প্রথমে অজ্ঞানের নিদ্রায় নিদ্রিত ধর্ম বন্ধুদের (হিন্দুদের) জাগ্রত করে,অন্ধ বিশ্বাসের আধারে সাধনা করতে থাকা শ্রদ্ধালুদের শাস্ত্রবিধিহীন সাধনার (বুরকা) পর্দা ছিঁড়ে দিয়ে,গুপ্ত গভীর জ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞান) আলোকপাত করবে। নিজের সনাতন ধর্মের পালন করিয়ে সমৃদ্ধি শান্তির অধিকারী করে তুলবেন। তারপর তাঁর তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ বিশ্বে ছড়াবে, ওই (মহান তত্ত্বদর্শী সন্ত) সন্তের জ্ঞানের সমতুল্য কেউ হবে না। তার গুঢ় জ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞান) সামনে সূর্যের তেজও ফিকে হয়ে যাবে। এইজন্য আমি (নাস্ত্রেদমস) বলছি, এই বৈশ্বিক সিংহ মহামানব এতটাই মহান হবেন যে, আমি তার মহিমাকে শব্দে আবদ্ধ করতে পারবো না। আমি (নাস্ত্রেদমস) ওই গ্রেট শায়রণকে দেখতে পাচ্ছি ।

উপরোক্ত বিবরণের ভাবার্থ হল, "ওই বিশ্বনেতার ৫০ বৎসর বয়সে শাস্ত্রে প্রমাণিত তত্ত্বজ্ঞাতা হবেন অর্থাৎ ৫০ বৎসর বয়সে ২০০১ সালে সর্ব ধর্মের শাস্ত্রগুলি অধ্যায়ন করে সেগুলির জ্ঞাতা (তত্ত্বজ্ঞানী) হবেন। তারপর ওই তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞাতা (জানার যোগ্য পরমেশ্বরের জ্ঞান অনান্য দের প্রদানকারী) হবে এবং ওই শায়রণের আধ্যাত্মিক জন্ম অমাবস্যায় হবে। ঐ সময় তার বয়স তরুণ অর্থাৎ ১৬, ২০, ২৫ বৎসরের হবে না, তিনি প্রৌঢ় হবেন এবং যখন তিনি প্রসিদ্ধ হবেন, তখন তার বয়স ৫০ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে হবে।

৬. (পৃষ্ঠা নং. ৪৬, ৪৭) :- নাস্ত্রেদমস বলেছেন, নিঃসন্দেহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞাতার (গ্রেট শায়রণ) বিষয়ে আমার ভবিষ্যৎবাণীর শব্দগুলি কোন নেতার ওপর যুক্ত করে তর্ক-বির্তক করে দেখলে কেউ এই চিহ্নিত করনে সফল হবে না। আমি নাস্ত্রেদমস জোর গলায় বলছি আমার শায়রণের কর্তৃত্ব আর তার গভীর জ্ঞান

(তত্ত্বজ্ঞান) সকলের অজ্ঞান পর্দা দূর করবে। ২০০৬ সাল আসতে দাও আমার এক এক শব্দ ওই শায়রণের জন্য সত্য হবে।

৭. (পৃষ্ঠা নং ৫২) নাস্ত্রেদমস তাঁর ভবিষ্যৎবাণীতে বলেছেন যে, ২১ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুনিয়ার (পৃথিবীর) ভূমির উপর শায়রণের উদয় হবে। যে সব পরিবর্তন হবে তা আমার ইচ্ছায় হবে না, শায়রণের আদেশে নিয়তির ইচ্ছায় সর্ব পরিবর্তন হবে। তাঁর মধ্যে নতুন পরিবর্তন অর্থাৎ হিন্দুস্থান সর্ব শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হবে। অনেক শতাব্দী পর্যন্ত দেখা যায়নি, হিন্দুদের এরকম সুখ সাম্রাজ্য দৃষ্টিগোচর হবে। ওই দেশেই জন্ম নেওয়া ধার্মিক সন্তই তত্ত্বদ্রষ্টা এবং জগতের মুক্তিদাতা হবে। এশিয়া মহাদেশে যে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির জ্ঞান যা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাঁর থেকেও পৃথক সত্য প্রমাণিত জ্ঞান ওই তত্ত্বদর্শী সন্তের হবে। তিনি সত্ পুরুষের অনুগামী হবেন। এবং এক অদ্বিতীয় সন্ত হবেন।

৮. (পৃষ্ঠা নং ৭৪):- অনেক সন্ত, নেতা, আসবে আর যাবে, তারা সকলে পরমাত্মার দ্রোহী এবং অভিমানী হবে। আমার (নাস্ত্রেদমস) আন্তরিক সাক্ষাৎকার ওই শায়রণের সঙ্গে হয়েছে। নাস্ত্রেদমস বলেছেন, ওই মহান হিন্দু ধার্মিক নেতাকে চিনতে না পেরে তাঁর উপর রাষ্ট্রদ্রোহীর অপবাদও লাগাবে। আমি দুঃখিত যে, ওই মহান ধার্মিক নেতাকে উপেক্ষার পাত্র বানানো হবে। কিন্তু হিন্দুস্থানের হিন্দু সন্ত আগামী অন্ধকার (ভক্তি জ্ঞানের অভাবে অন্ধ) প্রলয়কারী (স্বার্থের জন্য ভাই - ভাইকে মারছে, ছেলে বাপের থেকে বিমুখ, হিন্দু-হিন্দুর শত্রু, মুসলমান-মুসলমানে শত্রু) ধ্বংসকারী (মায়ার জন্য পাগল সমাজ) জগৎকে নতুন আলোর প্রকাশ দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক বিশ্বনেতার নিজের উদাসী ছাড়া কোন অভিলাস থাকবে না। অর্থাৎ মানব উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন স্বার্থ থাকবে না। আমার এই ভবিষ্যৎ বাণী গৌরবের কথা হবে। আসলে ওই তত্ত্বদর্শী সন্ত অবশ্যই সংসারে প্রসিদ্ধ হবেন। তাঁর দ্বারা বলা জ্ঞানের প্রভাব কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত থাকবে। এই সন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করবে। এমন আধ্যাত্মিক চমৎকার করবেন যে বৈজ্ঞানীকরাও বিস্মিত হয়ে যাবে। তাঁর সর্ব জ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণিত হবে। আমি (নাস্ত্রেদমস) বলছি, বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা তাঁকে উপেক্ষা করবেন না। ওনাকে ছোট জ্ঞানদীপ মনে করো না। ওই তত্ত্বজ্ঞাতা মহা মানবকে সিংহাসনে বসিয়ে আরাধ্যদেব মেনে পূজা করবে। ওই আদি পুরুষ (সতপুরুষ) এর অনুগামী দুনিয়ার (পৃথিবীর) মুক্তিদাতা হবেন।

"সন্ত রামপালজী মহারাজের সমর্থনে অন্য ভবিষ্যবক্তাদের ভবিষ্যৎ বাণী"

১. ইংল্যান্ডের জ্যোতিষী "কীরো" সন্ ১৯২৫ এ লেখা পুস্তকে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। বিংশ শতাব্দী অর্থাৎ ২০০০-এর উত্তরার্ধে (সন্ ১৯৫০-এর পরে উৎপন্ন সন্ত) বিশ্বে এক নতুন সভ্যতা আনবে, যা সম্পূর্ণ বিশ্বে ছড়াবে। ভারতের এক ব্যক্তি সমস্ত সংসারে জ্ঞানের ক্রান্তি নিয়ে আসবে।

২. ভবিষ্যৎ বক্তা শ্রী বেজীলেটিন'- এর অনুসার বিংশ শতাব্দী উত্তারার্থে বিশ্বে নিজেদের মধ্যে প্রেম ভাবের অভাব, মানুষত্বের হ্রাস, মায়া (টাকা) সংগ্রহের প্রতিযোগিতা, লুট, রাজনেতারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি অনেক উৎপাত দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারত থেকে উৎপন্ন শান্তি, ভ্রাতৃত্বের ভাবে আধারিত সভ্যতা, সংসারে অশান্তি আর জাতির সীমা ভেঙে বিশ্বের সর্বত্র অমন ও চেন (সুখ-শান্তি) স্থাপন করবে।

৩. আমেরিকান মহিলা ভবিষ্যৎ বক্তা "জীন ডিস্কন"- এর অনুসার বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বে এক ঘোর হাহাকার তথা মানবতার সংহার হবে। বৈচারিক যুদ্ধের পরে আধ্যাত্মিকতার উপর আধারিত এক নতুন সভ্যতার সম্ভবত:- ভারতের গ্রামীন পরিবারের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আসবে এবং সংসার থেকে যুদ্ধকে চিরদিনের মত বিদায় করে দেবে।

৪. আমেরিকার 'শ্রী অ্যান্ডারসন'র অনুসারে বিংশ শতাব্দীর শেষে এক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্বে অসভ্যতার উৎশৃঙ্খল তাণ্ডব হবে। এর মধ্যে ভারতের এক গ্রামীণ ধার্মিক ব্যক্তি-এক মানব-এক ভাষা-আর এক ঝাণ্ডার রূপ রেখার সংবিধান বানিয়ে সংসারকে সদাচার-উদারতা-মানবীয় সেবা এবং প্রেমের শিক্ষা শেখাবেন। এই মসীহা সন্ ১৯৯৯ থেকে আসা হাজারো বর্ষের জন্য সুখ শান্তি ভরে দেবে।

৫. হল্যান্ড-এর ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা 'শ্রী গেরার্ড ক্লাইস'র অনুসারে বিংশ শতাব্দীর শেষে এক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কারণে অনেক দেশের অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতের এক মহাপুরুষ সারা পৃথিবীকে এক সূত্রে বাঁধবে। হিংসা- দুরাচার - ছল- কপট ইত্যাদি এই সংসার থেকে চিরদিনের জন্য সমাপ্ত করে দেবে।

৬. আমেরিকার ভবিষ্যৎ বক্তা 'শ্রী চালর্স ক্লার্ক'-এর অনুসারে বিংশ শতাব্দীর শেষে এক দেশ বিজ্ঞানের উন্নতিতে সমস্ত দেশকে পিছনে ফেলে দেবে। কিন্তু ভারতের প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে ধর্ম আর দর্শনে হবে। যা পুরো বিশ্বে প্রতিষ্ঠা হবে। এই ধার্মিক ক্রান্তি এক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সম্পূর্ণ বিশ্বকে প্রভাবিত করবে। এবং আধ্যাত্মিকতা স্বীকারে বাধ্য করবে।

৭. হাঙ্গেরীর মহিলা জ্যোতিষী 'বোরিস্কা'-এর অনুসার সন ২০০০-এর প্রথম দিকে উগ্র পরিস্থিতিতে হত্যা আর লুটপাটের মধ্যে মানবীয় সদগুণের বিকাশ এক ভারতীয় ফরিস্তার (দেবদূত) দ্বারা ভৌতিকবাদ থেকে সফল সংঘর্ষে ফল স্বরূপ হবে। যা চিরস্থায়ী থাকবে। এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তির প্রচুর সংখ্যায় ছোট ছোট লোক (মধ্যবিত্তের) অনুগামী হয়ে ভৌতিকবাদ কে আধ্যাত্মিকতায় বদলে দেবে।

৮. ফ্রান্স-এর 'ডা. জুলর্বন' এর অনুসারে সন্ ১৯৯০ এর পরে ইউরোপীয় দেশ ভারতের ধার্মিক সভ্যতার দিকে ঝুঁকবে। সন্ ২০০০ পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা ৬৪০ কোটির কাছাকাছি হবে। ভারতে ওঠা জ্ঞানের ধার্মিক ক্রান্তি নাস্তিকতার নাশ করে কালবৈশাখী ঝড়ের মত পুরো বিশ্বকে ঢেকে দেবে। ওই ভারতীয় মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তির অনুগামী দেখতে দেখতে এক সংস্থার রূপ নিয়ে এক আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

৯. ফ্রান্সের নাস্ত্রেদমসের অনুসারে, সম্পূর্ণ বিশ্বে সৈনিক ক্রান্তির পরে, কিছু ভালো মানুষ সংসারকে ভালো বানাবে। মহান ধর্মনিষ্ঠ বিশ্ববিখ্যাত নেতা বিংশ শতাব্দীর শেষে আর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোন পূর্ব দেশে জন্ম নিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সদাচার দ্বারা বিশ্বকে এক সূত্রে বাঁধবে। (নাস্ত্রেদমস শতক ১ শ্লোকে ৫০-এ প্রমাণিত) তিন দিকে সাগরে ঘেরা দ্বীপে ওই মহান সন্তের জন্ম হবে। ওই সময় তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঘোর অন্ধকার হবে। নৈতিকতার পতন হয়ে হাহাকার করবে। ওই শায়রণ (ধার্মিক নেতা) গুরুবর অর্থাৎ গুরুকে বড় (শ্রেষ্ঠ) মেনে নিজের সাধনা করবে ও করাবে। ওই ধার্মিক নেতা (তত্ত্বদর্শী সন্ত) নিজের ধর্মবল অর্থাৎ ভক্তির

শক্তিতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্বরাষ্ট্রকে নত মস্তক করবে। এশিয়ায় তাকে বাধা দেওয়া পাগলামী হবে। (শতক ১ শ্লোক ৫০ সেঞ্চুরী ১-কন্না -৫০)

১০. ইজরাইলের অধ্যাপক 'হরার'-এর অনুসারে ভারত দেশে এক দিব্য মহাপুরুষ মানবতাবাদী বিচারে সন্ ২০০০-এর প্রথমে আধ্যাত্মিক ক্রান্তির শিকড় বিস্তার করবে। পুরো বিশ্ব তাঁর বিচার শুনতে বাধ্য হবে। ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। কিন্তু পরে নেতৃত্ব ধর্মনিষ্ঠ বীর মানুষের হাতে হবে। যিনি এক ধার্মিক সংগঠন-এর আশ্রিত হবেন।

১১. নরওয়ের 'শ্রী আনন্দাচার্য'-র ভবিষ্যৎবাণী অনুসার ১৯৯৮-সালের পরে এক শক্তিশালী ধার্মিক সংস্থা ভারতে প্রকাশ্যে আসবে। যার স্বামী (প্রভু) এক গৃহস্থ ব্যক্তি হবে, তাঁর আচার সংহিতার পালন সারা বিশ্ব করবে। ধীরে ধীরে ভারত শিল্প বিপ্লব, ধার্মিক, আর্থিক দিক থেকে বিশ্বকে নেতৃত্ব করবে। তাঁর বিজ্ঞান (আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জ্ঞান) সমস্ত বিশ্বকে মানতে হবে।

উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে আজ সম্পূর্ণ পৃথিবীতে এই ঘটনা ঘটছে। যুগ পরিবর্তন প্রকৃতির অটল বিধান। বৈদিক দর্শণের অনুসারে চার যুগের ব্যবস্থা আছে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। যখন পৃথিবীতে পাপীদের একচ্ছত্র সম্রাজ্য হয়, তখন ভগবান পৃথিবীতে মানব রূপে প্রকট হন।

মানবতার এই পূর্ণ বিকাশের কাজ অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষই বহন করে আসছে। পূণ্য ভূমিতে অবতারদের অবতরণ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে।

কিন্তু বিড়ম্বনা এই যে,ঋষি-মুনি,মহাপুরুষ বা অবতারের জীবন কালে, ঐ সময়ের শাসন ব্যবস্থা ও জনতা তাঁদের দিব্য বার্তা ও আদর্শের উপর ধ্যান দেয়নি। আর তাঁরা অন্তর্ধ্যান হওয়ার পর দুই গুন উৎসাহে পূজা-পাঠ শুরু করে দেয়, এটাও এক বিড়ম্বনা যে, আমরা তাঁর জীবনকালে বা সময় থাকতে তাকে মানি না, উপরন্তু বিরোধ ও অপমান করতে থাকি। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ জনতাকে ভ্রমিত করে পরম সন্তকে বদনাম করার চেষ্টা করে। এটা প্রত্যেক যুগে হয়। আর এখনো হচ্ছে।

যে মহাপুরুষ হাজার কষ্ট সহ্য করে নিজের তপস্যা বা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাঁর কথা অসত্য হতে পারে না। সত্যের উপর অটুট থেকে ঈসা মসীহ নিজের শরীরে পেরেকের ভয়ঙ্কর ব্যাথা যন্ত্রণা সহ্য করেছিল। সক্রেটিসকে বিশ পান করিয়েছিল, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকেও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

ঈসা মসীহ বলেছিলেন যে,"পৃথিবী আর আকাশ নড়ে যেতে পারে, সূর্যের অটল সিদ্ধান্ত উদয় আর অস্ত যাওয়া, তাও ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু আমার কথা মিথ্যা হতে পারে না।"

সাধুগন! যদি আজ কোটি কোটি মানব ওই পরম তত্ত্ব জ্ঞাতাকে খোঁজ করে স্বীকার করে নেয় এবং তাঁর পথ অনুসরণ করে নিজের জীবন শৈলীকে ঠিক করে নেয়, তাহলে পুরো পৃথিবীতে সদ্ভাবনা-নিজেদের মধ্যে প্রেম-ভাব, ভ্রাতৃতভাব, দয়া ও সতভক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হবে। বর্তমান মানুষ বুদ্ধিজীবী তাই ওই সন্তের বিচার ধারা স্বীকার করে অবশ্যই ধন্য হবে। ওই সন্ত জগত গুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ। কৃপা করে পড়ুন সন্ত রামপালজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী যা সর্ব ভবিষ্যৎ বক্তার ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে মিলে যায়।

"সন্ত রামপাল জী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"

সন্ত রামপাল জী মহারাজের জন্ম ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সালে, গ্রাম- ধনানা, জিলা- সোনীপথ, হরিয়াণার এক কৃষক পরিবারে হয়। লেখাপড়া শেষ করে তিনি হরিয়াণা প্রদেশের সেচ্ বিভাগে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের পোস্টে ১৮ বৎসর কর্মরত ছিলেন। সন ১৯৮৮ তে পরম সন্ত স্বামী রামদেবানন্দ জীর কাছে থেকে নাম দীক্ষা নেন। এবং তন-মন থেকে সক্রিয় হয়ে স্বামী রামদেবানন্দ জীর দেওয়া ভক্তি মার্গের সাধনা শুরু করেন এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

১৭-ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ সালে ফাল্গুন মাসের অমাবস্যার রাতে সন্ত রামপাল জী নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করেন। তখন শ্রী রামপালজীর বয়স ৩৭ বৎসর ছিল। উপদেশ দিবসকে (দীক্ষার দিন) সন্ত মতে আধ্যাত্মিক জন্মদিন বলা হয়।

উপরোক্ত বিবরণ শ্রী নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যৎবাণীর সাথে পূর্ণ রূপে মিলে যায়। যা পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪-৪৫-এ লেখা আছে। "যখন ওই তত্ত্বদ্রষ্ঠা সন্তের জন্ম হবে তখন অন্ধকার অমাবস্যা থাকবে। তখন ওই বিশ্বনেতার বয়স ১৬, ২০, ২৫ হবেন না। তিনি তরুণও হবেন না। বরং প্রৌঢ় হবেন, ৫০ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে হবেন এবং সংসারে সুপ্রসিদ্ধ হবেন। যা ২০০৬- এ হয়েছে।"

সন্ ১৯৯৩-এ স্বামী রামদেবানন্দজী মহারাজ, আমাকে সত্সঙ্গ করার আজ্ঞা দেন এবং ১৯৯৪ সালে নাম দান দেওয়ার আজ্ঞা প্রদান করেন। ভক্তি মার্গে বিলীন হওয়ার কারণে জে.ই পদে ত্যাগপত্র দেন। হরিয়াণা সরকার দ্বারা ১৬-০৫-২০০০-এ পত্রের ক্রমিক নং ৩৪৯২-৩৫০০ তিথি ১৬-৫-২০০০ এ স্বীকৃত আছে। সন্ ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সন্ত রামপালজী মহারাজ ঘরে-ঘরে, গ্রামে- গ্রামে, নগরে-নগরে গিয়ে সতসঙ্গ করতেন। প্রচুর সংখ্যায় অনুগামী হয়। এর সাথে সাথে অজ্ঞানী সন্তদের বিরোধও বাড়তে থাকে। সন্ ১৯৯৯-এ গ্রাম কেরৌথা, জেলা রোহতক (হরিয়াণা) সতলোক করৌঁথা আশ্রম স্থাপন করেন এবং ১-লা জুন, ১৯৯৯ থেকে ৭ জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত পরমাত্মা কবীর জীর প্রকট দিবস উপলক্ষে ৭ দিনের বিশাল সৎসঙ্গের আয়োজন করে আশ্রমের শুভারম্ভ করেন। পরে প্রতি মাসের প্রত্যেক পূর্ণিমায় তিন দিবসের সত্সঙ্গ প্রারম্ভ করেন। দূর-দূর থেকে শ্রদ্ধালুরা সত্সঙ্গ শুনতে আসতে লাগে। এবং তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝে প্রচুর সংখ্যায় অনুগামী হতে লাগে। অল্পদিনের মধ্যেই অনুগামীদের সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে যায়। যে জ্ঞানহীন সন্ত ও ঋষিদের অনুগামীরা সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছে আসতেন এবং অনুগামী হতে লাগলেন, তারা তখন অজ্ঞানী গুরু মহন্তদের প্রশ্ন করতে লাগেন, আপনারা কেন সতগ্রন্থের বিপরীত জ্ঞান দিচ্ছেন!

যজুর্বেদ অধ্যায় ৮ মন্ত্র ১৩ তে লেখা আছে, পূর্ণ পরমাত্মা নিজের ভক্তের সমস্ত অপরাধ (পাপ) নাশ (ক্ষমা) করে দেন। কিন্তু আপনার পুস্তকে, যা আমারা কিনেছি তাতে লেখা আছে,পরমাত্মা ভক্তের পাপ ক্ষমা করে না। আপনাদের পুস্তক সত্যার্থ প্রকাশ সমুল্লাস ৭-এ লেখা আছে সূর্যের উপর পৃথিবীর মত মানুষ ও অন্য প্রাণী বাস করে। পৃথিবীর মত সর্ব পদার্থ আছে। বাগান, নদী, ঝর্না ইত্যাদি। এসব কি সম্ভব? পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র-১-এ লেখা আছে যে, পরমাত্মা সশরীর। অগ্নে তনুঃ অসি। বিষ্ণুবে ত্বাম্ সোমস্য তনুর অসি॥ এই মন্ত্রতে দুইবার সাক্ষী দিচ্ছে পরমেশ্বর সশরীর। ওই অমর পুরুষ পরমাত্মার সর্ব জীবকে পালন করার জন্য শরীর আছে। অর্থাৎ পরমাত্মা যখন নিজের ভক্তকে তত্ত্বজ্ঞান বোঝানোর জন্য কিছু সময় অতিথি রূপে এই

সংসারে আসেন, তখন নিজের বাস্তবিক তেজোময় শরীরের উপর হাল্কা তেজপুঞ্জ শরীর ধারণ করে আসেন। এইজন্য উপরোক্ত মন্ত্রে দুই বার প্রমাণ দিয়েছে। এইসব তর্কে নিরুত্তর হয়ে নিজেদের অজ্ঞানের পর্দা ফাঁস হওয়ার ভয়ে, ওই অজ্ঞানী সন্ত মহন্ত আচার্যরা সতলোক আশ্রম করৌঁথার আসেপাশের গ্রামে রামপালজী মহারাজকে বদনাম করার জন্য দুষ্প্রচার শুরু করে এবং ১২-৭ - ২০০৬ সন্ত রামপালজীকে প্রাণে মারার জন্য এবং আশ্রম কে ধ্বংস করার জন্য সতলোক আশ্রমের উপর আক্রমণ করে। পুলিশ বাধা দিলে কিছু উপদ্রবকারী আঘাত পায়। সরকার সতলোক আশ্রমকে নিজের অধীনে নেয় এবং সন্ত রামপালজী মহারাজ ও কিছু অনুগামীদের উপর মিথ্যা কেস দিয়ে জেলে পাঠায়। এইভাবে ২০০৬-এ সন্ত রামপালজী মহারাজ বিখ্যাত হন। যদিও অজ্ঞানীরা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বদনাম করার চেষ্টা করে কিন্তু সন্ত রামপাল জি মহারাজ নির্দোষ। প্রিয় পাঠক! নাস্ত্রেদমস-এর ভবিষ্যৎবাণী পড়ে চিন্তা করতে পারেন যে সন্ত রামপালজীকে এত বদনাম করে দিয়েছে যে, তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব সমস্ত বিশ্বে জ্ঞান প্রচার করা। তাদের কাছে প্রার্থনা, পরমাত্মা কিন্তু এক পলকেই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারেন।

কবীর, সাহেব সে সব হোত হৈ, বন্দে সে কছু নাঁহি।
রাঈ সে পর্বত করে, পর্বত সে ফির রাঈ॥

পরমেশ্বর কবীর সাহেব নিজের সন্তানদের উদ্ধারের জন্য শীঘ্রই সমাজকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাস্তবিকতার সাথে পরিচিত করাবেন। তারপর সমস্ত বিশ্ব সন্ত রামপালজী মহারাজের জ্ঞানকে মানতে বাধ্য হবে।

সন্ত রামপালজী মহারাজ সন্ ২০০৩ থেকে খবরের কাগজ, টি.ভি, চ্যানেলের মাধ্যমে সত্যজ্ঞান দ্বারা অন্য ধর্ম গুরুদের বলছেন যে, আপনাদের জ্ঞান শাস্ত্র বিরুদ্ধ, আপনারা ভক্ত সমাজকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ পূজা করিয়ে দোষী হচ্ছেন। যদি আমি ভুল বলি তাহলে তার জবাব (উত্তর) দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ধর্মগুরু সন্ত-মহন্তদের সাহস হয়নি এই প্রশ্নের উত্তর বা জবাব দেওয়ার।

সন্ ২০০১-এ অক্টোবর মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার হঠাৎ সন্ত রামপালজী মহারাজের প্রেরণা হয়, সর্ব ধর্মের গ্রন্থকে গভীর ভাবে অধ্যায়ন করার। সর্ব প্রথম শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায়ন করেন, এবং "গহরী নজর গীতা মেঁ" নামক পুস্তকের রচনা করেন। গীতার আধারে সর্ব প্রথম রাজস্থান প্রান্তের যোধপুর শহরে মার্চ ২০০২-এ সৎসঙ্গ আরম্ভ করেন। এইজন্য নাস্ত্রেদমস জী বলেছেন যে, ঐ বিশ্ব ধার্মিক হিন্দু সন্ত (শায়রণ) পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ২০০১-সালে তত্ত্বজ্ঞাতা হয়ে প্রচার করবেন। সন্ত রামপালজী মহারাজের জন্ম সন্ ১৯৫১-এর ৮ ই সেপ্টেম্বর ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের সোনীপথ জেলার অন্তর্গত ধনানা গ্রামে হিন্দুধর্মে এক কৃষক পরিবারে হয়। সন্ত রামপালজীর বয়স ২০০১-এ পঞ্চাশ বৎসর হয়। যা নাস্ত্রেদমসের অনুসারে সঠিক। তাই ঐ বিশ্ব ধার্মিক নেতা সন্ত রামপাল জী মহারাজই। যার অধ্যক্ষতায় ভারতবর্ষ পুরো বিশ্বে রাজ করবে। আর সারা পৃথিবীতে একই জ্ঞান (ভক্তি) চলবে। একই আইন হবে। কেউ দুঃখী থাকবে না। সমস্ত বিশ্বে পূর্ণ শান্তি আসবে। যারা বিরোধ করবে পরে তাঁরাও অনুশোচনা করবে এবং তত্ত্বজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য হবে। সর্ব মানব সমাজ মানব ধর্ম পালন করবে এবং পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে সতলোকে যাবে।

যে তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে নাস্ত্রেদমস নিজের ভবিষ্যতবাণীতে উল্লেখ করেছেন যে,

ঐ বিশ্ব বিজেতা সন্ত দ্বারা বলা শাস্ত্রে প্রমাণিত তত্ত্বজ্ঞানের সম্মুখে সর্ব সন্ত (বর্তমানের) নিষ্প্রভ (অসফল) হয়ে যাবে। অর্থাৎ সকলকে বিনম্র হয়ে ঝুঁকতে হবে। ওই বিষয়ে পরমেশ্বর কবীর বন্দীছোড় নিজের অমৃত বাণীতে পবিত্র "কবীর সাগর" গ্রন্থে (যা শ্রী ধর্মদাস দ্বারা প্রায় ৫৫০ বর্ষ পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) বলেছেন, এক সময় আসবে তখন সমস্ত বিশ্বে আমার জ্ঞান চলবে এবং সবাই শান্তি পূর্বক ভক্তি করবে। একে অন্যের প্রতি বিশেষ প্রেমভাব হবে অর্থাৎ সত্য যুগের মত স্বর্ণযুগ আসবে। পরমেশ্বর কবীর বন্দীছোড়ের দেওয়া জ্ঞান একমাত্র রামপালজী মহারাজই ঠিকমত বুঝেছেন।

এই জ্ঞানের বিষয়ে কবীর সাহেব জী নিজের বাণীতে বলেছেন :-

কবীর, ঔর জ্ঞান সব জ্ঞানড়ী, কবীর জ্ঞান সো জ্ঞান।
জৈসে গোলা তোব কা, করতা চলে মৈদান॥

ভাবার্থ :- এই তত্ত্বজ্ঞান এতটা প্রবল (শক্তিশালী বা অদ্বিতীয়) যে, এর সম্মুখে অন্য সন্ত ও ঋষিদের জ্ঞান টিকবে না। যেমন কামানের গোলা (তোপের গোলা) যেখানে পড়ে সেখানে কিছুই থাকে না। সব ধ্বংস করে ময়দান খালি করে দেয়।

এই প্রমাণ সন্ত গরীবদাসজী (ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়ানা) ও দিয়েছেন, যে সৎগুরু (তত্ত্বদর্শী সন্ত পরমেশ্বর কবীর বন্দীছোড়ের পাঠানো) দিল্লী মণ্ডলে আসবে।

"গরীব, সতগুরু দিল্লী মণ্ডল আয়সী, সূতী ধরণী সুম জগায়সী।"

পরমাত্মার ভক্তি না করা ভক্তিহীন মানুষকে জাগাবে। গ্রাম ধনানা, জেলা সোনীপথ পূর্বে দিল্লী শাসিত ক্ষেত্র ছিল। এইজন্য সন্ত গরীবদাসজী মহারাজ বলেছেন, সদগুরু (বাস্তবিক জ্ঞান জানা সন্ত অর্থাৎ তত্ত্বদ্রষ্টা সন্ত) দিল্লী মণ্ডলে আসবে। আবার বলেছেন যে -

"সাহেব কবীর তখ্ত খবাসা, দিল্লী মণ্ডল লীজৈ বাসা" ॥

ভাবার্থ - বন্দীছোড় পরমাত্মা কবীর সাহেবের তখত্ (দরবার) এর বিশেষ (চাকর) অর্থাৎ পরমাত্মার পাঠানো প্রতিনিধি দিল্লি মণ্ডলে বাস করবেন অর্থাৎ দিল্লী মণ্ডলে জন্ম নেবেন। প্রথমে নিজের হিন্দুবন্ধুদের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করাবেন। বুদ্ধিমান হিন্দুরা হড়বড় করে জেগে উঠবে অর্থাৎ ওই সন্তের দ্বারা বলা তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝে অবিলম্বে তাঁর শরণ গ্রহণ করবে। পরে সমস্ত বিশ্ব ওই তত্ত্বদর্শী সন্তের জ্ঞান স্বীকার করবে। এই ভবিষ্যৎবাণী শ্রী নাস্ত্রেদমস জীও করেছেন। নাস্ত্রেদামস জী এও লিখেছেন যে, আমি দুঃখিত এই কারণে যে, ওনার সাথে পরিচয় না হওয়ার কারণে আমার শায়রণ (তত্ত্বদর্শী সন্ত) উপেক্ষার পাত্র হবেন। হে বুদ্ধিমান মানব! ওনাকে উপেক্ষা করো না। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে আরাধ্যদেব (ইষ্ট দেব) মেনে পূজা করো। ওই হিন্দু ধার্মিক সন্ত (শায়রণ) আদি পুরুষ (পূর্ণ পরমাত্মা)-এর অনুগামী জগতের মুক্তিদাতা হবেন।

নাস্ত্রেদমস জী পুস্তকের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় তিন শব্দের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে, ওই বিশ্ব বিজেতা তত্ত্বদ্রষ্টা সন্ত ক্রুরচন্দ্র অর্থাৎ কালের দুঃখদায়ী লোক থেকে ছাড়িয়ে নিজের আদি-অনাদি পূর্বজদের কাছে নিয়ে গিয়ে ওখানের স্থায়ী বাসিন্দা বানাবে। অর্থাৎ পূর্ণ মুক্তি প্রদান করবে। এখানে উপদেশ মন্ত্রের দিকে সংকেত করে বলেছেন, ওই সন্ত মাত্র তিন শব্দের (ওম্- তত্-সত্) মন্ত্র জপ দেবেন। এই তিন শব্দের সাথে মুক্তির জন্য অন্য কোন শব্দ জুড়বে না। এই প্রমাণ পবিত্র ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬ সামবেদ শ্লোক সংখ্যা ৪২২ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৭

শ্লোক ২৩-এ আছে যে, পূর্ণ সন্ত (তত্ত্বদর্শী সন্ত) তিন মন্ত্র (ওম্-তত্-সত্ এখানে তত্ ও সত্ সাংকেতিক) দিয়ে পূর্ণ পরমাত্মার (আদি পুরুষ) ভক্তি করিয়ে জীবকে কাল জাল থেকে মুক্ত করাবেন। তখন ঐ সাধক নিজের ভক্তি সাধনার বলে সেখানে চলে যায়। যেখানে আদি সৃষ্টির সত্ (ভালো) প্রাণী আছে। যেখান থেকে ঐ জীব নিজের পূর্বজদের ছেড়ে ক্রুরচন্দ্রের (কাল প্রভু) সাথে এসে এই দুঃখদায়ী লোকে ফেঁসে মহাকষ্ট ভোগ করছে। নাস্ত্রেদমস জী এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, মধ্যকাল অর্থাৎ বিচলি পীঢ়ীতে হিন্দু ধর্মের আদর্শ জীবন হবে। শায়রণ নিজের জ্ঞানে সর্বোচ্চ চমকপদ সর্বোচ্চ শিখর (দৈদিপ্যমান উতঙ্গ) স্বরূপ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি বিধান বিনা শর্তে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে। এবং মানব সংস্কৃতি অর্থাৎ মানব ধর্ম নিষ্কপট ভাবে সামলাবে। (মধল্যা কালাত হিন্দু ধর্মাচে ও হিন্দুচ্যা অদর্শবত্ ঝালেল) এটা মারাঠী ভাষায় পৃষ্ঠা ৪২-এ লেখা, আছে। ভাবার্থ:- মধ্য পীঢ়ীর উদ্ধার শায়রণ করবে। এর উল্লেখ পৃষ্ঠা ৪২ হিন্দী অনুবাদ লেখা হয় নি, তাই এখানে লিখে দিলাম। এবং স্পষ্টিকরণও করে দিয়েছি। এই প্রমাণ স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা কবীরজী বলেছেন:-

ধর্মদাস তোহে লাখ দুহাঈ, সারজ্ঞান ব সার শব্দ কহীঁ বাহর ন জাঈ।
সারনাম বাহর জো পরহী, বিচলী পীঢ়ী হংস নহীঁ তর হী॥
সারজ্ঞান তব তক ছুপাঈ, জব তক দ্বাদস পন্থ্ ন মিট জাঈ।

যেমন, সন্ ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। তাঁর আগে হিন্দুস্থানে শিক্ষা ছিল না। সন্ ১৯৫১ -তে সন্ত রামপালজী মহারাজকে পরমেশ্বর পৃথিবীতে পাঠান। সন্ ১৯৪৭-এর আগে কলিযুগের প্রথম প্রজন্ম মনে করো এবং ১৯৪৭ থেকে মধ্য প্রজন্ম প্রারম্ভ হয়। এখন এক হাজার বৎসর পর্যন্ত এই সৎভক্তি চলবে। এই সময় যারা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে ভক্তি করবে তাঁরা সতলোকে চলে যাবে। যারা সতলোকে যেতে পারবে না এবং কখনো ভক্তি করেছে আবার ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু গুরুদ্রোহী হয়নি,তারা আবার হাজার মানুষ জন্ম এই কলিযুগে প্রাপ্ত করবে। কারণ এটা তাদের শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তির পরিনাম হবে। এই প্রকার কয়েক হাজার বৎসর পর্যন্ত কলিযুগের সময় বর্তমান সময় থেকেও ভালো যাবে। তারপর শেষের প্রজন্ম (বংশ) ভক্তিহীন হবে। কারণ ভক্তির শুভ ফল যা ভক্তি যুগে করেছে তা বারবার জন্ম প্রাপ্ত করে খরচ করে দিয়েছে। এই প্রকার কলিযুগের শেষ প্রজন্ম কৃতঘ্নী হবে। তাঁরা ভক্তি করতে পারবে না। এইজন্য বলা হয়েছে যে, এখন কলি যুগের মধ্য প্রজন্ম চলছে (১৯৪৭ থেকে)। সন ২০০৬ থেকে ওই শায়রণ সবার সামনে প্রকট হয়ে গেছে। তিনিই হলেন, "সন্ত রামপালজী মহারাজ"।

উপরোক্ত জ্ঞান যা মধ্য প্রজন্ম এবং প্রথম ও অন্তিম প্রজন্মের সন্ত রামপালজী মহারাজ নিজের প্রবচনে কয়েক বৎসর থেকে বলে আসছেন যা নাস্ত্রেদমস জীর ভবিষ্যৎবাণীতে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এইজন্য গরীবদাস জী মহারাজ বলেছেন যে, কবীর পরমেশ্বরের ভক্তি পর্ণ সন্ত থেকে উপদেশ নিয়ে করো। এই সুযোগ বার বার আসবে না।

গরীব, সমঝা হৈ তো সির ধর পাঁব,, বহুর নহীঁ রে এস্যা দাব॥

ভাবার্থ এই যে, যদি আপনি তত্ত্বজ্ঞান বুঝে গিয়ে থাকেন, তাহলে মাথার উপর পা রেখে অর্থাৎ অতিশীঘ্রতার সঙ্গে তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যাণ করুন। এই সুবর্ণ সুযোগ বার বার প্রাপ্ত হবে না।

যেমন এই বিচলী পিড়ীর (মধ্যকাল) সময় আর আপনার মানব শরীর প্রাপ্তি, সেই সাথে তত্ত্বদর্শী সন্তের প্রকট হওয়া। যদি এখনো ভক্তি মার্গ অনুসরণ না করেন তো তাঁর বিষয়ে বলেছে:-

য়হ সংসার সমঝদা নাঁহী, কহন্দা শ্যাম দুপহরে নূঁ।
গরীবদাস য়হ বক্ত জাত হৈ, রোবেঙ্গে ইস পহরে নূঁ॥

ভাবার্থ - সন্ত গরীব দাস জী মহারাজ বলছেন, এই ভোলা সংসার শাস্ত্রবিধি রহিত সাধনা করে অতি দুঃখী হচ্ছে, আর একেই তারা সুখ মনে করছে। যেমন জুন মাসের দুপুর ১২-টার সময় কেউ রৌদ্রে দাঁড়িয়ে পুড়ছে,আর তাকেই সন্ধ্যা বলছে। যেমন, কোনো মদ্যপান করা ব্যক্তি নেশায় মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে, আর তাকে যদি কেউ বলে আপনি রৌদ্রে কেন দাঁড়িয়ে আছেন ছায়ায় চলুন। ওই মাতাল নেশায় মত্ত হয়ে বলে, কে বলে দুপুর হয়েছে? এখন তো সন্ধ্যা বেলা। এই প্রকার যে সাধক শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমতো (নিজের ইচ্ছামত) আচরণ করছে, সে নিজের জীবন নষ্ট করছে। তাকে ত্যাগ করতে চায়না বরং তাকেই সর্ব শ্রেষ্ঠ মেনে কালের লোকের আগুনে জ্বলছে। সন্ত গরীবদাসজী মহারাজ বলছেন যে, এতো প্রমাণ পাওয়ার পরেও যদি পূর্ণ সন্তের কাছে গিয়ে সত্সাধনা না করেন, তাহলে এই অমূল্য মানব জন্ম ও মধ্য প্রজন্মের ভক্তি যুগ চলে যাবে তখন এই সময়ের কথা মনে করে কাঁদতে হবে। তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

পরমেশ্বর কবীর জী বন্দীছোড় জী বলেছেন:-

আচ্ছে দিন পাছৈ গএ, সতগুরু সে কিয়া না হেত।
অব পছতাবা ক্যা করে, জব চিড়িয়া চুগ গঈ খেত॥

সর্ব মানব সমাজের কাছে প্রার্থনা করছি যে, পূর্ণ সন্ত রামপালজী মহারাজকে জানো-চেনো সেইসাথে নিজের ও নিজের পরিবারের কল্যাণ করুন। নিজেদের বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়- স্বজন সবাইকে বলুন এবং পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করুন। স্বর্ণ যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ পূণ্য আত্মারা সন্ত রামপালজী মহারাজকে চিনে তাঁর কাছ থেকে সত্যভক্তি করে সুখী হয়ে গেছে। সর্ব বিকার ছেড়ে নির্মল জীবন যাপন করছেন।

কৃপা করে মহারাষ্ট্রের জ্যোতিষ শাস্ত্রী দ্বারা নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যৎবাণীর মারাঠি ভাষায় অনুবাদের ফোটোকপি নীচে দেখুন:-

প্রমাণের জন্য দেখুন ফটোকপি

होते ही वे फिर से विश्व में योग्यमार्ग से भ्रमण करके शत्रुत्व के भाव से भारत को त्रस्त करेंगे। देखिए, प्रथम मुस्लिम समाज रूप से शुक्र भारत पर आक्रमण करके उस भूमि को तहस-नहस कर देगा। उसके बाद भारत में घुसकर वे सत्ता पर कब्जा करेंगे, अंधश्रद्धालु और दुर्बल भारतीय जनता को सतायेंगे और उन्हें मुस्लिम धर्म की दीक्षा देंगे। उसके कारण महान् भारतमाता मुस्लिमों की दासी बनेगी। भारतीय प्रदेश और समाज भ्रष्ट होगा। यह कार्य इ.स. 1291 से 1999 तक चलेगा।

इसी काल में भारत माता का (कामदुहिता का) बंधु गुरु पिंगल सम शत्रुत्व भाव धारण करके पश्चिम यूरोप के क्रिश्चनों को व्यापारी और नाविक बनाकर भारत की ओर भेज देगा। वे प्रथम व्यापारी बनकर भारतमाता को लूटेंगे। उसके बाद एक-एक प्रदेश हाथ में लेकर उन्हें और वहाँ की जनता को भ्रष्ट क्रिश्चन बनाकर उन पर शासन करेंगे। धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाकर वे संपूर्ण भारत माता को अपने कब्जे में ले लेंगे। उसी समय भारतीय गुलाम दुर्बल जनता मोक्षप्राप्ति के लिए मंदिर बाँधकर देवी-देवता के भजन-कीर्तन करती रहेगी।

इसी काल में धोखेबाज क्रिश्चन गुरु का भ्रष्टाचारी रूप लेकर आयेंगे। यहाँ के प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन कर किरो जैसे यूरोपीयन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी होंगे। लेकिन भारतीय अंध और झूठे ज्योतिषियों को अपने ज्योतिष-ग्रंथों का अर्थ नहीं समझेगा। वे गुलाम होंगे। उन्हें अपनी मानसिकता और प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी भाषा में मौजूदा ज्ञान ही सत्य लगेगा। लेकिन कीरोसम भारतीय ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन करके महान् विद्वताधारक लेखकों द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर ज्योतिषशास्त्र नहीं समझेगा अन्त में वे शापित होंगे और उसके कारण उनमें मूर्खता और क्रूरता होगी।

उसके कारण महापरिवर्तन काल का आरंभ होगा। वह काल होगा इ.स. 1905 से 2028 तक। सबसे पहले भारत को स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिए काँग्रेस की स्थापना होगी। भारतीय जनता महान् राक्षस कुंभकर्ण के अनुसार गहरी नींद में से जागृत होने लगेगी। झूठा ज्योतिषशास्त्र नष्ट करके अचूक भविष्य ज्ञान देने के लिए मद्रास में के.एस.कृष्णमूर्ति का जन्म होकर वे भारतीय जनता को कृष्णमूर्ति पद्धति का ज्ञान देंगे। 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिषशास्त्री नॉस्ट्रॅडॅमस की भविष्यवाणी में अंकित सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण कर उसमें लिखित भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्यग्रंथ प्रकाशित करेगा। उस समय वह भारत में अज्ञात ज्योतिष द्वारा कलियुग के विषय में दिये गए महान् सांकेतिक भाषा में अर्थ को सुलझाकर उसमें लिखित महान् भविष्यवाणी का अर्थ स्पष्ट करेगा। लेकिन भारतीय जनता पर और सत्ताधारियों पर झूठे प्रचंड ज्योतिषियों का प्रभुत्व होगा। वे इन नये महान् ज्ञानी ज्योतिषियों को प्रकाश में नहीं आने देंगे। लेकिन उन पर स्वार्थ के अंधकार से, झूठे धर्म जाति का भूत सवार हुआ होगा। अब भी वे मातंग (गारुड़ी) कार्य में मग्न होकर सत्य का, मानवता धर्म का, ज्योतिष ज्ञान का खून करते रहेंगे।

२१ व्या शतकात जगातील
सर्व श्रेष्ठ भविष्यवेत्ता
नॉस्ट्राडेमस्
यांचे जागतिक स्तरावरचे भविष्य
- डॉ. रामचंद्र ज. जोशी

२१ व्या शतकाकडे झेपावतांना
जगातील सर्वश्रेष्ठ भविष्यवेत्ता!

मायकेल द नॉत्रदेम (नॉस्ट्राडेमस)

यांचे जागतिक स्तरावरचे भाविष्य

डॉ. रामचंद्र ज. जोशी.

ग्रंथ मिळण्याचे ठिकाण

जोशी ब्रदर्स अप्पा बळवंत चौक, पुणे २. फोन: ४४५९४२४	**श्री गजानन बुक डेपो** भरत नाट्य मंदिरासमोर, पुणे ३०. फोन : ४४७३३०४
श्री गजानन बुक डेपो कबुतरखाना, दादर, मुंबई २८. फोन: ४२२७५८४	**श्री गजानन बुक डेपो** बिल्डिंग नं. १३२, पहिला माळा, पंतनगर, घाटकोपर, मुंबई ७५. फोन: ५१३८००९

...(32)...

आफ्रिकेला वळसा घालण्याचा द्राविडी-प्राणायाम त्या सुवेज कालव्याच्या निर्मितीने कमी झाला हे खरेच, पण त्या कालव्याच्या निर्मितीची कल्पना नॉस्ट्राडेमसच्या विलक्षण भाकिताने फ्रेंच वास्तुशास्त्रविशारद लेसेप्स याला सुचलेली आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

पाहिल्या प्रकरणातच स्पष्ट केले आहे की, १९९९ साली छेडल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या जागतिक महायुध्दात, आज वरवर पाहता परस्पर विरोधी राष्ट्रे मित्र बनून, अमेरिका व रशिया यांचे एकत्रित बळ प्रचंड असेल. नॉस्ट्राडेमसच्या मृत्यूनंतर २०९ वर्षांनी जन्माला आलेली अमेरिका आपल्या सामर्थ्याच्या शिखरावर असेल असे, शतक २, श्लोक ४९ मध्ये हा द्रष्टा ज्योतिर्विद सांगतो हे सत्य किती चित्तथरारक आहे?

'भारत' सर्वश्रेष्ठ हिंदु राष्ट्र?

या पूर्वीच्या लेखात कै. इंदिरा गांधींचा नॉस्ट्राडेमसने केलेला उल्लेख आपण वाचला. त्या संदर्भात हेन्री सी रॉबर्टस 'कंप्लीट प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडेमस' या १९४२ साली प्रसिध्द झालेल्या आपल्या पुस्तकात लिहितो- 'डॉमिनन्ट प्रिमियर' (म्हणजेच प्रभावी पंतप्रधान) इंदिराजी गांधी यांच्या आकस्मिक खुनानंतर दोन बदल होतील. त्यातील क्रमांक पहिल्या बदलाप्रमाणे त्यांचे पुत्र राजीव गांधी जरी पंतप्रधान झाले असले तरी दुसरा जो बदल होणार आहे तो म्हणजे एक मध्यम वयाचा नेता पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ, तिबेट, अफगाणिस्तान, मलाया आदी देश जिंकून हिंदुस्थानाला जगातील सर्वश्रेष्ठ हिंदुराष्ट्र म्हणून निर्माण करणार आहे. तो सार्वभौम असेल. औदार्यात अजोड व आपल्या सनातन धर्माला पुनरुज्जीवन देईल आणि भारत खंडातच नव्हे तर साऱ्या पृथ्वीवर सुवर्णयुग आणील. (सेंच्युरी शतक ५, श्लोक ४१ वा). या श्लोकाबद्दल सर्वच भाष्यकारांत एकमत आहे. वरील दोन बदलांच्या दरम्यानच्या काळात सत्ताधारी मंडळीत वावरणारी चांडाळ चौकडी सत्ताकेंद्र आपल्या ताब्यात ठेवून बराच काळ मनमानी करील. वर उल्लेख केलेला नेता फक्त जगाला अद्याप माहीत व्हायचा आहे!

...(33)...

: ४ :

थांबा, इ. स. २००६ मध्ये

रामराज्य येतेय!

हिंदु जगज्जेता भूतलावर सुवर्ण-युग आणणार आहे!

ज्योतिष हे हि एक शास्त्र आहे

'शितावरून भाताची परीक्षा' या वाकप्रचारानुसार नॉस्ट्राडेमस यांनी वर्तविलेल्या अनेक भाकितांचे खरेपण आपण गेल्या प्रकरणात पाहिले. नॉस्ट्राडेमस यांना हे सर्व ज्ञान आगामी पिढीला देणे आवश्यक वाटले; व त्याने 'सेंच्युरीं' मंध्ये दहा शतके (१००० श्लोक) लिहिलीं व १५५५ साली तें पुस्तक प्रसिध्द झाले. या पुस्तकातील श्लोकांची वर्गवारी केली तर असे आढळते की पहिले सुमारे १०० श्लोक फ्रान्स व युरोपसाठी, म्हणजे नॉस्ट्राडेमसच्या काळातील घटनांबद्दल केलेल्या भाकितांवरच खर्च झाले आहेत. त्यानंतर ३५० - ४०० श्लोक १९ - २० व्या शतकातील घटनांच्या भाकितांचा ऊहापोह करण्यात लागले असून उरलेल्या ४५० - ५०० श्लोकांत २१ व्या शतकापासून इ. स. ३७९२ पर्यंतच्या कालखंडात होऊ घातलेल्या भाकितांचे विवरण आलेले आहे.

-ज्योतिष शास्त्र हे असे चमत्कारिक शास्त्र आहे की सर्वसामान्य माणसांपासून अधिकारी वर्ग, देशा-राष्ट्रांचे शास्ते, धनाढ्य, श्रीमंत, राजेरजवाड्यापर्यंत सर्वांनाच त्याचे आकर्षण आहे. उघडरीत्या त्या शास्त्राचा निषेध, परंतु खाजगीरीत्या त्याची चाचपणीच केवळ नव्हे तर आवर्जून त्या शास्त्राच्या पारंगत ज्योतिर्विदाची मनधरणी करण्याची प्रथा सर्वकाली व सर्व देशांतून रूढ असल्याचे दिसते. ज्योतिष हे शास्त्र आहे, त्याचे आकाशस्थ ग्रहांच्या गतीनुसार ठरलेले आडाखे आहेत. इथून तिथून निसर्ग हा सारखाच असल्याने त्या त्या काळच्या ग्रहस्थितीनुसार व्यक्ति, समाज, देश नि त्यांचे धर्म, संस्कृती यावर परिणाम घडत असतात. ज्योतिषी फक्त त्याने केलेल्या शास्त्राभ्यासाच्या आधाराने मिळविलेल्या ज्ञानाने जे परिणाम घडायचे असतात त्याची आगाऊ माहिती सांगतो, त्याचे आनंददायी, सुखसंवर्धक बदल स्पष्ट करतो. ते बदल केव्हा कसे होतील त्याबद्दल भाकित वर्तवतो. त्याचप्रमाणे दुःख वर्धक उलथापालथी काय होतील त्याचीही नोंद करीत असतो. जे घडायचे असते ते ज्योतिषाला टाळता येत नाही - किंवा तो ते घडवीतही नाही. म्हणून नॉस्ट्राडेमससारखे जगप्रसिध्द ज्योतिर्विद आत्मविश्वासाने म्हणतात की, 'मी लिहिले, सांगितले - त्यात काहीही बदल करण्याची माझी इच्छा नाही.'

...(40)...

गेली नऊ वर्षे इराकबरोबर विध्वंसक युध्दात गेली. जवळ जवळ एक हजार किलोमीटर प्रदेश इराकने सोडलेला नाही. युध्दकैदी सोडविता आले नसल्याने युध्द थांबले, परंतु इराणची मानहानी संपलेली नाही. या युध्दात पेट्रोलियमच्या उद्योगाची महत्त्वाची साधने उद्ध्वस्त झाली, अर्थव्यवस्था, उद्योगधंदे, रोजगार यांची झालेली हानी फार मोठी आहे. शाह यांच्या पदच्युतीच्या सुमारास जी स्थिती होती त्यापेक्षा कितीतरी पटीने सध्याची इराणची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे.

आपले घरदार, कौटुंबिक सुख व सुरक्षितता या बाबींचा विचार टाळता येणे अशक्य झाले आहे; आणि त्याबद्दल बहुजनसमाज बोलू लागला आहे. इराणी राष्ट्रांच्या समस्यांना तोंड फुटू लागले आहे आणि त्या समस्यांची सोडवणूक करायला इस्लामची अथवा धर्माची वाढ पुरेशी पडणार नाही याची जाणीव बहुजन समाजालाच नव्हे तर सत्तारूढ पक्षातल्या मवाळांनाही होऊ लागली आहे.

नॉस्ट्राडेमस यांनी शतक १ श्लोक ७० मध्ये असे स्वच्छ लिहून ठेवले आहे की, खोमेनीच्या कडव्या हेकटपणाला विरोधकच कडवेपणाने मोडून काढतील नि खोमेनी विरोधकांची सरशी होईल; त्यांचा विजय होईल. अखेरीस फ्रान्सच मध्यस्थी करून खोमेनी व त्याचे साथीदार यांना दया दाखवावी असे सांगेल व बंडखोर फ्रान्सचा सल्ला मानतीलही! नॉस्ट्राडेमस या सर्व घडामोडींचे वर्णन करून सांगतोय. 'थांबा, रामराज्य येतेय!' जुलै १९९९ ते इ. स. २००६ पर्यंत चालणाऱ्या या सर्व संहारक युध्दाच्या शेवटी सुवर्णयुग अवतरेल; हिंदुस्थानात उगवणारा तारणहार शायरन व फ्रेंच नेता मार्स यांची युति होईल. त्यानंतर ७५ वर्षे जगात सुख-समृध्दि, व शांतता नांदेल. (१० / ८९)

नॉस्ट्राडेमसने निःसंधिग्धपणे म्हटलेय, की नव्याने प्रकट होणारा शायरन (CHYREN) आजच्या घटकेला अज्ञान आहे. परंतु तो ख्रिश्चन वा मुस्लिम नसेल. पाश्चात्य विद्वानांनीही हे विधान मान्य केले आहे.

नॉस्ट्राडेमस स्वतः ज्यू वंशाचा, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला, फ्रान्सचा नागरिक. तो ४५० वर्षांनी अवतरणारा विश्वनेता हिंदूच असेल असे छातीठोकपणे सांगतो, त्या हिंदु नेत्याचा गौरव करतो तो ह्याच कारणांनी की त्या स्वातंत्र्यसूर्य शायरनच्या उदयाबरोबर आधीते नेते निष्प्रभ होऊन नम्र होतील. 'तो' शायरन तिसऱ्या जागतिक युध्दाच्या काळानंतर वाचलेल्या नागरिकांना कायद्याचे राज्य देईल. कुणावरही अन्याय होणार नाही. 'गुणाः पूजास्थानं नच लिंगम् नच वयः' बरोबरच 'नच श्रध्दास्थानः' ही त्या लोकशाही राज्याची वेदी असे. सामाजिक रचना 'गुणकर्मविभागशः' असेल. जन्मदात्या मातापित्याच्या श्रध्दास्थानांवर ती आधारलेली असणार नाही. राखीव जागा, खास हक्क ही भाषा असणार नाही. त्याचप्रमाणे दलित, मागासलेला समाज अशी विभागणीही या साम्राज्यात असणार नाही. प्रत्येकाच्या वैयक्तिक गतिशील प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले जाईल; त्याच्या प्रगमनशील कर्तृत्वाला भरपूर संधि व वाव दिला जाईल, सरसकट आमिषांची खिरापत वाटली जाणार नाही. यामुळे जो मेहनत करील

...(41)...

त्याला 'संधि' मिळेलच मिळेल अशी आश्वासक खात्री पटल्याने राष्ट्रसंवर्धनाला आवश्यक असणारी चढाओढ समाजात मानवाला कार्यप्रवण करील. शासन अमानवी वागणारांना वठणीवर आणीलच, शिवाय त्यांच्यातील अतिरेक्यांचा निःपात केला गेला जाईल. सर्वांना लागू पडणारा समान कायदा राज्यभर कसोशीने पाळण्यात येईल.

आता एक गोष्ट निर्विवादपणे सिध्द झाली आहे की तिसऱ्या अतिसंहारक महायुध्दातून नव्याने दर्शन घडविणारा तारणहार 'आशिया खंडात जन्म घेतलेला असेल, (शतक २० श्लोक २५).' युरोपात नाहीच नाही! तो ख्रिश्चन नसेल, मुसलमान तर नसेलच नसेल. ज्यूही असणार नाही. तर हिंदूच असेल असे जे नॉस्ट्राडेमसने निःसंदिग्धपणे म्हटलेय् ते पाश्चात्य विद्वानांनाहि मान्य आहे. तो हिंदू-नेता अन्य सर्व भूतपूर्व नेत्यांपेक्षा महत्तर असेल, बुध्दिमान असेल, अजिंक्यही! नॉस्ट्राडेमसचा शतक ६ श्लोक ७० फार महत्त्वाचा मानावा लागेल.

The grest CHYREN will be
chief of the world.
Loved feard and unchallenged
even at the death
His name and praise will reach
beyond the skies.
And he will be content to be
known only as Victor.

महान् शायरन जगाचा प्रमुख नियंता होई ल. त्याच्यावर सर्वसामान्य जनता प्रेम करील; त्याचबरोबर त्याचा वचक येवढा असेल की प्रजाजन काहीही अपकृत्य करायला धजणार नाहीत. त्याच्या मृत्युनंतरही त्याचा दबदबा कायम राहील, त्याचे नाव आणि पराक्रम नागरिकांच्या मनावर इतके खोलवर परिणाम करतील की त्याची कीर्ति त्रिखंड पसरेल. सामर्थ्य इतके प्रचंड असेल की शत्रू त्याच्या देशाला घाबरतील, त्याच्या राज्याची, नव्हे साम्राज्याची दहशत मानतील. तो सार्वभौम असेल, त्याच्या कर्तृत्वाचा प्रभाव संपूर्ण जगावर पडेल. हा महान् हिंदु नेता भारताला भूमि आणि सागर यावर अजिंक्यपद प्राप्त करून देईल. आतापर्यंत निद्रिस्त असलेल्या हिंदूंना खडबडून जागृत करून त्यांच्याकरवी अशी काही चिरंतन कामगिरी करवील की ज्याने ते आपल्या पूर्वजांचे सार्थ वारस ठरतील.

शतक २, श्लोक ७९ द्वारा फ्रेंच द्रष्टा नॉस्ट्राडेमस स्वच्छपणे सांगतोय की, शायरन क्रूर आणि हिंसक जमातीतल्यांना ठिकाणावर आणिल आणि चंद्रकोरीच्या ताब्यातील भूमि मुक्त करील. त्याचे हे शब्दच पहा किती बोलके आहेत!

फ्रेंच - Subjuguva 10 gent crelle add fiere Le grand chyren ostera du longin Tous les captifs par seline baniaet.

...(42)...

इंग्लिशमध्ये स्वैर भाषांतरित शब्दात सांगायचे तर -

1) Will subjugate the cruel and
violent freed,
The great CHYREN will
take from distance,
All those held captive by
crescent moon

वरील श्लोकातील Cruel and Violent held captive by crescent moon म्हणजेच - हिंसक आणि क्रूरचंद्र हे शब्द इतके अर्थवाही आहेत की वरील उल्लेख मुसलमानांना उद्देशूनच आहेत याबाबत दुमत न व्हावे.

थोडक्यात सांगायचे तर शायरनच्या कारकीर्दीत या भूतलावर सुवर्णयुग अवतरेल. त्याच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या महानतेचे व सद्‌गुणांचे आवर्जून गुणगान होत राहिल. पण त्याच्या मनाची शालिनता, विनम्रपणा व औदार्य इतके ढळढळीतपणे दिसते की यापूर्वी नमूद केलेल्या शतक ६ श्लोक ७० व्या श्लोकाच्या शेवटच्या ओळीत त्याबद्दल केलेला उल्लेख फार बोलका आहे. (शायरन म्हणतोय) 'जनतेने त्याच्याबद्दलचा उल्लेख फक्त एक विजयी नेता या तीन शब्दात करायचा तर करावा आणखी विशेषणे त्याच्या नावाला चिकटवू नयेत.

मधल्या काळात हिंदूधर्माचे व हिंदूंच्या आदर्शवत् जीवनाचे पुसट झालेले क्षणचित्र, पुन्हा आपल्या देदिप्यमान उत्तुंग स्वरूपात प्रस्थापित होणारच, आणि मानवी संस्कृती निर्धोक बनेल हे नॉस्ट्राडेमसने पुरेशा स्पष्टपणे सुचविले आहे. त्यात संदिग्धता कुठेही नाही. हे सर्व घडवून आणणारा आज अज्ञात असणारा परंतु योग्य समयी प्रकट होणारा महापुरुष तथा शायरन हा हिंदुधर्मीयच असेल असेही नॉस्ट्राडेमस निखालसपणे सांगतो, नव्हे नव्हे, जवळ जवळ साडेचारशे वर्षापूर्वी अक्षरबध्द करतो. त्याने या शायरनच्या मनाचा घेतलेला वेधही इतका काही तर्कशुध्द व अचूक आहे की नॉस्ट्राडेमसच्या द्रष्टेपणाचे आश्चर्य वाटते! नॉस्ट्राडेमसने म्हटलेय की, शायरन बेचैन मनाने खूप प्रवास करील. या बेचैनीचे कारण काय असणे शक्य आहे? आपल्या धर्मबांधवांच्या समस्या आणि त्यांची सद्यःकालीन दयनीय अवस्था हे असू शकेल! त्या बेचैन अस्वस्थ मनाचा कानोसा आपण पुढच्या प्रकरणात घेऊ!

...(43)...

: ५ :

नॉस्ट्राडेमसच्या भाकितांना दुजोरा देणारी आणखी कांही भाकिते

उभ्या आयुष्यात भारताला कधीही भेट न दिलेल्या महर्षी नॉस्ट्राडेमसने, सुमारे ४००-४५० वर्षापुर्वी,'२००१ साली प्रलययंकारी विनाशाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या जगाला शायरन (CHYREN) हा हिंदू नेता आपल्या क्षात्रतेजाने तारणहार होईल.' या स्वातंत्र्यसूर्याच्या आगमनाने बलाढ्य हिंदू राष्ट्राचा उदय होऊन हिंदूंचे पुनरुत्थान होईल, हिंदू साम्राज्य स्थापन होऊन 'सुवर्णयुग अवतरेल' असे भविष्य शब्दबध्द केले आहे.

१९९९ साली सुरू होणाऱ्या व इ. स. २००६ ला संपणाऱ्या महायुध्दासंबंधी अनेक श्लोकात नॉस्ट्राडेमस लिखित, 'सेंच्युरी' मध्ये 'शायरन' या टोपण नावाचा उल्लेख 'विश्वनेता' म्हणून ठिकठिकाणी केलेला आढळतो. गेली जवळ जवळ २०० वर्षे या 'शायनर' चा शोध घेण्याचे काम नॉस्ट्राडेमस विषयातील तज्ज्ञ हिरीरीने करीत आहेत. गेल्या प्रकरणांत या विश्वनेत्याबद्दल नॉस्ट्राडेमसच्या कित्येक अभ्यासकांनी लढविलेले तर्ककुतर्क किती विसंगत आहेत हे दाखविले; आणि त्या संदर्भात सध्याचा इराणचा धर्मनेता आयातुल्ला खोमेनीचे नाव आग्रहाने घेतले जाते ते तर किती असंबध्द आहे त्याचीही चर्चा केली.

नॉस्ट्राडेमसच्या भविष्यवाणीत 'क्रम' नसतो-सकारण नसतो, त्यामुळे हे तर्काधिष्ठित घोटाळे होतात हे जरी खरे असले तरी नॉस्ट्राडेमस वेगवेगळया लोकांमधून शायरन् बाबत जे विखुरलेले उल्लेख करतो त्यावरून येऊ पाहाणाऱ्या ३ऱ्या जागतिक युध्दकालातील क्षितिजावर नव्याने उगवणारा पण आज जगाला अज्ञात असलेला जगज्जेता कोण असेल, कुठचा असेल याबाबत सुसंगत तर्ककरायला अडचण पडू नये.

पृष्ठसंख्येचे बंधन लक्षांत घेऊन आतापर्यंत नॉस्ट्राडेमसच्या श्लोकांचे 'शतक अमुक व श्लोक क्रमांक अमुक' एवढाच निर्देश करून त्याने वर्तविलेल्या भाकितांचा मागोवा घेत घेत गूढार्थांची उकल केली. परंतु, आता यापुढे महान् शायरनच्या कर्तृत्वाचा प्रकाश पाडणाऱ्या भाकितांबद्दलचे लेखन, नुसतेच शतक 'श्लोक' क्रमांक अशा संदर्भात न देता, आवश्यक तेवढे मूळ श्लोक, जसेच्या तसे, उध्दृत केल्याशिवाय वाचकांचेही समाधान होणार नाही म्हणून ते प्रसिध्द करण्याचे योजिले आहे. मूळ फ्रेंच भाषेतील श्लोक देणे अशक्य नाही. तरी ती भाषा अत्यल्प लोकांना समजणारी असल्याने त्या श्लोकांचे इंग्रजीत भाषांतर उध्दृत केले जाईल. त्यावरून नॉस्ट्राडेमसच्या एकेका विधानाचे निरुपण करणे सोपे होईल.

...(44)...

यापूर्वीच्या २ ऱ्या प्रकरणांत नॉस्ट्राडेमसचा जीवनवृतांत देतांना, त्याने गूढ भाषेत भविष्यकथन कसे केले आहे त्याचे उदाहरण म्हणून, 'सेंच्युरी' च्या शतक ४ श्लोक १४ चा पूर्वार्ध मूळ फ्रेंच व त्याचेच इंग्रजीत रुपांतरित भाग उध्दृत करून त्याबद्दल विवरण केले. तिसरे प्रकरण नॉस्ट्राडेमसच्या तंतोतंत खऱ्या झालेल्या भाकितांची ओळख वाचकांना व्हावी म्हणून लिहीले, त्यात पुन्हा वरील शतका-श्लोकाच्या आधारे भारताच्या 'डॉमिनंट प्रिमिअर' कै. इंदिरा गांधी यांच्या अकस्मात (इंग्रजी शब्द आहे Sudden) हत्येने 'भारत' सर्वश्रेष्ठ हिंदुराष्ट्र घडविण्याच्या संभाव्य दोन बदलांचा उल्लेख केला तो असा- इंदिराजींचे पुत्र राजीव गांधी हे पंतप्रधान होतील (श्लोकातील शब्द shall cause change) हा पहिला बदल तर, वरील शब्दांपाठोपाठ त्याच श्लोकात आलेल्या 'and put another in the reign soon' या अधोरेखित शब्दांनी ध्वनित होणारे राजीव गांधींच्या पाठोपाठ २० व्या शतकाचा अस्त होण्याचे काळी उगवणारे दुसरे सत्ताधारी म्हणजेच नॉस्ट्राडेमसना अभिप्रेत असलेला 'शायरन' असेल हे सुसंगत वाटते. हेन्री सी. रॉबर्टस् नामक नॉस्ट्राडेमसचे एक प्रसिध्द भाष्यकार आहेत यांनीही वरील विधान उचलून धरले आहे.

नॉस्ट्राडेमस येवढ्यावरच थांबत नाही तर विश्वनेत्याबद्दल आणखी काही महत्त्वाच्या खुणा दाखवतो.

शतक ५ श्लोक ४१ मध्ये नॉस्ट्राडेमसने स्पष्टच सांगितले आहे की, रात्री अंधाऱ्या वेळी (त्यांचे शब्द आहेत - Noctural time) 'तो' जन्माला येईल. तो सर्वभौम असेल आणि औदार्यात त्याच्याशी कुणीही बरोबरी करू शकणार नाही. तो आपल्या सनातन धर्माचे पुनरुज्जीवन करील आणि या अवनीतलावर सुवर्णयुग आणील!

'अंधाऱ्या वेळी' या शब्दाचे अनेक अर्थ संभवतात. पैकी एक म्हणजे श्रीकृष्णाच्या जन्माचे वेळेप्रमाणे 'तो' शायरन रात्रीच केवळ नव्हे तर अमावास्येच्या अंधाःकारमय रात्रीहि जन्म पावला असेल! दुसरा असाही अर्थ होऊ शकतो की, भोवतालचे जगात जेव्हा त्या जगास 'अंधार-युग' म्हणण्याइतकी काळ्या कृत्यांची बेबंदशाही माजली असेल तशा भयंकर कालावधीत 'शायरन'ने या जगात पदार्पण केले असावे. तिसराही अर्थ या 'रात्री'च्या उल्लेखाला चिकटवला जातो, तो म्हणजे, या अवनीतलावर चालू असलेल्या 'जगा'मध्ये आणीबाणी जाहीर होऊन (उदा. २ ऱ्या महायुध्दाचे वेळी जशी अंमलात होती तशी) ब्लॅक आऊट असेल तेव्हा जन्माला आलेले हे मूल असावे! या सर्व लेखनाचा इतकाच इत्यर्थ निघतो की आगामी महासंहारक तिसऱ्या महायुध्दात अमेरिका-रशियाच्या युतिसह 'शायरन' ही तिसरी भारतीय शक्ती महान कार्य करील. आज ती अज्ञात असली तरी ती व्यक्ती आजच्या जगात वावरत असेल. अमावस्येसारख्या कुठल्या तरी अंधेऱ्या रात्री जन्म घेतलेली व आगामी महान नेता ठरणारी ही व्यक्ती तरुण १६ते२०-२५ वर्षाची तरी असेल किंवा पन्नाशीसाठी गाठलेली अनुभवी ध्येयैकशरण प्रौढ व्यक्तीही असू शकेल; यापेक्षा शायरनच्या वयावर प्रकाश पाडणारा उल्लेख नॉस्ट्राडेमसने कुठे केल्याचे आढळत नाही.

...(45)...

नाही म्हणायला नॉस्ट्राडेमस हे मात्र नमुद करतो की या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली भारत हा जगातील सर्व-श्रेष्ठ देश बनेल. इतकेच नव्हे तर दूरवर पसरलेले हिंदूंचे साम्राज्य नव्याने आकारास येईल.

शतक १,श्लोक ५० मध्ये त्या पुरुषाचा पुन्हा उल्लेख आढळतो तो असा-

'From Peninsula of three seas will be born one who will make Thursday his day of worship. His fame praise and rule will form mighty by land, sea. There will be a tempest of India.'

तीन सागरांनी बनलेल्या व्यापक द्वीपकल्पात तो जन्म घेईल; त्याचा गुरुवार हा प्रार्थनेचा दिवस असेल. त्याची कीर्ति त्रिखंडात पसरेल. त्याचे सामर्थ्य इतके प्रभावी असेल की त्याच्या आक्रमक घोडदौडीमुळे उत्पन्न झालेल्या त्याच्या प्रभावाने वादळी वातावरण उत्पन्न होईल. द्वीपकल्प, गुरुवार प्रार्थनेचा दिवस (या संदर्भात असेही म्हटले गेले आहे की शायरनचा विश्रांती घेण्याचा दिवस सोमवार असेल). या तिन्ही लाक्षणिक शब्दांद्वारे नॉस्ट्राडेमसला काय सुचवायचे असावे त्याबद्दल यापूर्वीच्या प्रकरणांतून स्पष्टीकरण केलेच आहे. या सर्वांचा निःसंदिग्धपणे आशय स्पष्ट होतो तो हा की शायरन हा महाम नेता भारतात जन्मलेला हिंदू नेताच असेल.

वरील भाकिताला दुजोरा देणारे भाष्य नॉस्ट्राडेमसने स्वतःच शतक ५, श्लोक २५ मध्ये केले आहे तेच पहा ना -

The Arab Primer, Mars, Sol, Venus, Leo,Rule of Church will surrender to the sea towards Persia, close to a million, True serpent power invade Turkey and Egypt.'

मागे उल्लेख केलेल्या हेन्री रॉबर्टस्ने याही श्लेकाखाली, आपल्या पुस्तकात टीप दिली आहे की -

'Christian Ideal will be overcome by Oriental Ideology where serpent meaning True serpent.....'

(म्हणजेच कुंडलिनी शक्ति धारण करणारी व्यक्ति). नॉस्ट्राडेमस भविष्याचा वेध घेऊन, वरील श्लोकात स्वच्छपणे सांगून टाकतो की सागराच्या नावाचा धर्म ज्याचा आहे (म्हणजेच हिंदी महासागर त्या अनुषंगाने हिंदुधर्म-तथा हिदुस्थान!) - कुठल्याहि प्रादेशिक भूमीकडे अंगुली निर्देश करण्याकरिता असा उल्लेख कुठल्याही भौगोलिक वाङमयात आढळत नाही-तो ज्याचा आहे त्याच्या पुढाकाराने युरोपमधील नव्हेत तर ख्रिश्चन व यावनी संस्कृतीचा खातमा केला जाईल. त्यांची सारी केन्द्रे ज्या ज्या राष्ट्रात विखुरलेली आहेत ती राष्ट्रेही पादाक्रांत केली जातील. इतर, कोणत्याही धर्मात ज्याप्रमाणे गुरुवार हा प्रार्थनेचा दिवस म्हणून पाळला जात नाही त्याचप्रमाणे कुंडलिनी शक्ति कुणाही बिगर हिंदूला ज्ञात नाही. हिंदूंचे ते खास शक्तिस्थान आहे, ते हिंदुच इजिप्त, तुर्कस्तान इत्यादी मध्यपूर्वेत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना दूर फेकून तिथे हिंदु संस्कृति केवळ नांदू लागेल असे नाही तर तिचा अम्मल सुखेनैव चालू राहील.

...(46)...

वरील भाकितावर आणखी झगझगीत प्रकाश टाकणारे भाकीत नॉस्ट्राडेमसने शतक १०, श्लोक ९६ मध्ये प्रसिध्द केले आहे ते असे -' Religion of the name of sea will against the sect of Caliphs of the Moon vanquish. The deplorably obstinate sect shall br afraid of wounded by Alef and Alef.'

फ्रेंच द्रष्ट्या ज्योतिषवर्यानि केलेले वरील भविष्य फार महत्त्वाचे आहे. कारण, यात जास्तच स्पष्टपणे सांगितले आहे की समुद्राचे (तथा हिंदी महासागराचे) नाव असलेला देश - हिंदुस्थान - खलिफाच्या प्रशंसित पंथाचा नाश करील. वरच्या श्लोकातील २ ऱ्या ओळीतील Sect हा शब्द महत्त्वाचा व नॉस्ट्राडेमसच्या मार्मिक शब्दयोजनांचा निदर्शक आहे. त्या शब्दाचा एक अर्थ जसा 'पंथ' होऊ शकतो तसाच तो शब्द फ्रेंच भाषेत वापरला जातो तो 'श्रध्दा' या अर्थाने! या दृष्टीने या काव्यपंक्तीचा अर्थ लावावयाचा तर समुद्राचे नाव असलेल्यांची श्रध्दा तथा धर्म, हा सद्धर्म आहे तर खलिफा प्रशंसित धर्म ही केवळ अंधश्रध्दा आहे. या वाक्याचा आणखी स्पष्टार्थ करायचा तर नॉस्ट्राडेमसला हिंदू हा 'धर्म' तर इस्लामला तो अंधश्रध्दा म्हणून अभिप्रेत आहे. Obstinate हे विशेषण खलिफाच्या पंथाला लावून नॉस्ट्राडेमसने हेही आडपडदा न ठेवता सांगून टाकले आहे की, 'खलिफ-प्रशंसित पंथ अपरिवर्तनशील, अतिरेकी आहे!'

या पूर्वीच्या प्रकरणात 'शायरन' म्हणून आयातुल्ला खोमेनीबद्दल लिहितांना सध्या जगभर चालू असलेल्या रश्दींच्या 'सॅटॅनिक व्हर्सेस' या कादंबरीवरून उसळलेल्या सैतानी उद्रेकाचा उल्लेख केलाच आहे. त्याला आणखी दुजोरा देणारी बातमी नुकतीच वाचण्यात आली, तीही या संदर्भात बरेच काही सांगून जाते असे वाटते म्हणून येथे तिचा उल्लेख करतो - पॅरिसहून आलेली ही सत्यकथा आहे. प्रसिध्द फ्रेंच गायिका व्हेरोनिक सान्सॉं, आपल्या कार्यक्रमात 'अल्ला' हे गीत सादर करीत असे. (म. गांधी ज्याप्रमाणे त्यांच्या रामनामात - 'ईश्वर अल्ला तेरे नाम' असे खादीचे ठिगळ लावून म्हणत त्याप्रमाणे!) परंतु, गीत - गायकाला ठार मारू अशी धमकी त्यांना देण्यात आल्यावर त्यांनी ते गीत न गाण्याचे ठरविले. नभोवाणीवरील एका मुलाखतीत ही माहिती देऊन पुढे स्पष्टीकरणही केले की, 'वास्तविक या गीतात इस्लामचा अवमान करणारे काहीही नाही, ती एक प्रार्थना आहे. पण 'ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति।।' हे जास्त अनुभवसिध्द वाक्य कुणाच्या खिजगणतीत आहे?

मुस्लिम धर्माच्या तत्त्वांना खोमेनीसारखे धर्मांध त्यांना अभिप्रेत असलेला वेगळाच रंग देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे होते काय तर काही मुस्लिम मूळ ग्रंथ न वाचताच विनाकारण कडवे धर्मांध बनत चाललेले आहेत. मशिदीमध्ये ठिय्या मारून बसलेले मुल्ला - मौलवी नि इमाम आपापले राजकारण पुढे रेटण्याचे मनसुबे उभारण्यात मश्गूल झाले आहेत. भारतीय शिक्षण यंत्रणेतून इस्लाम विरोधी (हेही त्यांनीच ठरवायचे) सारे उल्लेख काढून टाकावेत, पाठ्यपुस्तकांचे शुध्दीकरण (!) केले

...(47)...

जावे अशी मागणी करायला सुरुवात झाली आहे. या सर्वांची परिणती कशात होईल हे सांगणे आतापर्यंतच्या अतिरेकी अनुभवावरून जाणता येण्यासारखे असले तरी ज्या वेगाने १९९९ चा झंझावात समीप येत आहे त्या वेगाशी सुसंगत असा अत्याचारांचा नेहमी उसळणारा डोंब लक्षात आला की हीच वावटळ आगामी तिसऱ्या महायुध्दाची नांदी ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

१७ व्या शतकात ज्याप्रमाणे मुसलमानांच्या अत्याचारांनी हिंदुस्तानांत मर्यादा गाठली, तेव्हा मूठभर मावळ्यांना एकत्र करून परिस्थितीशी मुकाबला करणे अपरिहार्य झाले.

तेव्हा बाल शिवरायांनी विजापूर सोडून पुण्याच्या आपल्या जहागिरीत राहायला सुरुवात केली व आपल्या सवंगड्यांसह करंगळीचे बोट कापून श्रीशंकरावर (रोहिडोश्वर?) रक्ताचा अभिषेक करून स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. हाताशी असलेले सीमित मनुष्यबळ, युध्दमान शस्त्रांचा तुटवडा, अर्धपोटी जेवण, आणि एकंदर समाजावर मुसलमानी अंमलाची खोलवर रूजलेली दहशत व त्यामुळे रूळलेली अगतिकता यामुळे गनिमी काव्याने या सत्तेशी दोन हात करावे लागले. पारतंत्र्याचा एक अवश्यमेव भाग असा असतो की त्याविरुध्द प्रथम उठाव करणाराला नामोहरम करणे, घरच्यापेक्षा बाहेरचा सत्ताधारी आपलासा वाटणे! घरभेदीपणा सत्कर्माचा रंग घेतो. प्रत्येक कृतीला धर्मांधता म्हणण्यात येते, जातीयतेचा छाप मारला जातो. सूर्याजी पिसाळाची अवलाद उत्तम होऊन फंद - फितुरी वाढते - या सर्वांवर मात करून शिवरायांनी राजगडावर तोरण बांधून, राज्याभिषेक करविला तेव्हाच भूषण कवींनी त्यांचा गौरव केला तो या शब्दांनी - 'शिवाजी न होता तो सब की होती सुन्ता'. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते असे म्हणतात त्यानुसार आजही शायरनच्या नेतृत्त्वाने हिंदुत्वाची द्वाही फिरवण्याची नेमकी वेळ आली आहे. शिवरायांनी अनुसरलेला मार्ग धर्मांधतेचा नव्हता तर 'स्वत्व' टिकविण्याचा होता. त्याकरिता प्राणांची बाजी लावून मराठमोळ्यांनी लढा दिला होता. ती स्फूर्ति नंतर १९ व्या शतकापर्यंत कार्यरत होती. मराठ्यांचा भगवा जरिपटका अटकेपार लागला, दिल्लीचे तक्त फोडून आपल्या शौर्याची मुद्रा भारतभर पसरलेल्या भारतीयावर उमटवली. एवढी मर्दुमकी असूनही दिल्लीच्या सिंहासनावर - तक्तावर - .शेवटपर्यंत 'मराठा' न बसविता, मोगल बादशाहीच चालू राहिली. हे विषयांतर एवढ्यासाठीच केले की हिंदूंची युध्दप्रविणता ते सत्ताधीश होण्याइतकी बलशाली असूनही, त्यांच्या विशिष्ट मानसिक ठेवणीनुसार ते आक्रमक सत्ताधारी केव्हाच झाले नाहीत हे स्पष्ट व्हावे!

भारतीय हिंदू हे निसर्गतः व त्यांना मिळालेल्या धार्मिक व अध्यात्मिक वारसानुसार प्रवृत्तीने सौम्य प्रकृतीचे आहेत, आक्रमक नाहीत. परंतु, या आधी उध्दृत केलेल्या नॉस्ट्राडेमसच्या शतक १, श्लोक ५० प्रमाणे, 'शायरन' हा हिंदू नेता अखिल हिंदुविश्वाला जागृति आणून स्वतःच्या वादळी व्यक्तिमत्वाने, आपल्या भूमि नि सागरी सामर्थ्याचे दर्शन घडविणार आहे. अजिंक्य हिंदुनेता ही आपली प्रतिमा सर्व

...(52)...

प्रारंभी जगाच्या क्षितीजावर उगवणार आहे. हा जो बदल घडणार आहे तो नॉस्ट्राडेमसच्या इच्छेने घडणार नसून नियतीच्या इच्छेने हा सारा बनाव घडणार आहे. त्यातून नवीन जे घडणार आहे ते म्हणजे हिंदुस्थान हा सर्वश्रेष्ठ देश होणार आहे. आज कित्येक शतके न दिसलेले, दृष्टिआड झालेले हिंदुंचे साम्राज्य अवतरणार आहे.

आजच्या विज्ञानयुगात अणुशास्त्राचा जो अभ्यास चालू आहे, व अणु-अस्त्रे बनविण्याची वा संग्रही ठेवण्याची जी चढाओढ सर्व जगभर चालू आहे त्यावरून आगामी युध्दाची भीषणता स्पष्ट होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानंतर जो अहवाल प्रसिध्द झाला आहे त्यावरून निःसंदिग्ध शब्दात प्रामुख्याने सांगितले आहे की, आगामी युध्द हे अणुयुध्द झाल्यास - आणि आज, त्या दृष्टीने जी पावले पडत आहेत त्यानुसार ३ हे महायुद्ध अणुयुध्दच होणार याबद्दल दुमत होण्यासारखेही नाही - प्रत्यक्ष परिणाम प्रचंड मनुष्यहानी, उद्ध्वस्त झालेले देश, भस्मसात झालेली मालमत्ता व शेती या दृष्यांनी दिसतील हे तर खरेच, पण त्याहीपेक्षा त्याचे जे अप्रत्यक्ष परिणाम प्रदीर्घ कालपर्यंत जाणवतील ते मात्र फारच भयंकर स्वरूपाचे असतील.

या अणुयुध्दाने जगातील हवामानात बदल होईल. ज्या गोलार्धातील शहरांवर अणुबॉंब किंवा रॉकिट्स यांचा मारा होईल - आणि उत्तर गोलार्धातील मोठ्या शहरांवर असा वर्षाव होण्याचा संभव जास्त - त्या गोलार्धातील तपमान शून्य अंश सेल्शिअस् खाली जाईल. सूर्यप्रकाश पुरेसा मिळणार नाही. पाऊस कमी पडेल. त्यामुळे शेती, वनस्पती उगवण्या - उत्पन्न होण्यावर विपरित परिणाम होईल. ओझोनचा संरक्षक थर कमी होत आहे, अशी आजच आवई उठली आहे. तो संरक्षक थरही अणुयुध्दाने आणखी कमी होऊन अतिनील किरण रोखले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल.

नॉस्ट्राडेमसला हे सर्व प्रलयंकारी दृष्य दिसत असूनही त्याने केलेल्या ग्रहगणिताच्या आधारे तो म्हणतो की, या तिसऱ्या महायुध्दात अनेक तथाकथित प्रगत देश बेचिराख होतील. तरी त्यातून मानववंश टिकून राहील; हिंदुस्थान - म्हणजे हिंदुराष्ट्र - आणि त्या देशात जन्मलेला द्रष्टा नेताच, सर्व जगाचा तारणहार जगज्जेता असेल!

भगवान् श्री रामकृष्ण परमहंस यांचे एक फ्रेंच भक्त रीनकोर्ट नामक लेखक आहेत. त्यांनी परमहंसांचा निर्वाणापूर्वी जे सांगितले ते श्री रामकृष्णांचे शब्द उद्धृत करून म्हटले आहे की रामकृष्णांची ती भविष्यवाणी नॉस्ट्राडेमसच्या भाकितांना पुष्टीच देते. भगवान रामकृष्ण परमहंस म्हणाले होते की त्यांचा 'पुढचा जन्म भारताच्या वायव्येला होईल' हेच दुसऱ्या भाषेत विशद करून सांगायचे तर परमहंस रशियांत हिंदु संत म्हणून पुनः जन्म घेतील, नि हिंदुत्वाचे पुनरुत्थापन होईल. 'शक-हूण' आदि जमातींप्रमाणे रशियाहि हिंदुत्ववादी झालेला दिसेल, त्या जीवनपद्धतीचा स्वीकार करील कारण या आकाशाखाली सर्वकश विचारस्वातंत्र्य असलेली दुसरी जीवनपद्धतीच नाही. रशिया,

...(74)...

हिंदु संस्कृति, धर्म, व त्यांचे राष्ट्रप्रेम याबद्दल, नॉस्ट्राडेमस स्वतः ज्यू वा ख्रिश्चन असूनहि, जे उत्कटतेने उद्गार काढतो, ते त्याला काही आंतरिक साक्षात्कार झाल्यामुळें काढीत असावा असे वाटण्याइतके खणखणीत आहेत. भारतांतील हिंदु हे खरे हिंदुस्तानचे रहिवासी, भारतांतील मुस्लिम हे घुसखोर तरी किंवा बाटगे मुसलमान, त्यामुळें त्यांना, नॉस्ट्राडेमस, राष्ट्रद्रोही. म्हणतो. हिंदु धर्माशिवाय हिंदुस्तान अशक्य, आणि हिंदुस्तानची हिंदु संस्कृतीहि अशक्यच! आगामी प्रलयंकारी युद्धांतून जगाला नवा प्रकाश देणारा जगज्जेता म्हणून हिंदूच नेता असेल याबद्दल 'नॉस्ट्राडेमस' ठाम आहे!

"যথার্থ জ্ঞান প্রকাশের বিষয়"

"পরমেশ্বরের বিষয়ে শাস্ত্র কি বলে?"

প্রভু -স্বামী-রাম-ঈশ -খুদা- আল্লাহ্ -রব- মালিক- সাহেব- দেব- ভগবান-গড এসব শক্তি বোধক শব্দ গুলি বিভিন্ন ভাষায় লেখা বা উচ্চারণ করা হয়।

প্রভুর মহিমায় প্রত্যেক মানব শরীরধারী প্রাণী প্রভাবিত হয়ে বলে,কোন শক্তি অবশ্যই আছে। তিনি পরম সুখদায়ক ও কষ্ট নিবারক। তিনি কে?কেমন?কোথায় থাকেন? কিভাবে তাকে পাওয়া যাবে? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর জগতের কাছ থেকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায়নি। এইসব প্রশ্নের উত্তর ও সন্দেহ এই পুস্তকেই পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে যাবে।

এখন চলুন সেই সত্যকে খুঁজে বের করি :-

যে শক্তি অন্ধকে চক্ষু প্রদান করে, মুককে (বোবা) শব্দ (কথা বলার শক্তি) দেয়, বধির কে শোনার (শ্রবণ) শক্তি দেয়, বন্ধ্যাকে পুত্র দেয়, নির্ধনকে ধন দেয়, অসুস্থ দের সুস্থ শরীর দেয়, যাঁর দর্শনে বা কথায় শরীরে বিশেষ শিহরণ হয়,যিনি সর্বব্রহ্মাণ্ডের রচনহার, পূর্ণ শান্তিদায়ক, জগৎ গুরু এবং সর্বজ্ঞ। যার আদেশ ছাড়া গাছের পাতাও নড়তে পারে না অর্থাৎ সর্বশক্তিমান যাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। এমন গুন যার মধ্যে আছে, তাকেই আসলে প্রভু (স্বামী, ঈশ,রাম, ভগবান, ক্ষুধা,আল্লাহ,রহিম,মালিক, রব,গড) বলা হয়।

এখানে একটি কথা বিশেষ বিচারণীয় যে, কোন ভক্তির জ্ঞান কোন শাস্ত্র থেকেই হতে পারে। ঐ শাস্ত্রের আধারে গুরুজন নিজের অনুগামী (শিষ্য) দের মার্গ দর্শন করান। ঐ শাস্ত্রগুলি হল ধার্মিক পুস্তক :- চার বেদ (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ) শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত সুধাসাগর, আঠারো পুরাণ, মহাভারত, বাইবেল, কুরান, ইত্যাদি। চার বেদ স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মার আদেশে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) সমুদ্রের ভিতরে নিজের শ্বাসের দ্বারা লুকিয়ে রাখেন। এবং প্রথমবার সাগর-মন্থনের সময় ঐ চার বেদ শ্রী ব্রহ্মা প্রাপ্ত করেন। শ্রী ব্রহ্মা বেদগুলি (ক্ষর পুরুষের প্রথম পুত্র) পড়েন, এবং যেমন বোঝেন তার ভিত্তিতে নিজের বংশধরদের (ঋষিদের) মাধ্যমে প্রচার করেন। পূর্ণ পরমাত্মা পঞ্চম 'স্বসম' (সূক্ষ্ম) বেদও ব্রহ্ম (কাল) কে দিয়েছিলেন,যা এই জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের কাছে গুপ্ত রাখেন এবং তাকে সমাপ্ত করে দেন।

কিছু সময় পরে অর্থাৎ এক কল্প (এক হাজার চতুর্যুগ) পরে তিন লোক (পৃথিবী লোক,স্বর্গলোক, পাতাল লোক) এর সকল প্রাণীর বিনাশ হয়ে যায়। পরে আবার জ্যোতি নিরঞ্জন কালের নির্দেশে ব্রহ্মার নিজের রাত্রি সমাপ্ত হলে (ব্রহ্মার রাত্রি এক হাজার চতুর্যুগের হয় এবং এতটাই দিন হয়) যখন দিন শুরু হয় তখন রজোগুণ দ্বারা প্রভাবিত করে তিন লোকে প্রাণীদের উৎপত্তি শুরু করেন।

সত্যযুগের সূচনা লগ্নে ঐ চার বেদ কাল (ব্রহ্ম) স্বয়ং ব্রহ্মাকে আবার প্রদান করেন। এবং আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের (উথাল পাথালের) কারণে পবিত্র চার বেদের জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যায়। এরপরে আবার সময় অনুসারে অন্য ঋষিদের মধ্যে প্রবেশ করে দ্বিতীয়বার লিপিবদ্ধ করান। তারপরেও সময় অনুসারে প্রাকৃতিক উথাল পাথালের পরে স্বার্থপর লোকেদের দ্বারা বেদের মধ্যে পরিবর্তন করে, বাস্তব জ্ঞান সংসার থেকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়। ঐ কাল (ব্রহ্ম,জ্যোতি নিরঞ্জন) মহাভারতের

যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রেতের মত প্রবেশ করে চার বেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা রূপে দেন এবং বলেন যে, এই জ্ঞান আমি প্রথমে সূর্যকে দিয়েছিলাম, সে নিজের পুত্র বৈবশ্বত্ অর্থাৎ মনুকে এবং মনু নিজের পুত্র ইক্ষুবাকুকে বলেছিলেন। কিন্তু মাঝে এই উত্তম জ্ঞান প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই কাল (ব্রহ্ম) শ্রী বেদব্যাস ঋষির শরীরে প্রবেশ করে, চার বেদ, মহাভারত, ১৮ পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, শ্রী সুদাসাগর ইত্যাদি গ্রন্থ গুলি পুনঃ লিপিবদ্ধ (সংস্কৃত ভাষাতে) করান। যা আজ আমাদের কাছে উপলব্ধ। এইসব শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। এখন এই শাস্ত্র গুলিকে কলিযুগের ঋষিরা বিভিন্ন ভাষাতে অর্থাৎ হিন্দিতে অনুবাদ করার সময় নিজেদের চিন্তাধারা মেলানোর চেষ্টা করেছে। যা স্পষ্ট ভুল দেখা যায় এবং ব্যাখ্যাও মেলে না। এই শাস্ত্র, মহর্ষি বেদব্যাস দ্বারা মোটামুটি ৫৩০০ (পাঁচ হাজার তিনশত) বৎসর পূর্বে দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছিল। ঐ সময় হিন্দু, খ্রিস্টান,মুসলমান, শিখ, ইত্যাদি কোন ধর্মই ছিল না। বেদকে মান্য করা আর্যরাই একমাত্র ছিল। কর্মাধার অনুসারে মানব জাতিকে বিভাজিত করা হয়েছিল এবং কেবল চার বর্ণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ও শুদ্র) ছিল।

এতে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল শাস্ত্র কোন ধর্ম বা কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। এগুলি একমাত্র মানব কল্যাণের জন্য। দ্বিতীয়তঃ এটা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পূর্বসূরী এক ছিল। যাদের সংস্কার একে অপরের সঙ্গে মেলে। সর্বপ্রথম পবিত্র শাস্ত্র গীতার ওপর বিচার করি :-

"পবিত্র গীতার জ্ঞান কে বলেছে?"

পবিত্র গীতার জ্ঞান ঐ সময় বলা হয়েছিল, যখন মহাভারতের যুদ্ধ শরু হতে চলেছে। অর্জুন যুদ্ধ করতে মানা করে দিয়েছিল। যুদ্ধ কেন হচ্ছিল? এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কারণ এখানে দুই পরিবারের সম্পত্তির বিতরণের (ভাগের) বিষয় ছিল। কৌরব ও পাণ্ডবদের সম্পত্তি ভাগ হচ্ছিল না কারণ, কৌরবেরা পান্ডবদের প্রাপ্য অর্ধেক রাজ্য দিতে মানা করে দেয়। দুই পক্ষের শালিসি (বাত-বিচার) করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তিনবার শান্তি দূত হয়ে যান। কিন্তু দুই পক্ষই নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে পরিচিত করাতে গিয়ে বলেন, না জানি কত বোন বিধবা হবে? কত বাচ্চা অনাথ হবে? মহাপাপের অতিরিক্ত কিছুই পাবে না। যুদ্ধে না জানি কে মরবে আর কে বাঁচবে? তৃতীয়বার যখন শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থতা করার জন্য যান, তখন নিজের নিজের পক্ষের সৈনিক ও রাজাদের তালিকা দেখিয়ে বলেন আমার পক্ষে এতো রাজা ঐ পক্ষে অতো রাজা। শ্রীকৃষ্ণ দেখেন, দুই পক্ষই অটল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তখন শ্রীকৃষ্ণ আরেকবার শেষ চাল দেওয়ার চিন্তা করেন, যাতে যুদ্ধ না হয়। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেন পান্ডব আমার আত্মীয় হওয়ার কারণে জেদ ছাড়ছে না যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের সঙ্গে আছে, বিজয় আমাদেরই হবে (কারণ শ্রীকৃষ্ণের বোন সুভদ্রার বিবাহ অর্জুনের সঙ্গে হয়েছিল)। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন,একদিকে আমি থাকবো অন্যদিকে আমার সর্বসেনা থাকবে। সেই সাথে প্রতিজ্ঞা করছি আমি হাতিয়ার ওঠাব না। এই কথা শোনার পরে পান্ডবদের পায়ের নিজের মাটি সরে যায়। এবং চিন্তা করে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। এই ভেবে পাঁচ ভাই শলাপরামর্শ করতে সভার বাইরে চলে যান। কিছু সময় পরে শ্রীকৃষ্ণকে বাইরে আসার জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চপান্ডব বলেন,"হে ভগবান! আমাদের পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি গ্রাম দিতে বলুন, আমরা ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ চাই না।"

আমাদের সম্মানও থেকে যাবে আর আপনি যে চান যুদ্ধ না হোক তাও পূর্ণ হবে।

পান্ডবদের এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ খুবই প্রসন্ন হন এবং ভাবেন এবার হয়তো অশুভ সময় শেষ হল। সভায় তখন শুধু কৌরব ও তাদের সমর্থকরা উপস্থিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দুর্যোধন! যুদ্ধটা মনে হয় এড়ানো গেলো। আমারও এই ইচ্ছা ছিল। আপনি পান্ডবদের পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দেন, তারা বলছে আমরা যুদ্ধ চাই না। দুর্যোধন বলে, সূচাগ্র জায়গাও বিনা যুদ্ধে পান্ডবদের দেব না। জমি যদি দিতে হয় তাহলে যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রের ময়দানে যেন চলে আসে। এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ খুব রেগে গিয়ে বলেন, দুর্যোধন তুই মানুষ নয় শয়তান! কোথায় অর্ধেক রাজ্য আর কোথায় পাঁচটি গ্রাম। আমার কথা শোন পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় দুর্যোধন রেগে যান এবং সভায় উপস্থিত যোদ্ধাদের আদেশ দেন, শ্রীকৃষ্ণ কে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করো। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে সৈনিকরা শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরে। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিরাট রূপ দেখান। সর্ব যোদ্ধারা তখন ভয়ে চেয়ারের নিচে লুকিয়ে পড়ে এবং তাঁর শরীরের তেজ প্রকাশে সকলের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণ ওখান থেকে চলে যান।

এসো বিচার করি :-

উপরোক্ত বিরাট রূপ দেখানোর প্রমাণ সংক্ষিপ্ত মহাভারতে, গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রত্যক্ষ আছে। কুরুক্ষেত্রের ময়দানে পবিত্র গীতার জ্ঞান শোনার সময় (অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২ এ পবিত্র গীতা বলা) প্রভু বলেছেন,"অর্জুন আমি সব থেকে বড় কাল।এখন সকলকে খাওয়ার জন্য প্রকট হয়েছি।" একটু চিন্তা করুন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথম থেকেই অর্জুনের সঙ্গে ছিল। যদি পবিত্র গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলতেন, তাহলে এখনই এসেছি- এই কথা বলতেন না। শ্রীকৃষ্ণ 'কাল' ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্র মানুষ, পশুরাও প্রসন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে আসার চেষ্টা করতো তাঁর প্রেম পাওয়ার চেষ্টা করত। তার দর্শন বিনা গোপিনীদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। এই জন্য 'কাল' অন্য কোন পৃথক শক্তি, যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মতো প্রবেশ করে পবিত্র শ্রীমদ্ভবদ্ গীতার জ্ঞান - চার বেদের সার বলেছেন। তার এক হাজার বাহু। শ্রীকৃষ্ণ তো বিষ্ণুর অবতার ছিলেন, তাঁর চারটি বাহু। গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক একুশে ২১ ও ৪৬ এ অর্জুন বলেছেন, "হে ভগবান! আপনি তো ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং সিদ্ধোদেরও খাচ্ছেন। যারা আপনার গুনোগান পবিত্র বেদের মন্ত্র দ্বারা উচ্চারণ করছে এবং জীবন রক্ষার জন্য মঙ্গল কামনা করছে, আপনি তাদেরও খাচ্ছেন। কিছু আপনার দাঁতে বিদ্ধ হয়ে ঝুলে আছে কিছু মুখের ভিতর চলে যাচ্ছে। হে সহস্রবাহ! অর্থাৎ হাজার হাতের ভগবান! আপনি চতুর ভূজে ফিরে আসুন। আমি আপনার বিরাট ভয়াবহ রূপ দেখে স্থির থাকতে পারছিনা।

অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এ পবিত্র গীতা বলা প্রভু কাল বলেছেন, হে অর্জুন! এ আমার আসল রূপ তুই ছাড়া অন্য কেউ আগে কখনো দেখেনি, আর না পরে কেউ দেখতে পাবে।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় যে, কৌরবদের সভায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিরাট রূপ দেখিয়েছিলেন। আবার এখানে যুদ্ধের ময়দানে বিরাট রূপ (শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত প্রবেশ করে কাল নিজের বিরাট রূপ দেখান) কাল দেখিয়েছিল। না হলে এটা বলতো না যে, তুই ছাড়া অন্য কেউ এই বিরাট রূপ আগে কখনো দেখেনি। কেননা শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিরাট রূপ কৌরবদের সভায় পূর্বেই দেখিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত: এটা প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র গীতার জ্ঞানদাতা কাল (ব্রহ্ম, জ্যোতি নিরঞ্জন) শ্রীকৃষ্ণ নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ আগে কখনো বলেন নি যে,'আমি কাল' এবং পরেও কখনো বলেন নি 'আমি কাল'। শ্রীকৃষ্ণ কাল হতে পারে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়ার জন্য দূর দুরান্তের স্ত্রী পুরুষরা সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকতো।

নোট :- বিরাট রূপ কি?

বিরাট রূপ :- দিনের বেলায় অথবা চাঁদনী রাত্রে (জোৎস্না রাত্রে) যখন শরীরের ছায়া শরীরের মতো লম্বা বা কিছুটা বড় হোক তখন ঐ ছায়ার বুকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে। চোখ দিয়ে জল বের হলেও। তারপর সামনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। নিজের বিরাট রূপ দেখতে পাবেন। যা সাদা রঙের আকাশকে ছুঁতে যাচ্ছে, এমন বড়। ঐরকম প্রত্যেক মানুষের বিরাট রূপ থাকে। কিন্তু যাদের ভক্তির শক্তি বেশি হয় তাদের প্রকাশের তেজ ততটাই বেশি হয়।

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব ভক্তির শক্তি থেকে সিদ্ধি যুক্ত ছিলেন। উনিও নিজের সিদ্ধিশক্তি থেকে নিজের বিরাট রূপ প্রকট করেছিলেন। যা কালের তেজোময় শরীর (বিরাট রূপ) থেকে কম তেজোময় ছিল। তৃতীয়তঃ এটা প্রমাণ হলো যে, পবিত্র গীতার জ্ঞান বলা প্রভু কাল হাজার বাহু যুক্ত অর্থাৎ হাজার হাত যুক্ত। এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর অবতার ছিলেন। যিনি চার ভূজা যুক্ত। শ্রী বিষ্ণু ষোল কলা যুক্ত এবং জ্যোতি নিরঞ্জন কাল, হাজার কলা যুক্ত। যেমন একটি বাল্ব ৬০ ওয়াট এর ও একটি বাল্ব ১০০ ওয়াট। আলো দুটি বাল্ব থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু দুটোর আলোর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। ঠিক এই প্রকার দুই প্রভুর শক্তি ও বিরাট রূপের তেজ ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

এই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে গীতা পাঠ করা মহাত্মাদের এই দাস (রামপাল দাস) প্রশ্ন করতেন, যুদ্ধের প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনবার শান্তির দূত হয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যুদ্ধ করা মহাপাপ। কিন্তু যখন অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং মানা করে বলছেন, "হে দেবকী নন্দন! আমি যুদ্ধ করতে চাই না। সামনে দাঁড়ানো আত্মীয়-স্বজন এবং নাতি, সৈনিকদের বিনাশ দেখে আমি অটল সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যদি তিন লোকের রাজ্যও প্রাপ্ত করি তাহলেও আমি যুদ্ধ করবো না। আমি চাই, আমাকে নিরস্ত্র দুর্যোধনেরা তির বিদ্ধ করে হত্যা করুক। যাতে আমার মৃত্যুতে যুদ্ধে হওয়া বিনাশ ও পাপ থেকে সবাই বেঁচে যায়। হে কৃষ্ণ! আমি যুদ্ধ না করে ভিক্ষার অন্ন খেয়ে জীবন নির্বাহ করা উচিত মনে করি। হে কৃষ্ণ! নিজের লোকেদের মেরে তো পাপই হবে। আমার বুদ্ধি কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি আমার গুরু। আমি আপনার শিষ্য। যা আমার পক্ষে হিতকর। সেই পরামর্শ দিন। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, আপনার কোন পরামর্শই আমাকে যুদ্ধের জন্য রাজি করাতে পারবে। অর্থাৎ আমি যুদ্ধ করবো না।" (প্রমাণ পবিত্র পুস্তক গীতা অধ্যায় ১ শ্লোক ৩১ থেকে ৩৯, ৪৬ এবং অধ্যায় ২ শ্লোক ৫ থেকে ৮)।

শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে কাল বারবার বলেছে, "হে অর্জুন! ভীরু কাপুরুষ হয়ো না। যুদ্ধ করো। যদি যুদ্ধে মারা যাও তাহলে স্বর্গ প্রাপ্তি হবে, আর যদি জয়ী হও তাহলে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে" ইত্যাদি ইত্যাদি বলে এমন ভয়ংকর বিনাশ করিয়ে দিলেন যা আজ পর্যন্ত কোন সন্ত মহন্ত ও সভ্য লোকেদের চরিত্রে খুঁজলেও পাওয়া যায় না। তখন ঐ অজ্ঞানী গুরুরা (নিম হাকিমরা) বলে আসছেন যে, অর্জুন ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিল। এতে ক্ষত্রিয়দের হানি (ক্ষতি)

এবং সুরবীরতা চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যেত। অর্জুনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধ করিয়েছিলেন। প্রথমে তো আমিও এই অজ্ঞানীদের কাহিনী (যুক্তিহীন গল্প) শুনে চুপ হয়ে যেতাম। কারণ তখন আমারও জ্ঞান ছিল না।

পুনঃ বিচার করি :- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ক্ষত্রিয় ছিলেন। কংসবধের পরে শ্রী অগ্রসেন মথুরার শাসনভার নিজের নাতি শ্রীকৃষ্ণ কে অর্পণ করেছিলেন। একদিন নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, নিকটবর্তী এক গুহায় মুচকন্দ নামের এক সিদ্ধি যুক্ত রাক্ষস শুয়ে আছে। সে ৬ মাস শুয়ে থাকে আর ৬ মাস জেগে থাকে। যখন জেগে থাকে তখন যুদ্ধ করতে থাকে,আর নিদ্রার সময় যদি কেউ নিদ্রা ভঙ্গ করে দেয় তাহলে মুচকন্দের চোখ দিয়ে অগ্নিবান ছোটে। এই সময় সম্মুখে কেউ থাকলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু অনিবার্য। আপনি সাবধান থাকবেন। এই বলে নারদ চলে যান।

কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণকে কম বয়সে সিংহাসনে বসতে দেখে কাল্যবন নামক এক রাজা ১৮ কোটি সৈন্য নিয়ে মথুরায় আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ দেখে শত্রু সেনা অনেক না জানি কত সৈনিকের মৃত্যু হবে। তাই তিনি কাল্যবনের বধ করতে মুচকন্দকে হাতিয়ার বানায়, এই চিন্তা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাল্যবনকে যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে (ক্ষত্রিয় ধর্ম ভুলে বিনাশ বাঁচাতে) পালিয়ে ঐ গুহায় প্রবেশ করেন, যেখানে মুচকন্দ শুয়েছিল। নিজের হলুদ চাদর (পীতাম্বর বস্ত্র) দিয়ে মুচকন্দকে ঢেকে দেয় এবং গুহার ভিতরে গিয়ে লুকায়। পিছনে পিছনে কাল্যবন ঐ গুহায় প্রবেশ করেন। মুচকন্দকে শ্রীকৃষ্ণ ভেবে তার পা ধরে ঘোরায়,আর বলে ভীতু কাপুরুষ পালালেও তোকে ছাড়বো না। ব্যথার কারণে মুচকন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং চোখ দিয়ে অগ্নিবাণ বের হতে থাকে। তখন সেই অগ্নিবানেই কাল্যবনের বধ হয়। কাল্যবনের সৈনিক ও মন্ত্রীরা রাজার মৃতদেহ নিয়ে চলে যায়। কারণ, ঐ সময়ে যুদ্ধে রাজার মৃত্যুকে সেনাদের পরাজয় মানা হতো। যাওয়ার সময় বলে যায় আমরা নতুন রাজা নিযুক্ত করে শীঘ্রই ফিরে আসবো। শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ছাড়বো না।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিয়ন্তা (চিফ ইঞ্জিনিয়ার) শ্রী বিশ্বকর্মা কে ডেকে বলেন এমন একটি স্থান খোঁজ, যার তিনদিকে সমুদ্র এবং একটি প্রবেশ দ্বার থাকবে। সেখানে খুব শীঘ্রই এক দ্বারকা (যার একটি রাস্তা) নগরী বানাও। আমরা শীঘ্রই এখান থেকে প্রস্থান করবো। এই মূর্খ ব্যক্তিরা এখানে শান্তিতে বাঁচতে দেবে না। শ্রীকৃষ্ণ এত পবিত্র আত্মা ছিলেন যে, নিজের ক্ষত্রিয় ধর্মকে বাজি রেখে যুদ্ধকে রোধ করেছিলেন। তাহলে ঐ শ্রীকৃষ্ণ কি নিজের প্রিয় সখা ও সমন্ধি অর্জুনকে যুদ্ধ করার জন্য খারাপ (ভুল) পরামর্শ দিতে পারে? এবং স্বয়ং যুদ্ধ না করার প্রতিজ্ঞা করে অন্যকে যুদ্ধ করতে প্রেরণা দিতে পারে? অর্থাৎ কখনোই না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে স্বয়ং শ্রী বিষ্ণুই অবতার হয়ে এসেছিলেন।

একসময় শ্রী ভৃগু ঋষি ভগবান শ্রী বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণ) বুকে লাথি মারে। শ্রী বিষ্ণু শ্রী ভৃগু ঋষির পা কে আদর করে বলেন, "হে ঋষিবর! আপনার কোমল পায়ে আঘাত লাগেনি তো? কারণ আমার বুক কঠিন পাথরের মত।" যদি শ্রীবিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) যুদ্ধ প্রিয় হতো তাহলে সুদর্শন চক্র দিয়ে ভৃগু ঋষিকে টুকরো টুকরো করে দিত।

আসলে, কাল ভগবান যে ২১ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আমি আমার (মানব সদৃশ্য) বাস্তবিক শরীর নিয়ে জীবের সামনে কখনোই আসবো না। তাই তিনি সূক্ষ্ম শরীর বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মত প্রবেশ করে, গীতার

পবিত্র জ্ঞান সঠিক তো বলেন, কিন্তু যুদ্ধ করানোর জন্য মিথ্যা বলে ভ্রমিত করতেও দ্বিধা বোধ করেননি। কাল ব্রহ্ম কে? এটি জানার জন্য পড়ুন "সৃষ্টি রচনা" জ্ঞানগঙ্গা পুস্তকের পৃষ্ঠা 19 - 66

মহাভারতের যুদ্ধ যত দিন চলছিল, ততদিন জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল-ব্রহ্ম, ক্ষর পুরুষ) শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতবশ প্রবেশ করে ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে দিয়েও মিথ্যা বলায় যে, বলো অশ্বত্থামা মারা গেছে। ভীমের নাতি তথা ঘটোৎকচের পুত্র বার্বরিকের গলা কাটায় এবং নিজেও হাতিয়ার হিসাবে রথের চাকা তোলে, এই সব কালেরই উপদ্রব ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ছিল না। মহাভারতের যুদ্ধ সমাপ্ত হতেই শ্রীকৃষ্ণের শরীর থেকে কাল বেরিয়ে যায়। শ্রী কৃষ্ণ, শ্রীযুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর)-এর রাজধানীর সিংহাসনে বসিয়ে দ্বারকা নগরী যেতে চান। তখন অর্জুন প্রার্থণা করে,হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাদের পূজ্য গুরুদেব, আমাদেরকে একটি সত্সঙ্গ শুনিয়ে যান। যাতে আপনার সদ্ ভাবনায় চলে আমরা নিজেদের আত্মার কল্যাণ করতে পারি।

অর্জুনের প্রার্থনা স্বীকার করে, শ্রীকৃষ্ণ তিথি, সময় ও স্থান নির্ধারিত করে দেন। নির্ধারিত তিথিতে অর্জুন শ্রী কৃষ্ণ কে বলেন, হে প্রভু! আজ ঐ পবিত্র গীতা জ্ঞান দ্বিতীয় বার শোনান। কারণ আমি বুদ্ধির দোষে ভুলে গিয়েছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে অর্জুন! তুই নিশ্চয়ই বড় শ্রদ্ধাহীন। তোর বুদ্ধি ভালো না। এমন পবিত্র জ্ঞান তুই কি করে ভুলে গেছিস? তৎপশ্চাত স্বয়ং বলছেন, এখন ঐ গীতা জ্ঞান আমিও যথাযথ বলতে পারব না। অর্থাৎ আমারও জ্ঞান নেই। ঐ সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে বলেছিলাম। বিচারের বিষয়, যদি ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যুদ্ধের সময় যোগযুক্ত হতে পারেন, তাহলে শান্তির সময় যোগ যুক্ত হওয়া কি কঠিন ছিল? তার অনেক পরে শ্রী ব্যাসজী ঐ পবিত্র গীতাজ্ঞান যথাযথ লিপিবদ্ধ করেন। ঐ সময়ও কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) শ্রী ব্যাসজীর শরীরে প্রবেশ করে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা লিপিবদ্ধ করান। যা আজ আমাদের হস্তগত।

প্রমাণের জন্য সংক্ষিপ্ত মহাভারত পৃষ্ঠা নং ৬৬৭ এবং পুরাণের ১৫৩১ পৃষ্ঠা দেখুন:-

ন শক্যং তন্ময়া ভূযস্তথা বক্তুমশেষতঃ॥ পরম্ হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।

(মহাভারত, আশ্রব ১৬১২-১৩)

ভগবান বলেন - ঐ যথাযথ জ্ঞান আমার পক্ষে দ্বিতীয়বার দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমি তখন যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মার তত্ত্ব বর্ণনা করেছিলাম।

সংক্ষিপ্ত মহাভারতের দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্টা নং ১৫৩১ থেকে সংগৃহীত:-

(সিদ্ধি প্রাপ্ত মহর্ষি বৈশম্পায়ন আর কাশ্যপ এর সংবাদ) পাণ্ডু নন্দন অর্জুন শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে খুব প্রসন্ন ছিলেন। অর্জুন মনোমুগ্ধকর সুসজ্জিত সভার দিকে তাকিয়ে ভগবান কে বলেন, হে দেবকি নন্দন! যখন যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলন তখন আপনার মহত্বের জ্ঞান ও ঈশ্বরীয় স্বরূপের দর্শন হয়েছিল। কিন্তু হে কেশব! আপনি স্নেহেরবশে ঐ সময় যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছিলেন, সেই জ্ঞান এই সময় বুদ্ধির দোষে আমি ভুলে গিয়েছি। ঐ বিষয়কে শোনার জন্য আমার মন আজ ব্যাকুল হয়ে উঠছে। এদিকে আপনি দ্বারকা যাওয়ার কথা বলছেন। তাই ঐ জ্ঞান কে পুনরায় যথাযথ বলার কৃপা করুণ।

বৈশম্পায়ন বলেন:- অর্জুনের এই কথা শুনে বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে এই রূপ উত্তর দেন।

শ্রী কৃষ্ণ বলেন, অর্জুন! ঐ সময় আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ে বলেছিলাম। নিজের স্বরূপভূত ধর্ম সনাতন তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলাম। আর (শুক্ল কৃষ্ণ গতির নিরূপন করে) দিবানিশি লোকেরও বর্ণনা করেছিলাম। কিন্তু তুমি অজ্ঞানতার কারণে ঐ উপদেশকে ভুলে গিয়েছো, এই কথা শুনে আমি খুবই দুঃখিত। এই জ্ঞানকে এখন যথাযথ স্মরন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হে পান্ডব! তুমি খুব শ্রদ্ধাহীন, তোমার বুদ্ধি ভালো না। আমি ঐ অমূল্য জ্ঞানকে দ্বিতীয় বার বলতে পারব না। কারণ, ঐ অমূল্য জ্ঞান আমারও মনে নেই। কারণ, ঐ সময় আমি যোগ যুক্ত হয়ে পরমাত্ম তত্ত্বকে বর্ণনা করেছিলাম। (সম্পূর্ন জানার জন্য পড়ুন সংক্ষিপ্ত মহাভারতের দ্বিতীয় ভাগ)।

বিচার করুন :- উপরোক্ত মহাভারতের লেখা ও শ্রী বিষ্ণু পুরাণের লেখা এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার লেখায় প্রমাণিত হয় যে, শ্রী কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান দেন নি। এই জ্ঞান কাল রূপী ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) অর্থাৎ মহাবিষ্ণু প্রেতের মত শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে বলেছিল।

অন্য প্রমাণ :- ১. শ্রী বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থ অংশ (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক ২৬ পৃষ্ঠা ২৩৩-এ বিষ্ণু (মহাবিষ্ণু অর্থাৎ কাল রূপী ব্রহ্ম) দেবতা ও রাক্ষসদের যুদ্ধের সময়, দেবতাদের প্রার্থণা স্বীকার করে বলেন, আমি রাজর্ষি শশাদ-এর পুত্র পুরঞ্জ্যের শরীরের অংশ মাত্র অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য প্রবেশ করে রাক্ষসদের নাশ করে দেব।

২. শ্রী বিষ্ণু পুরাণ (গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) চতুর্থ অংশ, অধ্যায় তৃতীয় শ্লোক ৬ পৃষ্ঠা ২৪২ -তে শ্রী মহাবিষ্ণু গন্ধর্ব ও নাগদের যুদ্ধের সময় নাগদের পক্ষ নিয়ে বলেন, “আমি (মহাবিষ্ণু অর্থাৎ কাল রূপী ব্রহ্ম) মানধাতার পুত্র-পুরুকুত্স-এর শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে সকল দুষ্ট গন্ধর্বকে নাশ করে দেব।”

অন্য প্রমাণ - কিছু দিন পর শ্রী যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কারণ ও সমাধানের জন্য জিজ্ঞাসা করলে বলেন, যুদ্ধে তোমরা যে পাপ করেছ ঐ নরসংহারের দোষ তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে। তার জন্য এক যজ্ঞ করো। শ্রী কৃষ্ণের মুখ কমলের বচন শুনে অর্জুনের মনে দুঃখ হয়। এবং মনে মনে চিন্তা করেন ভগবান শ্রী কৃষ্ণ পবিত্র গীতা জ্ঞান দেওয়ার সময় বলেছেন, অর্জুন তোমার কোনো পাপ লাগবে না, তুমি যুদ্ধ কর (পবিত্র গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭-৩৮)। যদি যুদ্ধে মারা যাও তাহলে স্বর্গে যাবে আর যুদ্ধে জিতলে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ ও আনন্দ করবে। যে সমাধান দুঃখ নিবারনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হবে। যদি আমি শ্রী কৃষ্ণের সাথে বাদ বিবাদ (তর্ক) করি যে, আপনি গীতা জ্ঞান দেওয়ার সময় তো বলেছিলেন, পাপ লাগবে না, এখন তাঁর বিপরীত কেন বলছেন। তাহলে আমার বড় ভাই চিন্তা করবে টাকা ব্যয়ের জন্য অর্জুনের কষ্ট হচ্ছে। আমার কষ্ট নিবারনে প্রসন্ন না। এই জন্য চুপ চাপ থাকা শ্রেয় মনে করে স্বীকৃতি দেন, আপনি যেমন বলবেন তেমনই হবে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ যজ্ঞের তিথি নির্ধারিত করে দেন। ঐ যজ্ঞও কবীর পরমেশ্বর দ্বারা শ্রী সুদর্শন সুপচ- এর রূপে ভোজন খেয়ে সফল হয়েছিল।

কিছুদিন পরে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে সর্ব যাদব কুলের বিনাশ হয়ে যায়। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পায়ের তলায় এক শিকারী (যিনি ত্রেতাযুগে সুগ্রীবের ভাই বালীর আত্মা ছিল) বিষাক্ত তির মারে। তখন পাঁচ পাণ্ডব ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর, শ্রীকৃষ্ণ

বলেন, তোমরা আমার শিষ্য আর আমি তোমাদের ধার্মিক গুরু। তাই আমার অন্তিম আজ্ঞা শোন। প্রথমত অর্জুন দ্বারকার সমস্ত স্ত্রীলোকদের ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লি) নিয়ে যাবে। কারণ ওখানে কোন নর (পুরুষ) বেঁচে নেই। দ্বিতীয়ত আপনরা সমস্ত পাণ্ডব রাজ্য ত্যাগ করে হিমালয়ে সাধনা করে শরীরকে গলিয়ে দেবে। কারণ তোমারা মহাভারতের যুদ্ধে যে হত্যা করেছো তার ভয়ঙ্কর পাপ তোমাদের মাথায় আছে। ঐ সময় অর্জুন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলেন, হে প্রভু! আপনি এখন এমন স্থিতিতে আছেন যে,আমার এই কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু প্রভু যদি আজ আমার শঙ্কার সমাধান না হয়, তাহলে আমি শান্তিতে মরতেও পারবো না। সারা জীবন কাঁদতে থাকবো। শ্রী কৃষ্ণ বলেন, অর্জুন যা জিজ্ঞাসা করার করে নাও, এখন আমার অন্তিম সময়। শ্রী অর্জুন কেঁদে বলেন, প্রভু কিছু মনে করবেন না, যখন আপনি পবিত্র গীতা জ্ঞান বলেছিলেন, তখন আমি যুদ্ধ করতে মানা করেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, অর্জুন তোর দুই হাতেই লাড্ডু। যদি যুদ্ধে মারা যাস তাহলে স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। আর যুদ্ধে জয়ী হলে পৃথিবী রাজ্য ভোগ করবে। তোমার কোন পাপ লাগবে না। আপনার আজ্ঞায় যুদ্ধ করি। (প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭, ৩৮) হে ভগবান! আমাদের তো কোন হাতেই লাড্ডু নেই। না যুদ্ধে মরে স্বর্গপ্রাপ্তি হলো, না পৃথিবীর রাজ্যের আনন্দ ভোগ করতে পারলাম? এখন আপনি রাজ্য ত্যাগ করার আদেশ দিচ্ছেন? এমন ছল কপট যুক্ত ব্যবহার করার আপনার কি স্বার্থ ছিল? অর্জুনের মুখে এই কথা শুনে যুদ্ধিষ্ঠির বললেন, অর্জুন! এমন স্থিতিতে যখন ভগবান অন্তিম শ্বাস গুনছে, তখন শিষ্টাচার রহিত ব্যবহার শোভা দেয় না। শ্রী কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন এখন আমার অন্তিম স্থিতি। তুই আমার অতি প্রিয়। এখন আসল কথা (সত্য কথা) বলছি। অন্য কোন খলনায়কের মত শক্তি আছে যে, আমাকে যন্ত্রের মত নাচাচ্ছিল। আমি কিছু জানি না। আমি গীতায় কি বলেছিলাম। কিন্তু এখন যা বলছি তা তোমার হিতের বা কল্যাণের জন্য বলছি। শ্রীকৃষ্ণ অশ্রু যুক্ত নয়ণে এই কথা বলে প্রাণ ত্যাগ করেন। উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়, পবিত্র গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেন নি। এটা কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) বলেছিল। যে (২১) একুশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী।

শ্রীকৃষ্ণ সহিত সর্ব যাদবদের অন্তিম সংস্কার করে অর্জুনকে ছেড়ে চার পাণ্ডব ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লি) চলে গেলেন। পরে অর্জুন দ্বারকার স্ত্রীদের নিয়ে আসছিল। রাস্তায় জংলীরা সমস্ত গোপিনীদের লুঠ করে এবং কিছু গোপিনী ধরে নিয়ে যায়, আর অর্জুনকে ধরে পেটায়। অর্জুনের হাতে সেই ধনুষ গণ্ডীব ছিল যা দিয়ে মহাভারতের যুদ্ধে অগনিত হত্যা করেছিল। তাও তখন আর চলল না। তখন অর্জুন বলেন, "এই শ্রী কৃষ্ণ আসলে মিথ্যাবাদী এবং কপটী ছিল। যখন যুদ্ধে পাপ করানোর ছিল তখন শক্তি প্রদান করেছিল, এক তিরে শত শত যোদ্ধা মেরেছি। আর আজ ঐ শক্তি ফিরিয়ে নিয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছি।" তাই পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর সাহেব বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাবাদী বা কপটী ছিলেন না। এ সর্ব অত্যাচার (জ্যোতি নিরাঞ্জন) কাল করেছিল। যতদিন এই আত্মা কবীর পরমেশ্বরের শরণে পূর্ণ সন্তের মাধ্যমে না আসবে ততদিন কাল এইভাবে আত্মাকে দুঃখী করতে থাকবে। পূর্ণ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান থেকেই হয়। এইজন্য কাল কে? তা জানার জন্য পড়ুন এই পুস্তকে 19 - 66 পৃষ্ঠায়।

বিশেষ বিচার :- উপরোক্ত প্রমাণে সিদ্ধ হল শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেননি। শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত প্রবেশ করে কাল (ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন) বলেছিল।

"শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার সার"

পরমেশ্বরের খোঁজ আত্মারা যুগ যুগ ধরে করে আসছে। যেমন জলের পিপাসায় জলের খোঁজ করা হয়। জীব আত্মা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকেই মহাকষ্ট ভোগ করে আসছে। যে সুখ পূর্ণ ব্রহ্মের (সতপুরুষ) সতলোকে (ঋতধামে) ছিল, সেই সুখ এই কালের লোকে নেই। যদিও কেউ কোটিপতি হয় বা পৃথিবীপতি (সর্ব পৃথিবীর রাজা), সুরপতি (স্বর্গের রাজা ইন্দ্র) বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতো ত্রিলোক পতি হলেও শান্তি নেই। কারণ জন্ম ও মৃত্যু এবং কর্ম ভোগ অবশ্যই প্রাপ্তি হবে। (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫) এইজন্য পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞানদাতা (কাল) প্রভু অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ তথা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছেন,হে অর্জুন! সর্বভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা। তাঁর কৃপায় তুই পরম শান্তি ও সত্যলোক (শাশ্বত স্থান) প্রাপ্ত করবি। ঐ পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিমার্গ আমি (গীতা জ্ঞানদাতা) জানি না। ঐ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে দণ্ডবত প্রণাম করে বিনম্র ভাবে প্রশ্ন করো। তখন ঐ তত্ত্বদ্রষ্টা সন্ত, পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান বলবে। তখন সেই ভক্তি মার্গে সব কিছু ত্যাগ করে লেগে যা। (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪)। তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ -এ বলার সময় বলেছে, এই সংসার উল্টো ঝুলে থাকা বৃক্ষের মত জানো। যার উপরের দিকে মূল আর নীচের দিকে শাখা ও পাতা। যে এই সংসার রূপী বৃক্ষের বিষয়ে ভালোভাবে জানে তিনি তত্ত্বদর্শী সন্ত। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোকে ২ থেকে ৪-এ বলেছে- ঐ সংসার রূপী বৃক্ষের তিন গুণ (রজোগুণ- ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) রূপী শাখা (ডাল) আছে। যা (স্বর্গলোক, পাতাললোক ও পৃথিবীলোক) তিন লোকের উপর ও নীচে ছড়িয়ে আছে। ঐ সংসাররূপী উল্টানো বৃক্ষের বিষয়ে তথা সৃষ্টি রচনার বিষয়ে আমি গীতা জ্ঞানে বলতে পারব না। এখানে বিচার কালে (গীতা জ্ঞান) যে জ্ঞান তোমাকে বলছি তা পূর্ণ জ্ঞান নয়। তার জন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪-এ ইঙ্গিত করেছে, পূর্ণ জ্ঞানের জন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে যা, তিনিই বলবেন। পূর্ণ জ্ঞান আমি জানি না। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে তত্ত্বদর্শী সন্তের প্রাপ্তির পর ঐ পরমপদ পরমেশ্বরকে (যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছে) খোঁজ করা উচিত। যেখানে গেলে সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না, অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে পূর্ণ পরমাত্মা থেকে উল্টো ঝোলানো সংসার রূপী বৃক্ষের উৎপত্তি ও বিস্তার হয়েছে। যে পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছেন। আমিও (গীতা জ্ঞান দাতা কাল ব্রহ্ম) ঐ আদি পুরুষ পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মার শরণে আছি। তাঁর সাধনা করলে অনাদি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

তত্ত্বদর্শী সন্তই তিনি, যিনি উপরের মূল এবং তিন গুণরূপী শাখা, কাণ্ড ও মোটা ডালের পূর্ণ জ্ঞান বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতে পারেন। (কৃপা করে দেখুন উল্টো ঝোলানো সংসার রূপী বৃক্ষের চিত্র)

নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তত্ত্বদর্শী সন্তের ভূমিকায় লীলা করেন (কবির্গীর্ভিঃ) কবীর বাণী দ্বারা বলেন। (প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ থেকে ২০ তথা ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১ থেকে ৫, অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ অনুবাদ ১ মন্ত্র ১ থেকে ৭ এ)

পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব
পরম অক্ষর ব্রহ্ম
মূল শিকড়
গীতা অধ্যায় নং ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
কান্ড
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্মা)
কবীর-অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রুপ সংসার ॥
ডাল (ডার)
শিব (তমো গুন)
ব্রহ্মা (রজগুন)
বিষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
শাখা
পাতা রূপী সংসার
এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন – উপরে মূল (শিকড়)
নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র
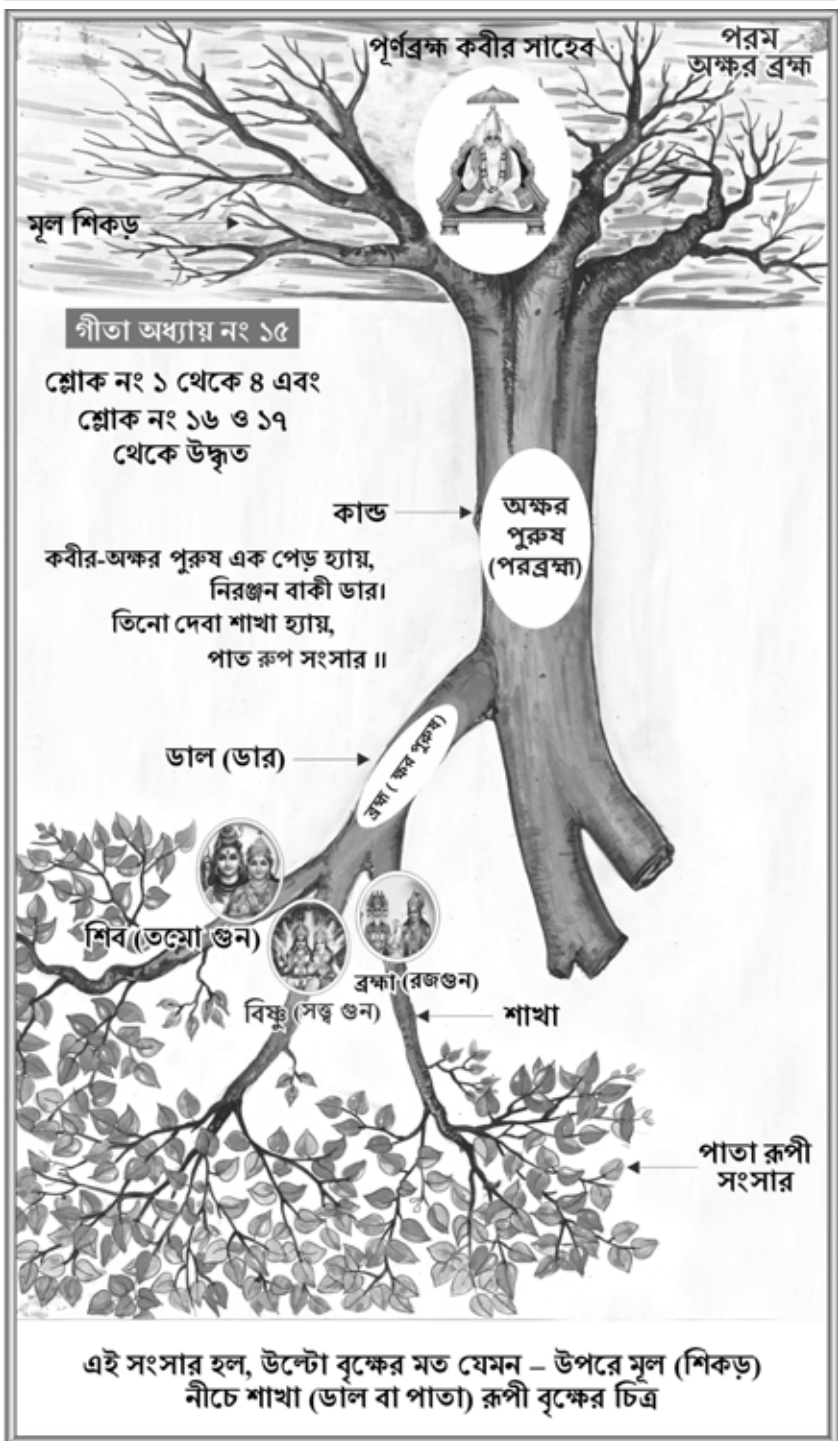
কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হৈ, জ্যোতি নিরঞ্জন বাকী ডার।
তীনোঁ দেবা শাখা হৈঁ, পাত রূপ সংসার॥

পবিত্র গীতায় তিন প্রভুর (১. ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম ২. অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ৩. পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম) বিষয়ে বর্ণনা আছে। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ অধ্যায় ৯ শ্লোক ১-এর উত্তর শ্লোক ৩-এ আছে। তিনি পরম অক্ষর ব্রহ্ম। তিন প্রভুর আর এক প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৫- এ গীতা জ্ঞান দাতা কাল নিজের বিষয় বলেছেন যে, আমি অব্যক্ত থাকি। ইনি প্রথম অব্যক্ত প্রভু। আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৮ তে বলেছে, এই সংসার দিনের সময় অব্যক্ত (পরব্রহ্ম) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আবার রাত্রির সময় ওনাতেই লীন হয়ে যায়, ইনি-দ্বিতীয় অব্যক্ত হলেন। অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ তে বলেছে,ঐ অব্যক্ত থেকেও যিনি অন্য অব্যক্ত (পূর্ণ ব্রহ্ম) আছেন, তিনি পরম দিব্য পুরুষ। তিনি সর্ব প্রাণী নষ্ট হওয়ার পরেও নষ্ট হন না। ইনি হচ্ছেন তৃতীয় অব্যক্ত। এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ তেও আছে। নাশ রহিত ঐ পরমাত্মাকে জানো, যাকে কেউ নাশ করতে সক্ষম নয়। নিজের বিষয় গীতা জ্ঞানদাতা (ব্রহ্ম) প্রভু অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৫ এবং অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ তে বলেছেন যে, আমিও জন্ম-মৃত্যুতে আছি, অর্থাৎ আমিও নাশবান।

উপরোক্ত সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়) তো পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব। এই কবির্দেব কেই তৃতীয় অব্যক্ত প্রভু বলা হয়েছে। বৃক্ষের মূল থেকেই সর্ব বৃক্ষের আহার প্রাপ্ত হয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলেছে যে, বাস্তবে পরমাত্মা তো ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম, অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম থেকে অন্য । যিনি-তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ পোষণ করেন। তিনিই বাস্তবে অবিনাশী।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ তথা ১৬ থেকে ১৭ এর সারাংশ রূপ চিত্র।

১. ক্ষর-এর অর্থ নাশবান। কারণ ব্রহ্ম অর্থাৎ গীতাজ্ঞান দাতা স্বয়ং বলছেন, হে অর্জুন তুই এবং আমি জন্ম-মৃত্যুতে আছি। (প্রমাণ গীতা অধ্যায়-২, শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫-এ)

২. অক্ষর অর্থ অবিনাশী:- এখানে পরব্রহ্মকেও স্থায়ী অবিনাশী বলা হয়েছে। কিন্তু এই পুরুষও বাস্তবে অবিনাশী নয়। যেমন একটি চিনামাটির কাপ, হাত থেকে নীচে পড়লেই ভেঙে যাবে। এমন স্থিতি ব্রহ্ম (কাল, ক্ষর পুরুষ) জানো। দ্বিতীয় কাপ স্টীলের হয়, এটি মাটির কাপ থেকে বেশি স্থায়ী হলেও একদিন জং লেগে নষ্ট হয়ে যাবে। যদিও বেশি দিন চলে। তাই এটিও চিরস্থায়ী বা অবিনাশী নয়। তৃতীয় কাপ সোনার। স্বর্ণ ধাতু আসলে অবিনাশী,যা কখনো নষ্ট হয় না।

যেমন পরব্রহ্মকে (অক্ষর ব্রহ্ম) অবিনাশীও বলা হয়েছে। বাস্তবে অবিনাশী তো এই দুই প্রভু থেকে অন্য। অক্ষর পুরুষকে অবিনাশীও বলা যেতে পারে না।কারণ সাত রজোগুণ ব্রহ্মার মৃত্যুর পরে এক সত্ত্বগুণ বিষ্ণুর মৃত্যু হয়। সাত সত্ত্বগুণ বিষ্ণুর মৃত্যুর পরে এক তমোগুণ শিবের মৃত্যু হয়। এই রূপ ৭০ হাজার বার তমোগুণ শিবের মৃত্যুর পরে এক ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) - এর মৃত্যু হয়। তখন পরব্রহ্ম এর (অক্ষর পুরুষ) এক যুগ হয়। এই রকম এক হাজার যুগে পরব্রহ্মের এক দিন এবং এতটাই এক রাত্রি হয়। ত্রিশ দিন-রাত্রির এক মাস, ১২ মাসে এক বৎসর, এই রূপ ১০০ বৎসর পরব্রহ্মের আয়ু হয়। তখন এই পরব্রহ্ম এবং সর্ব

ব্রহ্মান্ড যা সতলোকের নিচে অবস্থিত সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। কিছু সময় পরে নীচের সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের (ব্রহ্ম লোক এবং পরব্রহ্ম লোক) রচনা পূর্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ পুনরায় করেন। এইপ্রকার এই তত্ত্বজ্ঞান বুঝতে হবে। কিন্তু পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম (সতপুরুষ) এবং তাঁর সত্যলোক (ঋতধাম) সহিত উপরের অলখলোক, অগম লোক, ও অনামী লোক কখনো নষ্ট হয় না।

এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলেছে যে, বাস্তবে উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম তো ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) ও পরব্রহ্ম (অক্ষর পরুষ) থেকে অন্য পূর্ণব্রহ্ম (পরম অক্ষর পুরুষ)। উনিই বাস্তবে অবিনাশী। সকলের ধারন পোষণ করা সংসার রূপী বৃক্ষের মূল রূপী পূর্ণ পরমাত্মা। বৃক্ষের যে ভাগ মাটির উপর থাকে তাকে কাণ্ড (তনা) বলা হয়। এই অংশকে অক্ষর পুরুষ জানো। কাণ্ডের আহারও (খাদ্য) মূল থেকে প্রাপ্ত হয়। পরে কান্ড থেকে আরও অনেক ডাল বের হয়, এর মধ্যে একটি ডালকে ক্ষর পরুষ (ব্রহ্ম) মনে করো। এর খাদ্যও মূল থেকে প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ পূর্ণ পরমেশ্বর (পরম অক্ষর পুরুষ) থেকে প্রাপ্ত হয়। এই ডাল থেকে তিন শাখা অর্থাৎ তিন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ- শিব) জানো। এদেরও আহার মূল থেকে প্রাপ্তি হয়। এই তিন শাখা থেকে পাতা রূপে অন্য প্রাণীরা আশ্রিত। এনাদের আহারও আসলে মূল (পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম) থেকেই প্রাপ্ত হয়। এইজন্য সবার পূজ্য পূর্ণ পরমাত্মা। এটা সত্য যে পাতা পর্যন্ত আহার (খাদ্য) পৌঁছানোর জন্য কাণ্ড ডাল ও শাখার সংযোগ আছে। তাই সবাই আদরনীয় (সম্মানীয়) কিন্তু পূজনীয় একমাত্র মূল (জড়)। সাধনা এবং পূজার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী সকলকে সম্মান করে, যেমন ভাসুরকে বড় ভাইয়ের মত, দেবরকে ছোট ভাইয়ের মত,কিন্ত পূজা নিজের পতির (স্বামী) করে। অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রীর নিজের স্বামীর প্রতি যে ভাব হয়, তা অন্য পুরুষের প্রতি হতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ :- এক সময় হরিয়াণা প্রান্তে বন্যা এসেছিল। তখন প্রায় ছয়শো কোটি টাকার লোকসান হয়। তার পূর্তি (পূর্ণ) হরিয়াণা সরকার করতে পারত না । কারণ হরিয়াণা সরকারের বাৎসরিক বাজেট নয়শো কোটি টাকা। দেশের প্রধানমন্ত্রী এই ক্ষতি পূরণ করেন। ঐ ছয়শত কোটি টাকার বিতরণ হরিয়াণা সরকারের অধিকারী ও কর্মচারীরা করে। ত্রাণ প্রাপ্ত কর্তারা তা জানে না। তারা বিতরণ কর্তাকে ত্রাণকর্তা মনে করে। ভবিষ্যতেও এদের থেকে ত্রাণ (সাহায্য) পাওয়ার আশাও করে। অর্থাৎ তাদের কে পূজা (ঘুষ ইত্যাদি দেওয়া) করতে থাকে। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানে এদের (কর্মচারীদের) যোগদান কতটা। তাঁরা সম্মান তো করে কিন্তু পূজা (ঘুষ ইত্যাদি দেওয়া) করে না। বা অন্য কাজের সাহায্যের আশাও করে না।

বন্যায় সাহায্য রাশি বিতরণের পর ঐ এলাকায় রাজ্যের মন্ত্রী এসে বলেন যে, আমি আপনাদের এলাকায় দশ লাখ টাকা দিয়েছি। ঐ গ্রামের সূচী থেকে নাম পড়ে শোনায়। ১. রাম অবতারকে দশ হাজার টাকা/- ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঐ গ্রামে আসেন। উনিও ঐ সূচীপত্র পড়ে শোনান এবং বলেন, আমি আপনাদের গ্রামে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। রাম অবতারকে দশ হাজার টাকা/- ইত্যাদি। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী ওখানে এসে তিনিও বলেন, আমি তোমাদের গ্রামে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছি সূচী পড়ে শোনায় রাম অবতারকে ১০ দশ হাজার

টাকা/-ইত্যাদি। কিন্তু রামঅবতার বলে, এরা সব মিথ্যা কথা বলছে। আমাকে তো পাটোয়ারী (বিডিও সাহেব) টাকা দিয়েছে। রাম অবতার অজ্ঞানতার কারণে পাটোয়ারীর পূজা করে নিজের সর্ব কার্য সিদ্ধ করতে চায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানে, প্রধান মন্ত্রীজী যদি ত্রাণ রাশি না দেয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী বা পাটোয়োরী কিছুই দিতে পারবে না। যদি মুখ্যমন্ত্রী নিজের ত্রাণ কোষ (সাহায্য তহবিল) থেকে বিতরণ করতেন, তাহলে খুব জোর ১০০ টাকা করে বন্যা পীড়িত দের দিতে পারতেন, যা নাম মাত্র হত। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানে কার কতটা ক্ষমতা। সেই ভাবে তার উপর ভরসা করে। এরা সবাই সম্মানীয়। কিন্তু পূজনীয় কে? ভেবেচিন্তে নির্ণয় করেন। ঠিক এমনই গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৪৬-এ বলেছে, হে অর্জুন! খুব বড় জলাশয় (যেখানে কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও জল সমাপ্ত হয় না) প্রাপ্তির পরে ছোট জলাশয়ের (যার জল ১ বৎসর বর্ষা না হলেই সমাপ্ত হয়ে যায়) প্রতি যেমন ভাব থাকে, তেমনই পূর্ণ পরমাত্মার থেকে পাওয়া লাভের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে তোর ভাব (আস্থা) অন্য প্রভুর প্রতি তেমনই হবে। ছোট জলাশয় খারাপ না। কিন্তু তার ক্ষমতা কোনমতে কাজ চালানোর মত, পর্যাপ্ত নয়।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫তে বলেছে, তিন গুণ থেকে যা কিছু হচ্ছে (যেমন, রজোগুণ বহ্মা থেকে জীবের উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু থেকে স্থিতি, এবং তমোগুণ শিব থেকে সংহার)। তার মুখ্য কারণ আমি (কাল ব্রহ্ম)। যে সাধক তিন গুণের পূজা করে (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) সে রাক্ষস স্বভাব ধারণ করা মানুষের মধ্যে নীচ দুষ্কর্ম করা মূর্খ আমার ভক্তিও করে না। পরে নিজের ভক্তিকেও অতি অনুত্তম খারাপ বলেছেন। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ তথা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলেছে, এই পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করলেই পূর্ণ লাভ বা পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে শাস্ত্র বিধি অনুসার ভক্তি আছে, তা না করে অন্য প্রভুদের ইষ্ট রূপে সাধনা শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধ অর্থাৎ ব্যর্থ। (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ)।

যেমন আমের গাছ নার্সারি থেকে এনে তার মূলকে মাটিতে গর্ত করে লাগান। পরে মূলে (গাছের গোড়ায়) জল দিতে (পূজা) থাকলে গাছ বড় হবে এবং ভালো আম ফলবে। যদি কেউ মূলকে উপরে রেখে শাখা মাটিতে পুঁতে দেয় তাহলে গাছ শুকিয়ে যাবে। (কৃপা করে দেখুন, উল্টো এবং সোজা করে লাগানো গাছের চিত্র) এই পুস্তকে:-181-182 পৃষ্ঠায়।

ভাবার্থ- সাধক পূর্ণ পরমাত্মার (মূল) সাধনা (পূজা) ইষ্টরূপে করলে তর ফল বা লাভ তিন গুণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবই প্রদান করবেন। কারণ এই সব ভগবানরা কর্ম ফল অনুসারে ফল দেন।

যদি আপনি কোন কোম্পানীতে চাকরি করতে চান, তাহলে পূজা ঐ কোম্পানীর মালিকেরই করতে হবে। প্রার্থনা পত্র দ্বারা আবেদন করে চাকরি প্রাপ্ত করলেও চাকরি কিন্তু মালিকেরই করতে হয়। যেমন কোন চাকরকে কোন কাজের জন্য বললে সে নিজের সেবা কালে (চাকরির সময়) ঐ কাজ করে দেয়। ঐ পূজা (নকরী বা চাকরি) মালিকেরই হয়। চাকরির (পূজার) পারিশ্রমিক ঐ মালিকের অন্য চাকর (কর্মচারী- অধীকারী) দেয়। যেমন অফিসার উপস্থিতির আধারে (কার্য করা ফল) পারিশ্রমিক (মজুরী) বিল তৈরী করে ক্যাশিয়ারের কাছে পাঠায়।

গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
িষ্ণু(সত্ত্ব গুন)
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রূপ সংসার ॥
ডাল (ডার)
ডাল = [কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)]
কান্ড (পেড়)
কান্ড = [অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)]
(মূল শিকড়)
কবীর সাহেব
[পরম অক্ষর ব্রহ্ম = পূর্ণ ব্রহ্ম]
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা
অর্থাৎ সোজা করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক
পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রূপ সংসার।।
(মূল শিকড়)
[পরম অক্ষর ব্রহ্ম
= কবীর সাহেব]
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)
কান্ড (পেড়)
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)
বিষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
শাস্ত্র বিরুদ্ধ
সাধনা
অর্থাৎ উল্টো করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

ওখান থেকে ঐ চাকর (সেবক) সেবার (কাজের) ফল পায়। সিফট অফিসার ও ক্যাশিয়ার শুধুমাত্র কাজ করার ফল দেন। তাতে কোন পরিবর্তন করতে পারে না। সে এক টাকা কম বা বেশী দিতে পারে না। যদি ঐ কোম্পানীর মালিকের চাকর (পূজার) বিশ্বস্ত (ইমানদারী বা নেক) ভাবে চাকরি করে তাহলে মালিকই তার বেতন রাশি বৃদ্ধি করে দেয়, এবং পৃথক ভাবে ইনাম (বকশিস) রূপে অধিক টাকা দেয়। এবং যদি কেউ মালিকের চাকরি ছেড়ে অধিকারীর চাকরি করে তাহলে মালিকের থেকে পাওয়া লাভ বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যক্তি নির্ধন হয়ে যায়। কারণ অধিকারীরা তাকে মালিকের সমতুল্য লাভ দিতে পারে না। এই জন্য মালিক কে ত্যাগ করে যে অধিকারীদের সেবা (কাজ বা উপসনা) করে, সে ব্যক্তি মহাদুঃখী হয়ে যায়। কৃপাকরে তত্ত্বজ্ঞানের আধারে পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান বোঝার চেষ্টা করুন। পূর্ণ ব্রহ্ম সর্বকূলের মালিকের পূজা ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের পূজা করলে, সাধক পূর্ণলাভ পায় না অর্থাৎ সাধকের মহাকষ্ট হয়।

এইজন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোকে ১২ থেকে ১৫ তথা ২০ থেকে ২৩ পর্যন্ত,তিন গুণ অর্থাৎ তিন দেবতাদের (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) পূজা করা রাক্ষস স্বভাবের মানুষের মধ্যে নীচ, দুষ্কর্ম করা মূর্খরা আমারও (ক্ষর পুরুষ কাল) ভক্তি করে না। ভাবার্থ এই যে, তিন দেবতা বা অন্য দেবতাদের যারা পুজা করে (ক্যাশিয়ার বা আধিকারীর চাকরি) তারা মূর্খ, রাক্ষস স্বভাবের ব্যক্তি বলা হয়েছে। যে ব্যক্তিদের আয় (উর্পাজন) কম হয় তারা হেরাফেরি অবশ্যই করে। কখনো চুরি, নকল জিনিস মেশানো ইত্যাদি ছল কপট করে সমাজের চোখে ছোট (হেয়) হয়ে যায়। এই প্রকার তিন দেবতা (শ্রীব্রহ্মা-শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব) বা অন্য দেবতাদের পূজায় পূর্ণলাভ প্রাপ্ত হয় না। তাই সাধক বিভিন্ন বিকার যেমন ছল, কপট, মিথ্যা, ইত্যাদি করে। পরে কর্ম দণ্ড ভুগতে হয়। এইজন্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (সিফট অফিসার) বলছেন যে, এই মূর্খ সাধক আমার পূজাও (চাকরি) করে না। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব থেকে অধিক পারিশ্রমিক (মজুরী) দিতে পারি। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে বলেছেন, আমার পূজাও পূর্ণ লাভদায়ক নয়। এইজন্য নিজের পূজাকে ও গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষ) প্রভু অতি ঘাটিয়া অর্থাৎ খুব নিম্নস্তরের (অনুত্তম) বলেছেন। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২তে বলেছেন, ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা, তাঁর কৃপায় তুই পরম শান্তি তথা সতলোক (শাশ্বত স্থান) প্রাপ্ত করবি। ওখানে যাওয়ার পরে সাধকের পুনঃ জন্ম-মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ অনাদি মোক্ষ (পূর্ণমোক্ষ) প্রাপ্তি হয় এবং গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু (ক্ষর পুরুষ / ব্রহ্ম) বলছেন, আমিও ঐ আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫, ১৮ ও ২০ থেকে ২৩ কে বোঝার জন্য কৃপাকরে ধ্যান পূর্বক নিম্নের বিবরণ পড়ুন।

"তিনগুণ কি? প্রমাণ সহিত"

"তিনগুণ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণুও তমোগুণ শিব। এই তিন জন ব্রহ্ম (কাল) ও প্রকৃতি (দুর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। এবং এই তিন জনই নাশবান।"

প্রমাণ:- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরাণ যার অনুবাদক সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব তিন দেবতায় গুণ আছে, কিন্তু শিবকে (ব্রহ্ম- কাল) গুণাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ:- গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, শ্রীমদ্ দেবী ভাগবত পুরাণ, যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমনলাল গোস্বামী। তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩:- ভগবান বিষ্ণু শ্রী দুর্গার স্তুতি করে বলছেন, “আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা ও শংকর তোমার কৃপায় বিদ্যামান। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) তথা তিরোভাব (মৃত্যু) হয়। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য, জগৎ জননী, প্রকৃতি আর সনাতনী দেবী।” ভগবান শঙ্কর বলেন, "যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমার থেকে উৎপন্ন হয় তাহলে, তারপরে উৎপন্ন হওয়া আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান নই ? অর্থাৎ আমাকেও তুমি সৃষ্টি করেছ। এই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি সংহারে তোমার গুণ সর্বদা বিরাজমান আছে। এই তিন গুণে উৎপন্ন আমরা ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শঙ্কর নিয়মনুসার কার্যে তৎপর থাকি।”

উপরোক্ত এই বিবরণ শুধু হিন্দিতে অনুবাদিত শ্রী দেবী মহাপুরাণে আছে। এতে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। তাই এই প্রমাণ দেখার জন্য শ্রীমদদেবী ভাগবত্ মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণ দাস প্রকাশন মুম্বাই, এতে সংস্কৃত সহিত হিন্দিতে অনুবাদ আছে।

তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক ৪২:-

ব্রহ্মা-- অহম্ মহেশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাত্সর্বে বয়ং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ, কে অন্যে সুরা: শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরানা॥ ৪২॥

বাংলা অনুবাদ :- (বিষ্ণু জী বলেছেন), হে মাতা! ব্রহ্মা, আমি এবং শিব তোমারই প্রভাবে জন্মবান হয়েছি, আমরা নিত্য নই অর্থাৎ আমরা অবিনাশী নই। তাহলে ইন্দ্র ও অন্যান্য যে দেবতারা কি প্রকারে নিত্য হতে পারে? তুমিই অবিনাশী আমাদের জননী অর্থাৎ উৎপন্নকারী মাতা, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।(৪২)

পৃষ্ঠা ১১-১২ গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ৮॥ **যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাংৎবিকে কথমহং বিহিতঃ চ তমোগুণঃ কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্বগুণোং হরিঃ॥ ৮॥**

অনুবাদ:- ভগবান শঙ্কর বললেন হে মাতা! যদি আমাদের উপর আপনি দয়াবান হন তাহলে আমাকে তমোগুণ কেন বানিয়েছেন, পদ্ম ফুল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ কেন বানিয়েছেন? অর্থাৎ জীবের জন্ম-মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মতে কেন লাগিয়েছেন?

শ্লোক নং ১২- **রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিদম্ বয়ম শিবে॥ ১২॥**

অনুবাদ - নিজের পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা ভোগ বিলাস করতে থাকেন। আপনার গতি কেউ জানে না।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা ১৪ অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ৪৩:- **একমেবা দ্বিতীয়ং যৎ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ। সা কিং ত্বম্ বাৎপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্তয়॥ ৪৩॥**

অনুবাদ :- যাকে বেদে অদ্বিতীয় কেবল এক পূর্ণ ব্রহ্ম বলা হয়েছে, সে কি আপনিই, না- অন্য কেউ? আমার এই শঙ্কার নিবারণ করুণ।

শ্রী-ব্রহ্মার প্রার্থনার পর দেবী বললেন:-

দেব্যুবাচ সদৈকত্বং ন ভেদোৎস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ॥ যোৎসৌ সাৎহমহং যোৎসৌ ভেদোৎস্তি মতিবিভ্রামাৎ॥ ২॥ আবয়োরংতরম্ সূক্ষং যো বেদ মতিমান্হি স:॥ বিমুক্ত: সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩॥

অনুবাদ :- দেবী বলেছেন, তিনি যা আমিও তাই, যা আমি তাই তিনি, মতির

বিভ্রমের জন্য ভেদ হয়ে থাকে॥ ২॥ আমাদের দু'জনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যকে যিনি জানেন তিনিই মতিমান অর্থাৎ তত্বদর্শী। তিনি সংসার থেকে পৃথক হয়ে মুক্ত হন, এতে কোনো সন্দেহ নেই॥ ৩॥

সুমরণাদ্দর্শনম তুভ্যম দাস্যেহম বিষমে স্থিতে। স্বর্তব্যাহম সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ৮০॥ উভয়োঃ সুমারণাদেব কার্যসিদ্ধির সংশয়ম্। ব্রহ্মোবাচ॥ ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জাস্মান্দ ত্বা শক্তিঃ সুসংস্কৃতান্॥ ৮১॥ বিষ্ণব্যেথ মহালক্ষ্মী মহাকালীং শিবায় চ॥ মহাসরস্বতীং মহ্যং স্থণাত্তস্মাদ্ধি সর্জিতাঃ॥ ৮২॥

অনুবাদ:- কোন সঙ্কট উপস্থিত হলে, আমার সুমিরণ করলেই আমি তোমাকে দর্শন দেব, দেবতারা সনাতন পরমাত্মার শক্তিরূপে সবসময় আমার স্মরণ করবে ॥ ৮০॥ আমাদের দুইজনের স্মরণ (সুমিরণ) দ্বারা অবশ্যই কার্যসিদ্ধি হবে, ব্রহ্মা জী বললেন, এই প্রকার সংস্কার ক'রে শক্তি প্রদান ক'রে আমাদেরকে বিদায় করেছেন। বিষ্ণুর নিমিত্তে মহালক্ষ্মী, শিবের নিমিত্তে মহাকালী আর আমাকে মহাসরস্বতী কে দিয়ে বিদায় করেছেন॥ ৮২॥

মম চৈব শরীরং বৈ সুত্রমিত্যাভিধীয়তে। স্থূলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ৮৩॥

অনুবাদ- আমার শরীরকে সুত্ররূপ বলা হয়, পরমাত্মা ব্রহ্ম কে স্থূল শরীর বলা হয়॥ ৮৩॥

"উপরোক্ত পুরাণের বাক্যের সার"

এখন প্রমাণিত হল যে, শ্রীব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব যথাক্রমে রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ যুক্ত। এই তিন প্রভুই নশ্বর অর্থাৎ এনাদের জন্ম-মৃত্যু হয়। দুর্গাকে প্রকৃতিও বলা হয়। দুর্গা এবং পতি ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ/কাল) সর্বদা পতি-পত্নী ব্যবহার (রমণ- বিলাশ) করতে থাকে। দুর্গা এবং ব্রহ্ম দুই জনই স্থুল শরীরে, আকারে আছে।

এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫ এ আছে। গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ/কাল) বলছেন যে, প্রকৃতি (দুর্গা) তো আমার স্ত্রী (পত্নী) । আমি তাঁর যোনীতে (গর্ভাধান স্থান) বীজ স্থাপন করি। যাতে সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়। আমি সর্ব (একুশ ব্রহ্মাণ্ডের) প্রাণীদের পিতা আর প্রকৃতি (দুর্গা/অষ্টাঙ্গী) সকলের মাতা। এই দুর্গা (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী থেকে উৎপন্ন তিন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ - শিব) অন্য প্রাণীকে কর্ম বন্ধনে বেঁধে রাখে।

"ত্রিগুণীয় মায়া জীবকে মুক্ত হতে দেয় না। (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব)"

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১ ও ২-এ ব্রহ্ম বলছেন, হে অর্জুন! এখন তোকে সেই জ্ঞান শোনাব যা জানার পরে অন্য কিছু জানার বাকি থাকে না।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম (ক্ষরপুরুষ/ব্রহ্ম) বলছেন, তিন গুণ থেকে যা কিছু হচ্ছে তা আমার থেকেই হচ্ছে মনে কর। যেমন রজোগুণ (ব্রহ্মা) থেকে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ (বিষ্ণু) থেকে পালন পোষণ স্থিতি ও তমোগুণ (শিব) থেকে প্রলয় (সংহার) - এর কারণ এক মাত্র কাল ভগবান। আবার বলেছে, আমি এর মধ্যে নেই। কারণ কাল বহু দূরে (একুশতম ব্রহ্মাণ্ডে নিজের লোকে) থাকেন। কিন্তু মন রূপে আনন্দ, ফুর্তি বিকার কালই করে,অর্থাৎ রিমোট দিয়ে সর্ব প্রাণী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে যন্ত্রের মত চালায়। গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলেছেন, আমার একুশ ব্রহ্মাণ্ডের

প্রাণীর জন্য আমার পূজা থেকে শাস্ত্র অনুকুল সাধনা আরম্ভ হয়,যা বেদে বর্ণিত আছে। আমার অন্তর্গত যত প্রাণী আছে তাঁদের বুদ্ধি আমার হাতে। আমি কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এইজন্য (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত) তিনগুণ থেকে যা কিছু হচ্ছে তাঁর মুখ্য কারণ আমি। (কেননা অভিশাপের কারণে কাল এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরকে মেরে তার গন্ধ খায়) যে সাধক আমার সাধনা না করে ত্রিগুণের সাধনা করে তাঁরা ক্ষনিক লাভ প্রাপ্তি করে। এদের থেকে বেশি লাভ আমি দিতে পারি। কিন্তু এই মূর্খরা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে এই তিন গুণ পর্যন্ত সীমিত। এইজন্য এই রাক্ষস স্বভাবের, মানুষের মধ্যে নীচ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করা মূর্খরা আমার সাধনা করে না। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ৪ থেকে ২০ ও ২৩, ২৪ পর্যন্ত। অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২ থেকে ১৪ তথা ১৯ ও ২০ তে ও আছে।

বিচার করি :- রাবণ ভগবান শিবকে মৃত্যুঞ্জয়, অজর, অমর, সর্বেশ্বর মেনে ভক্তি করেন, দশবার মাথা কেটে সমর্পিত করে দেন। তাঁর প্রতিফলে রাবণের দশ মাথা প্রাপ্তি হয়, কিন্তু মুক্তি হয়নি। রাক্ষস উপাধি পায়। এই দোষ রাবণের গুরুদেবের। ঐ নির্বোধ গুরু বেদ কে ঠিক মত না বুঝে নিজের বিচারে তমোগুণ যুক্ত ভগবান শিবকে পূর্ণ পরমাত্মা বলেছেন। এবং রাবন মিথ্যাবাদী (ভন্ড) গুরুদেবের কথায় বিশ্বাস করে জীবন ও নিজের কুলের (বংশ) নাশ করেন।

১. এক ভস্মাগিরী নামের সাধক ছিল, সে শিব (তমোগুণ) কে ইষ্ট মেনে শীর্ষাসনে (নীচে মাথা উপরে পা) ১২ বৎসর পর্যন্ত সাধনা করে। ভগবান শিবকে বচনবদ্ধ করে ভস্মকড়া নিয়ে ভগবান শিবকেই মারার জন্য তৈরি হয়। উদ্দেশ্য ছিল ভগবান শিবকে মেরে পার্বতীকে পত্নী বানানো । মৃত্যুর ভয়ে ভগবান শিব পালিয়ে যান। তখন শ্রী বিষ্ণু ঐ ভস্মাসুরকে গংডহস্ত নাচ-নাচিয়ে ভস্মকড়া দিয়ে ভষ্ম করেন। শিবের (তমোগুণী) এই সাধককেও রাক্ষস বলা হয়। হরিণ্যকষিপু ভগবান ব্রহ্মার (রজোগুণ) সাধনা করত তাকেও রাক্ষস বলা হয়েছে।

২. এক সময় (আজ থেকে সন্ ২০০৬ থেকে প্রায় ৩৩৫ বৎসর পূর্বে) হরিদ্বারে হরকী পৈড়িতে (শাস্ত্র বিধি রহিত সাধনা করা) কুম্ভ মেলার সংযোগ হয়। ওখানে সর্ব (ত্রিগুণ উপাসক) মহাত্মারা স্নানার্থে পৌঁছায়। গিরী পুরী, নাথ, নাগা, ভগবান শিবের (তমোগুণ) উপাসক এবং বৈষ্ণব, ভগবান বিষ্ণুর (সত্ত্বগুণের) উপাসক। প্রথম স্নান করা নিয়ে নাগা ও বৈষ্ণব সাধুদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হয়। প্রায় ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) ত্রিগুণীয় উপাসক মৃত্যু প্রাপ্ত করে। যে ব্যক্তি সামান্য কথায় নরসংহার করে সে কি সাধু, না রাক্ষস? আপনারাই বিচার করুন। সাধারণ ব্যক্তিরা কোথাও স্নান করার সময় যদি অন্য কোন ব্যক্তি এসে বলে কৃপা করে আমাকে একটু স্নান করার জায়গা দেন। শিষ্টাচারের জন্য বলবে, আসুন আপনিও স্নান করুণ। এদিক-ওদিক সরে অন্যকে স্থান দেয়। তাই পবিত্র গীতায় অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ তে বলেছে; ত্রিগুণময়ী মায়ার (রজোগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুন শিব) পূজার দ্বারা যার জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, তাঁরা কেবল মান সম্মানের ক্ষুধার্ত রাক্ষস স্বভাব ধারণ করা মানুষের মধ্যে নীচ অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তির থেকেও নীচ স্বভাবের। দুষ্কর্ম করা মূর্খ আমার ভক্তিও করে না। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত পবিত্র গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু বলছেন, আমার ভক্তি (ব্রহ্ম-সাধনা) চার প্রকারের সাধকরা করে। এক অর্থার্থী (ধন লাভ করার জন্য) যারা বেদ মন্ত্রের যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র, হবণ ইত্যাদি করতে থাকে।

দ্বিতীয়ত-আর্ত সংঙ্কট নিবারনের জন্য, বেদ মন্ত্রের সাহায্যে মন্ত্র তন্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি করে। তৃতীয়ত- জিজ্ঞাসু যে পরমাত্মার জ্ঞান জানার ইচ্ছা রাখে বা শুধু জ্ঞান সংগ্রহ করে বক্তা হয়ে যায়। তথা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়ে তাঁর আধারে উত্তম হয়ে বা জ্ঞানবাণ হয়ে অভিমানে ভক্তি হীন হয়ে যায়। চতুর্থ জ্ঞানী, এই সাধকের এই জ্ঞান হয়ে যায় যে মানব শরীর বার বার প্রাপ্ত হয় না। আর এই জন্মে প্রভু সাধনা না হলে জীবন ব্যর্থ হবে। তাই বেদ কে অধ্যায়ন করে যাতে জ্ঞান হয় যে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) তিন গুণ ও ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) এবং পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) থেকেও উপরে পূর্ণব্রহ্মের ভক্তি করতে হবে। অন্য দেবতাদের নয়। ঐ জ্ঞানী উদার আত্মাকে আমার ভালো লাগে। আমার এই জন্য ভালো লাগে, যে তিন গুণের (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু-তমোগুণ-শিব) উপরে উঠে আমার (ব্রহ্ম কাল) সাধনা করে যা অন্য দেবতাদের থেকে ভালো। কিন্তু বেদে যে "ওম্" মন্ত্র আছে যা কেবল ব্রহ্মের সাধনার মন্ত্র তা বেদ বিদ্বানরা নিজেরা বিচার-বিমর্শ করে পূর্ণ ব্রহ্মের মন্ত্র জেনে বৎসরের পর বৎসর সাধনা করতে থাকে। কিন্তু প্রভু প্রাপ্তি হয় নি। অন্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেছে। কারণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এবং পবিত্র যর্জুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০-এ বর্ণিত তত্ত্বদর্শী সন্ত পায় নি, যিনি পূর্ণ ব্রহ্মের সাধনার তিন মন্ত্র বলেন। এইজন্য জ্ঞানী ভক্তরাও ব্রহ্ম (কাল) সাধনা করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে থেকে গেছে ।

এক জ্ঞানী উদার আত্মা মহর্ষি চুনক-বেদগ্রন্থ কে পড়ে পূর্ণ প্রভুর ভক্তির এক "ওম্" মন্ত্র জেনে বহু বৎসর সাধনা করেন। ঐ সময় এক মানধাতা চক্রবর্তী রাজা ছিল। (চক্রবর্তী রাজা তাকে বলা হয়, যার শাসন ক্ষমতা সমস্ত পৃথিবীতে হয়) । তিনি নিজের অন্তর্গত রাজাদের হার স্বীকার করানোর জন্য একটি ঘোড়ার গলায় পত্র বেঁধে সমস্ত রাজ্যে ঘোরায়। শর্ত রাখেন-যে রাজা মানধাতার গুলামি (অধীনতা) স্বীকার করবে না, তাকে যুদ্ধ করতে হবে। সে এই ঘোড়া কে বেঁধে রাখবে। কেউ ঘোড়া টিকে বাঁধেনি। চুনক জী এই কথা জানতে পারে যে রাজার খুব অভিমান হয়ে গেছে। তাই শিক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করে বলেন, আমি যুদ্ধ স্বীকার করে নিচ্ছি। যুদ্ধ শুরু হয়। মানধাতা রাজার কাছে ৭২ কোটি সেনা ছিল। সেই সেনাদের চার ভাগ করে এক ভাগ (১৮ কোটি) সেনা দিয়ে মহর্ষি চুনকের উপর আক্রমণ করে। এদিকে মহর্ষি চুনক নিজের সিদ্ধি শক্তি দিয়ে (সাধনার কামাই) চার পুতুল (Bomb) বানায় এবং প্রত্যেক বারে একটি করে পুতুল ছেড়ে দেয়। এই পুতুলে রাজার চার ভাগ সৈনের বিনাশ করে দেয়

বিশেষ:- শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিব এবং ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের ভক্তিতে পাপ ও পূণ্যের ফল ভোগ করতে হয়। পূণ্য স্বর্গে আর পাপ নরকে ও ৮৪ লাখ যোনীতে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট যন্ত্রণায় ভোগ করতে হয়। যেমন জ্ঞানী আত্মা শ্রীচুনক ঋষি "ওম্" নাম জপ করে কিছু ফল চার পুতুল তৈরি করে সমাপ্ত করেন। যার কারণে মহর্ষি বলে পরিচিত হন। তাঁর কিছু সাধনার ফল মহাস্বর্গে ভোগ করে আবার নরকে যাবেন এবং পুনরায় ৮৪ লক্ষ যোনীতে শরীর ধারণ করে কষ্ট ভোগ করবেন। যে ৭২ কোটি সৈনিককে সংহার বচনশক্তি দ্বারা করেছিলেন ,তার কর্মদন্ডও ভোগ করতে হবে। কেউ হাতিয়ার দ্বারা হত্যা করুক কিম্বা বচন রূপী তলোয়ার দ্বারা দুজনকেই প্রভু সমান দণ্ড দেন। যখন ঐ মহর্ষি চুনক ঋষির আত্মা কুকুর রূপে জন্ম নেবে,তার মাথায় ক্ষত (ঘা) হবে, তাতে পোকা হয়ে ঐ সৈনিকের আত্মারা প্রতিশোধ নেবে।

কখনো পা ভাঙ্গবে, কখনো পঙ্গু হয়ে যাবে; ঠাণ্ডা গরমের অসহনীয় নানা প্রকারের কষ্ট ভোগ করবে।

এইজন্য পবিত্র গীতার জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম (কাল) গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে স্বয়ং বলছেন যে, এই সর্ব জ্ঞানী আত্মা তো উদার কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মার তিন মন্ত্রের বাস্তবিক সাধনা বলা তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ায় জন্য এই সকল ভক্ত আমার (অনুত্তমম্) অতি জঘন্য অশ্রেষ্ঠ মুক্তির আশায় আশ্রিত থাকে। অর্থাৎ আমার সাধনাও অশ্রেষ্ঠ। এইজন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছেন, হে অর্জুন! তুই সর্ব ভাবে ঐ পূর্ণ পরমাত্মার শরণে চলে যা। যার কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং সনাতন পরম ধাম (সতলোক) প্রাপ্ত করবি। পবিত্র গীতাজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মত প্রবেশ করে ব্রহ্ম (কাল) বলেছিল। কয়েক বৎসর পরে পবিত্র গীতা ও চারবেদ কে মহর্ষি ব্যাস জীর শরীরে প্রেতবত প্রবেশ করে স্বয়ং ব্রহ্ম (ক্ষার পুরুষ) লিপিবদ্ধ করান।এতে পরমাত্মা কে, কেমন? কিভাবে তাঁর ভক্তি করতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণ বর্ণনা বেদে দেওয়া আছে। কিন্তু পূজার বিধি শুধু ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) পর্যন্ত আছে।

পূর্ণ ব্রহ্মের ভক্তির জন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোকে ৩৪ এ পবিত্র গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু স্বয়ং বলছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি প্রাপ্তির জন্য কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ কর। তারপর তিনি যে বিধি বলেন তাই কর। আমি পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তির বিধি জানি না। নিজের সাধনার বিষয় গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোকে ১৩ তে বলেছেন। আমার ভক্তি শুধু মাত্র এক ওম্-অক্ষর,এই মন্তের উচ্চারণ অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত করলে আমার দেওয়া পরম গতি প্রাপ্তি হবে। আবার গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে বলেছেন, যে প্রভু প্রেমী আত্মা তত্ত্বদর্শী সন্ত পায় না যে পূর্ণ ব্রহ্মের সাধনা জানে, সেই উদার আত্মাও আমার অনুত্তমম্ (অশ্রেষ্ঠ) পরমগতিতে আশ্রিত থাকে ।

"অন্য দেবতাদের (রজোগুণ শ্রীব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ শ্রীবিষ্ণু, তমোগুণ শ্রীশিব) পূজা অজ্ঞানী ব্যক্তিরা করে।"

অধ্যায় ৭ শ্লোক ২০ তে বলেছে, যার সম্বন্ধে অধ্যায় ৭ থেকে লাগাতার আছে, শ্লোক ১৫ তে বলেছেন, ত্রিগুণীয় মায়ার দ্বারা যার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব-এর পূজা পর্যন্ত সীমিত আছে। সে রাক্ষস স্বভাব ধারণ করা মানুষের মধ্যে নিচ, দুষ্কর্ম করা মূর্খ আমার সাধনাও করে না। অধ্যায় ৭ শ্লোক ২০ তে বলেছেন, ঐ ভোগের কামনা করার জন্য যার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে,সে নিজের স্বভাবে প্রেরিত হয়ে অজ্ঞান (শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞান) নিয়মের আধারে অন্য দেবী দেবতাদের পূজা করে। অধ্যায় ৭ শ্লোক ২১-এ বলেছেন, যে ভক্ত যে দেবতার স্বরূপকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করতে চায়, আমি ঐ ভক্তের শ্রদ্ধাকে ঐ দেবতার প্রতি স্থির করে দিই।

অধ্যায় ৭ শ্লোক ২২- এ বলেছে, শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে , যে দেবতার পূজা করে সে আমার দ্বারা বিধান (নিয়ম) করা কিছু ইচ্ছিত ভোগকে প্রাপ্তি করে। যেমন মুখ্য মন্ত্রী বলেন নীচের অধিকারী আমার চাকর। আমি তাদের কিছু অধিকার দিয়ে রেখেছি। তাই তাদের আশ্রিতদেরও লাভ আমার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত হয় না। অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৩-এ বর্ণনা আছে কিন্তু ঐ মন্দ বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিদের ফল নাশবান

হয়। ভক্তি বিধি অনুসার ভক্তি করা ভক্তও আমাকেই প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ কাল জাল থেকে কেউ বাইরে যেতে পারে না।

বিশেষ:- অধ্যায় ৭ শ্লোক ২০ থেকে ২৩-এ বলেছে যে, কোন সাধনা যেমন পিতর, ভূত, দেবী দেবতা ইত্যাদির পূজা যে স্বভাব বশত করে, ঐ মন্দ বুদ্ধির লোক (ভক্তকে) কে ঐ দেবতার প্রতি আসক্ত আমিই করি। ঐ অবুঝ (নাদান) সাধক দেবতা থেকে যে লাভ পায়, সেই শক্তিও আমিই (কাল) দেবতাদের দিয়ে রেখেছি। ঐ আধারে (নিয়মের) দেবতাদের পূজারী দেবতাদের প্রাপ্তি করে। কিন্তু ঐ বুদ্ধিহীন সাধককের ঐ সাধনা (পূজা) শ্রীঘ্রই চুরাশি লক্ষ যোনীতে নিয়ে যাবে। যে আমাকে (কালকে) ভজে সে তপ্তশিলা থেকে মহাস্বর্গে (ব্রহ্মা লোক) চলে যায়, পরে জন্ম মৃত্যুতে ফিরে আসে। মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। ভাবার্থ এই যে দেবী-দেবতা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও মাতা প্রকৃতি থেকে ভগবান ব্রহ্ম-এর সাধনা অধিক লাভদায়ক। মহাস্বর্গে যাওয়া সাধকের মহাস্বর্গে থাকার সময় এক মহাকল্প কাল পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু মহাস্বর্গে শুভ কর্মের সুখ ভোগ করার পরে নরক তথা অন্য প্রাণীর শরীরে ৮৪ লক্ষ কষ্ট-ই থেকে যায়। পূর্ণ মোক্ষ অর্থাৎ কাল জাল থেকে মুক্ত হয় না।

"অন্য প্রমাণ"

পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদে অন্য দেবতাদের পূজা বা পিতর পূজা শ্রাদ্ধ করা ভূতপূজা (ফুল উঠানো, অস্থি উঠানো, পিণ্ড দান ইত্যাদি) করতে মানা করেছে।

"পবিত্র চার বেদ অনুসার সাধনার পরিণাম কেবল স্বর্গ মহাস্বর্গ প্রাপ্তি, মুক্তি হয় না।"

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২০, ২১-এ বলা হয়েছে যে, যে মনস্কামনা (সকাম) সিদ্ধির জন্য বেদে বর্ণিত শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করে সে নিজের কর্মের আধারে মহাস্বর্গে আনন্দ উপভোগ করে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুতে ফিরে আসে। অর্থাৎ শাস্ত্র অনুকূল যজ্ঞ হলেও তার একমাত্র লাভ সাংসারিক ভোগ, স্বর্গ আর পরে নরক ও চুরাশী লাখ যোনী ভ্রমণ করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তিন মন্ত্র (ওম্ তত্-সত্-সংকেতিক) পূর্ণ সন্ত থেকে প্রাপ্তি হবে না। অধ্যায় ৯-এর শ্লোক ২২-এ বলেছে,যে নিষ্কাম ভাবে শাস্ত্র অনুকূল আমার পূজা করে, তার পূজা বা সাধনার রক্ষা আমি স্বয়ং করি, কিন্তু মুক্তি নয়।

"শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধ সাধনা পতনের কারণ।"

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৩, ২৪ এ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য দেবতাদের পূজা করে সে আমারই (কাল জালে থাকার জন্য) পূজা করে। কিন্তু তাদের ঐ পূজা অবিধি পূর্বক (অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ভাবার্থ অন্য দেবতাদের পূজা করতে নেই) কারণ সম্পূর্ণ যজ্ঞের ভোক্তা বা স্বামী আমি নিজেই (কাল) । ঐ সাধক আমাকে ভালোভাবে জানে না। এইজন্য তার পতন হয়। নরক আর লাখ চুরাশিতে কষ্ট ভোগ করে।যেমন গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫ তে বলেছে, সর্ব যজ্ঞতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সম্মানিত, যাকে যজ্ঞ সমর্পিত করা হয় ঐ পরমাত্মাই পূর্ণব্রহ্ম। তিনি কর্মাধার বানিয়ে ফল সর্ব প্রাণীকে প্রদান করেন। কিন্তু পূর্ণ সন্ত না পাওয়া পর্যন্ত, সর্ব যজ্ঞের ফল (আনন্দ) কাল (মন রূপে) ভোগ করে। এইজন্য বলেছে আমি সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা বা স্বামী।

"শ্রাদ্ধ করা (পিতর-পূজা) ব্যক্তি পিতর লোকে যায় মুক্ত হয় না"

গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫-এ বলেছেন, দেবতাদের পূজা করা সাধক দেবতাদের প্রাপ্ত হয় আর পিতরকে পূজা করলে পিতৃলোকের (পিতরলোক) প্রাপ্তি হয় এবং ভূতের পূজা (পিণ্ডদান) করলে ভূতলোকের প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ভূত হয়। আর শাস্ত্র অনুকুল (পবিত্রবেদ ও গীতানুসার) পূজা করলে আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কাল দ্বারা নির্মিত স্বর্গ বা মহা স্বর্গ ইত্যাদিতে কিছু বেশী সময় ধরে আনন্দ করা যায়।

বিশেষ:- যেমন কেউ তহশীলদারের অধীনে চাকরি (সেবা-পূজা) করলেও, সে তো আর তহশীলদার হতে পারে না। তহশীলদারের দেওয়া প্রাপ্ত ধন থেকেই সংসার পরিচালনা করতে হয় এবং তাঁর অধীন থাকতে হয়। ঠিক এই রূপ যারা যে দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ত্রিদেব) পূজা করে, সে তাঁর থেকে পাওয়া লাভ প্রাপ্তি করে। ত্রিগুণীয় মায়া অর্থাৎ তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) এর পূজা করা নিষেধ পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোকে ১২ থেকে ১৫ এবং ২০ থেকে ২৩ এ বর্ণনা আছে। তাই যদি কেউ পিতরের পূজা করে তাহলে ঐ পিতরের কাছে গিয়ে ছোট পিতর হয়ে কষ্ট ভোগ করবে,কেউ ভূতের পূজা করলে ভূত হবে। কারণ সারা জীবন যার প্রতি আসক্তি করে থাকবে অন্তিম সময়েও তাতেই মন ফেঁসে থাকে। যে কারণে তাকে তার কাছেই চলে যেতে হয়। কিছু লোক বলেন- পিতর-ভূত দেবী-দেবতার পূজাও করবো আর আপনার থেকে নাম উপদেশ নিয়ে সাধনাও করবো। সত্য সাধনায় তা চলবে না। যে সাধনা পবিত্র গীতায় বা পবিত্র চার বেদে মানা করেছে তা করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা। পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪-এ বলেছে,যে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমতো আচরণ করে তথা পূজা করে সে না-তো সুখ প্রাপ্ত করে, না পরমগতি, এবং না কোন কার্য সিদ্ধি করার সিদ্ধি প্রাপ্ত করে। অর্থাৎ জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্য অর্জুন তোর জন্য কর্তব্য (যে সাধনা কর্ম করার যোগ্য) আর অকর্তব্য (যে সাধনা কর্ম করার যোগ্য নয়) তার ব্যবস্থা (নিয়ম) শাস্ত্রেই দেওয়া আছে, অন্য সাধনা বর্জিত।

এর প্রমাণ মার্কণ্ডে পুরাণে (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা নং ২৩৭- তে আছে। এতে মার্কণ্ডে পুরাণ এবং ব্রহ্ম পুরাণ এক সাথে বর্ণনা করা হয়েছে)

এক রুচি নামের সাধক ব্রহ্মচারী হয়ে বেদ অনুসার সাধনা করছিল। যখন সে ৪০ বৎসরের হয়, তখন তার চার পূর্বজ যারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে পিতর হয়ে কষ্ট ভোগ করছিল তারা দেখা দেয়। পিতর বলে, পুত্র রুচি! বিবাহ করে আমাদের শ্রাদ্ধ করো, আমরা খুব দুঃখে আছি। রুচি ঋষি বলে, পিতামহ বেদে কর্মকাণ্ডের মার্গে (শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান করা) এই সাধনা মূর্খের কাজ বলেছে। আর আপনি আমাকে কেন ভুল (শাস্ত্র বিরুদ্ধ) সাধনার কথা বলছেন। পিতর বলে, পুত্র এ কথা তো সত্য যে, বেদে পিতর পূজা,ভূত পূজা দেবী দেবতাদের পূজা (কর্মকাণ্ড)কে অবিদ্যাই বলেছে,এটা মিথ্যা নয়। কিন্তু পিতর কিছু তো লাভ দিতে পারে।

বিশেষ:- পিতর তাঁর নিজের চালাকি দ্বারা ভ্রমিত করার চেষ্টা করছে। এটা আমরা করবোনা। কারণ পুরাণের আদেশ কোন ঋষি বিশেষের, যে ভূত, প্রেত, পিতর বা অন্যদের পূজা করতে বলেছে। কিন্তু বেদে প্রমাণ না থাকার জন্য এটা প্রভুর আদেশ নয়। এইজন্য কোন সন্ত বা ঋষির কথামত প্রভুর আজ্ঞার অবহেলা করলে সাজা ভোগ করতে হবে।

এক সময় থানাদারের (থানার বড় বাবু) সঙ্গে এক ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়। ঐ ব্যক্তি দারোগা বন্ধুকে বলে, আমার প্রতিবেশী আমাকে খুব বিরক্ত করে। দারোগা (S.H.O) বন্ধু বলে, লাঠি দিয়ে মার, আমি দেখে নেব। থানাদার বন্ধুর আজ্ঞা পালন করে ঐ ব্যক্তি প্রতিবেশীকে লাঠি দিয়ে মারে। মাথায় আঘাত লাগার কারণে তার মৃত্যু হয়। ঐ ক্ষেত্রের অফিসার হওয়ার কারণে আইন রক্ষক দারোগা বন্ধুকে ধরে জেলে দেয়, পরে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়। তার বন্ধু থানেদার কোন সাহায্য করতে পারেনি। কারণ রাজার সংবিধানে আছে যদি কেউ অন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ডের সাজা হবে। ঐ নির্বোধ ব্যক্তি বন্ধু দারোগার কথা শুনে রাজার সংবিধান ভঙ্গ করেছে,তাই তার জীবন চলে গেল। ঠিক এরকম পবিত্র গীতা ও পবিত্রবেদ, প্রভুর সংবিধান। এতে একমাত্র পূর্ণ পরমাত্মারই পূজার বিধান আছে। অন্য দেবী দেবতা-পিতর-ভূতের পূজা করা নিষিদ্ধ। পুরাণে ঋষিগণের (দারোগার) আদেশ আছে। এই আদেশ পালন করলে প্রভুর সংবিধান ভঙ্গ হওয়ার কারণে দুঃখের পরে দুঃখ ভোগ করতে হয়। এইজন্য অন্য উপাসনা (যা শাস্ত্র বিরুদ্ধ) তা পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তিতে পথের কাঁটা স্বরূপ!

"সত্য কথা "

আমার (সন্ত রামপালজী মহারাজ) পূজ্য গুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দ জী প্রায় ষোল বৎসর বয়সে, পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য হঠাৎ ঘর ত্যাগ করে চলে যান। ঘন জঙ্গলের ভিতর কোন এক মৃত পশুর হাড়ের উপর নিজের পড়া জামা কাপড় ফেলে রেখে যান। সন্ধ্যার সময় বাড়িতে না আসার কারণে বাড়ির লোক খোঁজ করতে গিয়ে দেখে জঙ্গলের পাশে হাড় আর জামাকাপড় পড়ে আছে। রাত্রির সময় ছিল। জামা কাপড় চিনতে পেরে দুঃখী মনে পশুর হাড়কে বাচ্চার অস্তি মনে করে উঠিয়ে আনে। বাড়ির লোকেরা চিন্তা করে কোন হিংস্র পশু বাচ্চাকে খেয়ে ফেলেছে। ঐ হাড়ের অন্তিম সংস্কার করে এবং সর্ব ক্রিয়া করে। তের দিনের শ্রাদ্ধের পরে বাৎসরিক শ্রাদ্ধও করতে থাকে। প্রায় ১০৪ বৎসর বয়সে স্বামীজী হঠাৎ নিজের গ্রামে যান। (বড়া পৈঁতাবাস জেলা-ভিবাণী, তহশিল চরখীদাদরী, হরিয়াণা।) স্বামীজীর ছোটবেলার নাম হরিদ্বারী ছিল এবং ব্রাহ্মণকূলে জন্মে ছিল। আমি (শ্রী রামপাল মহারাজ) জানতে পেরে দশনার্থে ওখানে যাই। স্বামীজীর বৌদির বয়স তখন প্রায় ৯২ বৎসর। আমি (শ্রী রামপাল মহারাজ) ঐ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার গুরুদেব ঘর ত্যাগ করার পরে আপনারা কি মনে করেছিলেন? ঐ বৃদ্ধা বলেন, আমার বিবাহের পরে আমাকে বলে, এনার হরিদ্বারী নামের এক ভাই ছিল তাকে জঙ্গলে হিংস্র পশুতে খেয়ে ফেলেছে। তাঁর শ্রাদ্ধ করছি। আমাকেও এই শ্রাদ্ধ করতে বলে। ৭০ বার শ্রাদ্ধ তো আমি নিজের হাতে করেছি। যখন ক্ষেতে ফসল ভালো হত না বা বাড়িতে কোন সমস্যা দেখা দিত বা অসুখ বিসুখ হলে পুরোহিত (গুরুজী) কে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, হরিদ্বারী পিতর হয়ে গেছে। সে তোমাদের দুঃখী করছে। শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় কোন অশুদ্ধি রয়েছে। এবার সর্ব ক্রিয়া আমি নিজের হাতে করব। এর আগে আমি সময় দিতে পারিনি কারণ, এক দিনে কয়েক জায়গায় শ্রাদ্ধ করতে হয়। এইজন্য ছেলেদের পাঠিয়েছিলাম। ততক্ষণ কিছু দান করো, যাতে পিতর শান্ত থাকে। তখন ভয়ে গুরুজীর কথামত ২১বা ৫১ টাকা দান করতাম। পরে শ্রাদ্ধের সময় গুরুজী (পুরোহিত) স্বয়ং শ্রাদ্ধ করতেন। তখন আমি বলি (সন্ত রামপালজী মহারাজ) মা! এখন এই গীতা

বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেন, না হলে আপনিও প্রেত হবেন। গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫ পড়ে শোনাই। তখন ঐ বৃদ্ধা বলেন গীতা আমিও পড়ি। দাস বলে,আপনি পড়েছেন, ঠিক কিন্তু বুঝতে পারেননি। এখন এই ফালতু (বেকার) সাধনা বন্ধ করুন। বৃদ্ধা বলেন,না ভাই, কিভাবে ছেড়ে দেব শ্রাদ্ধ করা এ অনেক পুরানো পরম্পরা। এই দোষ আমাদের নয়। আমাদের গুরুদের (নিম-হাকিম) । তাঁরা পবিত্র শাস্ত্র না বুঝে নিজের ইচ্ছা মত আচরণ বলে দিয়েছে। যার জন্য কোন কর্মসিদ্ধ হয় না, বা সুখ শান্তি বা পরমগতি কিছুই প্রাপ্ত হয় না। প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪।

তাই দাসের প্রার্থনা, (সন্ত রামপাল দাস) বর্তমানের শিক্ষিত সমাজ অবশ্যই ধ্যান দেবেন, শাস্ত্র বিধি অনুসার সাধনা করে পূর্ণ পরমাত্মার সনাতন ধাম (শাশ্বতম্ স্থানম) অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্তি করুন, যাতে পূর্ণ মোক্ষ এবং পরম শান্তি প্রাপ্তি হয়। (গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২) তারজন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করুণ। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪) ।

এক শ্রদ্ধালু বলে, আমি আপনার কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে আপনার দ্বারা দেওয়া সাধনার সাথে সাথে শ্রাদ্ধ ও করব এবং নিজের ঘরের দেবী দেবতাদেরও মনে মনে পুজা করব,ততে দোষ কি?

দাসের প্রার্থনা, সংবিধানের কোন ধারা বা আইন অমান্য করলে, আইন অমান্যকারীকে অবশ্যই সাজা পেতে হয়। এইজন্য পবিত্র গীতা ও পবিত্র চার বেদে বর্ণিত ও বর্জিত বিধির বিপরীত সাধনা করা ব্যর্থ (প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪-এ) যদি কেউ বলে আমি মনে মনে গাড়ির চাকা পাংচার করে দেব। না, রাম নামের গাড়ি পাংচার করা যাবে না। ঠিক এইরকম শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা ক্ষতিকারক।

অন্য এক শ্রদ্ধালু বলেছে, আমি কোন বিকার (মদ-মাংস ইত্যাদি সেবন) করি না। একমাত্র তামাক (বিড়ি, সিগারেট-হুক্কা) সেবন করি। আপনার দ্বারা বলা সাধনার জ্ঞান অতি উত্তম। আমি গুরুও বানিয়েছি, কিন্তু এই জ্ঞান আজ পর্যন্ত কোন সন্তের কাছে শুনিনি। আমি ২৫ বৎসর ঘুরে তিন গুরু বদল করেছি। দয়া করে আমাকে তামাক সেবনের ছাড় দেন। বাকি শর্ত আমি মেনে নেব। তমাক সেবনে ভক্তিতে কি বাধা আসবে?

দাসের প্রার্থনা মানব শরীরে অক্সিজেনের প্রয়োজন। তামাকের ধোঁয়ায় উৎপন্ন হওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসকে দুর্বল করে ও রক্ত দূষিত করে দেয়। দুর্লভ মানব শরীর প্রভু প্রাপ্তি ও আত্মকল্যাণের জন্য প্রাপ্ত হয়েছে। এই শরীরে পরমাত্মা পাওয়ার রাস্তা সুষ্মনা নাড়ী থেকে প্রারম্ভ হয়। নাকের দুই ছিদ্র, ডান দিকে ঈড়া আর বাম দিককে পিংঙ্গুলা বলা হয়। এই দুয়ের মাঝখানে সুষ্মনা নাড়ী আছে। এই নাড়ীতে একটি ছোট সুচের ছিদ্রের সমান দ্বার আছে। তামাকের ধোঁয়ায় এই দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। যাতে প্রভু প্রাপ্তির মার্গ বন্ধ হয়ে যায়। যদি প্রভু পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে মানব জীবনই ব্যর্থ। এইজন্য প্রভু ভক্তি করা প্রত্যেক সাধককে নেশা জাতীয় বস্তু ও অখাদ্য (মাছ-মাংস ইত্যাদি) পদার্থ সেবন করা নিষিদ্ধ।

এক শ্রদ্ধালু বলেছে, আমি তামাক সেবন করি না। মাছ ও মাংস সেবন করি। এতে ভক্তির কি ক্ষতি হবে? এইসব তো খাওয়ার জন্য বানিয়েছে। তাছাড়া গাছও তো জীব, এই সব খাওয়া মাংস খাওয়ার সমান।

দাসের প্রার্থনা:- যদি কেউ আমাদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন বা বাচ্চাদের মেরে খায়, তাহলে কেমন লাগবে? "জৈসা দর্দ আপনে হোবৈ, বৈসা জান বিরানে

কহে কবীর বে জায়ে নরক মেঁ, জো কাটেঁ শিশ খুরাঁনে” যে ব্যক্তি পশুদের মারার সময় খুর তথা শীশ (মাথা) নির্মম ভাবে কেটে মাংস খায় সে নরকের ভোগী হয়। যেমন দুঃখ নিজের বাচ্চা বা আত্মীয়দের হত্যায় হয় তেমন অন্যেরও বুঝতে হবে। এখন শাক সব্জি খাওয়ার কথায় আসি। এসব খাওয়ার আদেশ স্বয়ং প্রভু দিয়েছেন (ভগবানের) এ সব জড় যোনী। অন্য চেতন প্রাণীর বধ প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে এইজন্য এতে অপরাধ বা পাপ হয়।

মদ (মদিরা) সেবনের কথাও প্রভু বলেন নি। স্পষ্ট মানা করা হয়েছে, কারণ মদ মানব জীবনকে বর্বাদ করে দেয়। মদপান করা ব্যক্তি যেকোন ভুল কাজ করতে পারে। মদপান করলে ধন নাশ ও শরীরের ক্ষতি হয় এবং পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। নেশা সভ্য সমাজের মহাশত্রু। এতে প্রিয় সন্তানদের ভবিষ্যৎ ও চরিত্রের উপর কু-প্রভাব পড়ে। মদ্যপান করা ব্যক্তি যতই ভালো হোক, তার কোন সম্মান বা ইজ্জত নেই। তাকে বিশ্বাসও করা যায় না।

একদিন এই (রামপাল জী মহারাজ) দাস এক গ্রামে সতসঙ্গ করতে গিয়েছিল। ঐ দিন নেশা নিষেধের উপর সৎসঙ্গ করি। সৎসঙ্গ শেষে এক এগারো বৎসরের মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। জিজ্ঞাসা করলে ঐ মেয়েটি বলে, মহারাজ জী আমার পিতা পালম এয়ারপোর্টে ভালো চাকরি করেন। কিন্তু সকল পয়সা মদ পান করে উড়িয়ে দেয়। আমার মা বাধা দিলে এতো মারে যে শরীরে নীল দাগ পড়ে যায়। একদিন আমার পিতা আমার মা কে মারছিল। আমি মায়ের গায়ের উপর পড়ে মা-কে বাঁচাতে যাই, তখন পিতা আমাকেও মারে। আমার শরীর ও ঠোঁট ফুলে যায়। সেই আঘাত ভালো হতে দশ দিন সময় লাগে। আমার মা আমাকে ছেড়ে মামার বাড়ি চলে যায়। ছয়-মাস পরে আমার ঠাকুরমা গিয়ে নিয়ে আসে। ততদিন আমি ঠাকুরমার কাছে থাকি। বাবা ওষুধও এনে দিত না। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে চাকরিতে চলে যায় আর সন্ধ্যায় সময় মদ খেয়ে ঘরে আসে। আমরা তিন বোন, দুই জন আমার থেকে ছোট। বাবা যখন সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসে তখন আমরা তিন বোন খাটের নীচে লুকিয়ে থাকি।

বিচার করুন পূণ্য আত্মারা, যে বাচ্চাদের আদর করে বুকে টেনে নেওয়া উচিত, এবং বাচ্চারা পথের দিকে তাকিয়ে থাকে পিতাজী কখন খাবার নিয়ে আসবে। আজ এই মানব সমাজের শত্রু মদ কিভাবে সংসার কে ভাঙছে। মাতাল ব্যক্তি নিজের ক্ষতি তো করেই, সাথে সাথে আরো অনেক ব্যক্তির আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার পাপও নিজের মাথায় নেয়। যেমন পত্নীর দুঃখে তার মাতা- পিতা, ভাই -বোন দুঃখী হয় এবং মাতাল ব্যক্তির মাতা-পিতা,ও ভাই-বোন, দাদা-দাদী অন্যরাও দুঃখী হয়। একজন মাতাল ব্যক্তি পাড়া প্রতিবেশীদের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মাতাল ব্যক্তি বাড়িতে যখন ঝগড়া করে, তখন পত্নী বা বাচ্চাদের চিৎকার শুনে ঠেকাতে আসলে, ঐ মাতাল তার পিছনে পড়ে যায়। প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। প্রায় এক লক্ষ ব্যক্তি যারা নিত্য মদ খেত তারা আমার (শ্রী রামপাল দাসের) কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে সর্ব নেশা জাতীয় পদার্থ ও মাছ মাংস ভক্ষণ পূর্ণ রূপে ত্যাগ করে দিয়েছে। যারা সন্ধ্যায় মদ খেয়ে প্রেতনীর মত নৃত্য করত এখন সেই পূণ্যআত্মারা সন্ধ্যার সময় বাচ্চা সহিত ঘরে বসে সন্ধ্যা আরতি করে। হরিয়াণা প্রদেশ ও নিকটবর্তী এলাকার প্রায় দশ হাজার গ্রাম ও শহরের এক নম্বরের অনেক মাতালের উদাহরণ আছে, তারা সর্ব বিকার ছেড়ে নিজের মানবজীবন সফল করছে। আবার কেউ বলে, আমি বেশী খাই না কোন-কোন দিন একটু আধটু খাই। বিশ (জহর) অল্পই অনেক। এতে ভক্তি ও মুক্তিতে বাধা আসে।

মনে করুন, দুই কিলো গ্রাম ঘি-এর হালুয়া (সত্ ভক্তিতে) বানিয়ে তাতে ২৫০ গ্রাম বালু বা রেত (তামাক, মাংস, মদিরা-অন্য উপসনা) ঢেলে দিলেন। তাতে কি লাভ হলো? সব ব্যর্থ গেল। তাই পূণ্য পরমাত্মার (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) পূজা পূর্ণ সন্ত থেকে প্রাপ্ত করে আজীবন মর্যাদায় থেকে ভক্তি করলে পূর্ণ মোক্ষ লাভ হয়।

"তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির পরেই ভক্তি আরম্ভ হয়"

অধ্যায় ৯ শ্লোকে ২৬, ২৭, ২৮-এর ভাবার্থ এই যে, কোন আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক কাজ কর, তা আমার মতানুসারে বেদে বর্ণিত পূজার বিধি অনুসারই কর। তাহলে ঐ উপাসক আমার (কাল) দ্বারা লাভান্বিত হবে। এর বর্ণনা এই অধ্যায়ের শ্লোক ২০ ও২১-এ আছে। অধ্যায় ৯-এর শ্লোক ২৯ এ ভগবান বলছেন, আমার সঙ্গে কারো শত্রুতা বা মিত্রতা নেই। সাথে সাথে আবার বলছেন, যে আমাকে প্রেমের দ্বারা (মনে প্রাণে ভালোবেসে) ভজনা করেন সে আমার প্রিয় এবং আমি তার প্রিয়। আমি তার মধ্যে আর সে আমার মধ্যে আছে। রাগ-দ্বেষ -এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ:-- প্রহ্লাদ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিত ছিল। আর হিরন্যকশ্যপুকে দ্বেষ করত। নরসিংহ রূপ ধারণ করে ভগবান নিজের প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করার জন্য রাক্ষস হিরন্যকাশীপুরের পেট ফাটিয়ে বধ করেছিল। প্রহ্লাদের প্রতি প্রেম,আর হিরন্যকশিপুরের প্রতি দ্বেষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এইজন্য পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৩ তে বলেছে, যে তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে বিভিন্ন (নানা প্রকারের) প্রকারের ভ্রমিত করা বচনে বিচলিত না হয়ে, তোর বুদ্ধি এক পূর্ণ পরমাত্মায় দৃঢ়তার সহিত স্থির হয়ে যাবে। তখন তুই যোগী হবি। অর্থাৎ তখন তুই অনন্য মনে নিঃশংসয় হয়ে এক পূর্ণ প্রভুর ভক্তি আরম্ভ করতে পারবি।

পবিত্র গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৪৬-এ বলেছে, অনেক বড় জলাশয়ের (যার জল ১০ বৎসর পর্যন্ত বর্ষা না হলেও সমাপ্ত হয় না।) প্রাপ্তি হওয়ার পর ছোট জলাশয় (যার জল ১ বৎসর বর্ষা না হলে সমাপ্ত হয়ে যায়) এর যতটা প্রয়োজন (মনে হয়) থেকে যায়। ঠিক তেমনই পূর্ণ পরমাত্মার (পরম অক্ষর পুরুষ) গুণের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তোমার আস্থাও (বিশ্বাস) অন্য জ্ঞানে বা অন্য ভগবানের (অন্য দেবী দেবতা যেমন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ক্ষর পুরুষ, পরব্রহ্ম) প্রতি ততটাই থেকে যাবে। ছোট জলাশয় খারাপ না কিন্তু তার ক্ষমতা স্বাভাবিক কাজ চালানোর জন্য,এক সামান্য সাহারা মাত্র, জীবন যাপনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। বড় জলাশয়ের প্রাপ্তি হলে জানা যায় যে, অকাল পড়লেও জলের সমস্যা আসবে না। তাই ছোট জলাশয় ত্যাগ করে অতিশ্রীঘ্র বড় জলাশয়ে আশ্রিত হতে হবে।

এইরূপ তত্ত্বদর্শী সন্ত থেকে পূর্ণ পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পূর্ণব্রহ্মের মহিমার পরিচিত হওয়ার পরে সাধক পূর্ণ রূপে (অনন্য মনে) ঐ পূর্ণ পরমাত্মায় সর্বভাবে আশ্রিত হয়ে যায়।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছেন, হে অর্জুন! তুই সর্ব ভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা, ঐ পরমাত্মার কৃপায় তুই পরম শান্তি প্রাপ্ত করবি। তথা শাশ্বত স্থান অর্থাৎ সনাতন পরম ধাম অর্থাৎ কখনো নষ্ট না হওয়া সতলোক প্রাপ্তি করবি।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৩-তে বলেছেন, আমি তোকে এই রহস্যময় অতি গোপনীয় জ্ঞান বলে দিয়েছি। এখন যেমন তোর মন চায় তেমন কর। (কারণ গীতার অন্তিম অধ্যায় ১৮-এর অন্তিম শ্লোক চলছে এই জন্য বলেছে) ।

"গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্মের ইষ্ট (পূজ্য) দেব পূর্ণ পরমাত্মা"

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোকে ৬৪-তে বলেছে, সর্ব গুপ্ত থেকেও গুপ্ত জ্ঞান একবার পুনরায় শোন। ঐ পূর্ণ পরমাত্মা (যার বিষয় অধ্যায়-১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছে) আমার পাক্কা পূজ্য দেব। অর্থাৎ আমি (ক্ষর পুরুষ) ঐ পূর্ণ পরমাত্মার পূজা করি। এটা তোর ভালোর (হিতের) জন্য বলছি। (এই কথা গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে) আমিও ঐ আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি। এই জন্য বলেছেন, ঐ গোপন থেকেও অতি গোপন (গুপ্ত) জ্ঞান আবার শোন।

বিশেষ:- গীতার অন্যান্য অনুবাদ কর্তারা ভুল অনুবাদ করেছে, "ইষ্টঃ অসি মে দৃঢ়ম্ ইতি" এর অর্থ করেছে, তুই আমার প্রিয় আছিস কিন্তু এর অর্থ হয়:-

"গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোকে নং ৬৪"

সর্বগুহ্যতমম্, ভূয়ঃ শৃণু মে পরমম্ বচঃ ইষ্টঃ
অসি, মে, দৃঢ়ম্, ইতি, ততঃ বক্ষামি, তে, হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ:- (সর্বগুহ্যতমম্) সম্পূর্ণ গোপনীয় থেকেও অতি গোপনীয় (ম) আমার (পরমম্) পরম রহস্য যুক্ত (হিতম) হিতকারী (বচঃ) বচন (তে) তোকে (ভূয়:) পুনরায় (বক্ষামি) বলব।(তত:) এটা (শৃণু) শোন, (ইতি) এই পূর্ণব্রহ্ম (মে) আমার (দৃঢ়ম) দৃঢ় বা নিশ্চিত (ইষ্ট) পূজ্যদেব গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৫-গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু (কাল ভগবান ক্ষর পুরুষ) বলেছে যদি আমার শরণে থাকতে চাও তাহলে আমার পূজা অনন্য মন দিয়ে কর। অন্য দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) তথা পিতর আদির পূজা ত্যাগ কর। তাহলে আমাকে প্রাপ্ত হবি। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে বানানো মহাস্বর্গে চলে যাবি। আমি তোকে প্রতিজ্ঞা করে সত্য বলছি। তুই আমার খুব প্রিয়।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ তে বলছেন, যদি ঐ এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ যার তুলনা অন্য কারো সাথে করা যায় না। ঐ সর্ব শক্তিমান, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনহার, সবাই কে ধারণ পোষণ করা পরমেশ্বরের শরণে যেতে হলে আমার স্তরের "ওম্" নামের সাধনার ফল এবং অন্যান্য ধার্মিক শাস্ত্র অনুকূল যজ্ঞ ও সাধনার ফল আমাকে দিয়ে দে (যাতে তুই ঋণমুক্ত হয়ে যাবি)। ঐ (একম) অদ্বিতীয় অর্থাৎ যার সমতুল্য কেউ নেই, তুই ঐ পূর্ণ পরমাত্মার শরণে (ব্রজ) চলে যা। আমি তোকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুই চিন্তা করিস না।

বিশেষ:- গীতার অন্য অনুবাদ কর্তারা শ্লোক ৬৬ এর অনুবাদ ভুল করেছে "ব্রজ"-এর অর্থ "আসা" করেছে। কিন্তু "ব্রজ"-এর অর্থ "যাওয়া" হয়।

অনুগ্রহ করে নিম্ন পড়ুন:-

অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬

সর্বধর্মান্, পরিত্যজ্য, মাম্, একম, শরনম্, ব্রজ,
অহম্, ত্বা, সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা, শুচঃ ॥

অনুবাদ:- (মাম্) আমার (সর্বধর্মান) সম্পূর্ণ পূজাকে (পরিত্যজ্য) ত্যাগ করে তুই কেবল (একম্) এক মাত্র ওই পূর্ণ পরমাত্মার (শরণম্) শরণে (ব্রজ) যা। (অহম্) আমি (ত্ব) তোকে (সর্বপাপেভ্যঃ) সম্পূর্ণ পাপ থেকে (মোক্ষয়িষ্যামি) ছাড়িয়ে দেব তুই (মা, শুচঃ) শোক করিস না।

"ব্রহ্মের সাধক ব্রহ্মকে আর পূর্ণব্রহ্মের সাধক পূর্ণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে"

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ থেকে ১০ ও ১৩ এবং গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩- এ নির্ণায়ক জ্ঞান আছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে বলেছে। আমার (ব্রহ্ম) সাধনা একমাত্র এক অক্ষর "ওম্" আছে। যা সাধক উচ্চারণ করে জপ করতে হয়। যে সাধক অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত এই মন্ত্র জপ করে সে আমার পরম গতি প্রাপ্ত করে। (নিজের পরম গতিকে গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে অতি অনুত্তম্ অর্থাৎ খারাপ বলেছেন।)

গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩-এ বলেছে,পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তির কেবল তিন মন্ত্র ওঁ, তত্, সত্, জপের নির্দেশ আছে। এখানে (ওম্ জপ ব্রহ্মের তত্ ও সত্ সাংকেতিক যা পরব্রহ্ম ও পূর্ণব্রহ্মের জপ) । ঐ পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী সন্তই জানে, তার থেকে প্রাপ্ত কর। আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) জানি না।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৬-এ বলেছে, এটি বিধান যে, অন্তিম সময়ে যারা যে প্রভুর নাম জপ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করে, তারা তাকেই প্রাপ্তি করে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ থেকে ৭-এ বলেছে যে,অন্তিম সময় যে আমার নাম জপ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে সে, আমার (ব্রহ্ম) ভাবে ভাবিত থাকে। আবার মানুষ জন্ম প্রাপ্তি করলে, ঐ সাধক নিজের সাধনা পুনরায় ব্রহ্ম থেকেই শুরু করে। তার স্বভাব চরিত্র এমনই হয়ে যায়। (এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ -১৭ তে আছে। যে সাধক পূর্ব জন্মে যেমন সাধনা করে আসে সে পরের জন্মেও স্বভাব অনুসার সেই সাধনা করে)।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৭-এ বলেছে, সব সময় আমার সুমিরণ কর আর যুদ্ধও কর, নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্তি করবি।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত স্পষ্ট করেছে যে সাধক অনন্য মনে পরমেশ্বরের নাম জপ করে সে সদা তার সুমিরণ করে, (পরম দিব্যম্ পুরুষ্ যাতি) তাই সে ঐ পরম দিব্য পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্তি করে। (অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮) যে সাধক অনাদি সর্ব নিয়ন্তা সুক্ষ্ম থেকে অতি সুক্ষ্ম সবাইকে ধারণ পোষণ করে। সূর্যের মত স্বপ্রকাশিত অর্থাৎ তেজময় শরীর যুক্ত অজ্ঞান রূপ অন্ধকার ছাড়িয়ে (কবিম্) যে কবির্দেব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের সুমিরণ করে (অধ্যায় ৮ শ্লোক ৯)।

ঐ ভক্তি যুক্ত সাধক তিন মন্ত্রের জপ সাধনার শক্তি নাম জপের (পূণ্য ফল) দিয়ে অন্ত সময় অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করে যাওয়ার সময় ত্রিকুটিতে পৌঁছে অভ্যাস বশতঃ সার নামের সুমিরণ করলে ঐ দিব্যপুরুষ অর্থাৎ তেজোময় সাকার পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করে। (অধ্যায় ৮ শ্লোক ১০)

"ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) -এর সাধনা অনুত্তম (ঘাটিয়া) "

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ তথা ৪ শ্লোক ৫ তথা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে বলেছে, (গীতা জ্ঞানদাতা) আমি নাশবান। আমার ও তোর জন্ম মৃত্যু সদা হতে থাকবে। শুধু কর্মের ফলই প্রাপ্ত হবে, মোক্ষ বা পূর্ণ মুক্তি হবে না। আমার সাধনা করা সাধক যদিও উদার প্রকৃতির কিন্তু তারা আমার অতি জঘণ্য (অনুত্তমাম্) সাধনায় ব্যস্ত থাকে। সেইজন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২, ৬৪, ৬৬ তে বলেছে, ঐ পরমেশ্বরের শরণে

যা, আমারও পূজ্যদেব উনি।

প্রার্থনা:- উপরোক্ত তিন মন্ত্রের সাধনা এই দাসের (শ্রী রামপাল দাস) কাছে উপলব্ধ আছে। যেটা স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব নিজের আত্মাদের কল্যাণের জন্য দয়া করে প্রদান করেছেন। কারণ এখন বিচলী পীঢ়ী (মধ্য প্রজন্ম) চলছে। কেননা কলিযুগের প্রারম্ভে আমাদের পূর্বজ অশিক্ষিত ছিল। ঐ সময় পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানকে নকল সন্ত, গুরু মহন্ত এবং আচার্যরা প্রচার হতে দেয়নি। কলিযুগের শেষের দিকে সর্ব ব্যক্তি ভক্তিহীন এবং মহাবিকার গ্রস্ত অসৎ চরিত্রের হয়ে যাবে। বর্তমানে বিংশ শতক চলছে এখন সর্ব সমাজ শিক্ষিত।

বাস্তবিক জ্ঞান আমাদের বিদ্যমান আছে। যে জ্ঞান নকল গুরু, সন্ত, আচার্যরা বুঝতে পারেনি। সেকারণে সর্ব ভক্ত সমাজ শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞানের আধারে, দন্ত কথার উপর ভিত্তি করে, শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে, মনমর্জী আচারণ করে, নিজের অমূল্য জীবন ব্যর্থ করছে।

শাস্ত্র বিধি অনুসার সাধনা:-

১. শরীরের কমল খোলার জন্য প্রথম চরণে ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়। উপদেশ প্রাপ্ত করতে ইচ্ছুক ভক্ত আত্মারা চিন্তা করবেন, গুরুজী বলেছিল তিন গুনের (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) পুজা করতে হবে না। আর মন্ত্র জপ তাদেরই দিয়েছেন। তাদের জন্য নিবেদন- এ পূজা নয়। আমরা কালের লোকে বসবাস করছি। এখানে আমরা যে সুবিধা পেতে চাই তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবই প্রদান করবে।

যেমন মনে করুণ, বিজলির কানেশন নিয়েছেন তাঁর বিল দিতে হবে। আমরা বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বা তাঁর বিভাগের পূজা করব না। আমরা শুধু বিদ্যুতের বিল জমা দেব, তাহলে বিদ্যুৎতের লাভ পেতে থাকব। এইরূপ, টেলিফোন (দূরাভাষ) বিল, জলের বিল ইত্যাদি। বিল পরিশোধ করলে আমরা ঐসব কানেক্শনের সুবিধার লাভ করতে পারব। আপনারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে ভক্তিহীন হয়ে গিয়েছেন অর্থাৎ পূণ্যহীন হয়ে গিয়েছেন। তারজন্য আপনাদের ধনলাভ বা সাংসারিক অন্য কোন লাভ হচ্ছে না। এই দাস (রামপালদাস) আপনার গ্যারান্টার (জিম্বেদার) হয়ে এই কাল লোকের এক ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, মাতা আদি থেকে) থেকে আপনাদের সর্ব সুবিধা পুণরায় প্রারম্ভ করাবেন। আপনি শুধু এই মন্ত্র জপের মাধ্যমে এদের বিল দিতে থাকবেন। যে মন্ত্র প্রথমে (সত সুকৃত অবিগত কবীর) আছে, এটাই আপনার পূজা, ইনি পূর্ণ পরমাত্মা, এতে সতম্ লাভ (ফল) প্রাপ্ত হবে। সতম্-এর অর্থ অবিনাশী, অর্থাৎ আমাদের অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করতে হবে। এই মন্ত্রের (৪) চার মাস পরে আপনাকে সতনাম (সত্যনাম) দেওয়া হবে, যা দুই মন্ত্রের হবে। এক মন্ত্রের জপের ফলে একুশ ব্রহ্মাণ্ডের ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। এই মন্ত্রের কামাই করে কালের (ক্ষর পুরুষ) ঋণ শোধ করতে হবে। তখন এই কাল আমাদের সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেবে।

গীতা অধ্যায় নং ১৮ শ্লোক নং ৬২ - ৬৬ :-

গীতা অধ্যায় নং ১৮ শ্লোকে নং ৬২

তম্, এব, শরনম্, গচ্ছ, সর্বভাবেন, ভারত,

তত্প্রসাদাত্, পরাম্, শান্তিম, স্থানম্, প্রাপ্স্যসি, শাশ্বতম্॥ ৬২॥

অনুবাদ :- (ভারত) হে ভারত (সর্বভাবেন) তুই সর্বপ্রকারে (তম্) ওই অজ্ঞান অন্ধকারে লুকানো পরমেশ্বরের (এব) ই (শরনম্) শরণে (গচ্ছ) যা। (তত্প্রসাদাত্) ওই পরমাত্মার কৃপায় তুই (পরাম্) পরম (শান্তিম) শান্তিকে তথা (শাশ্বতম্) চিরস্থায়ী (স্থানম্) স্থান- ধাম -লোককে (প্রাপ্স্যাসি) প্রাপ্ত হবি।

অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ :-

সর্বধর্মান, পরিত্যজ্য, মাম্, একম্, শরনম্, ব্রজ,
অহম্, ত্বা, সর্বপাপেভ্যঃ, মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ ॥

অনুবাদ :- (মাম্) আমার (সর্বধর্মান) সম্পূর্ণ পুজাকে (পরিত্যজ্য) ত্যাগ করে তুই কেবল (একম্) এক ওই পূর্ণ পরমাত্মার (শরনম্) শরণে (ব্রজ) যা। (অহম) আমি (ত্বা) তোকে (সর্ব পাপেভ্যঃ) সম্পূর্ণ পাপ থেকে (মোক্ষয়িষ্যামি) মুক্ত ক'রে দেব, তুই (মা, শুচঃ) শোক করিস না।

অনুবাদ:-আমার সম্পূর্ণ পূজাকে ত্যাগ করে তুই কেবল এক ঐ পূর্ণ পরমাত্মার শরণে যা, আমি তোকে সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুই শোক করিস না।

উপরোক্ত শ্লোকের ভাবার্থ:- কাল (ব্রহ্ম-ক্ষরপুরুষ) বলছেন, অর্জুন তুই আমার শরণে থাকতে চাইলে তোর জন্ম-মৃত্যু হতে থাকবে। যদি পরম শান্তি এবং সতলোকে যেতে চাস তাহলে ঐ পূর্ণ পরমাত্মার শরণে চলে যা। তারজন্য আমার সর্ব ধার্মিক পূজা অর্থাৎ সতনামের প্রথম মন্ত্র জপের ফল আমাকে ছেড়ে দে। আর সর্বভাবে ঐ এক অদ্বিতীয় সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের শরণে চলে যা। আমি তোকে সর্ব পাপ (ঋণ) থেকে মুক্ত করে দেব। তুই চিন্তা করিস না। সন্তনামের দ্বিতীয় মন্ত্রের কামাই পরব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষর পুরুষকে দিতে হবে। কারণ আমাদের অক্ষর পুরুষের লোক হয়ে সতলোকে যেতে হবে। তার ভাড়া দিতে হবে। পরে তৃতীয় মন্ত্র সতশব্দ অর্থাৎ সারনাম প্রাপ্ত করবে যা সতলোকে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত করাবে।

যদি কোন ব্যক্তি বিদেশে যায় এবং ঐ সরকারের ঋণী হয়ে যায়। তাহলে ঐ ব্যক্তিকে দেশে ফিরে আসতে হলে প্রথমে ঐ দেশের সরকারের ঋণ শোধ করতে হবে। তারপর (No due Certificate) ঋণ মুক্ত প্রমাণ পত্র দিতে হবে। তখন ঐ ব্যক্তিকে ফিরে আসার অনুমতি দেবে। তা না হলে আসতে পারবে না।

সেইরূপ আপনি কাল লোকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে ভক্তিহীন হয়ে ঋণী হয়ে গিয়েছেন। প্রথমে আপনাকে সাবলম্বী বানানো হবে। তারজন্য কবির্দেব (কবীর সাহেব) এই দাসকে (সন্তরামপাল দাস) নিজের প্রতিনিধি (Representative) করে পাঠিয়েছেন। ঐ পরমেশ্বরের তরফ থেকে এই দাস (Guaranter) জামিনদার হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও অন্যশক্তির সঙ্গে পুনরায় আপনাকে কানেকশন (সম্পর্ক) করিয়ে সর্বলাভ প্রাপ্ত করাবেন। আপনি শুধু এই মন্ত্র জপের কামাই দিয়ে কিস্তিতে বিল দিতে থাকবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে না মুক্ত হবেন ততক্ষণ এখানের সর্ব ভৌতিক সুবিধা মিলতে থাকবে। যাতে আপনি দান-পূণ্য ইত্যাদি করে ভক্তির ধনী হতে পারবেন। আমাদের শরীরে যে কমল আছে, শরীর ত্যাগের পরে সেই কমলের রাস্তা দিয়ে পরমাত্মার কাছে যেতে হবে। যেমন (১) মূল কমলে গণেশ (২) স্বাদ কমলে সাবিত্রী ব্রহ্মা (৩) নাভী কমলে লক্ষ্মী-বিষ্ণু, (৪) হৃদয় কমলে পার্বতী, শিব (৫) কণ্ঠ কমলে দুর্গা (অষ্টাঙ্গী) আছেন। এই কমল দিয়ে আমরা তখনই যেতে পারব, যখন এদের ঋণ শোধ করে দেব। প্রথম উপদেশে আপনার সর্ব কমল খুলে যাবে।

অর্থাৎ আপনি ঋণ মুক্ত হয়ে যাবেন। আপনি যখন শরীর ত্যাগ করে যাবেন, তখন আপনার রাস্তা পরিষ্কার থাকবে। অর্থাৎ সমস্ত ঋণমুক্ত প্রমাণ পত্র তৈরি থাকবে।

কিন্তু পূজা আমাদের মূল মালিক কবির্দেবই (কবীর সাহেব) করতে হবে। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী, তার স্বামীর পূজা করে কিন্তু পরিবারের সবাইকে আদর যত্নও করে। যেমন দেবরকে ছোট ভাইয়ের মত, ভাসুরকে বড় ভাইয়ের মত, শ্বশুড়-শাশুড়িকে মাতা, পিতার মত। কিন্তু নিজের পতির প্রতি যে ভাব, তা অন্যের প্রতি হয় না। তাই অজ্ঞানীদের কথায় না চলে বা বিশ্বাস না করে, পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এই দাসের দ্বারা বলা ভক্তি মার্গে শাস্ত্র অনুকূল সাধনায় পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় থাকতে হবে। এই ভক্তি মার্গ সমস্ত শাস্ত্রের আধারে প্রমাণিত।

২. দ্বিতীয় বারে সতনাম প্রদান করা হয়। যা দুই মন্ত্রের। এক ওঁ (ওম্)+ দ্বিতীয় তত্ যা সাংকেতিক। কেবল সাধককে বলা হয়।

৩. তৃতীয় বারে সার নাম দেওয়া হয় যা তিন মন্ত্রের ওম্-তত্-সত্ (তত্-সত্ সংকেতিক) যা সাধকেই বলা হয়।

এই প্রকার সারনাম জপের অভ্যাসে সাধক পরম দিব্য পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর কবির্দেবকে প্রাপ্তি করবে। এবং সতলোকে পরম শান্তি অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি করে।

বিশেষ:- বর্তমানে এই বাস্তবিক সাধনা এই দাস ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই। যদি কেউ আমার কাছে থেকে চুরি করে স্বয়ং গুরু হয়ে নকল শিষ্য বানায় তাহলে সে মানব সমাজের এবং ভক্ত সমাজের ঘোর শত্রু। তার থেকে ভক্ত সমাজ সাবধান থাকবে। তারা অধিকারী না হওয়ার কারণে নিজের জীবনের সাথে-সাথে অন্য ভক্তদের জীবনও নষ্ট করার পাপ মাথায় নিচ্ছে। সেই সাথে তাদেরকে কালের পাঠানো দূত জানবে।

"শঙ্কা সমাধান"

১. প্রশ্ন- উপরোক্ত গীতা সার থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর শিবের পূজা ব্যর্থ। কিন্তু আমি ৩০ বৎসর থেকে শ্রী শিবের পূজা করে আসছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার খুব প্রিয়। আমি এইসব ভগবানকে (প্রভুকে) ছাড়তে পারব না। এদের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। শ্রী গীতার নিত্য পাঠ করি। হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, রাধে শ্যাম, সীতারাম, ওম্ নমঃ শিবায়, ওম্ নমঃ ভগবতে, বাসুদেবায় ইত্যাদি নাম জপ করি। সোমবারের ব্রত-উপবাস করি। মন্দিরে মূর্তি পূজাও করতে যাই। স্বর্গ প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে। পরম্পরাগত পূজার জন্য এক মহন্তের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছি।

উত্তর:- কৃপাকরে আপনি পুনরায় 'গীতার সার'কে পড়ুন যতক্ষণ আপনি তত্ত্বজ্ঞানের সহিত পরিচিত না হবেন, ততক্ষণ শঙ্কারূপী কাঁটা বিঁধতে থাকবে। যেমন উপরে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে উল্টো ঝুলানো সংসার রূপী বৃক্ষ যার মূল (জড়) পূর্ণ পরমাত্মা পরমেশ্বর। আর তিন গুণ রূপী (রজোগুণ- ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) শাখা। আপনি যদি কোন আম গাছ লাগিয়ে মূলের যত্ন করেন (পূজা করেন/ জল, সার দেন) তাহলে এক সময় শাখায় ফল ধরবে। শাখা ভাঙতে হবে না। চিত্রে দেখুন সোজা লাগানো ভক্তিরূপী গাছ অর্থাৎ শাস্ত্র বিধি অনুসার সাধনা।

তাই পূজা পূর্ণ পরমাত্মা অর্থাৎ মূলের করতে হবে। তাহলে কর্ম ফল তিনগুণ

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) রূপী শাখায় লাগবে। এইজন্য কিছুই ছাড়তে হবে না। শুধু মাত্র ভক্তিরূপী গাছ সোজা লাগিয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা প্রারম্ভ করতে হবে।

বর্তমানে সমস্ত পবিত্র ভক্ত সমাজ-শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজেদের ইচ্ছা মত আচরণ করছে। অর্থাৎ ভক্তি রূপী গাছ উল্টা লাগিয়ে রেখেছে। যদি কেউ এমন ভাবে গাছ লাগায় তাহলে তাকে মূর্খ বলা হবে। (দেখুন উল্টো লাগানো ভক্তিরূপী গাছের চিত্র)

এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৮ পর্যন্ত তিন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব)-এর পূজা সীমিত বুদ্ধির লোকেরা এনাদের ছাড়া অন্য কারো পূজা করে না। তাদের রাক্ষস স্বভাবকে ধারণ করে রেখেছে। তাঁরা মানুষের মধ্যে নীচ এবং দুষিত কর্ম করে, এদের মূর্খ বলা হয়েছে। বলেছে এসব মূর্খ লোক আমার পূজাও করে না। পরে নিজের সাধনা কেও গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু (ব্রহ্ম-ক্ষরপুরুষ) অতি অশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্যর্থ বলেছেন। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২, ৬৪, ৬৬ তথা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪-এ বলেছে ঐ পূর্ণ পরমাত্মার শরণে যা। তাঁর পূজার বিধি তত্ত্বদর্শী সন্তের বলা মার্গ-এ কর। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪-এ তত্ত্বদর্শী সন্তের দিকে ইশারা করেছে) ঐ পূর্ণ পরমাত্মার সাধনা শাস্ত্র বিধি অনুসারে করলে সাধক পরম শান্তি তথা সতলোক প্রাপ্তি করে। অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি করে। গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু (ক্ষরপুরুষ-কাল) বলছেন যে, আমিও তাঁর শরণে আছি অর্থাৎ আমারও ইষ্টদেব ঐ পূর্ণ পরমাত্মা আমিও তাঁর পূজা করি। তাই অন্য সবাইকে তাঁর পূজা করা উচিত। আপনি গীতার নিত্য পাঠ করেন কিন্তু সাধনা গীতায় বর্ণিত বিধির (নিয়ম) বিরুদ্ধে করছেন। যে মন্ত্রের (হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, রাধে শ্যাম, সীতারাম, ওম্ নমঃ শিবায়ঃ, ওম্ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়ঃ ইত্যাদি মন্ত্র) জপ আপনি করেন এবং অন্য সাধনা ব্রত করা, তীর্থ ধামে দান বা পূজার জন্য যাওয়া গঙ্গা স্থান, তীর্থে স্নান, পবিত্র গীতায় বর্ণিত না হওয়ার কারণে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমতো আচরণ হয়। পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪-এই সব সাধনা ব্যর্থ বলেছে।

"গদি তথা মহন্ত পরম্পরা বিষয়ে আলোচনা"

কোন নির্জন স্থানে শহর বা কোন গ্রামে কোন মহান আত্মা বা সাধক ছিল। তাঁর শরীর ত্যাগের পরে, স্মৃতি বানিয়ে রাখার জন্য অন্তিম সংস্কার স্থলে পাথর বা ইটের সমাধি চিহ্ন তৈরী করা হয়। পরে ঐ পবিত্র আত্মার ভক্ত বা বংশের লোকেরা মূর্তি তৈরী করে রাখে। কিছুদিন পরে শ্রদ্ধালুরা যাওয়া শুরু করে ও ধন দান করতে থাকে। মন্দিরের রূপ দিতেই ঐ সন্তের বা ঋষির বংশধরদের ধন উপার্জনের লোভ হয়, এবং প্রলোভন দেওয়া শুরু করে যে, এখানে দর্শন করতে আসলে তাঁর পূর্ণ মোক্ষ হবে, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এই মূর্তিকে সাক্ষাৎ ঐ সন্ত মহাপুরুষ জানো। এখানে না আসলে মুক্তি সম্ভব নয় ইত্যাদি।

ঐ অজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করুন, এক কবিরাজ (বৈদ্য) ছিল। সে নাড়ী দেখে ওষুধ দিলে রোগ ভালো হয়ে যেত। ঐ বৈদ্যের মৃত্যুর পরে তাঁর মূর্তি স্থাপন করে কোন লোভী ব্যক্তি যদি বলে, এই মূর্তি ঐ কবিরাজের হয়ে কাজ করে। যে এখানে দর্শন করতে আসবে সে সুস্থ হয়ে যাবে এবং নিজেই নকল বৈদ্য হয়ে বসে বলে, আমিও ওষুধ দিই। কিন্তু ঐ নকল কবিরাজ ওষুধ ও ব্যবস্থা গ্রন্থের বিপরীতে

দেয়। এই নকল বৈদ্য সবাইকে ঠকাচ্ছে কারণ তার শুধুমাত্র ধন উর্পাজন করার উদ্দেশ্যে। যে কোন সন্ত বা প্রভুর মূর্তি সম্মানীয় হয় কিন্তু পূজনীয় নয়।

যদি কোন সন্ত বা ভগবানের মূর্তি তৈরী করে তাকে ঢাল করে কোন পূজারী বা মহন্ত যদি বলে আমিও নাম দিই। কিন্তু ঐ ব্যক্তি সমস্ত সাধনা ঐ পবিত্র শাস্ত্রের বিপরীত দেয় যা সেই মহান সন্ত নিজের অনুভবে লিখে রেখেছিলেন। এই নকল সন্ত বা মহন্ত স্বয়ং দোষী হচ্ছে এবং নিজের অনুগামী দেরও দোষী বানিয়ে জীবনকে ব্যর্থ করার ভার মাথায় নিচ্ছে। তত্ত্বদর্শী সন্ত এক সময়ে এক জনই পৃথিবীতে আসেন। কোটি কোটি নকল সন্ত, মহন্ত ও আচার্যরা তাঁর মার্গের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

কোন সন্তের শরীর ত্যাগের পরে সন্ত বা মহন্ত পরম্পরা শুরু হয়। পূর্ব সন্তের স্থান রক্ষার্থে প্রবন্ধক নিযুক্ত করা হয় তাকে মহন্ত বলা হয়। ঐ মহন্তকে ঐ পবিত্র স্মৃতির রক্ষনা বেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়। পরে লোভের জন্য স্বয়ংই গুরু হয়ে বসে, এবং ভক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখা পূন্য ভক্ত আত্মা ঐ নকল সন্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে (আধারিত হয়ে) নিজের জীবনকে নষ্ট করে দেয়।

মহন্ত পরম্পরার এক নিয়ম তৈরী করে রেখেছে, যে পূর্ব মহন্তের প্রথম পুত্রই মহন্ত পদের অধিকারী হবে। সে অজ্ঞানী হোক বা মাতাল । এটা ভক্তি মার্গ, এখানে পূর্ণ সন্তই পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেন বা জীবকে উদ্ধার করতে পারে। আমি (সন্ত রামপাল দাস) দুই/তিন টি মহন্ত পরম্পরার পুস্তক পড়েছি তার কাহিনী নিম্নে বর্ণিত করা হল।

১. এক ২ বৎসরের ছেলেকে গুরুর গদিতে বসায়, পরে সে বড় হয়ে নাম উপদেশ দেওয়া শুরু করে।

দ্বিতীয় পুস্তকে পড়ি, এক পাঁচ বৎসরের বাচ্চার পিতা মহন্ত ছিল। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর মাতা এবং অন্য সন্তরা পাঁচ বৎসরের বাচ্চাকে মহন্ত নিযুক্ত করে। কয়েক বৎসর পরে সে গুরু হয়ে যায়।

২ অন্য এক মহন্ত পরম্পরার ইতিহাস পড়েছি। মহন্তজীর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যু হয়। ভাই-এর মৃত্যু আগেই হয়েছিল। তাঁরও কোন সন্তান ছিল না। গদীর দেখাশোনা করার জন্য এক সেবক কে অস্থায়ী মহন্ত রূপে নিযুক্ত করা হয়, যত দিন পর্যন্ত ঐ কুলে পুত্র সন্তান না হয়। কিছু সময় পর মহন্ত কূলে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অস্থায়ী মহন্ত গদি নিয়ে পালায়। এবং অন্য শহরে স্বয়ং গদি স্থাপনা করে মহন্ত হয়ে বসে। ওখানে নতুন দোকান খোলে। পূর্বের স্থানে এক আড়াই বৎসরের বাচ্চাকে মহন্ত বানিয়ে দেওয়া হয়।

(৩) এক মহন্ত পরম্পরার ইতিহাসে দেখেছি, বড় পুত্র ঘর ত্যাগ করে চলে যায়। মেজো ছেলেকে মহন্ত পদে নিযুক্ত করে। কিছু সময় পরে ওখানে মন্দির তৈরি হলে অধিক দান পূজা, দক্ষিণা আসতে থাকে। তখন ঐ বড় ছেলের সন্তান বলে, এই মন্দিরে আমার অধিকার। তখন ঝগড়া শুরু হয়। গদিতে বিরাজমান মহন্তকে হত্যা করা হয়। পরে তার বড় পুত্রকে মহন্ত অর্থাৎ গদির অধিকারী নিযুক্ত করা হয়। তাকেও হত্যা করা হয়। তখন তার দ্বিতীয় ভাইকে গদিতে বসানো হয়। বড় ভাইয়ের ছেলে যে নিজেকে উত্তরাধিকারী বলতো নতুন স্থান তৈরী করে নতুন দোকান খোলে। একে অন্যের উপর কেস/মোকদ্দমা করে সুখময় জীবন কে লোভের

কারণে নরকে পরিণত করে। ওখানে ধাম কোথায় থাকল? সে তো মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মাঠ হয়ে গেল। কিছু মহন্ত-সন্ত বলার এজেন্সী নিয়ে রেখেছে। লাল বস্ত্র ধারণ করিয়ে পূর্বের নাম পরিবর্তন করিয়ে নতুন নাম দেয়। পরে ঐ নকল সন্তের নকল শিষ্য সন্ত হয়ে সহজ-সরল ভক্ত আত্মাদের জীবন নিয়ে খেলা করে, অর্থাৎ অমূল্য মনুষ্য জীবনের সর্বনাশ করে পাপের ভাগী হয়।

যখন রাজা পরীক্ষিত কে সাপে কাটার অভিশাপ দিয়ে ছিল, তখন পূর্ণ গুরুর প্রয়োজন হয়। কারণ পূর্ণ গুরু ছাড়া জীবের কল্যাণ অসম্ভব। ঐ সময় পৃথিবীর সমস্ত ঋষিরা রাজা পরীক্ষিতকে নাম দীক্ষা এবং সাতদিন যাবত শ্রীমদ্ভগবদ্ সুধাসাগর পাঠ করে শোনানোর জন্য মানা করে দেয়। কারণ সপ্তম দিনে অঘটন ঘটবে জেনে কেউ সামনে আসেনি। শ্রীমদ্ভগবদ্ সুধাসাগরের রচয়িতা বেদ ব্যাস স্বয়ং অসমর্থতা ব্যক্ত করে। কারণ ঐ ঋষিগণ প্রভুকে ভয় পেত। এইজন্য রাজা পরীক্ষিতের জীবন নিয়ে খেলা করা উচিত মনে করেন নি।

রাজা পরীক্ষিতের কল্যাণের জন্য মহর্ষি সুখদেবকে স্বর্গ থেকে ডেকে আনা হয়। তিনি রাজাকে দীক্ষা দেন এবং সাতদিন পর্যন্ত কথা শুনিয়ে যতটা সম্ভব উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। বর্তমানের গুরু সন্ত, মহন্ত ও আচার্যরা স্বয়ং প্রভুর সংবিধানের সহিত পরিচিত নয়। এইজন্য ভয়ঙ্কর দোষ করে দোষী হচ্ছে।

ঔরোঁ পন্থ্ বতাবহীঁ, স্বয়ং ন জানে রাহ।
অনঅধিকারী কথা-পাঠ করে ব দীক্ষা দেবেঁ, বহুত করত গুণাহ।

বর্তমানে কথা, গ্রন্থপাঠ করানোর ও নাম দীক্ষা দেওয়ার বন্যা এসে গিয়েছে। কারণ সর্ব পবিত্র ধর্মের পবিত্র আত্মারা তত্ত্বজ্ঞানের সহিত পরিচিত নয়। যার কারণে নকল গুরু, মহন্ত ও সন্তরা সুযোগ পাচ্ছেন। যখন এই পবিত্র আত্মারা তত্ত্বজ্ঞানের সাথে পরিচিত হবে তখন এই নকল, গুরু, সন্ত ও মহন্তদের লুকানোর জায়গা থাকবে না।

“পবিত্র তীর্থ ধামের বিষয় জানা”

কোন সাধক বা ঋষি, কোন এক স্থানে বা জলাশয়ে কাছে বসে সাধনা করেন বা নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রদর্শন করেন তিনি নিজের ভক্তি কামাই (পুঁজি) কে সঙ্গে নিয়ে ইষ্ট লোকে চলে যান। পরে ঐ সাধনা স্থল কে ধাম বা তীর্থের নাম দেওয়া হয়। এখন যদি কেউ দেখার জন্য ওখানে যায় যে এখানে এক সাধক ছিলেন। তিনি অনেক লোকের কল্যাণ করেছেন। কিন্তু এখন তিনি আর নেই যে উপদেশ দেবেন। তিনি তো নিজের কামাই করে চলে গিয়েছেন।

বিচার করুন:- মনে করি তীর্থ বা ধাম এক হামানদস্তা। (লোহার এক খোড়ল এবং ডাণ্ডা বিভিন্ন জিনিস গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহার করা হয়।) এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর হামনদস্তা এনে হবন সামগ্রী গুঁড়ো করে ভালো করে ধুয়ে-মুছে হামনদস্তা ফিরিয়ে দেয়। যে ঘরে হামনদস্তা রাখা ছিল, সেখান থেকে সুগন্ধ আসতে লাগে। বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারে প্রতিবেশি কোন সুগন্ধ যুক্ত বস্তু গুঁড়ো করেছে। কিছুদিন পরে ঐ সুগন্ধ আসা বন্ধ হয়ে যায়।

ঠিক এই প্রকার ধামকে একটি হামানদস্তা জানুন। যেমন সামগ্রী গুড়ো করা

ব্যক্তি নিজের সব বস্তু ধুয়ে মুছে রেখে দিয়েছে। কেবল হামামদস্তা ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন কেউ যদি হামানদস্তার গন্ধ শুকেই কৃত্যার্থ মনে করে তাহলে তার বোকামি। তাকেও সামগ্রী আনতে হবে, তবেই লাভ পাওয়া যাবে।

ঠিক তেমন কোন ধাম বা তীর্থে থাকা পবিত্র আত্মা রাম নামের কামাই সামগ্রী কেটে কুটে ঝাড়-পোছা করে সর্ব পুঁজি সাথে নিয়ে চলে গিয়েছে। পরে অজ্ঞান শ্রদ্ধালুরা যদি মনে করে ঐ স্থানে গেলে বা দর্শনে কল্যাণ হবে। এইসব কথা তাঁদের মার্গ দর্শকদের বলা (গুরুদের) শাস্ত্রবিধি রহিত সাধনার পরিণাম। কিন্তু কল্যাণ তো তখন সম্ভব হবে যখন ঐ মহান সন্তের মত প্রভু সাধনা করবে। তার জন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করুন, তাঁর থেকে উপদেশ নিয়ে আজীবন ভক্তি করে মোক্ষ প্রাপ্ত করুন। শাস্ত্র বিধি অনুসার সত্ সাধনা আমার (সন্ত রামপাল জী মহারাজ) কাছে উপলব্ধ, কৃপা করে নিঃশুল্ক প্রাপ্ত করুন।

"শ্রী অমরনাথ ধাম কিভাবে স্থাপন হয়?"

ভগবান শঙ্কর পার্বতীকে নির্জন স্থানে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই মাতা পার্বতী এতোটা মুক্তিপ্রাপ্ত করেন, যত দিন প্রভু শিবের মৃত্যু হবে না, তত দিন মাতা উমারও মৃত্যু হবে না। সাত শ্রীব্রহ্মার (রজোগুণ) মৃত্যুর পরে এক সত্ত্বগুণ শ্রীবিষ্ণুর (সত্ত্বগুন) মৃত্যু হয়। সাত শ্রীবিষ্ণুর মৃত্যুর পরে এক তমোগুণ শিবের মৃত্যু হয়। তখন মাতা পার্বতীরও মৃত্যু হবে। পূর্ণ মোক্ষ হবে না। তবুও যতটা লাভ মাতা পার্বতীর হয়েছে তা অধিকারী থেকে উপদেশ মন্ত্র নেওয়ার পরে হয়েছে। পরে শ্রদ্ধালুরা ঐ স্থানের স্মৃতি রক্ষা করার জন্য তাকে সুরক্ষিত করে রাখে এবং দর্শন করতে যেতে শুরু করে।

যেমন এই দাস (সন্ত রামপাল) বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সতসঙ্গ করতাম এবং সেখানে ক্ষীর, হালুয়া ইত্যাদি তৈরী করতাম। যে ভক্ত আত্মারা উপদেশ প্রাপ্তি করত তাদের কল্যাণ হত। সত্সঙ্গ শেষে তাবু (টেন্ট) ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে অন্য স্থানে চলে যেতাম। পূর্বের স্থানে কেবল ইট, মাটি দ্বারা বানানো উনুন থেকে যেত। পরে যদি কেউ বলে এসো তোমাকে ঐ স্থান দেখিয়ে নিয়ে আসি যেখানে সন্ত রামপালজী মহারাজ সত্সঙ্গ করেছিলেন এবং খুব সুস্বাদু ক্ষীর বানিয়েছিলেন। ঐ উনুন (ভাট্টা) দেখতে যাওয়া লোকেরা না ক্ষীর পাবে,না সৎসঙ্গের অমৃত বচন শুনতে পাবে,আর না নাম উপদেশ নিতে পারবে। তারজন্য সন্তের খোঁজ করতে হবে। যেখানে সত্সঙ্গ চলছে সেখানে সমস্ত কার্জ সিদ্ধ হবে।

তীর্থ বা ধামে যাওয়া মানে স্মৃতি চিহ্ন দেখা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এটা পবিত্র গীতায় বর্ণিত না হওয়ার কারণ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কাজ। এতে কোন লাভ প্রাপ্তি হয় না (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র ২৩-২৪)।

তত্ত্বজ্ঞান হীন সন্ত বা মহন্ত ও আচার্যগণের দ্বারা ভ্রমিত শ্রদ্ধালুরা তীর্থ বা ধামে আত্মা কল্যাণের জন্য যায়। শ্রী অমরনাথ তীর্থ দর্শনে যাওয়া অনেক শ্রদ্ধালু তুষার ঝড়ে মৃত্যু বরন করে। প্রত্যেকবার মৃত্যুর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। বিচারনীয় বিষয়, যদি শ্রী অমরনাথের দর্শন বা পূজা লাভদায়ক হয় তাহলে ভগবান শিব ঐ শ্রদ্ধালুদের কেন রক্ষা করেন নি? অর্থাৎ প্রভু শিব শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনায় প্রসন্ন নয়।

"বৈষ্ণব দেবীর মন্দিরের স্থাপনা কি ভাবে হয়েছে?"

যখন সতী (উমা দেবী) নিজের পিতা রাজা দক্ষের হবন (যজ্ঞ) কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু প্রাপ্ত করে, তখন ভগবান শিব মোহবশত সতীর কঙ্কাল শরীর কাঁধে নিয়ে হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত পাগলের মত ঘুরতে থাকেন। তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেন। যেখানে ধর পরে ছিল সেখানে ধর মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। এই ধার্মিক ঘটনার স্মৃতি চিহ্ন বানিয়ে রাখার জন্য ওখানে একটি মন্দির বানানো হয়। কারণ পরে যেন কেউ না বলতে পারে পুরাণে মিথ্যা কথা লেখা আছে। ঐ মন্দিরে এক স্ত্রীর চিত্র রেখে দিয়ে তাকে বৈষ্ণবদেবী বলতে শুরু করে। পরে ঐ স্মৃতি চিহ্ন দেখা শোনার জন্য বা শ্রদ্ধালুদের ও স্থানের কাহিনী বলার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। তাকে অন্য ধার্মিক ব্যক্তি কিছু বেতন দিতে থাকে। পরে ধীরে ধীরে তার বংশধরগণ দান নেওয়া শুরু করে এবং মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করে দেয়। এক ব্যক্তির ব্যবসায় লোকসান হয়ে যায়, তিনি মায়ের কাছে ১০০ টাকা সংকল্প করেন এবং এক নারকেল চড়ায়। পরে সে ধনবান হয়ে যায়। এক নিঃসন্তান দম্পতি, দুইশত টাকা, একটি শাড়ি, একটি সোনার তৈরী গলার হার দেওয়ার সংকল্প করেন। তাদেরও পুত্র প্রাপ্তি হয়।

এইভাবে সহজ-সরল ভক্ত আত্মারা শোনা কথায় বিশ্বাস করে পবিত্র গীতা, পবিত্র বেদকে ভুলে গিয়েছে। এইসব সাধনা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যার কারণে না কোন সুখ হয়, না শান্তি, না কোন কার্য সিদ্ধি হয় (প্রমাণ গীতা অধ্যায়-১৬ শ্লোক-২৩-২৪)। ঠিক তেমনই যেখানে দেবীর চোখ (আঁখ) পড়েছে সেখানে নৈনা দেবীর মন্দির, যেখানে জিহ্বা পড়েছে সেখানে জ্বালাদেবীর মন্দির, আর যেখানে ধর পড়েছে সেখানে বৈষ্ণো দেবীর মন্দির স্থাপিত হয়েছে।

"পুরীতে শ্রী জগন্নাথের মন্দির অর্থাৎ ধাম কিভাবে তৈরী হয়েছে"

উড়িষ্যা প্রান্তে এক ইন্দ্রদমন নামের এক রাজা ছিলেন। তিনি ভগবান কৃষ্ণের অনন্য ভক্ত ছিলেন। এক রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন, জগন্নাথ নামে আমার এক মন্দির তৈরী করে দাও। শ্রীকৃষ্ণ এটাও বলেন ওখানে মূর্তি পূজা করবে না। কেবল এক সন্তকে রাখবে যে গীতার জ্ঞান প্রচার করবে। সমুদ্রতীরে মন্দির বানানোর স্থানও দেখিয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজা পত্নীকে বলেন আজ রাত্রে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে মন্দির তৈরী করতে বলেছেন। রানী বলেন শুভকর্মে দেরি কেন? এ সব তো তারই দেওয়া। তাকে দিতে চিন্তা কিসের? রাজা চিহ্নিত স্থানে মন্দির তৈরী শুরু করেন। মন্দির তৈরী করার পরে সমুদ্রে তুফান উঠে আর মন্দিরকে ভেঙে দেয়। মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রাজা পাঁচবার এইভাবে মন্দির তৈরী করেন। সমুদ্র পাঁচবারই একই ভাবে মন্দির ভেঙে দেয়।

রাজা নিরাশ হয়ে মন্দির তৈরী করার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। রাজা চিন্তা করেন, না জানি সমুদ্র কোন জন্মের প্রতিশোধ নিচ্ছে। তহবিল (কোষাগার) খালি হয়ে গিয়েছে কিন্তু মন্দির তৈরী করতে পারলাম না। কিছু দিন পরে পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব) কালকে দেওয়া বচন অনুসারে রাজা ইন্দ্রদমনের কাছে এসে বলেন, রাজা আপনি মন্দির তৈরী করুণ। এবার সমুদ্র মন্দির ভাঙবে না। রাজা বলেন সন্তজী! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মন্দির তৈরী

করেছিলাম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণজী সমুদ্রকে ঠেকাতে (রুখতে) পারছেন না। ভেবে ছিলাম শ্রীকৃষ্ণজী পরীক্ষা নিচ্ছে তাই পাঁচ বার মন্দির তৈরী করি। এখন কোষাগারে (তহবিলে) টাকা নেই। এখন আমার দ্বারা মন্দির বানানো সম্ভব নয়। পরমেশ্বর বললেন, রাজন! যে পরমেশ্বর সমস্ত সৃষ্টির রচনাহার তিনি সর্ব কার্য করতে সক্ষম। আমি সেই পরমেশ্বরের বচনশক্তি প্রাপ্ত করেছি। আমি সমুদ্রকে আটকে দিতে পারি। (পরামাত্মা নিজেকে লুকানোর জন্য সন্ত বলছেন) রাজা বলেন, সন্তজী আমি বিশ্বাস করি না শ্রীকৃষ্ণের থেকেও কোন বড় শক্তি আছে। তিনি যখন সমুদ্রকে থামাতে পারছেন না তখন আপনি কোন খেতের মূলী, অর্থাৎ আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। সন্ত রূপে আসা কবির্দেব কবীর পরমেশ্বর বলেন, যদি মন্দির বানানোর ইচ্ছা হয় তাহলে আমার কাছে এসো আমি অমুক স্থানে থাকি সমুদ্র এবার আর মন্দির ভাঙবে না। এই কথা বলে প্রভু (পরমেশ্বর) চলে যায়।

ঐ রাত্রে প্রভু শ্রী কৃষ্ণ আবার রাজাকে দর্শন দিয়ে বলেন ইন্দ্রদমন আর একবার মন্দির বানিয়ে দাও। যে সন্ত তোমার কাছে এসেছিল তাঁর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করো। ঐ সন্ত কোন সাধারণ সন্ত নয়। ওনার ভক্তি শক্তি অতুলনীয়।

রাজা সকালে ঘুম থেকে উঠে রানীকে সকল বৃত্তান্ত বলেন। রানী বলেন, প্রভুর যখন ইচ্ছা তখন দুশ্চিন্তা কিসের। প্রভুর মহল বানিয়ে দাও। রানীর কথা শুনে রাজা বলেন, এখন কোষাগারও খালি হয়ে গেছে। কিভাবে মন্দির বানাই। মন্দির না বানালে প্রভু অপ্রসন্ন হবেন। আমি তো ধর্ম সংকটে ফেঁসে গিয়েছি। রানী বলেন, আমার কাছে যে গহনা আছে তাতে মন্দির তৈরি হয়ে যাবে। আপনি গহনা নিয়ে মন্দির তৈরি করুন। রানী নিজের সমস্ত অলংঙ্কার (গহনা) প্রভু নিমিত্ত পতির চরণে রেখে দেন। সন্তরূপী পরমেশ্বর যে স্থানের কথা বলেছিলন রাজা সেই স্থানে যান। এবং সমুদ্রকে থামানোর জন্য প্রার্থণা করেন। প্রভু কবীর জী বলেন, যে দিক থেকে সমুদ্র উঠে আসে সেই দিকে সমুদ্র তীরে একটি চৌরা (বসার জায়গা) তৈরী করে দাও। আমি ওখানে বসে ভক্তি করব এবং সমুদ্র কে আটকাব। রাজা একটি বড় পাথর দিয়ে মিস্ত্রি দ্বারা প্রভুর বসার জায়গা তৈরী করে দেন। তখন পরমেশ্বর কবীর ওখানে বসলেন । ষষ্ঠবার মন্দির তৈরীর কাজ শুরু হয়। তখন নাথ পরম্পরার এক সিদ্ধি যুক্ত সন্ত এসে বলেন, রাজা খুব সুন্দর মন্দির তৈরি করছ এখানে মূর্তি স্থাপিত করা দরকার। মূর্তি ছাড়া মন্দির হয় নাকি? এটা আমার আদেশ। রাজা হাত জোড় করে বললেন, হে নাথ! প্রভু স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন, মন্দিরে কোন মূর্তি থাকবে না আর কোন পাখণ্ডি পূজাও হবে না। রাজার কথা শুনে নাথ বলেন, স্বপ্ন সত্যি হয় নাকি? চন্দনের কাঠ দিয়ে মূর্তি বানাও, অবশ্যই মূর্তি স্থাপিত করবে। এই কথা বলে নাথ জল পান না করেই রেগে চলে যান। রাজা ভয়ে চন্দনের কাঠ এনে মিস্ত্রিকে মূর্তি বানাতে বলেন। শ্রীনাথ জী শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি বানাতে বলেছিলেন। পরে অন্য গুরু ও সন্তরা রাজাকে পরমর্শ দেন, প্রভু একা কিভাবে থাকবেন? শ্রী কৃষ্ণের সাথে বলরাম সব সময় থাকতেন। আর একজন বলেন, শুভদ্রা শ্রী কৃষ্ণের একমাত্র আদরের বোন সে ভাইদের ছাড়া কিভাবে থাকবে? তখন তিন মূর্তি তৈরির সিদ্ধান্ত হয় এবং তিন মিস্ত্রি নিযুক্ত করা হয়। মূর্তি তৈরি হতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। এ রকম তিন বার মূর্তি খন্ডিত হয়ে যায়। রাজা খুবই চিন্তিত হন। ভাবেন আমার ভাগ্যে এই যশ ও পূর্ণ কর্ম লেখা নেই। আগে মন্দির বানালেও ভেঙে যেত,

এখন মূর্তি বানায় তাও ভেঙে যায়। নাথ-কে যদি বলি মূর্তি ভেঙে যাচ্ছে তাহলে নাথ মনে করবেন রাজা বাহানা বনাচ্ছে। আমাকে কখন না অভিশাপ দিয়ে দেন! এই চিন্তায় রাজার ঘুম খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

রাজা সকালে চিন্তা গ্রস্থ হয়ে রাজদরবারে যান। ঐ সময় পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবির প্রভুর একজন ৮০ বর্ষীয় কারিগরের রূপ ধারন করে রাজদরবারে উপস্থিত হন। কোমরে ঝোলা বাঁধা, সেই ঝোলার বাইরে করাত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঝোলার মধ্যে, এমন ভাব ভঙ্গিমায় মিস্ত্রির পরিচয় দিয়ে প্রভু রাজাকে বলেন, আমি শুনেছি প্রভুর মন্দিরের জন্য মূর্তি তৈরির কাজ পূর্ণ হচ্ছে না। আমার বয়স ৮০ বৎসর হয়ে গিয়েছে। আমার ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চন্দন কাঠের মূর্তি প্রত্যেক কারিগর বানাতে পারে না। যদি আপনার আজ্ঞা হয় তাহলে সেবক উপস্থিত। রাজা বললেন, আপনি আমার জন্য ভগবান হয়ে এসেছেন। আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম, ভাবছিলাম কোনো দক্ষ কারিগর পেলে সমস্যার সমাধান হবে। আপনি শীঘ্র মূর্তি তৈরি করুন। কারিগর রূপে কবির্দেব (কবীর প্রভু) বলেন, রাজা! আমাকে একটি ঘর দেন। আমি সেখানে বসে দরজা বন্ধ করে মুর্তি তৈরি করব। মূর্তি তৈরীর পরে দরজা খুলে দেব। যদি কেউ এর মধ্যে দরজা খোলে তাহলে মূর্তি যতটা হবে ততটাই থেকে যাবে। রাজা বলেন, আপনি যেটা ভালো বোঝেন তাই করুন।

মূর্তি বানানোর বারো দিন পরে নাথ জী আসেন। নাথজী রাজাকে বলেন, ইন্দ্রদমন মূর্তি তৈরি হয়েছে? রাজা হাত জোড় করে বলেন, আপনার আদেশ পালন করা হয়েছে মহাত্মাজী। কিন্তু আমার দুভার্গ্য মূর্তি বানাতেই ভেঙে যাচ্ছিল। দাসদের দিয়ে ভাঙ্গা টুকরো গুলি আনিয়ে নাথ জীকে দেখান, নাথজী যাতে বিশ্বাস করেন। নাথজী বলেন, মূর্তি অবশ্যই বানাতে হবে। এখন আমার সামনে বানাও দেখি কিভাবে ভাঙে। রাজা বলেন, নাথজী চেষ্টা করা হচ্ছে প্রভুর পাঠানো এক অনুভবী কারিগর ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ তিনি বন্ধ রুমের ভিতরে বসে মূর্তি বানাচ্ছেন। কারিগর বলেছে, মূর্তি তৈরি হলে আমি দরজা খুলে দেব। যদি এর মধ্যে কেউ দরজা খোলে তাহলে মূর্তি যতটা তৈরি হবে ততটাই থেকে যাবে।

আজ মূর্তি তৈরির বারো দিন হয়ে গিয়েছে। না বাইরে এসেছে, না জল পান করেছে আর না আহার করেছে। নাথজী বলেন, মূর্তি দেখা দরকার কেমন তৈরি হচ্ছে। তৈরি হওয়ার পরে দেখে কি লাভ। নাথজী রাজা ইন্দ্রদমনকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঘরের সামনে গিয়ে দরজা খোলার জন্য কারিগর কে ডাকে। দ্বার খোলো! দ্বার খোলো! কয়েক বার ডাকে কিন্তু দরজা খোলে না। ভিতর থেকে যে খটখট্ শব্দ আসছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। নাথজী বললেন ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ বলছেন, ১২ দিন না খেয়ে আছে। এখন ভিতরের শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে। কারিগর মারা যায়নি তো? ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে দেন, দেখেন তিনটি মূর্তি রাখা আছে। তাদের হাতের ও পায়ের পাঞ্জা বানানো হয়নি। কারিগর অন্তর্ধ্যান ছিল।

মন্দির তৈরি হয়ে গিয়েছে তাই অন্য কোন উপায় না দেখে জেদি নাথজী বলেন, এই মূর্তিই স্থাপিত করে দাও। হতে পারে এটাই প্রভুর ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মূর্তি তৈরি করে গিয়েছেন।

মুখ্য পাণ্ডে শুভ মুহূর্ত বের করে পরের দিন মূর্তি স্থাপিত করে দেয়। সর্ব

পাণ্ডে এবং মূখ্য পণ্ডিত, রাজা ও সৈনিক এবং শ্রদ্ধালুরা মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মন্দিরের দিকে যেতে লাগেন। পরমেশ্বর এক শূদ্রের রূপ ধারণ করে মন্দিরের মূখ্য দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমন লীলা করেন যেন তিনি কিছুই জানেন না, বা কোন জ্ঞান নেই যে পিছন দিক থেকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য পণ্ডিত, রাজা ও সেনারা আসছে। আগে আগে মুখ্য পান্ডা আসছে,পরমেশ্বর তবুও দ্বারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। নিকটে এসে মূখ্য পণ্ডিত শুদ্ররূপী পরমেশ্বরকে এতো জোরে ধাক্কা মারে যে, দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েন এবং একান্ত স্থানে গিয়ে শুদ্ররূপে লীলা করতে বসে যান। সর্ব শ্রদ্ধালুরা ভিতরে গিয়ে দেখে সমস্ত মূর্তি ঐ দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা শূদ্রের রূপ (পরমেশ্বরের) ধারণ করে আছে। এই কৌতুক দেখে উপস্থিত ব্যক্তিরা আশ্চর্য হয়ে যায়। মূখ্য পণ্ডিত বলতে লাগে প্রভু ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ ঐ শুদ্র মুখ্যদ্বার কে অশুদ্ধ করে দিয়েছে। এইজন্য সর্বমূর্ত্তি শুদ্র রূপ ধারণ করে নিয়েছে। বড় অনিষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিছু সময় পরে মূর্তির বাস্তবিক রূপে ফিরে আসে। তখন মূর্তির গায়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে পবিত্র করতে লাগে। (কবির্দেব বলেন অজ্ঞানতা ও পাখণ্ডের চরম সীমা দেখো। কারিগর মূর্তির ভগবান বানায় । পরে পূজারী বা অন্য সন্ত ঐ মূর্তি রূপী প্রভুতে প্রাণ দেয় অর্থাৎ প্রভুর জীবন দান দেন। তখন মাটি বা কাঠ বা পাথরের প্রভু কার্য সিদ্ধি করে। বাহ রে পাখণ্ডীরা! খুব মূর্খ বানাচ্ছো প্রভুপ্রেমী আত্মাদের)।

মূর্তি স্থাপন হওয়ার কয়েক দিন পরে প্রায় ৪০ ফুট উচু সমুদ্রের তুফান (ঢেউ) ওঠে এবং খুব দ্রুত গতিতে মন্দিরের দিকে ধেয়ে আসে। সামনে কবীর সাহেব বেদীর (চবুতরের উপর) উপর বসে ছিলেন। নিজের এক হাত উপরে উঠান যেন আশীর্বাদ দিচ্ছেন। সমুদ্র যেমন উঠেছিল তেমন পর্বতের মত খাড়া দাঁড়িয়ে যায়। আগে আসতে পারে না। সমুদ্র বিপ্র রূপ ধারণ করে প্রভুর কাছে এসে বলেন, ভগবান আপনি আমাকে রাস্তা দেন। আমি মন্দির ভাঙতে যাব। প্রভু বলেন, ওটা মন্দির নয়, ওটা মহল (আশ্রম)। এখানে বিদ্বান পুরুষ থাকবে এবং পবিত্র গীতার জ্ঞান প্রচার করবে। এই আশ্রম নষ্ট করা আপনার শোভা দেয় না। সমুদ্র বলে আমি এটাকে অবশ্যই ভাঙবো! প্রভু বলেন, যাও! কে মানা করছে? সমুদ্র বলে আমি আপনার সামনে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছি,আপনার শক্তি অপার। আপনি আমাকে রাস্তা দেন প্রভু। পরমেশ্বর কবীর সাহেব বলেন, আপনি কেন এমন করছেন ? বিপ্ররূপী সমুদ্র বলেন, এই শ্রীকৃষ্ণ ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রূপে এসেছিল। তখন আমাকে অগ্নিবাণ দেখিয়ে অপমান করে রাস্তা চেয়েছিল। আমিসেই প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি।

পরমেশ্বর কবীরজী বললেন প্রতিশোধ তো আপনি আগেই নিয়েছেন। আপনি দ্বারকা নগরীকে ডুবিয়ে রেখেছেন। সমুদ্র বলে,ওখানেও অর্ধেক বাকি আছে, পূর্ণ ভাবে ডোবাতে পারিনি। কারণ ওখানেও এক প্রবল শক্তি যুক্ত সন্ত সামনে এসেছিল, এখনো চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। আমাকে ওদিক থেকে বেঁধে রেখেছে।

তখন পরমেশ্বর কবীরজী বললেন, ওখানেও আমিই গিয়েছিলাম। আমিই ঐ অবশিষ্ট অংশ বাঁচিয়েছি। এখন যাও বাকি দ্বারকাকেও ডুবিয়ে দাও। শুধু ঐ স্মৃতি চিহ্ন ছেড়ে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণের সমাধি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম সংস্কার করা হয়েছিল) বাকি সব খেয়ে নাও। শ্রীকৃষ্ণর অন্তিম সংস্কারের স্থলে অনেক বড় মন্দির বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই স্মৃতিচিহ্ন প্রমাণ থাকবে যে, বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণর মৃত্যু হয়েছিল,
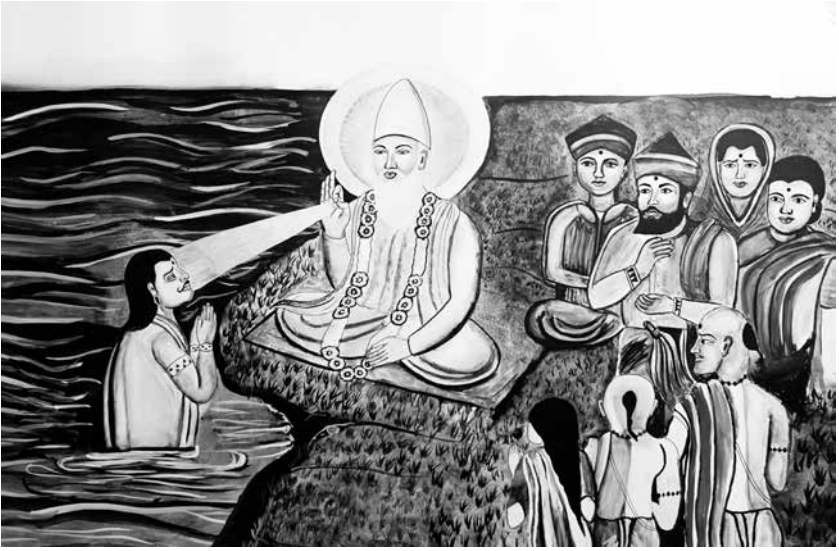
এবং তিনি পঞ্চ ভৌতিক শরীর ছেড়ে গিয়েছিলেন। না হলে আগত সময়ে সকলে বলবে শ্রীকৃষ্ণের তো মৃত্যুই হয়নি। আজ্ঞা পেয়ে সমুদ্র বাকি দ্বারকাকে ডুবিয়ে দেন। পরমেশ্বর কবীরজী সমুদ্রকে বলেন, এই মন্দিরকে আর ভাঙার চেষ্টা না করে এখান থেকে দূরে চলে যাও। প্রভুর আজ্ঞা মেনে সমুদ্র প্রণাম করে মন্দির থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে চলে যায়। এইভাবে শ্রী জগন্নাথ মন্দির স্থাপিত হয়।

"প্রথম থেকেই শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে ছুঁয়াছুত (অস্পৃশ্যতা) নেই"

কিছুদিন পরে যে পাণ্ডা (পণ্ডিত) শূদ্র রূপী প্রভু কবীর জীকে ধাক্কা মেরেছিল তাঁর কুষ্ঠ রোগ হয়ে যায় । সর্ব প্রকারের চিকিৎসা করার পরেও কুষ্ঠ রোগের কষ্ট বাড়তে থাকে। সর্ব উপাসনা ও শ্রী জগন্নাথের কাছে দিন রাত কান্না করে সঙ্কট মোচনের জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু সব নিষ্ফল হয়। একদিন শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন, পণ্ডিত যে শূদ্রকে তুই মন্দিরের মূখ্য দরজায় ধাক্কা মেরেছিলি সেই শূদ্রের চরণ ধুয়ে জল পান কর। ঐ মহাত্মার আশীর্বাদে তোর কুষ্ঠরোগ ঠিক হতে পারে। যদি তিনি মন থেকে ক্ষমা করে দেন তবেই হবে অন্যথা নয়। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে মানুষ কিনা করে।

সেই মূখ্য পণ্ডিত সকালে ঘুম থেকে উঠে। কয়েকজন সহযোগী পাণ্ডাকে (পণ্ডিত) সাথে নিয়ে ঐ স্থানে যায়, যেখানে প্রভু কবীর শূদ্ররূপে বিরাজমান ছিলেন। যখন পণ্ডিত প্রভুর নিকটে আসে তখন পরমেশ্বর উঠে দূরে চলে যায় আর বলেন, হে পণ্ডিত! আমি অচ্ছুৎ,আমার থেকে দূরে থাকুন, তা না হলে অপবিত্র হয়ে যাবেন। পণ্ডিত নিকটে যেতেই প্রভু দূরে চলে যান। তখন পণ্ডিত কান্নায় ভেঙে পড়ে আর বলে, হে পরবরদীগার! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। তখন দয়ালু প্রভু দাঁড়ান। পণ্ডিত শ্রদ্ধার সাথে পরিষ্কার কাপড় মাটিতে বিছিয়ে প্রভুকে বসার জন্য প্রার্থণা করেন। তখন প্রভু ওই বিছানো বস্ত্রে বসেন। ঐ পণ্ডিত নিজে শূদ্ররূপী প্রভুর চরণ ধূয়ে চরনামৃত একটি পাত্রে রাখে। তখন প্রভু কবীর বলেন, পণ্ডিত এই চরণামৃত ৪০ দিন পর্যন্ত পান করবে এবং স্নান করা জলে মিশিয়ে স্নান করবে। ৪০ দিনে তোর কুষ্ঠ ঠিক হয়ে

যাবে। আরো বললেন, ভবিষ্যতে যদি কেউ এই মন্দিরে ছুয়াছুঁত করে তারও এই রূপ দণ্ড ভোগ করতে হবে। সর্ব উপস্থিত পণ্ডিত বললেন, আজ থেকে এই পবিত্র স্থানে ছুঁয়াছুত থাকবে না।

বিচার করুন:- ভারত বর্ষের একটি মন্দির এমন আছে যেখানে শুরুথেকে কোন জাতপাত (ছুঁয়াছুত) নেই।

এই দাসেরও একবার ঐ স্থানে যাওয়ার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। কয়েকজন সেবককে সঙ্গে নিয়ে ঐ স্থানকে দেখতে যাই কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত করার জন্য। আজও ওখানে সর্ব প্রমাণের সাক্ষী আছে। যে পাথরের (চৌড়া বসার স্থান) উপর বসে কবীর সাহেব মন্দির বাঁচানোর জন্য সমুদ্রকে আটকে ছিলেন। তা আজও বিদ্যমান আছে। স্মৃতি চিহ্নের জন্য ওখানে এক গম্বুজ বানিয়ে রেখেছে। অনেক পুরাণো মহন্ত পরম্পরার এক মহন্ত ঐ আশ্রমে আজও আছে। প্রায় ৭০ বৎসরের এক বৃদ্ধ মহন্তকে উপরোক্ত মন্দির কে সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষার বিষয়ে জানতে চাইলে উনিও এই কথাই বললেন। এবং বললেন, আমার পূর্বজ কয়েক পিড়ি থেকে এখানে মহন্ত রূপে দেখাশুনা করছে। এখানে শ্রী ধর্মদাস ও তার স্ত্রী ভক্তমতি আমনী দেবী শরীর ত্যাগ করেছিলেন। দুই জনের সমাধিও একই জায়গায় বানানো দেখালেন ।

পরে আমরা শ্রী জগন্নাথের মন্দিরে যাই। ওখানে মূর্তিপূজা এখনো হয় না, কিন্তু প্রদর্শনী অবশ্য লাগানো হয়। যে তিনটি মূর্তি আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও বোন সুভদ্রার, তাদের দুই হাতের পাঞ্জা নেই। দুই হাত কাটা। ঐ মূর্তিরও পূজা হয় না। কেবল দর্শনার্থে রাখা আছে। ওখানের এক গাইডকে জিজ্ঞাসা করি-আমরা শুনেছি এই মন্দিরকে সমুদ্র পাঁচবার ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু কেন ভাঙল? পরে কে সমুদ্রকে আটকায়? গাইড বলে, এতোটা তো আমি জানি না। এসব জগন্নাথের কৃপা ছিল। তিনিই সমুদ্রকে থামিয়ে ছিলেন। শুনেছি মন্দির তিনবার ভেঙেছিল। আমি আবার প্রশ্ন করি প্রথম বারে শ্রীকৃষ্ণজী সমুদ্রকে কেন ঠেকালেন না। পণ্ডিতজী উত্তর দেয়, লীলা জগন্নাথজীর।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, এই মন্দিরে ছুঁয়াছুত (অস্পৃশ্যতা) আছে কি না? পণ্ডিত উত্তর দেয়, এখানে কোন ছুঁয়াছুত নেই। শূদ্র ও পণ্ডিত এক থালিতে খাবার খেলেও কেউ কিছু মনে করে না। আমি আবার প্রশ্ন করি, পাণ্ডেজী অন্য হিন্দু মন্দিরে তো প্রথম থেকে খুব ছুয়াছুত ছিল। এখানে কেন নেই? সব তো একই ভগবান। পণ্ডিত উত্তর দেয় লীলা জগন্নাথের।

পূণ্য আত্মাগন বিচার করুন সত্যকে কিভাবে মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু জগন্নাথের লীলা বলে চালিয়ে দেয়। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন আদরনীয় বা সম্মানীয়। কিন্তু আত্মা কল্যাণ তো পবিত্র গীতা, পবিত্র বেদে বর্ণিত তথা পরমেশ্বর কবীরজীর দ্বারা দেওয়া তত্ত্বজ্ঞান অনুসার ভক্তি সাধনা করলে সম্ভব। অন্যথায় শাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে মানব জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র ২৩-২৪। শ্রী জগন্নাথের মন্দিরে প্রভুর আদেশ অনুসারে পবিত্র গীতা জ্ঞানের মহিমা বা গুণাগুন করাই শ্রেয়। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা তে ভক্তিবিধি আছে ঐ প্রকার সাধনা করলে আত্মকল্যাণ সম্ভব। তাছাড়া শ্রী জগন্নাথের দর্শন বা খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ায় কোন লাভ হবে না। কারণ এই ক্রিয়া গীতায় বর্ণিত না হওয়ার কারণে শাস্ত্র বিরুদ্ধ। গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র ২৩, ২৪ এ এর প্রমাণ আছে।

"স্বর্গের সংজ্ঞা"

উদাহরণ স্বরূপ স্বর্গকে এক হোটেল মনে করো। যেমন কোন ধনী ব্যক্তি গরমের মরশুমে সিমলা, কুল্লু- মানালির মত ঠাণ্ডা জায়গায় ঘুরতে যায়। সেখানে কোন হোটেল ভাড়া করে থাকে। ওখানে রুমের ভাড়া ও খাবারের জন্য টাকা দিতে হয়। দুই, তিন মাসে ২০/৩০ হাজার টাকা খরচা করে, পুনরায় নিজের কর্মস্থানে ফিরে যেতে হয়। আবার ১০ (দশ) মাস কাজ কর্ম করে, পুনরায় দুই মাসে নিজের উপার্জিত টাকা খরচা করে ফিরে আসে। যদি কোন বৎসর ইনকাম ভালো না হয় তাহলে দুই মাসের সুখ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

ঠিক এই প্রকার স্বর্গ মনে করো :- এই পৃথিবীতে মানুষ সাধনা করে কিছু সময়ের জন্য স্বর্গরূপী হোটেলে চলে যায়। নিজের পূণ্যের ফল খরচ করে পুনঃ নরকে ও চুরাশি লাখ যোনীতে বিভিন্ন শরীরে কষ্টভোগ করতে হয়। যতক্ষণ তত্ত্বদর্শী সন্ত পাবে না ততক্ষণ উপরোক্ত জন্ম-মৃত্যু এবং স্বর্গ-নরক ও চুরাশি লক্ষ যোনীর কষ্ট লেগেই থাকবে। কারণ একমাত্র পূর্ণ পরমাত্মার সতনাম এবং সারনামই সমস্ত পাপকে নাশ করতে পারে। অন্য প্রভুদের পূজায় পাপ নষ্ট হয় না। সর্ব কর্মের যেমন কর্ম তেমন ফলই প্রাপ্তি হয়।

এইজন্য গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলেছে যে, ব্রহ্মলোক (মহাস্বর্গ) পর্যন্ত সর্বলোক নাশবান। যখন স্বর্গ ও মহাস্বর্গই থাকবে না তখন সাধকের ঠিকানা কোথায় হবে। কৃপাকরে বিচার করুন।

প্রশ্ন:- গীতার নিত্যপাঠ করলে কি লাভ হয় না? আমরা যে দান করি যেমন ক্ষুধার্তকে খাবাব দেওয়া, পিঁপড়েকে আটা, চিনি বা কুকুরকে খাবার দেওয়া, তীর্থে ভাণ্ডারা করা ইত্যাদি কি ব্যর্থ ?

উত্তর:- ধার্মিক সদগ্রন্থ পড়লে জ্ঞান যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। যজ্ঞের ফল কিছু সময় স্বর্গ বা যে উদ্দেশ্যে করা হয় সেই ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু মুক্তি হয় না। নিত্য পাঠ করার মূখ্য কারণ এটাই, সদগ্রন্থে যে সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং যা করতে মানা করেছে তা মনে রাখার জন্য। কখনো কোন ভুল না হয়ে যায়। আমরা আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাতে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মন-মতো আচারণ না করি। মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য একমাত্র আত্ম কল্যাণ তা শাস্ত্র অনুকূল সাধনার দ্বারাই সম্ভব।

যেমন, বৃদ্ধ বয়সে এক জমিদারের এক পুত্র সন্তানের প্রাপ্তি হয়। জমিদার চিন্তা করে-যখন পুত্র বড় হয়ে চাষবাস করার যোগ্য হবে ততদিনে আমার মৃত্যু না হয়ে যায়। তাই তিনি নিজের চাষবাসের অনুভব লিপিবদ্ধ করে ছেলেকে বলেন, তুমি বড় হয়ে চাষবাস করার যোগ্য হলে আমার লেখা অনুভব প্রতিদিন পড়ে নিজের কৃষি কাজ করবে। পিতার মৃত্যুর পর কৃষকের ছেলে প্রতিদিন ঐ লেখা পড়ে। কিন্তু যেমন লেখা আছে তেমন করে না। তাহলে ঐ কৃষকপুত্র ধনী হতে পারবে? কোনদিন পারবে না। ধনী হতে হলে তাকে তার পিতাজীর লেখা উপদেশের মত কাজ করতে হবে।

সেইরূপ শ্রদ্ধালুরা পবিত্র গীতা প্রতিদিন পড়ে, কিন্তু সাধন ভজন করে বিপরীত। তাই গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪-এর অনুসার এই সব সাধনা ব্যর্থ।

তিন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) এর পূজা গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ ও ২০ থেকে ২৩-এ নিষেধ করেছে। শ্রাদ্ধ করা অর্থাৎ পিতর পূজা, পিণ্ড দান, ফুল (অস্থি) উঠিয়ে গঙ্গায় ক্রিয়া করা, তেরদিনের অনুষ্ঠান, ৬ মাসের

বা বাৎসরিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা গীতা অধ্যায়ের ৯ শ্লোক ২৫-এ নিষেধ করেছে। ব্রত রাখাও গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোকে ১৬ তে নিষেধ। লেখা আছে যে, হে অর্জুন! যোগ (ভক্তি) না তো একেবারে অভুক্ত (ব্রত রাখা ব্যক্তির) থাকা ব্যক্তির সিদ্ধ হয়... অর্থাৎ ব্রতরাখা নিষেধ করেছে।

ক্ষুধার্তকে ভোজন খাওয়ানো বা অন্য জীব জন্তু পশু ইত্যাদিকে আহার করানো খারাপ নয়। কিন্তু পূর্ণ সন্তের মাধ্যমে বা তাঁর আজ্ঞা অনুসার দান এবং যজ্ঞ আদি করাই পূর্ণ লাভ দায়ক হয়।

যেমন একটি কুকুর গাড়ির ভিতরে মালিকের সিটে বসে যাত্রা করে। কুকুরের ড্রাইভার মানুষ হয়। ঐ পশুকে সাধারণ মানুষ থেকেও বেশি সুবিধা প্রাপ্ত হয়। পৃথক রুম, পাখা, কুলার ইত্যাদি লাগানো থাকে।

যখন এই নিরীহ জীব মানুষের শরীরে ছিল,দানও করেছিল কিন্তু মনমুখী আচরণের (পূজার) মাধ্যমে করেছিল, যা শাস্ত্রবিধি বিপরীত হওয়ার কারণে লাভদায়ক ছিল না। প্রভুর বিধান এই যে, যেমন কর্ম প্রাণী করবে সেই রকমে ফল পাবে। এই বিধান ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ তত্ত্বদর্শী সন্তের পূর্ণ মার্গদর্শন না পাওয়া যায়।

যেমন কর্ম প্রাণী করে, সেই রকমই ফল প্রাপ্ত করে। এই বিধান অনুসারে তীর্থ ধামে এবং অন্য স্থানে ভান্ডারা দ্বারা এবং কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিদের খেতে, দেওয়ার কর্ম আধারে কুকুর বিড়ালের যোনীতে চলে যায়। এখন কুকুরের যোনীতে সুখ ভোগ করছে। কুকুরের যোনীতে পূর্ব জন্মের শুভ কর্মফল ভোগ করার পরে গাধার যোনীতে জন্ম নেবে। ঐ গাধার যোনীতে কোন সুবিধা পাবে না। সারাদিন মাটি ও কাঁচা পাকা ইট বহন করতে হবে। এবং আরো অন্যান্য প্রাণীর শরীরে কষ্ট করতে হবে। নরক যন্ত্রণাও ভোগ করতে হবে। এই ভাবে চুরাশি লক্ষ যোনী ভ্রমণের পর পুনরায় মানুষ জন্মের প্রাপ্তি হবে। কে জানে তখন ভক্তি হবে কি না। তীর্থ ধামে যাওয়ার সময় পায়ের নিচে বা গাড়ির চাকার নিচে পড়ে যে অসংখ্য জীব মারা যায় তাঁর পাপও ঐ তীর্থ যাত্রীকে ভোগ করতে হবে। যতক্ষণ না পূর্ণ সন্ত দ্বারা পূর্ণ পরমাত্মার সত্সাধনা না পাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পাপ নাশ হবে না। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ- কাল) এবং পর ব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) এর সাধনায় পাপনাশ হয় না। পাপ এবং পূণ্য দুই ফলই ভোগ করতে হয়। যদি প্রাণী গীতা অনুসার পূর্ণ সন্তের শরণ প্রাপ্তি করে পূর্ণ পরমাত্মার সাধনা করে তাহলে সতলোক চলে যাবে। তা না হলে দ্বিতীয় বার মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত করবে। পূর্বের পূণ্যের আধারে আবার কোন সন্তের দর্শন পাবে এবং শুভকর্ম ও ভক্তি করে পার হয়ে যাবে। এইজন্য মনমর্জী আচরণ লাভ দায়ক নয়।

প্রশ্ন:- গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩৫, অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৭ এ বলেছে। ভালো আচরণের মোড়কে অন্যের ধর্ম থেকে গুণরহিত আড়ম্বর পূর্ণ নিজের ধর্ম অতি উত্তম। নিজে ধর্মে মৃত্যু ও কল্যাণ কারক। অন্যের ধর্ম ভয়াবহ। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে যেমন পূজা করে তা ত্যাগ করা উচিৎ নয়। নিজের ধর্মে মৃত্যু কল্যাণকারী হয়।

উত্তর:- গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩৫, এবং অধ্যায় ১৮ শ্লোক-৪৭-এর অর্থ এটাই যে, যে যেমন পূজা করছে, করতে থাক, তাকে ত্যাগ করো না তাহলে পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা জ্ঞানের কি প্রয়োজন ছিল? এক শ্লোকেই যথেষ্ঠ ছিল। গীতার এই শ্লোকের ভাবার্থ ঠিক। কিন্তু অনুবাদ কর্তারা বিপরীত অর্থ করেছে। কৃপা নিম্নে পড়ুন দুই শ্লোকের বাস্তবিক অর্থ।

গীতা অধ্যায় ৩-শ্লোক নং ৩৫

শ্রেয়ান, স্বধর্মঃ, বিগুণঃ, পরধর্মাত্, স্বনুষ্ঠিতাত্,
স্বধর্মে, নিধনম্, শ্রেয়ঃ, পরধর্মঃ, ভয়াবহ॥ ৩৫॥

অনুবাদ:- (বিগুণঃ) গুণরহিত অর্থাৎ শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে (স্বনুষ্ঠিতাত্) স্বয়ং ইচ্ছামত ভালো প্রকার আচরণ করা (পরধর্মাৎ) অন্য কোন ধার্মিক পূজা থেকে (স্বধর্মঃ) নিজের শাস্ত্রবিধি অনুসার পূজা (শ্রেয়ান) অতি উত্তম। শাস্ত্রানুকুল (স্বধর্মে) নিজের পূজাতে (নিধনম্) মরাও (শ্রেয়ঃ) কল্যাণকারক আর (পরধর্ম) অন্যের পূজা (ভয়াবহঃ) ভয়ের কারণ বা ভয়ানক।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৪৭

শ্রেয়ান, স্বধর্মঃ, বিগুণঃ, পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাৎ,
স্বভাবনিয়তম্, কর্ম, কুর্বন, ন, আপ্লোতি, কিল্বিষম্॥ ৪৭॥

অনুবাদ:- (বিগুণঃ) গুণ রহিত (স্বনুষ্ঠিতাত্) স্বয়ং ইচ্ছামত আচরণ শাস্ত্রবিধি ছাড়া ভালো প্রকার আচরণ করা হলেও (পরধর্মাৎ) অন্যের ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক পূজা থেকে (স্বধর্মঃ) নিজের ধর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজা (শ্রেয়ান) শ্রেষ্ঠ। (স্বভাবনিয়তম) নিজের স্বভাব অনুসারে ইচ্ছামত আচরণ দ্বারা ভক্তিকর্ম করবেন না যাতে পাপের প্রাপ্তি হয়।{(ন=না) (কুর্বন=কর/করবেন)(কিল্বিষম্=যার দ্বারা পাপকে) (আপ্লোতি=প্রাপ্তি হয়)।

বিশেষত :- এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৭ তে শ্লোক ১ থেকে ৬ এ স্পষ্ট আছে। বিশেষ -এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৭ তে শ্লোক ১ থেকে ৬ এ স্পষ্ট আছে।

উপরোক্ত শ্লোকে স্পষ্ট যে, নিজের শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনাই শ্রেষ্ঠ। অন্যের শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা যতই আকর্ষনীয় বা উজ্জ্বল হোক না কেন তা ক্ষতিকারক।

যেমন মাতার জাগরণ করার সময়, খুব সুন্দর মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে মাতার স্মৃতির, সুন্দর কবিতা সুন্দর সাজ সজ্জা ইত্যাদি করে। ঐ (স্বনুষ্ঠিতাৎ) স্বয়ং তৈরি করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনায় আকর্ষিত হয়ে নিজের শাস্ত্র অনুকূল সাধনা ত্যাগ করা উচিত নয়।

কোন সাধক সত্ সাধনায় লাগলে পূর্বের শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা বা পূজা ত্যাগ করে দেয়। যেমন পীতর পূজা, মন্দিরে যাওয়া, তীর্থে যাওয়া ইত্যাদি। তখন অন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করা ব্যক্তিরা বলেন, আপনি পূর্বের সর্ব পূজা ত্যাগ করেছেন। আপনার সর্ব ইষ্টদেব রুষ্ট হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি এই রকম করেছিল, তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। এইপ্রকার অন্যের শাস্ত্রবিরুদ্ধ সাধনা ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র অনুকূল সাধনা অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত করা কল্যাণকারী।

প্রশ্ন:- আমি গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১০ থেকে ১৫ তে বর্ণিত বিধি অনুসার এক আসনে বসে স্থির হয়ে ধ্যান করি। একাদশীর ব্রতও রাখি। এই ভাবে শান্তি প্রাপ্ত হবে?

উত্তর:- অনুগ্রহ করে আপনি গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১৬ পড়ুন। ওখানে লেখা আছে, হে অর্জুন! এই যোগ (সাধনা) যারা অধিক খায় বা কোন কিছু খায় না (ব্রত রাখে) তাদের সিদ্ধ হয় না। না অধিক জেগে থাকা সাধকদের সিদ্ধ হয়, না অধিক শয়ন করা সাধকদের সিদ্ধ হয়, না এক স্থানে বসে সাধনা করা ব্যক্তিদের সিদ্ধ হয়। গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত বর্ণিত বিধির খণ্ডন গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৫ থেকে ৯-এ করেছে,যে, মূর্খ ব্যক্তি ধর্ম কর্ম ইন্দ্রিয়কে হঠপূর্বক রুখে (বন্ধ) করে অর্থাৎ একস্থানে বসে চিন্তন করে তাকে পাখণ্ডী বলা হয়। এইজন্য কর্মযোগী (কার্য করতে

করতে সাধনা করা সাধক)-ই শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক ভক্তি বিধির জন্য গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু, (ব্রহ্ম) অন্য কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করতে বলেছেন (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪)। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম দ্বারা বলা ভক্তি বিধি ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ কাল) দ্বারা নিজের সাধনার বর্ণনায় তথা নিজের সাধনায় হওয়া শান্তিকে অতি জঘন্য (অনুত্তম) বলেছে। (গীতাঅধ্যায় ৭ শ্লোকে ১৮) উপরোক্ত অধ্যায় ৬ শ্লোকে ১০ থেকে ১৫ তে বলেছে, মন আর ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে সাধক এক বিশেষ আসন তৈরি করে যা না অধিক উচু না অধিক নীচু। এই আসনে বসে একাগ্র চিত্তে ইন্দ্রিয়কে বশ করার অভ্যাস করে। সোজা হয়ে বসে ব্রহ্মচর্যের পালন করে, মনকে স্থির করে একনিষ্ঠ হয়ে সাধনা করে। এই ধরণের সাধনা করা সাধক আমার দ্বারা পাওয়া (নির্বান পরমাম) অতি বেজান অর্থাৎ মরার মত (নাম মাত্র) শান্তি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে নিজের সাধনায় হওয়া গতি (লাভ) কে অতি ঘাটিয়া (অনুত্তম) বলেছে। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোকে ৪-এ বলেছে, হে অর্জুন! তুই পরম শান্তি এবং সতলোকে প্রাপ্ত হবি, পুনরায় জন্ম হবে না। পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে যাবে। আমি (গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু) ও ঐ আদি নারায়ণ পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি। তাই নিসংশয় হয়ে দৃঢ় ভাবে তাঁর সাধনা করা দরকার।

নিজের সাধনাকে অনুমান ভিত্তিক তথা সন্দেহ (যুক্ততমঃ মতঃ) যুক্ত জ্ঞানের আধারে বলা মার্গকে (অধ্যায় ৬ শ্লোক ৪৭-এ) স্বয়ং অজ্ঞান অন্ধকার যুক্ত বিচার বলেছে। অন্য অনুবাদ কর্তারা "মে যুক্ততমঃ মতঃ" এর অর্থ "পরম শ্রেষ্ঠ মান্য" করেছে। কিন্তু এর অর্থ করা দরকার ছিল, এটা আমার অটকল অজ্ঞান অন্ধকারের আধারে দেওয়া মত (সিদ্ধান্ত)। কারণ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় কোন তত্ত্বদর্শী সন্ত থেকে জানতে বলেছে (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪) বাস্তবিক অনুবাদ গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ৪৭:-

যোগীনাম্, অপি, সর্বেষাম্, মদ্গতেন, অন্তরাত্মনা,
শ্রদ্ধাবান, ভজতে, যঃ, মাম্, সঃ, মে, যুক্ততমঃ, মতঃ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ :- আমার দ্বারা দেওয়া আটকেল লাগানো ভক্তি বিচার, গীতা অধ্যায় শ্লোক ১০ থেকে ১৫ -তে বর্ণিত পূজা বিধি পূর্ণ জ্ঞান নয়। আমি অনুমানের উপর বলেছি। কারণ সর্ব সাধকের মধ্যে যিনি বিশ্বাসের সঙ্গে মনেপ্রাণে আমার দেওয়া ভক্তিমত অনুসারে আমাকে পূজা করেন, তিনিও অজ্ঞান-অন্ধকারে জন্ম – মৃত্যু, স্বর্গ-নরকের সাধনায় লীন আছেন। এটা আমার মত বা বিচার। {সর্বেষাম=সর্ব), (যোগিনাম=সাধকদের মধ্যে), (য:=যিনি), (শ্রদ্ধাবান= পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে), (অন্তরাত্মনা= মনে প্রানে), (মদগতেন= আমার দেওয়া ভক্তি মত অনুসারে), (মাম=আমাকে), (ভজতে=পূজা করে), (স:= তিনি), (অপি= ও), (যুক্ততম:= অজ্ঞান অন্ধকার), (মত:= বিচার)}

এর প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তথা গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ২৯ গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১৫ তে স্পষ্ট আছে। সেই জন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোকে ৬২- তে বলেছে, হে ভারত! তুই সর্বভাবে ঐ পরমাত্মার শরণে যা, তাঁর কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং সনাতন পরম ধাম অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত করবি। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে যখন গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ বর্ণিত তত্ত্বদর্শী সন্ত পাওয়া যাবে তখন ঐ পরমানন্দ পরমেশ্বরকে ভালো ভাবে খোঁজ কর। যেখানে গেলে সাধক আর পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যায়। যে

পরমেশ্বর সংসার রূপী বৃক্ষের রচনা করেছেন, আমিও সেই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি। তাঁর ভক্তি করা উচিত।

গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৫ থেকে ৯-এও গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১০ থেকে ১৫ -এর জ্ঞানকে ভুল প্রমাণ করেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছে, হে প্রভু! মনকে বশ করা খুব কঠিন। ভগবান উত্তর দিয়েছেন, অর্জুন! মনকে বশ করা আর বায়ুকে রোধ করা সমান কথা। আবার এটাও বলেছেন নিঃসন্দেহে কোন ব্যক্তি কোন সময় এক মুহূর্তও কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। এই মহা মুর্খ মানুষ সমস্ত কর্ম ইন্দ্রিয়কে হঠপূর্বক উপরে বন্ধ করে কিন্তু মন কিছু না কিছু চিন্তা করতে থাকে। এই জন্য এক স্থানে হঠযোগ করে না বসে সংসারিক কাজকর্ম করতে করতে (কর্মযোগ) সাধনা করা অতি শ্রেষ্ঠ। এক স্থানে বসে সাধনা (অকর্মনা) করলে তোর জীবন নির্বাহ কিভাবে হবে? শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাধনা করলে (১ আসনে হটযোগ করলে) কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। দ্বিতীয়ত শাস্ত্র অনুকূল সাধনা কর্ম করতে করতে করাই শ্রেষ্ঠ। এইজন্য সাংসারিক কার্য করতে করতে সাধনা কর। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৭-এ বলেছে যে, যুদ্ধও কর,আর আমার স্মরণও কর। এই প্রকারে আমাকেই প্রাপ্ত করবি। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তথা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছে যে, কিন্তু আমার সাধনায় হওয়া (গতি) লাভ অতি ঘাটিয়া (অনুত্তম)খারাপ ফল যুক্ত। এইজন্য ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা। যার কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং (শাশ্বতম্ স্থানম্) সতলোক প্রাপ্ত করবি। ঐ পরমেশ্বরের ভক্তি বিধি এবং পূর্ণ জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) কোন তত্ত্বদর্শী সন্তকে খোঁজ করে জিজ্ঞাসা কর। আমি (ক্ষরপুরুষ,কাল) জানি না।

প্রশ্ন:- গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৮ তে বলেছে, আমি লোকবেদের আধারে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা প্রভুই সর্বশক্তিমান। গীতা অধ্যায় ১২ তে সম্পূর্ণ ই গীতা জ্ঞানদাতার মহিমা কীর্তন করেছে।

উত্তর:- গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু নিজের সাধনা ও শক্তির কথাও বলছেন,আবার পরমাত্মার মহিমার কথাও বলেছেন। ঐ পরমেশ্বরের সাধনার জন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের দিকে সংঙ্কেতও করেছেন। গীতা অধ্যায় ১২ তে ব্রহ্মের (ক্ষরপুরুষ কাল) মহিমায় পরিপূর্ণ আছে। এবং গীতা অধ্যায় ১৩ তে ঐ পূর্ণ পরমাত্মার অর্থাৎ আদি পুরুষ পরমেশ্বরের মহিমায় পরিপূর্ণ। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এবং ১৬ থেকে ১৭ তে পূর্ণ পরমাত্মা এবং পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম-এর নির্ণায়ক জ্ঞান আছে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে বলেছে, পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত লোকে (ব্রহ্মার ২১ ব্রহ্মাণ্ড এবং পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে তৈরির কারণে এক লোকও বলা হয়) দুই প্রভু আছে। এক ক্ষর-পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম, দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম। এই দুই প্রভুর অন্তর্গত যত প্রাণী আছে তারা এবং এই দুই প্রভুর স্থুল শরীরও নাশবান। কিন্তু জীবত্মাকে অবিনাশী বলা হয়েছে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলা হয়েছে, বাস্তবে পুরুষত্তম অর্থাৎ সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বর তো উপরোক্ত দুই পুরুষ থেকে অন্য কেউ। যাকে পরমাত্মা বলা হয়। যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ পোষণ করেন। তাকে বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর বলা হয়।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৮তে গীতা জ্ঞানদাতা (ক্ষর পুরুষ-ব্রহ্ম) নিজের স্থিতি বলতে গিয়ে বলেছেন যে, আমাকে লোকবেদের (দন্ত কথা) আধারে পুরুষোত্তম বলা

হয়। কারণ আমার এই ২১ ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাণী আমার অধীনে আছে তারা স্থূল শরীরে নাশবান হোক, বা আত্মা রূপে অবিনাশী হোক, আমি তাদের মধ্যে উত্তম (শ্রেষ্ঠ)। এইজন্য লোক বেদের আধারে আমি পুরুষোত্তম্। বাস্তবে পুরুষোত্তম তো অন্য কোন পরমেশ্বর- তা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলেছে।

প্রশ্ন:- গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-এ এবং ৩-এ বলেছে যে, আমার উৎপত্তিকে কেউ জানে না। যে আমাকে অনাদি অজন্মা তত্ত্ব দ্বারা জানে,সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এতে স্পষ্ট যে ব্রহ্মের জন্ম হয় না এবং তিনি সর্ব পাপ নষ্ট করে দেন।

উত্তর:- গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ কে পুণরায় পড়ুন। এই শ্লোকে বলেছে, আমার উৎপত্তি কে না দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি) এবং না মহর্ষিরা জানে কারণ এরা সবাই আমার থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

এই শ্লোকে প্রমাণ হয়, গীতা জ্ঞানদাতা প্রভুর উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম তো হয়। কিন্তু কাল (ব্রহ্ম) থেকে উৎপন্ন দেবতা বা ঋষিগন জানে না। কেননা তারা কাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন পিতার জন্মের বিষয় সন্তান জানে না। কিন্তু পিতার পিতা অর্থাৎ দাদা (ঠাকুরদাদা) জানে। পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং কাল লোকে প্রকট হয়ে ব্রহ্মা-এর উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন। কৃপা করে পড়ুন সৃষ্টি রচনা এই পুস্তকের 20 পৃষ্ঠায়।

গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ৩-এর অনুবাদ ভুল করেছে। যেমন গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ এ নিজেকে নিজে নাশবান এবং বার বার জন্ম মৃত্যু প্রাপ্তি হয় বলেছে। অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ এবং অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৮ থেকে ১০ ও ২০ অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪, ১৬-১৭ তে কোন অন্য অবিনাশী অনাদি পরমাত্মার বিষয়ে বলেছে।

এইজন্য গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ৩-এ বলেছে, যে পুরুষের মধ্যে বিদ্বান অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত আমাকে এবং ঐ অনাদি, বাস্তবে জন্ম রহিত, সর্ব লোকের মহেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরকে তত্ত্ব দ্বারা জানে ঐ তত্ত্বদর্শী সন্ত, সত্য জ্ঞান উচ্চারণ করেন। সেই সত্য সাধনা করে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪-এ আছে।

কৃপা করে পড়ুন গীতা অধ্যায়, ১০ শ্লোক ৩-এর যথার্থ অনুবাদ:-

গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ২

ন, মে, বিদুঃ, সুরগণাঃ, প্রভবম্,ন, মহর্ষয়:,
অহম, আদিঃ, হি, দেবানাম্, মহর্ষীণাম্, চ, সর্বশঃ ॥ ২॥

অনুবাদঃ- আমার উৎপত্তিকে না দেবতারা জানেন, না মহর্ষিগণ জানেন কারণ আমি সব প্রকারে দেবতাদের এবং মহর্ষিদেরও আদি অর্থাৎ উৎপত্তির কারক। {(মে=আমার), (প্রভবম্=উৎপত্তিকে), (ন=না), (সুরগণা:=দেবতারা), (মহর্ষয়:=মহর্ষিগণ), (বিদু:=জানেন), (হি=কারন), (অহম=আমি), (সর্বশ:=সর্ব প্রকারে), (দেবানাম=দেবতাদের), (চ=এবং), (মহর্ষীণাম্=মহর্ষিদেরও), (আদি:=আদি অর্থাৎ উৎপত্তির কারক)}

গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ৩

যঃ, মাম্, অজম্, অনাদিম্, চ, বৃত্তি, লোকমহেশ্বররম্,
অসম্মুঢ়ঃ, সঃ, মর্ত্যেষু, সর্বপাপৈঃ, প্রমুচ্যতে ॥

অনুবাদ :- যে বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে এবং চিরস্থায়ী অনাদি যার কোনদিন জন্ম হয় না, সর্ব লোকের মহান ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরমেশ্বরকে জানেন, তিনি শাস্ত্রকে সঠিকভাবে জানেন অর্থাৎ বেদ অনুসারে জ্ঞান আছে অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী বিদ্বান

সম্পূর্ণ পাপকে বিস্তৃত বর্ননার সাথে বলেন অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টির জ্ঞান ও কর্ম এর সঠিক ভাবে বর্ণনা করেন অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেন। কারণ তত্বদর্শী সন্তের দ্বারা বলা বাস্তবিক সাধনায় ভক্তের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। {(যঃ=যিনি), (মাম=আমাকে), (চ=তথা, এবং), (অনাদিম=চিরদিন আছে, যার কোনও আদি বা শুরু নেই), (অজম=যার কখনো জন্ম হয় না), (লোক মহেশ্বরম্=সর্বলোকের মহান ঈশ্বর), (বেত্তি=জানেন), (সঃ=তিনি), (মর্তেষু=শাস্ত্রকে সঠিকভাবে জানেন অর্থাৎ বেদ অনুসারে যার জ্ঞান আছে), (অসম্মূঢ়ঃ=তত্ত্বদর্শী বিদ্বান), (সর্বপাপৈঃ=সম্পূর্ণ পাপকে), (প্রমুচ্যতে=বিস্তৃত বর্ণনার সাথে বলেন)}

"গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম (কাল) এর উৎপত্তির সংকেত"

অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-এ বলেছে, অর্জুন আমার উৎপত্তির (জন্ম)-বিষয়ে না দেবতারা জানে, না মহর্ষিরা কারণ এরা সবাই আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই থেকে স্বীকার্য যে কাল ব্রহ্মের উৎপত্তি তো হয়েছে কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ জানে না। যেমন পিতার উৎপত্তি সন্তানরা বলতে পারে না। কিন্তু দাদু (ঠাকুর দাদা) বলতে পারে। এইপ্রকার এই একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব দেব, ঋষি, প্রভৃতি রা একই ভাবে জ্যোতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল ও প্রকৃতি দেবীর (দূর্গা) সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে। এইজন্য বলেছে যে, আমার উৎপত্তিকে একুশ ব্রহ্মাণ্ডের কেউ জানে না। কারণ সবার উৎপত্তি আমার থেকে হয়েছে। শুধুমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মই কালের (ব্রহ্ম) উৎপত্তি বলতে পারে। কারণ ব্রহ্ম কালের উৎপত্তি পরম অক্ষর ব্রহ্ম (পূর্ণব্রহ্ম) থেকে হয়েছে। গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪, ১৫-তে ব্রহ্মের উৎপত্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অধ্যায় ১০ শ্লোক ৩-এ যে তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে এবং কোনদিন (চিরকাল) জন্ম না নেওয়া সর্বলোকের মহেশ্বর অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মাকে জানে এবং ৪ বেদ (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যর্জুবেদ ও অথর্ব বেদ) কে জানে, তিনিই তত্ত্বদর্শী সন্ত। তাঁর দ্বারা বলা ভক্তি মার্গে সাধনা করলে সর্ব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬, ১৭, ১৮-তে বর্ণনা আছে, অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা তো অন্য কেউ, যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ পোষণ করে। আমাকে (কাল) এইজন্য পুরুষোত্তম বলা হয়, কারণ আমার অধীনে একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নাশবান প্রাণী ও অবিনাশী জীবাত্মা থেকে আমি উত্তম। তাই আমাকে লোক বেদের আধারে অর্থাৎ দন্ত কথার আধারে পুরুষোত্তম বলা হয়েছে । বাস্তবে আমি অবিনাশী পালন কর্তা নই। গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪, ১৫, তে বলেছে- সর্ব জীব অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্ন বর্ষায় উৎপন্ন হয়। বর্ষা যজ্ঞ থেকে হয়। যজ্ঞ শুভ কর্ম থেকে, কর্ম ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেই অবিনাশী সর্ব ব্যাপক পরমাত্মাই যজ্ঞেতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনিই যজ্ঞে পূজার যোগ্য। তিনি যজ্ঞের (উপসনা) ফল দেন অর্থাৎ বাস্তবে অধিযজ্ঞও তিনিই ।

আবার গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ বলেছে আমার উৎপত্তি (প্রভবম) কে কেউ জানে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, কালের (ব্রহ্ম)ও উৎপত্তি হয়েছে। তাই সে কোন জায়গায় অবশ্যই আকারে আছে। তা-না হলে শ্রীকৃষ্ণ তো অর্জুনের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলতেই পারে না যে, আমি অনাদি-অজন্মা। এতে প্রমাণিত হয় কাল (অদৃশ্য ব্রহ্ম) শ্রী কৃষ্ণের শরীরে জীবস্থ রূপ প্রেতের মত প্রবেশ করে নিজের বিষয়ে সঠিক বর্ণনা দিয়ে গেছেন । উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মর উৎপত্তি পূর্ণব্রহ্ম থেকে হয়েছে। এই প্রমাণ অর্থববেদ কাণ্ড ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র ৩-এ ও

আছে। কৃপা করে নিম্নে পড়ুন। কান্ড নং-৪ অনুবাদক নং ১ মন্ত্র নং ৩ :-

প্র যো জজ্ঞে বিদ্যানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নিচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ ॥ ৩॥

প্র-যঃ- জজ্ঞে-বিদ্যানস্য- বন্ধুঃ-বিশ্বা-দেবানাম-জনিমা-বিবক্তি-ব্রহ্মঃ-ব্রহ্মণঃ-উজ্জভার-মধ্যাৎ-নিচৈঃ-উচ্চৈঃ-স্বধা-অভিঃ-প্রতস্থৌ।

অনুবাদঃ- সর্বপ্রথম দেবতাদের এবং ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তির জ্ঞান কে জিজ্ঞাসু ভক্তের যে বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মাই নিজের সেবক কে, সকলের উৎপত্তি কর্তা, নিজের দ্বারা তৈরী করা সৃষ্টিকে নিজেই ঠিক ঠিক বিস্তার পূর্বক বলেন) পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা অর্থাৎ শব্দ শক্তি দিয়ে ব্রহ্ম-ক্ষরপুরুষ অর্থাৎ কালকে উৎপন্ন করেন সমস্ত সংসারকে বা সর্ব ব্রহ্মান্ড ও লোকের উপর সতলোক ও নিচের পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের সর্ব ব্রহ্মান্ডকে নিজে ধারণ করে আকর্ষণ শক্তি দিয়ে দুটোই ভালো করে স্থির রেখেছেন।

ভাবার্থ:- পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টি রচনার জ্ঞান এবং সর্ব-আত্মার উৎপত্তির জ্ঞান নিজের দাসকে স্বয়ংই সঠিক বলেন। পূর্ণ পরমাত্মা, নিজের শরীর থেকে, নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ কাল) কে উৎপত্তি করেন, এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর সতলোক, অলখ লোক, অগমলোক, অনামী লোক প্রভৃতি এবং নিচের পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজে ধারণ করে আকর্ষণ শক্তি দিয়ে স্থিত (ঠহরায়া) করে রেখেছে।

যেমন পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) নিজের সেবক অর্থাৎ সখা শ্রী ধর্মদাস, শ্রী গরীবদাস প্রভৃতি আরো অনেক কে নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ংই বলেছেন।

উপরোক্ত বেদ মন্ত্রও তা সমর্থন করে।

কান্ড নং ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র ৭

যোৎথর্বানং পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ।

ত্বং বিশ্বেষাং জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ৎ স্বধাবান্॥ ৭ ॥

যঃ-অর্থবানম্-পিতরম্-দেববন্ধুম্-বৃহস্পতিম্-নমসা-অব-চ-গচ্ছাৎ-ত্বম-বিশ্বেষাম্- জনিতা-যথা-সঃ-কবির্দেবঃ-ন-দভয়াৎ-স্বধাবান।

অনুবাদ :- যে পরমেশ্বর অচল অর্থাৎ বাস্তবে অবিনাশী জগৎপিতা ভক্তের বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ আত্মাধার,জগৎ গুরু,সতলোকে পৌঁছে যাওয়া বিনম্র পূজারী অর্থাৎ বিধিবৎ সাধকদেরকে সুরক্ষার সাথে নিয়ে যাওয়া কান্ডারী, সর্বব্রহ্মান্ডের রচনহার (সৃষ্টিকর্তা) জগদম্বা অর্থাৎ মাতৃগুণ যুক্ত, কালের মত ধোখা না দেওয়া স্বভাব অর্থাৎ সত্ গুণযুক্ত যেমনকার তেমনিই, তিনি কবির্দেব। অন্য ভাষায় তাকে কবীর পরমেশ্বরও বলা হয়।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রের মধ্যেও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ওই পরমেশ্বরের নাম কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর, যিনি সকল সৃষ্টির রচনা করেছেন।

যে পরমেশ্বর বাস্তবে অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে প্রমাণ আছে) জগত্ গুরু আত্মাধার, যারা পূর্ণ মুক্ত হয়ে সতলোক গিয়েছে, তাদের সতলোকে নিয়ে যাওয়া প্রভু, যিনি সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচনাহার, কাল ব্রহ্মের মত প্রতারণা করেন না তিনিই স্বয়ং কবির্দেব অর্থাৎ কবীর প্রভু। ঐ পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করার কারণে মাতা, পিতা, বন্ধু, ভাই আসলে তিনিই এবং দেব

পরমেশ্বরও তিনিই। এইজন্য এই কবির্দেবের (কবির পরমেশ্বরের) স্তুতি (উপাসনা) করা হয়, ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম্ দেব দেব। এই পরমেশ্বরের মহিমা পবিত্র ঋগ্বেদ মন্ডল ১ সুক্ত ২৪-এ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

প্রশ্ন:- বেদে কবির্ অর্থাৎ কবীর নামের বিবরণ কিভাবে এসেছে? বেদ তো সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাপ্তি হয়েছিল। (কর্বিদেব) কবীর পরমেশ্বর তো ১৩৯৮ সালে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?

উত্তর:- পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম কর্বিদেব এবং উপমাত্মক নাম সত পুরুষ, পরম অক্ষর পুরুষ, পূর্ণ ব্রহ্ম ইত্যাদি। যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক নাম অন্য কিছু হয় এবং, প্রধানমন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার প্রভৃতি পদের নাম হয়। ঐ পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব ভিন্ন নামে (নামান্তর করে) চার যুগেই আসেন। এবং সৃষ্টি ও বেদের রচনার পূর্বে অনামী লোকে মানব সদৃশ শরীরে কবির্দেব নামে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ কবির্দেব সতলোকের রচনা করে সতলোকে বিরাজমান হলেন। তারপর পরব্রহ্ম,এবং ব্রহ্মের সর্বলোক ও বেদের রচনা করেন। তাই বেদে কবির্দেব- এর বিবরণ আছে।

"কবীর সাহেব, বিভীষণ ও মন্দোদরীকে শরণে আনে"

পরমেশ্বর মুনীন্দ্র অনল অর্থাৎ নল এবং অনিল অর্থাৎ নীলকে শরণে নেওয়ার পর শ্রীলঙ্কায় যান। ওখানে এক পরম ভক্ত চন্দ্রবিজয়ের ষোল জন সদস্যের পূণ্য আত্মার এক পরিবার ছিল। এই পূণ্য কর্মীর জন্ম ভাঁড় জাতিতে হয়েছিল। পরমেশ্বর মুনীন্দ্র ঋষির (কর্বিদেব) উপদেশ শুনে সম্পূর্ণ পরিবার নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে। পরম ভক্ত চন্দ্রবিজয়ের পত্নী ভক্তিমতি কর্মবর্তী লঙ্কার রাজা রাবনের স্ত্রী রানী মন্দোদরীর কাছে চাকরি (সেবা) করত। রানী মন্দোদরীকে হাসি-ঠাট্টা, ভাল মন্দ মজার কথা শুনিয়ে তার মনোরঞ্জন করত। ভক্ত চন্দ্রবিজয়ের পত্নী রাজা রাবণের দরবারে চাকরি (সেবা) করত। রাজাকে তার মহিমার গুণগান করে প্রসন্ন রাখত। ভক্ত চন্দ্র বিজয়ের পত্নী ভক্তমতি কর্মবর্তী পরমেশ্বর থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করার পরে রানী মন্দোদরীকে প্রভু চর্চা শোনাতে লাগে, যে সৃষ্টি রচনার বিষয়ে গুরুদেব মুনীন্দ্র ঋষির কাছ থেকে শুনেছিল তা প্রতিদিন রানীকে শোনাতে লাগলো।

ভক্তিমতি মন্দোদরী রানীও অতি আনন্দের অনুভব হতে লাগলো। ভক্তমতী কর্মবর্তী ঘন্টার পর ঘন্টা প্রভুর সত্কথা শোনাত এবং মন্দোদরীর চোখ থেকে অশ্রুজলের ধরা ভরে যেত। একদিন রানী মন্দোদরী কর্মবতীকে জিজ্ঞাসা করে তুমি এ জ্ঞান কার থেকে শুনেছ? তুমি তো খুব আজে-বাজে কথা বলতে। এতটা পরিবর্তন পরমাত্মা তুল্য সন্ত ছাড়া হতে পারে না। তখন কর্মবর্তী বলে, আমি এক পরম সন্ত থেকে কয়েক দিন হল উপদেশ নিয়েছি। রানী মন্দোদরী সেই সন্তকে দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলে- এইবার তোমার গুরুদেব এলে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। রানীর আদেশে কর্মবর্তী মাথা নত করে মর্যাদা পূর্বক বলে, মহারাণী আপনার যা আজ্ঞা আপনার দাসী তাই করবে। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে, লোকে বলে যে সন্তকে আদেশ পূর্বক ডেকে আনা উচিত নয়। স্বয়ং গিয়ে দর্শন করাটাই শ্রেয়কর, এবার আপনার যা আজ্ঞা আমি তাই করব। রানী মন্দোদরী বলে, এইবার তোমার গুরুদেব এলে আমাকে জানিও। আমি নিজে গিয়ে দর্শন করব। পরমেশ্বর আবারও শ্রীলঙ্কার ওপর কৃপা করেন। রানী মন্দোদরী উপদেশ (দীক্ষা) প্রাপ্ত করেন। কিছু দিন

পরে নিজ প্রিয় দেবর ভক্ত শ্রী বিভীষণকে মুনীন্দ্র ঋষির কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করান। ভক্তমতি মন্দোদরী উপদেশ প্রাপ্ত করে দিবা রাত্রি প্রভু ভক্তিতে লীন থাকে। নিজের পতি রাবণকেও সদগুরু মুনীন্দ্র ঋষির কাছ থেকে নাম উপদেশ নেওয়ার জন্য বহু বার অনুরোধ করে কিন্তু রাবণ তার কথা মানলো না। রাবণ বলতো আমি পরমশক্তি মহেশ্বর মৃতুঞ্জয় শিবের ভক্তি করি, তার তুল্য কোন শক্তি নেই।তোমাকে কেউ ভ্রমিত করেছে।

কিছু সময় পরই বনবাসিনী মাতা সীতাকে অপহরণ করে রাবণ নিজের নৌলখা বাগানে বন্দী করে নেয়। ভক্তিমতি মন্দোদরী বারং বার অনুরোধ করলেও রাবণ মাতা সীতাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। তখন ভক্তমতী মন্দোদরী গুরুদেব মুনীন্দ্র ঋষিকে বলে হে মহারাজ! আমার স্বামী একটি অন্যের স্ত্রীকে অপহরন করে এনেছে। আমার তা সহ্য হচ্ছে না । সে কোন মূল্যেই তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজী নয়। আপনি দয়া করুন প্রভু। আজ পর্যন্ত জীবনে এমন দুঃখ দেখিনি।

পরমেশ্বর মুনীন্দ্র ঋষি বলেন, পুত্রি মন্দোদরী! ঐ মহিলা কোন সাধারণ স্ত্রী নয়। শ্রী বিষ্ণু অভিশাপের কারণে পৃথিবীতে এসেছেন, তিনি রাজা দশরথের পুত্র অযোধ্যাবাসী শ্রীরামচন্দ্র। তিনি ১৪ বৎসরের জন্য বনবাস জীবন প্রাপ্ত করেছেন এবং শ্রী লক্ষ্মী স্বয়ং সীতার রূপ ধারণ করে এসে রামচন্দ্রের স্ত্রী রূপে বনবাসে ছিল। রাবণ এক সাধুর বেশ ধরে প্রতারণা করে তাকে তুলে এনেছে। স্বয়ং লক্ষ্মীই হলেন সীতা। তাকে শীঘ্র ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করে নিজের জীবন ভিক্ষা চাইলেই রাবণের মঙ্গল হবে।

ভক্তমতী মন্দোদরী অনেকবার প্রার্থণা করলেও রাবণ মানতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ঐ দুই ভবঘুরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তারা আমার কি ক্ষতি করবে। আমার কাছে অগনিত সৈন্য আছে। আমার এক লক্ষ ও পুত্র সোয়া লক্ষ নাতি, আমার পুত্র মেঘনাদ স্বর্গের রাজা ইন্দ্রেকে পরাজিত করে তার কন্যাকে বিবাহ করেছে। তেত্রিশ কোটি দেবতাদেরকে আমরা বন্দী করে রেখেছি। তুমি আমাকে ঐ দুই নিরাশ্রয় ঘুরে বেড়ানো বনবাসীকে ভগবান বলে ভয় দেখাচ্ছো। আমি এই স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেব না।

মন্দোদরী ভক্তি মার্গের যে জ্ঞান নিজ গুরুদেবের কাছ থেকে শুনেছিল তা রাবণকে বোঝানোর অতি চেষ্টা করে। বিভীষণও তার বড় ভাই রাবণকে বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু রাবণ তার ভাই বিভীষণকে মারে এবং বলে তুই শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে বলছিস। তুই ওর কাছে চলে যা।

একদিন ভক্তমতি মন্দোদরী তার পূজ্য গুরুদেবকে প্রার্থণা করে যে, হে গুরুদেব আমার সুহাগ নষ্ট (শেষ) হতে চলছে। একবার আপনি আমার স্বামীকে বোঝান। যদি আপনার কথা না শোনে তাহলে আমি বিধবা হলেও গেলেও দুঃখী হবো না।

মুনিন্দ্র ঋষি, পুত্রী মন্দোদরীর প্রার্থনা স্বীকার করে রাজা রাবণের দরবারের সামনে দাঁড়িয়ে (কবীর পরমেশ্বর) দ্বার পালকে রাবণের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রার্থণা জানায়। দ্বার পাল বলে, ঋষিজী এই সময় আমাদের রাজার দরবার বসেছে। এই সময় ভিতরের খবর বাইরে যাবে কিন্তু বাইরের খবর ভিতরে যাবে না, আমরা বিবশ। তখন পূর্ণ প্রভু অন্তর্ধ্যান হয়ে রাজা রাবণের দরবারে প্রকট হন। রাবণের দৃষ্টি ঋষির উপর পড়তেই সে গর্জে উঠে বলে এই ঋষিকে আমার অনুমতি ছাড়া কে ভিতরে আসতে দিয়েছে। তাকে ধরে এনে আমার সামনে হত্যা কর। তখন পরমেশ্বর বলেন রাজন! আপনার দ্বারপালেরা আমাকে স্পষ্ট মানা করে দিয়েছিল। তারা জানে

না যে, আমি কি ভাবে ভিতরে এসেছি। রাবণ বলে, তুই ভিতরে এলি কিভাবে ? তখন পূর্ণ প্রভু মুনিন্দ্র অদৃশ্য হয়ে পুনরায় প্রকট হয়ে বলেন, আমি এই ভাবে এসেছি। রাবণ জিজ্ঞাসা করে, আসার কারণ বল। তখন মুনিন্দ্র রূপে প্রভু বলে, আপনি যোদ্ধা হয়ে এক অবলা নারীকে অপহরণ করে এনেছেন, ইহা আপনার সূরবীরতা বা মর্যাদার বিপরীতে । ইনি কোন সাধারণ নারী নন। সীতা স্বয়ং শ্রী লক্ষ্মীর অবতার ও এনার স্বামী শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের জীবনের ভিক্ষা চেয়ে নাও। এতেই আপনার কল্যাণ হবে। এই কথা শুনে তমোগুণের (ভগবান শিব) উপাসক রাবণ, ক্রোধিত হয়ে উন্মুক্ত তরোয়াল নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং ঐ নির্বোধ জীব ৭০ বার অন্ধের মত আঘাত করে ঋষিকে মারার জন্য আসে। পরমেশ্বর মুনীন্দ্র জী একটি ঝাড়ুর সিঁক হাতে ধরে রেখেছিলেন তা ঢালের মত এগিয়ে দেন। রাবণের তরোয়ালের আঘাত ঐ পাতলা সিঁকের ওপর লাগলে এমন আওয়াজ হচ্ছিল যেন লোহার খুঁটিতে আঘাত লাগছে। সিঁক একটুও নড়লনা। রাবণ ঘামে ভিজে যায় তবুও অহঙ্কারবশত মুনিন্দ্র ঋষির কথা মানলেন না। কিন্তু বুঝতে পারেন যে, ইনি কোন সাধারণ ঋষি নয়। সে বলে আমি আপনার কেনো কথা শুনতে চাই না, আপনি যেতে পারেন। মুনিন্দ্র সাহেব অন্তর্ধ্যান হয়ে যান এবং মন্দোদরীকে সকল বৃত্তান্ত বলে প্রস্থান সেখান থেকে প্রস্থান করেন। রানী মন্দোদরী বলে গুরুদেব! এখন আমি যদি বিধবা হয়ে যাই তবুও কোনো কষ্ট হবে না।

শ্রীরামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ হয় এবং রাবণ বধ হয়। লঙ্কার রাজা রাবণ, যে তমোগুন শিবের কঠিন সাধনা ক'রে, দশ বার শীশ (মাথা) কেটে বলিদান দিয়ে প্রাপ্ত করেছিল সেই ক্ষণিক সুখও চলে গেলো এবং নরকের ভাগী হলো। বিপরীত দিক, পূর্ণ পরমাত্মার সতনাম সাধক বিভিষণ কোনো প্রকার কঠিন সাধনা ছাড়াই পূর্ণ প্রভুর কৃপায় লঙ্কা দেশের রাজ্য প্রাপ্ত করে। হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত বিভীষণ লঙ্কার রাজ্য সুখ ভোগ করে এবং প্রভু কৃপায় রাজ্যে পূর্ণ শান্তি হলো। সকল রাক্ষস প্রবৃত্তির ব্যক্তিরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভক্তমতি মন্দোদরী ও ভক্ত বিভীষণ তথা পরম ভক্ত চন্দ্রবিজয়ের পরিবারের ষোল সদস্য ও অন্যান্য যারা পূর্ণ পরমাত্মার উপদেশ প্রাপ্তি করে আজীবন মর্যাদায় থেকে সতভক্তি করে, সেই সকল সাধক এই পৃথিবীতেও সুখ ভোগ করে এবং শেষ সময় পরমেশ্বরের বিমানে বসে সতলোক (শাশ্বতম স্থানম) চলে যায়। তাই পবিত্র গীতায় অধ্যায় ৭ মন্ত্র নং. ১২ থেকে ১৫ তে বলেছে যে, তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) এর সাধনায় প্রাপ্ত ক্ষণিক সুবিধার জন্য যাদের হরণ জ্ঞান হরণ হয়েছে, তারা রাক্ষস স্বভাবের, মনুষ্যের মধ্যে নিচ, দুষ্কর্মকারী মূর্খ, তারা আমাকেও (কাল-ব্রহ্ম) ভজে না।

আবার গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র নং. ১৮ তে গীতা বলা (কাল-ব্রহ্ম) প্রভু বলছে, একমাত্র উদার আত্মাই আমার (ব্রহ্মের) সাধনা করে। কারণ তারা তত্ত্বদর্শী সন্ত পায়নি। সেই সৎ আত্মারা আমার (অনুত্তমম্) অতি অশ্রেষ্ঠ (গতিম্) মুক্তির স্থিতিতে আশ্রিত থেকে যায়। তারাও পূর্ণ মুক্তি পায় না। এই জন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৮ মন্ত্র নং. ৬২ তে বলেছে হে অর্জুন! তুই সর্বভাবে ঐ পরমেশ্বর (পূর্ণ পরমাত্মা ততব্রহ্ম) এর শরণে যা। তার কৃপায় তুই পরম শান্তি ও সতলোক অর্থাৎ সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত করবি।

তাই সকল পূণ্যআত্মার কাছে নিবেদন যে, আজ এই দাসেরও দাস (সন্ত রামপাল জী মহারাজ) অর্থাৎ আমার কাছে পূর্ণ পরমাত্মা প্রাপ্তির বাস্তবিক বিধি আছে। নিঃশুল্ক উপদেশ নিয়ে লাভ গ্রহণ করুন।

"দ্বাপর যুগে ইন্দ্রমতি কে শরণে নেওয়া"

দ্বাপর যুগে চন্দ্র বিজয় নামের এক রাজা ছিল। তার পত্নী ইন্দ্রমতি খুব ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। সাধু মহাত্মা দের খুব আদর যত্ন করতেন। তিনি একজন গুরুদেবের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলেন।গুরুদেব বলেছিলেন একাদশীর ব্রত, মন্ত্র জপ করতে। ইন্দ্রমতি খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে ভক্তি করতেন। ওনার গুরুদেব বলেছিলেন,পুত্রী! সাধু-সন্তদের সেবা করা উচিত। সন্তকে ভোজন করালে অনেক পুণ্য হয়। সন্তদের ভোজন করালে তুই পরের জন্মেও রানী হবি এবং স্বর্গ প্রাপ্তি করবি। তাই রানী প্রতিদিন একজন সন্তকে ভোজন করানোর সিদ্ধান্ত নেন। রানী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আমি প্রতিদিন প্রথমে একজন সাধুকে ভোজন করাব, তারপর আমি ভোজন করব। এতে আমার মনে থাকবে আমি কখনো ভুলে যাবো না। তাই প্রতিদিন প্রথমে একজন সাধুকে ভোজন করাতেন, পরে তিনি ভোজন করতেন। এইভাবে বছর পেরিয়ে গেল।

একসময় হরিদ্বারে কুম্ভ মেলার সংযোগ হয়। ত্রিগুনের সমস্ত উপাসক কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নানের জন্য (পরভী নেওয়ার জন্য) প্রস্থান করে। এই কারণে কয়েক দিন ভোজন করানোর জন্য রানী কোন সন্ত পান না। রানী ইন্দ্রমতিও প্রতিজ্ঞাবসত ভোজন করেননি। চতুর্থ দিনে রাণী ইন্দ্রমতি দাসীকে বলেন,"দেখ তো কোথাও কোন সন্ত আছে কিনা। না হলে আজ তোর রানী আর জীবিত থাকবে না। আমি মরে গেলেও কোন সন্তকে ভোজন না করিয়ে খাব না।" দীন দয়াল প্রভু কবীর পরমেশ্বর নিজের পূর্বের ভক্তকে শরণে নেওয়ার জন্য না জানি কোন কারণ বানায়। দাসী ছাদের উপরে উঠে দেখে সাদা কাপড় পরা একজন সাধু এইদিকে আসছে, দাসী তাড়াতাড়ি নিচে এসে রানীকে বলে, রানী মা! একজন সাধু এই দিকে আসছে। রানী বললেন, তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আয়। দাসী মহল থেকে বাইরে গিয়ে সাধুকে প্রার্থনা করে বলে, হে মহাত্মা জী! আমার রানী মা আপনাকে ডেকেছে। করুণাময় সাহেব বলেন যে, রানী মা কেন ডেকেছেন? তার সাথে আমার কি সম্পর্ক? দাসী সমস্ত কিছু খুলে বলে। করুণাময় সাহেব বলেন, যদি রানীর প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে এখানে আসতে বল। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তুই দাসী আর সে রানী। আমি ভিতরে গেলে যদি বলে তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে? তাছাড়া রাজা যদি কিছু বলে। সন্তকে অনাদর করলে অনেক পাপ হয়। দাসী ভিতরে গিয়ে রানীকে সব কথা বলে। রানী বলেন, দাসী! আমার হাত ধর, আমি নিজে যাচ্ছি। সাধু বাবার কাছে গিয়ে রানী দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলেন, হে পরবর্দিগার ভগবান! ইচ্ছা তো করে কাঁধে বসিয়ে প্রভুকে নিয়ে যাই। করুণাময় সাহেব বললেন, পুত্রী! আমি এটাই দেখতে চাইছিলাম। শুধু নিয়ম পালনের জন্য ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করছিস, না ভক্তির জন্য? রানী নিজের হাতে রান্না করে করুণাময় সাহেবকে খাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। করুণাময় সাহেব বলেন, পুত্রী! আমার এই শরীর খাওয়ার জন্য নয়। রানী বলেন, তাহলে আমিও অন্ন গ্রহন করব না। তখন করুণাময় সাহেব অন্ন গ্রহন করেন। কেননা সমর্থ তাকে বলে যিনি যা চান তাই করতে পারেন। করুণাময় রূপে প্রকট কর্বিদেব (কবীর সাহেব) রানীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই যে সাধনা করছিস, তা কে বলেছে? রানী বলেন, এ আমার গুরুদেবের আদেশ। তোর গুরুদেব আর কি কি আদেশ দিয়েছেন। একাদশী ব্রত, মন্দিরে ও তীর্থে যাওয়া, শ্রাদ্ধ করা, সাধু সন্তদের সেবা করা ইত্যাদি। করুণাময় সাহেব বলেন, তুই যে সাধনা করছিস তাতে মৃত্যুর পর স্বর্গ, নরক, আর ৮৪ লক্ষ যোনীর কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবি না। রানী বলেন, মহারাজ! সকল সন্ত নিজের নিজের প্রভুত্ব দেখাতে চায়। আমার গুরুদেবের বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন না। আমি মুক্ত হই বা না হই।

এখন করুণাময় সাহেব চিন্তা করেন, এই ভোলা আত্মা কে কিভাবে বোঝায়? মরতে পারে, কিন্তু যে সাধনা করছে তা ছাড়তে পারবে না। করুণাময় সাহেব বললেন, পুত্রী! যা তোর ইচ্ছা তাই কর। আমি কি তোর গুরুদেব কে গালি দিয়েছি? না কোন নিন্দা করেছি? আমি তো শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি মার্গ বলছি। এই সাধনায় তুই পার হতে পারবি না। আর না তোর ভবিষ্যতে আসন্ন কোন বিপদ কাটবে। আর শোন আজ থেকে তৃতীয় দিনে তোর মৃত্যু হবে, না তোর গুরুদেব বাঁচাতে পারবে,আর না তোর এই নকল সাধনা তোকে বাঁচাতে পারবে। (যখন মৃত্যুর কথা আসে তখন সবাই ভয় পায়) রানী চিন্তা করে সন্তরা তো মিথ্যা কথা বলে না। এমন তো নয় যে সত্যিই আমি পরশু মারা যাব? এই ভয়ে রানী করুণাময় সাহেব কে জিজ্ঞাসা করে, আমার প্রাণ কি বাঁচতে পারে? কবীর সাহেব (করুণাময়) বলেন, হ্যাঁ বাঁচতে পারে, যদি তুই আমার কাছে উপদেশ নিয়ে আমার শিষ্য হয়ে সদভক্তি করিস, পুরনো পূজা ত্যাগ করিস, তাহলে তোর প্রাণ বাঁচতে পারে। আমি শুনেছি গুরু পাল্টাতে নেই, তাতে পাপ লাগে। করুণাময় সাহেব বলেন, না পুত্রী! এটা তোর ভুল ধারণা (ভ্রম)। এক ডাক্তারের কাছে রোগ ঠিক না হলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাবি না? একজন পঞ্চম শ্রেণীর মাস্টার হয়,অন্যজন উচ্চ শ্রেণীর মাস্টার হয়। পুত্রী! সারা জীবন কি পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়ে থাকবি। পরের শ্রেণীতে যেতে হলে আগের শ্রেণিকক্ষ ছাড়তে হবে। এখন তোকে উচ্চ শিক্ষা নিতে হবে। আমি তোকে পড়াবো। এমনিতে তো মানতো না, কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে ইন্দ্রমতি চিন্তা করে, যদি সন্তের কথা না শুনি আর সত্যই যদি আমার মৃত্যু হয়। এই চিন্তা করে রানী বলে, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। করুণাময় সাহেব ইন্দ্রমতি কে নাম উপদেশ দিয়ে বলেন, তৃতীয় দিনে কাল আমার রূপ ধরে তোকে নিতে আসবে। তুই কিছু বলবি না, আমি যে নাম দিয়েছি তা দুই মিনিট পর্যন্ত জপ করে ওর দিকে তাকাবি। গুরুদেবের দর্শন মাত্রই শীঘ্রই তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত। এটা কেবল এবারকার মতো আমার আদেশ। রানী বললেন, ঠিক আছে গুরুদেব।

রানী মৃত্যুর ভয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্ত্র জপ করছিল।তৃতীয় দিনে করুণাময় সাহেবের রূপ ধরে কাল আসে। ইন্দ্রমতি- ইন্দ্রমতি বলে ডাকে। ইন্দ্রমতি তো ভয়েই ছিল। তাই কালের দিকে না তাকিয়ে মন্ত্র জপ করতে লাগে। দুই মিনিট পরে যখন তাকালো কালের স্বরূপ পাল্টে গেছে, করুণাময় সাহেবের রূপ বদলে কালের বাস্তবিক রূপ হয়ে গেছে। কাল বুঝতে পারে এর কাছে কোন শক্তি যুক্ত মন্ত্র আছে। তখন কাল চলে যায় এই বলে যে,তোকে পরে দেখছি। এইবার তো বেঁচে গেলি। রানী আনন্দে সবাইকে বলতে লাগে, আজ আমার মৃত্যু ছিল। কাল আমাকে নিতে এসেছিল। রাজাকেও বলে, আমার গুরুদেব আজ আমাকে রক্ষা করেছে। কাল আমাকে নিতে এসেছিল। রাজা বলেন, তুমি তো নাটক করতে থাকো। কাল এলে কি তোমাকে ছেড়ে দিত? সন্ত জী তোমাকে বোকা বানিয়েছে। রানী রাজার কথায় কান না দিয়ে আনন্দে বিছানায় শুয়ে পরে। কিছুক্ষণ পর সাপ হয়ে কাল আবার আসে, আর রানীকে ছোবল মারে। রানী যন্ত্রনায় চিৎকার করে ওঠে। আমাকে সাপে কামড়েছে। দাসী রা দৌড়ে আসে। দেখে জল বের হওয়া একটি ছিদ্র দিয়ে সাপটি বেরিয়ে গেল। নিজের গুরুদেবকে স্মরণ করতে করতে রানী অজ্ঞান হয়ে যায়। করুণাময় সাহেব ওখানে প্রকট হয়ে যান। লোকেদের দেখানোর জন্য মন্ত্র বলেন। (উনিতো বিনা মন্ত্রেও জীবিত করতে পারেন, মন্ত্রের কোন দরকার পড়ে না) রানী ইন্দ্রমতিকে জীবিত করে দেন। রানী ভগবানকে (করুণাময় জীকে) ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, হে বন্দীছোড়! যদি আজ আমি আপনার শরণে না থাকতাম তাহলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।কবীর পরমেশ্বর

বলেন, কালকে আমি তোর ঘরে ঢুকতেও দিতাম না। তোর উপর হামলাও করতে পারত না। কিন্তু তোর বিশ্বাস হতো না। তুই ভাবতি তোর উপর কোন বিপদ ছিল না। গুরুদেব আমাকে ভ্রমিত করে নাম দিয়েছে। এইজন্য তোকে বিশ্বাস করানোর জন্য এই ঘটনার প্রয়োজন ছিল। না হলে তোর বিশ্বাস হতো না।

ধর্মদাস য়হাঁ ঘনা অন্ধেরা, বিন পরিচয় জীব জম কা চেরা॥

করুণাময় সাহেব বলেন, এখন আমি যখন চাইবো তখন তোর মৃত্যু হবে। গরীব দাস জী বলেন :-

গরীব, কাল ডরৈ করতার সে, জয় জয় জয় জগদীশ।
জৌরা জৌরী ঝাড়তী পগ রজ ডারে শীশ॥

এই কাল কবীর পরমেশ্বর কে ভয় পায়। আর মৃত্যু কবীর সাহেবের জুতা পালিশ করে অর্থাৎ চাকর তুল্য । জুতার ধুলো নিজের মাথায় নিয়ে বলে, আপনার ভক্তদের কাছে আমি যাব না।

গরীব, কাল জো পীসৈ পীসনা, জৌরা হৈ পনিহার।
য়ে দো অসল মজদুর হৈ, মেরে সাহেব কে দরবার॥

এই কাল ব্রহ্ম ২১ ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পিতা। এ আমার কবীর সাহেবের আটা পেশায় করা অর্থাৎ পাক্কা চাকর। আর (জৌরা) মৃত্যু কবীর সাহেবের জল ভরে অর্থাৎ একজন বিশেষ দাসী। এই দুজন কবীর পরমেশ্বরের দরবারে আসল মজদুর (চাকর)। কিছুদিন পরে করুণাময় সাহেব আবার আসেন। রানী ইন্দ্রমতি কে সতনাম দেন।

আবার কিছুদিন পরে করুণাময় সাহেব রানী ইন্দ্রমতির অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখে সারনাম প্রদান করেন। শব্দের উপলব্ধি করান। কবীর পরমেশ্বর সময়ে সময়ে দর্শন দিতে আসতেন। তখন ইন্দ্রমতি প্রার্থনা করতেন, প্রভু আমার স্বামীকেও বোঝান। উনি আপনার শরণে আসলে আমার জীবন সফল হয়ে যাবে। কবীর সাহেব রাজা চন্দ্র বিজয় কে প্রার্থনা করেন, আপনিও নাম দীক্ষা নিয়ে নিন। এই সংসার দুই দিনের আনন্দ ফুর্তি। পরে ৮৪ লক্ষ যোনীতে চলে যেতে হবে। রাজা চন্দ্র বিজয় বলেন,ভগবান আমি নাম নেব না। আর আপনার শিষ্যাকে বাধাও দেব না। সে চাইলে সমস্ত ধন-সম্পত্তি দান করে দিতে পারে, চাইলে সৎসঙ্গ করতে পারে,আমি বাধা দেব না। কবীর সাহেব বলেন, কেন নাম উপদেশ নেবেন না। রাজা বলেন, আমাকে বিভিন্ন জায়গায় রাজা মহারাজাদের সভায় (পার্টিতে) যেতে হয়। করুণাময় (কবীর সাহেব) বলেন, তাতে নাম নিতে কি বাধা? পার্টিতে গেলে কাজু কিসমিস, ফল, দুধ, শরবত খান কিন্তু মদ (মদিরা) পান করবেন না। কারণ মদ্যপান করা মহাপাপ। কিন্তু রাজা তাতে কর্ণপাত করেনি।

রানীর প্রার্থণাতে করুণাময় সাহেব রাজাকে আরো বোঝান। নাম বিনা জীবন ব্যর্থ যাবে। আপনি নাম নিয়ে নিন। রাজা বলেন, গুরুজী আমাকে নাম নিতে বলবেন না। আপনার শিষ্যাকে আমি বাধা দেব না। সে যখন ইচ্ছা সৎসঙ্গ করাতে পারে। ভোজন-ভান্ডারা করাতে পারে। সাহেব বলেন, পুত্রী! এই দুই দিনের সুখ দেখে রাজার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তুই নিজের কল্যাণ কর। এই সংসারে কেউ কারো স্বামী নয়, কেউ কারো স্ত্রী নয়। পূর্ব জন্মের সংস্কারের কারণে দুই দিনের সম্পর্ক। তুই নিজের কর্ম কর। এখন ইন্দ্রমতি ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা হয়ে গেছে। কোথায় চল্লিশ বছর বয়সে মারা যেত। যখন শরীর আর চলছে না, তখন একদিন করুণাময় সাহেব বললেন, ইন্দ্রমতি সতলোকে যেতে চাস? ইন্দ্রমতি বলে, আমি তৈরি প্রভু!। সাহেব বলেন, তোর নাতি -পুত্রের বা

এই সংসারের উপর কোন মায়া নেই তো? রানী বলে, না গুরুদেব। আপনি এমন নির্মল জ্ঞান দিয়েছেন, এই নোংরা লোকে আর কি ইচ্ছা করব? তখন করুণাময় সাহেব বললেন, চল পুত্রী। রানী প্রাণ ত্যাগ করল। পরমেশ্বর কবীর (করুণাময়) বন্দীছোড় রানী ইন্দ্রমতির আত্মাকে উপরে নিয়ে গেলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডেই একটি মানসরোবর আছে। সেখানে আত্মাকে স্নান করিয়ে কিছু সময়ের জন্য রাখা হয়। সেখানে কবীর পরমেশ্বর পূর্ণ গুরুর স্বরূপে প্রকট থাকেন। পরমেশ্বর কবীর বন্দীছোড় জী আবার ইন্দ্রমতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সংসারে যদি তোর কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে আবার জন্ম নিতে হবে। মনে কোন ইচ্ছা থাকলে সতলোকে যেতে পারবি না। ইন্দ্রমতি বলল, প্রভু! আপনি তো অন্তর্যামী। কোন ইচ্ছা নেই। আপনার চরণে থাকতে চাই। কিন্তু মনে একটি শঙ্কা আছে। আমার যে স্বামী ছিল, সে আমাকে কখনো কোনো ধার্মিক কাজে বাধা দেয়নি। যদি সে মানা করে দিত তাহলে আমি আপনার চরণে থাকতে পারতাম না। আমার উদ্ধার হতো না। ওনার এই শুভ কর্মে সহযোগ করার জন্য যদি কোন ফল হয় তাহলে তাকে দয়া করো দাতা। পরমেশ্বর কবীর জী দেখলেন যে, এই ভোলা মেয়ে স্বামীর জন্য পুনরায় কালজালে আটকে যাবে। সাহেব বললেন, ঠিক আছে পুত্রী। এখন তুই দুই চার বছরের জন্য এখানেই থাক।

দুই বৎসর পরে রাজারও মৃত্যুর দিন আসে। যেহেতু নাম নিয়ে রাখেনি, যমদূত সামনে এসে দাঁড়ায়। রাজা ভয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। যমদূতরা তার গলা চেপে ধরে। তখন রাজার পায়খানা প্রস্রাব বের হয়ে যায়। করুণাময় সাহেব রানী কে বলেন, দেখ তোর রাজার কি অবস্থা হচ্ছে! মানসরোবর থেকে পরমেশ্বর কবীর জী রানীকে দেখালেন। এই সবকিছু দেখে রানী বললেন, হে প্রভু! সৎকর্মের সহযোগে যদি কোন ভালো ফল হয় তাহলে দয়া করো দাতা। এখনো রানীর একটু মমতা বেঁচে ছিল। রানী আবার কালের জালে ফাঁসতে যাচ্ছে দেখে, পরমেশ্বর মানসরোবর থেকে রাজা ইন্দ্র বিজয়ের মহলে গেলেন। সেখানে রাজা অচেতন হয়ে পড়েছিল। কবীর সাহেবকে আসতে দেখে যমদূতরা আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল। চন্দ্র বিজয়ের জ্ঞান ফিরলো। দেখলেন সামনে করুণাময় সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। কেবল চন্দ্র বিজয়ই দেখতে পাচ্ছিল অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। চন্দ্রবিজয় সাহেবের পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন প্রভু! আমার প্রাণ বাঁচান। রাজা বুঝতে পেরেছে, এখন তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই বারবার বলতে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দাও প্রভু, আমার প্রাণ বাঁচাও। কবীর সাহেব বললেন, রাজন! আগেও যা বলেছি, এখনো তাই বলবো। নাম নিতে হবে। রাজা বললেন, নাম নিয়ে নেব, এখনই নাম নিয়ে নেব। কবীর সাহেব নাম উপদেশ দিলেন, এবং বললেন, এখন আমি তোকে আরো দুই বছর আয়ু দেব, এর মধ্যে যদি একটি শ্বাসও খালি যায় তাহলে কর্মদণ্ড থেকেই যাবে।

কবীর, জীবন তো থোড়া ভলা, জৈ সত সুমিরন হো। লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখে ধরে না কো ॥

শুভ কর্মে সহযোগিতা করার ফলে,আর দুই বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি করার ফলে,তিন নাম প্রদান করে কবীর সাহেব রাজা চন্দ্র বিজয়কেও পার করে দিলেন। বলো কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) কি জয়। বন্দীছোড় কী জয়।

পরমেশ্বর কবির্দেব শ্রদ্ধালুদের আয়ু বাড়িয়ে দেন। এবং তার পরিবারেরও রক্ষা করেন। উপরোক্ত এই প্রমাণ অনেক পূর্বের। বর্তমানে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে না। বর্তমানে কবীর পরমেশ্বরের শক্তিতে সদগুরু রামপাল জী মহারাজ দ্বারা ভক্তদের আয়ু বাড়ানো ও কষ্ট নিবারনের কিছু প্রমাণ পড়ুন এই পুস্তকের পথভ্রষ্টের মার্গ দর্শন নামক লেখনীতে।

"পবিত্র পুরাণের রহস্য"

পুরাণ গুলিকে বোঝার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শ্রী ব্রহ্মা পুরাণ, শ্রী বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রী শিব পুরাণ ব্রহ্মের লীলা থেকে প্রারম্ভ হয়। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৫-এ যাকে (ব্রহ্মকে) প্রথম অব্যক্ত বলা হয়েছে। যিনি গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২-এ বলছে যে, "আমি কাল"। এই কালকে ক্ষর পুরুষ এবং জ্যোতি নিরঞ্জনও বলা হয়। এনাকেই সদাশিব, কালরূপী ব্রহ্ম বলা হয়। ইনি এই ব্রহ্মাণ্ডে এক ব্রহ্মলোকের রচনা করে তার উপরের অংশে থাকে।

এই ব্রহ্মকেই মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মা ও মহাশিবও বলা হয়। এই কাল যেখানে থাকে সেই ক্ষেত্রকে কাশীও বলা হয়ে থাকে। ওখানেই রজোগুণ প্রধান, সত্ত্বগুণ প্রধান ও তমোগুণ প্রধান এই তিনটি স্থান তৈরি করে, সেখানে নিজ পত্নী দুর্গাকে (মহালক্ষ্মী) সঙ্গে রেখে তিন পুত্র রজোগুণ শ্রী ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ শ্রীবিষ্ণু ও তমোগুণ শ্রী শিবের উৎপত্তি করে তাদের অচৈতন্য করে দেয়। অচৈতন্য অবস্থাতেই তাদের পালন করতে থাকে। যুবক হয়ে যাওয়ার পর শ্রী ব্রহ্মাকে পদ্মফুলের উপর, শ্রী বিষ্ণুকে শীষনাগের শয্যায় ও শ্রী শিবকে কৈলাশ পর্বতে রেখে চেতনা ফিরিয়ে দেয়। এই তিন প্রভুর স্বয়ং কোনো জ্ঞান ছিল না যে, আমাদের উৎপত্তি কর্তা কে? এই কাল রূপী ব্রহ্মই, বিষ্ণু রূপ ধারণ করে নিজ নাভী থেকে কমল উৎপন্ন করে তার উপর ব্রহ্মাকে রেখে চেতনা ফিরিয়ে দেন। সে যখন ইচ্ছা তখন শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের রূপ ধারণ করে (দৃষ্টিগোচর হয়) দর্শন দেয়। জ্যোতি নিরঞ্জন কাল তাঁর আসল রূপে কখনো প্রকট হয় না।

যেই রূপটি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান দেওয়ার সময় অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১০ ও ১১ তে আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭-৪৮-এ বলেছে হে অর্জুন! আমার এই আসল (বাস্তবিক) কাল রূপ তুই ছাড়া অন্য কেউ এর আগে দেখেনি এবং পরেও কেউ দেখতে পাবে না। আমি তোর উপর কৃপা করে তোকে দেখাচ্ছি। আমার এই হাজার বাহু ও চক্ষুযুক্ত কাল রূপটি বেদে বর্ণিত বিধিতে যেমন, যজ্ঞ, ওম্ নামের জপ ইত্যাদি দ্বারা কখনো দেখতে পাওয়া যাবে না। ভাবার্থ হলো, বেদে বর্ণিত বিধিতে প্রভু প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এই জন্য ঋষি-মহর্ষিগণ বেদের "ওম্" নামকেই প্রভু প্রাপ্তির জপ মনে করে যজ্ঞ তথা "ওম্" নামের জপের কঠিন সাধনা করেও "ব্রহ্ম" এর দর্শন পায়নি। কেউ কমলের প্রকাশ দেখেছে, কেউ শরীরের ভেতর জ্যোতি দেখেছে তথা ধ্বনি শুনেছে, এই সব কালের (ব্রহ্ম) ছলনা মাত্র। কেউ - কেউ সহস্র কমলের এক হাজার জ্যোতি থেকে নির্গত প্রকাশ দেখেই সেটিকে প্রভু প্রাপ্তি বলে মনে করছে। যেমন কোন স্থানে একই রং-এর হাজারটি বাল্ব এক জায়গায় গোলাকার পরিধিতে পরস্পর লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তারপর দূর থেকে কেউ দেখলে এক উজ্জ্বল প্রকাশমণ্ডলী দেখা যাবে। কিন্তু কাছে এসে দেখলে দেখা যাবে এটা বাল্ব-এর প্রকাশ মাত্র।

এই প্রকার, কিছু সাধক হঠযোগ করে শরীরে অন্তঃর্মুখী হয়ে সামান্য আতশবাজি দেখে সেটিকে প্রভু প্রাপ্তি বলে ভেবে নেয় এবং এই কাল জালকেই আনন্দ মনে করে নিজের অমূল্য জীবন নষ্ট করে দেয়। বেদে স্পষ্ট লেখা আছে যে পরমেশ্বর স্বশরীরে রয়েছেন। যজুর্বেদ অধ্যায় ১ মন্ত্র ১৫ এবং অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১ এ প্রমাণ আছে:-

অগ্নে তণুর অসি। বিষ্ণবে ত্বা সোমস্য তণূর অসি।

যার শব্দার্থ হলো :- পরমেশ্বর স্বশরীরে রয়েছেন। সর্ব পালন কর্তা অমর পুরুষ (সত্পুরুষ) এর শরীর আছে অর্থাৎ পরমাত্মা আকার যুক্ত। এইজন্য ঋষিগন প্রভু

দর্শনের জন্য ঘোর তপ করে কিন্তু বেদে বর্ণিত বিধি দ্বারা প্রভু প্রাপ্তি হবে না। তাই আজ পর্যন্ত সর্ব সাধক, ঋষিগন ইত্যাদি নিজেদের অভিজ্ঞতার ওপর পুস্তক রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ বেদ জ্ঞানের বিরুদ্ধ। বর্তমানে সর্ব ভক্ত সমাজ পবিত্র বেদের স্থানে মহর্ষিদের বা সন্তদের অভিজ্ঞতায় লেখা পুস্তকের জ্ঞানের উপর অধারিত হয়ে রয়েছে।

পবিত্র বেদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম বলছেন, তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) ইষ্ট রূপে পূজার যোগ্য নয়। কারণ তাঁরাও নাশবান এবং যেমন কর্ম ঠিক তেমনি ফল দেন। পাপ ক্ষমা (নাশ) করতে পারে না। এদের পূজারী ভক্তদেরকে প্রারব্ধের (ভাগ্যে) লেখা কষ্ট, ভোগ করতেই হয়। এই তিন প্রভুর সাধনায় ক্ষণিকের জন্য সংসারিক সুখ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু পূর্ণ মোক্ষ হয় না। এই তিন প্রভু (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব) দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষণিক লাভের উপর যাদের বিশ্বাস রয়েছে তারা রাক্ষস স্বভাবের, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নীচ, দুষ্কর্ম করা মুর্খ, তারা আমারও (কাল-ব্রহ্মা) ভজনা করে না (প্রমাণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত)। কারণ ব্রহ্মের সাধক নাম নিজের নাম জপ ও পুণ্যের কামাই এর আধারে অধিক সময় পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে তৈরি মহাস্বর্গে থাকে। তাই কাল বলছেন যে, তিন প্রভুর থেকে কিছুটা অধিক স্বস্তি (লাভ) আমি দিতে পারি। কিন্তু এই ব্রহ্মলোক ও কাল (ব্রহ্ম) সবই নাশবান। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলেছে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সর্ব লোক নাশবান। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ ও অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫-এ গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম স্বয়ং বলছেন যে, আমার জন্ম-মৃত্যু হয় অর্থাৎ আমিও নাশবান। এই জন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে বলা হয়েছে, আমার (ব্রহ্ম) যে চতুর্থ প্রকারের সাধক আছে যারা জ্ঞানী, তারা বেদের জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, কেবল একজন পূর্ণ পরমাত্মাই ইষ্ট রূপে পূজ্য, তিনিই পাপনাশক, পূর্ণ মোক্ষ দায়ক এবং মানব শরীর কেবল প্রভু প্রাপ্তির জন্যই পাওয়া। ঋষি - মহর্ষিগণ নিজেরাই বেদের নিষ্কর্ষ বের করে নিয়েছে যে "ওম্" (ওঁ) মন্ত্রই একমাত্র প্রভু প্রাপ্তির মন্ত্র। হাজার হাজার বৎসর ধরে এই "ওঁ" মন্ত্র জপের সাধনা করেই নিজের শরীরের বলিদান দিয়েছেন। কিন্তু প্রভুর দর্শন হয়নি বরং অন্য কিছু উপলব্ধি হয়ে যায়। কিছু সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে যায় তথা স্বর্গ-মহাস্বর্গ ইত্যাদিতে উচ্চ পদ প্রাপ্তি হয়ে যায়। তারপর ভক্তি কামাই ও উপার্জিত পূণ্য (পুঁজি) শেষ করে পুনরায় এই পৃথিবীতে এসে জন্ম-মৃত্যু ও চুরাশি লক্ষ প্রাণীর শরীরে মহা কষ্ট এবং নরকে পাপ কর্মের ফল ভোগ করতে থাকে।

পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র নং. ১০ এবং পবিত্র গীতা অধ্যায় ৪ মন্ত্র নং. ৩৪-এ উক্ত দুই শাস্ত্রের জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম বলেছেন যে, ঐ পূর্ণ পরমাত্মার বিষয়ে আমি (কাল রূপী ব্রহ্ম) জানি না। ঐ পরমেশ্বরের বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করার বিধি অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ মার্গ জানার জন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করো। তিনি যেভাবে সাধনা বলবেন তেমনই করো। তারপর ঐ পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিত যেখানে গেলে সাধক পুনরায় এই সংসারে আর ফিরে আসে না। অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি করে চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যু ও চুরাশি লক্ষ যোনীর মহাকষ্ট ও নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত করে (শাশ্বতম্ স্থানম্) অবিনাশী লোক অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্তি হয়। (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ ও গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এবং ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সুক্ত ২৪ মন্ত্র নং. ১-২)।

তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে ঋষিরা বেদ অনুসারে সাধনা করেও মহাকষ্টের মধ্যে রয়ে যায়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে বলেছে, যারা জ্ঞানী আত্মা তারা উদার প্রকৃতির হয়ে থাকে, কারণ তারা প্রভু প্রাপ্তির জন্য তন-মন-ধন

দিয়ে বেদ অনুসারে সাধনা করে। কিন্তু তারাও আমার অর্থাৎ (কাল) ব্রহ্মের অতি নিকৃষ্ট (অনুতমাম্) গতির উপর অর্থাৎ সাধনায় প্রাপ্ত লাভের উপরেই আশ্রিত থাকে। এতে তাদের মুক্তি বা পূর্ণ মোক্ষ সম্ভব নয়। কর্মের আধারে জন্ম-মৃত্যু এবং নানা প্রকার প্রাণীর শরীরে ও নরকে কষ্ট কখনো সমাপ্ত হয় না।

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল রূপী ব্রহ্ম) প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আমি কখনো কাউকে কোনো সাধনা দ্বারাই আমার বাস্তবিক কাল রূপে দর্শন দেব না। তাই এই কাল রূপী ব্রহ্মাই নিজের পুত্রদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) রূপে দর্শন দিয়ে নানান চরিত্র পালন করে। যে কারণে অন্যান্যরা মনে করেন, ঐ লীলাটি ভগবান বিষ্ণু করেছেন, কখনো বলে এই লীলাটি শ্রী ব্রহ্মা করেছেন, আবার কখনো বলে এই লীলা শ্রী শিব করেছেন। যেমন সাধারণ ব্যক্তিরা বলেন যে, শ্রী ব্রহ্মার উৎপত্তি শ্রী বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মের উপর হয়েছে। ঐ সময় শ্রী বিষ্ণুর রূপে কালই নিজের নাভী থেকে কমল প্রকট করেছিলেন।

শ্রী লোমহর্ষন ঋষি (যাকে সুতও বলা হয় থাকে) নিজের গুরুদেব শ্রী ব্যাস ঋষির থেকে শোনা জ্ঞান'ই ব্রহ্মা পুরাণে (সৃষ্টির বর্ণনা নামক অধ্যায়টিতে) বলেছেন। শ্রী ব্যাসদেব শ্রী নারদের কাছ থেকে শুনে এবং শ্রী নারদ নিজ পিতা শ্রী ব্রহ্মার কাছ থেকে শুনে এই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রী ব্রহ্মার স্বয়ং এই বিষয়ে জ্ঞান নেই যে, আমি কোত্থেকে কিভাবে উৎপন্ন হয়েছি (শ্রী দেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দে প্রমাণ)। এর ভাবার্থ এই নয় যে, পুরাণের জ্ঞান ভুল। যে জ্ঞান শ্রী ব্রহ্মা চেতনা ফিরে পাওয়ার পরে বলেছে তা ঐ স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু চেতনা ফিরে পাওয়ার পূর্বের জ্ঞান হলো শোনা কথা অর্থাৎ লোকবেদ বা দন্তকথা। যে পূর্ণ পরমেশ্বর প্রথম সত্যযুগে সত সুকৃত নামে প্রকট হয়ে তত্ত্বদর্শী সন্ত রূপে এসে তত্ত্বজ্ঞান ও বাস্তবিক সৃষ্টি রচনার জ্ঞান শ্রী ব্রহ্মা, মনু প্রমূখকে দিয়েছিলেন। তারা তা শুনেও অবহেলা করে। পরবর্তীতে যখন শ্রী ব্রহ্মাকে তারই বংশধরেরা জিজ্ঞাসা করে তখন ঐ শোনা জ্ঞানের ভিত্তিতেই কিছু তথ্য মিলিয়ে মিশিয়ে নিজের চেতনা ফিরে পাওয়ার পূর্বের জ্ঞান কিছু বলে দেয়। যার কারণে কোনো পুরাণ'ই নির্ণয়ক জ্ঞানযুক্ত নয়। কোনো এক পুরাণের আধারে প্রমাণিত হয় যে, শ্রী বিষ্ণুর উৎপত্তি শ্রী ব্রহ্মা থেকে হয়েছে। আবার অন্য এক পুরাণ সিদ্ধ করে যে, শ্রী ব্রহ্মার উৎপত্তি শ্রী বিষ্ণু থেকে হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই সকল ঋষিগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন।

"শ্রী ব্রহ্মা ও শ্রী বিষ্ণুর মধ্যে যুদ্ধ"

শ্রী শিব পুরাণ (বিদ্ধেশ্বর সংহিতা অধ্যায় ৬, অনুবাদক দীন দয়াল শর্মা, প্রকাশক রামায়ণ প্রেস মুম্বাই, পৃষ্ঠা নং ৬৭, সম্পাদক পণ্ডিত রামলগ্ন পাণ্ডে "বিশারদ" প্রকাশক সাবিত্র ঠাকুর; প্রকাশন রথযাত্রা বারানসী, ব্রাঞ্চ - নাটী ইমলী বারনসীর, বিদ্যেশ্বর সংহিতা অধ্যায় ৬ পৃষ্ঠা নং ৫৪ টীকাকার ডাঃ ব্রহ্মানন্দ ত্রিপাঠী সাহিত্য আয়ুর্বেদ জ্যোতিষ আচার্য্য এম.এ, পী.এচ.ডী, ডি.এস.সী.এ। প্রকাশক চৌখম্বা, সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ৩৮ ইউ. এ., জওহর নগর, বাংলো রোড, দিল্লি, সংস্কৃত সহিত শিব পুরাণের বিদ্ধেশ্বর সংহিতা অধ্যায় ৬ পৃষ্ঠা নং. ৪৫-এ)।

একদিন শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণুর কাছে আসলেন। সেই সময় শ্রীবিষ্ণু শ্রী লক্ষ্মীর সহিত শীষনাগের বিছানায় শুয়ে ছিলেন। শ্রী বিষ্ণুর সঙ্গে তার অনুচরেরাও বসে ছিল। শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণুকে বলে পুত্র! ওঠ দেখ আমি তোর পিতা এসেছি। আমি তোর প্রভু। এই শুনে বিষ্ণু বলে, এসো বস পুত্র! আমি তোমার পিতা। তোমার মুখ এমন বাঁকা হয়ে গেল কেনো! শ্রীব্রহ্মা বললেন- হে পুত্র! এখন তোর অভিমান হয়ে গিয়েছে কিন্তু

আমি কেবল তোর সংরক্ষকই নই বরং সমস্ত জগতের পিতা। শ্রী বিষ্ণু বললেন, আরে চোর! তুই নিজের মাহাত্ম্য কেন দেখাচ্ছিস? সর্ব জগৎ তো আমার মধ্যে বাস (নিবাস) করে, তুইও আমার নাভী কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছিস। আর তুই আমার সঙ্গেই এই ধরনের কথা বলছিস। এই বলে দুই প্রভু নিজ নিজ হাতিয়ার দিয়ে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। একে অন্যের বুকে আঘাত করতে লাগে। এই সব দেখে, সদা শিব (কাল রূপী ব্রহ্ম) তাদের দুই জনের মাঝে একটি তেজোময় লিঙ্গ দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন তাদের এই যুদ্ধ বন্ধ হয়। (উক্ত বিবরণটি গীতাপ্রেস গোরক্ষপুরের শিব পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত সহিত যা উপরে লেখা আছে, তা অন্য দুই সম্পাদকের প্রকাশিত শিব পুরাণেও সঠিক লেখা আছে।)

বিচার করুন :- শ্রী শিব পুরাণ, শ্রী বিষ্ণু পুরাণ, শ্রী ব্রহ্মাপুরাণ ও শ্রী দেবী মহাপুরাণে তিন প্রভু এবং সদাশিব (কাল রূপী ব্রহ্ম) ও দেবীর (শিবা-প্রকৃতি) জীবন লীলা আছে। এই পুরাণ গুলির ভিত্তিতেই সর্ব ঋষিগণ ও গুরুজনেরা জ্ঞান শোনাতেন। যদি কেউ পবিত্র পুরাণের থেকে ভিন্ন জ্ঞান বলে তবে তা পাঠক্রমের বিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়ায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

উপরোক্ত যুদ্ধের বিবরণটি পবিত্র শিব পুরাণ থেকে নেওয়া, যেখানে দুই প্রভু পাঁচ বৎসরের বালকদের মত ঝগড়া করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে তুই আমার পুত্র, অন্য জন বলে তুই আমার পুত্র আমি তোর পিতা। তারপর আবার একে অন্যের ঘাড় ধরে কিল, ঘুঁষি, লাথি মেরে ঝগড়া করে। এই ধরনের চরিত্র হলো আমাদের ত্রিলোক নাথেদের।

উপরোক্ত তিন পুরাণের (শ্রী ব্রহ্মা পুরাণ, শ্রী বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রী শিব পুরাণ) প্রারম্ভ কাল রূপী ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের থেকেই হয়। এই জ্যোতি নিরঞ্জন ব্রহ্মলোকে মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিব রূপ ধারণ করে সেখানে থাকে এবং নিজের লীলাও উপরোক্ত রূপে করে থাকে। নিজের আসল কাল রূপকে লুকিয়ে রাখে এবং পরবর্তীতে রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবে এই তিন দেবের লীলার বিবরণ দেওয়া আছে। উপরোক্তে জ্ঞানের ভিত্তিতে পবিত্র পুরাণ গুলিকে বোঝা অতি সহজ হয়ে যাবে।

"শ্রী বিষ্ণু পুরাণ"

(অনুবাদক শ্রী মুণিলাল গুপ্ত, প্রকাশক গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর)

শ্রী বিষ্ণু পুরাণের জ্ঞান শ্রী পরাসর ঋষি নিজের শিষ্য শ্রী মৈত্রেয় ঋষিকে বলেছিলেন।

শ্রী পরাসর ঋষি বিবাহের পরেই গৃহত্যাগ করে বনে গিয়ে সাধনা করার দৃঢ় সংকল্প করে। তার ধর্মপত্নী বলে এই তো বিবাহ হলো আর আপনি এখনই ঘর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন! সন্তান উৎপত্তি করে তারপর সাধনায় যাবেন। তখন শ্রী পরাসর ঋষি বলেন, সাধনার পর সন্তান উৎপন্ন করলে শুভ সংস্কারের সন্তান উৎপন্ন হবে। আমি কিছু সময় পরে আমার শক্তি (বীর্য) কোন পক্ষীর দ্বারা পাঠিয়ে দেব, তুমি তা গ্রহণ করে নিও। এই বলে ঘর ত্যাগ করে বানপ্রস্ত গ্রহণ করলেন। এক বৎসর সাধনার পর নিজের বীর্য বের করে বৃক্ষের পত্রে (পাতা) বেঁধে দিয়ে নিজের মন্ত্রশক্তি দ্বারা শুক্রানুকে রক্ষা করে, একটি কাক কে বলে এই পত্রটি আমার স্ত্রীকে দিয়ে এসো। কাক সেটিকে নিয়ে নদীর উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখনই কাকের ঠোঁট থেকে পাত্রটি নদীতে পড়ে যায় এবং একটি মাছে তা খেয়ে নেয়। কয়েক মাস পরে এক মাঝি ঐ মাছটিকে ধরে কাটলে মাছটির পেট থেকে একটি কন্যা প্রাপ্তি হয়। মাঝি মেয়েটির নাম সত্যবতী রাখে এবং (মাছের পেট থেকে বের হওয়ার কারণে) সে মছোন্দরী নামেও

পরিচিত ছিল। মাঝি মছোন্দরীকে নিজের মেয়ে রূপে লালন পালন করে।

কাকটি ফিরে গিয়ে পরাসর ঋষিকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়। সাধনা সমাপ্ত করে ১৬ (ষোল) বৎসর পরে শ্রী পরাসর ঋষি যখন ফিরে আসছিল, তখন সে নদী পার হওয়ার জন্য মাঝিকে ডাক দিয়ে বলে, আমাকে অতি শীঘ্র নদী পার করাও। আমার পত্নী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই সময় মাঝি খাবার খাচ্ছিল। শ্রী পরাসর ঋষির বীজ দ্বারা মাছের পেট থেকে উৎপন্ন চৌদ্দ বৎসরের যুবতী কন্যাটিও তার পিতার খাবার শেষ হওয়ার অপেক্ষায় সেখানেই উপস্থিত ছিল। মাঝি জানত যে, সাধনা তপস্যা করে আসা ঋষিরা সিদ্ধি যুক্ত হয়। আদেশ শ্রীঘ্র পালন না করলে অভিশাপ দিয়ে দেয়। মাঝি বললো, ঋষিজী! আমি খাবার খাচ্ছি, খাবার ছেড়ে উঠে গেলে অন্নদেবের অপমান হয়, এতে আমার পাপ হবে। কিন্তু পরাসর ঋষি কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। ঋষিকে খুব ব্যস্ত মনে করে মাঝি তার মেয়েকে বলে, ঋষিকে ওপারে দিয়ে এসো। পিতার আদেশে মেয়েটি ঋষিকে নৌকায় করে নিয়ে পার হতে লাগলো। এমন সময় মাঝ নদীতে যাওয়ার পর ঋষি পরাসর নিজের বীজ শক্তি দ্বারা মাছের পেটে থেকে উৎপন্ন মেয়ে অর্থাৎ নিজেই মেয়ের সাথে দুষ্কর্ম করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। মেয়েটি তার পালক পিতার কাছ থেকে ক্রোধিত ঋষিদের অভিশাপে হওয়া দুঃখী ব্যক্তিদের কাহিনী শুনত। অভিশাপের ভয়ে কাঁপতে থাকা মেয়েটি বললো ঋষিজী আপনি ব্রাহ্মণ, আর আমি এক শুদ্রের মেয়ে। ঋষি বললো কোন চিন্তা নেই। মেয়েটি নিজের সম্মান রক্ষার্থে পুনরায় অজুহাত দেয় যে, হে ঋষিবর! আমার শরীর থেকে মাছের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঋষি সিদ্ধি সেই শক্তি দিয়ে দুর্গন্ধ সমাপ্ত করে দেয়। তখন মেয়েটি আবারও বলে, নদীর দুই পারে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঋষি পরাসর গঙ্গার জল হাতে নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয় এবং নিজের সিদ্ধি শক্তি দিয়ে কুয়াশা উৎপন্ন করে নিজের মনের ইচ্ছা পুরণ করে। মেয়েটি নিজের পালক মাতার মাধ্যমে পালক পিতাকে সর্ব বৃত্তান্ত জানায়। ঋষি নিজের নাম পরাসর বলেছিলেন এবং বলেছিলেন আমি বশিষ্ঠ ঋষির নাতি। সময় এলে কুমারীর গর্ভ থেকে শ্রী ব্যাস ঋষির জন্ম হয়।

এই পরাসর ঋষি শ্রী বিষ্ণু পুরাণ লেখেন। শ্রী পরাসর বলেছে হে! মৈত্রীয় যে জ্ঞান আমি তোকে শোনাতে চলেছি, এই প্রসঙ্গই দক্ষাদি মুনি নর্মদা তটের উপর রাজা পুরুকুতস্ কে বলেছিলেন, পুরুকুতস্ সারস্বতকে আর সারস্বত আমাকে বলেছে। শ্রী পরাসর, শ্রী বিষ্ণু পুরাণের প্রথম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা ৩১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩-এ বলেছে এই জগত বিষ্ণুর থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ওনার মধ্যেই স্থিত রয়েছে। তিনিই স্থিতি ও প্রলয় কর্তা। অধ্যায় ২ শ্লোক ১৫-১৬ এর পৃষ্ঠা নং. ৪-এ বলেছে হে দ্বিজ! পরব্রহ্মের প্রথম রূপ, পুরুষ অর্থাৎ ভগবানের মত মনে হয় কিন্তু তার ব্যক্ত (মহাবিষ্ণু রূপে প্রকট) ও অব্যক্ত (অদৃশ্য রূপে এবং বাস্তবিক কাল রূপে একুশ ব্রহ্মাণ্ডে থাকে) অন্যান্য রূপও রয়েছে এবং 'কাল' রূপটি তার পরম রূপ। ভগবান বিষ্ণু, যিনি কাল রূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান রয়েছেন, এটা তাঁর শিশুসুলভ লীলা।

অধ্যায় ২ শ্লোক ২৭ পৃষ্ঠা নং. ৫-এ বলেছেন :- হে মৈত্রেয়! প্রলয় কালে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির ন্যায় স্থিত হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতি থেকে পৃথক স্থিত হয়ে যাওয়ার পর বিষ্ণু ভগবানের কাল রূপ প্রকট হয়।

অধ্যায় ২ শ্লোক ২৮ থেকে ৩০ পৃষ্ঠা নং. ৫ :- পরবর্তী কালে (যুগের সময়কাল উপস্থিত হলে) ঐ পরব্রহ্ম পরমাত্মা 'বিশ্বরূপ' সর্বব্যাপী সর্বভূতেশ্বর সর্বাত্মা পরমেশ্বর, নিজের ইচ্ছায় বিকার যুক্ত প্রধান ও নির্বিকার পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের ক্ষোভিত করে॥ ২৮-২৯ ॥ যেই প্রকার, ক্রিয়াশীল না হওয়া সত্ত্বেও সুগন্ধ নিজের সান্নিধ্য মাত্রই প্রধান ও পুরুষকে প্রেরিত করে।

বিশেষ:- শ্লোক সংখ্যা ২৮ থেকে ৩০-এ স্পষ্ট বলেছে যে, প্রকৃতি (দুর্গা) ও পুরুষ (কাল-প্রভু) থেকে অন্য কোন প্রভু (পরমেশ্বর) আছে, যিনি এই দুজনকে পুনরায় সৃষ্টি রচনার জন্য প্রেরিত করে।

অধ্যায় ২ পৃষ্ঠা ৮-এর শ্লোক নং. ৬৬ তে লেখা আছে, ঐ প্রভুই বিষ্ণু হয়ে সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মা রূপ ধারণ করে নিজেকেই সৃষ্টি করে। শ্লোক সংখ্যা ৭০-এ লেখা আছে। ভগবান বিষ্ণুই ব্রহ্মা প্রমুখদের অবস্থায় গিয়ে রচনা করেন। তিনিই স্বয়ং নিজেকে রচনা করেন এবং স্বয়ং সংহার হন অর্থাৎ মারা যান। অধ্যায় ৪ শ্লোক ৪ পৃষ্ঠা নং. ১১ তে লেখা আছে, অন্য কোন পরমেশ্বর আছেন যিনি ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতিদের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৪- ১৫, ১৭, ২২ এর পৃষ্ঠা নং. ১১, ১২ তে লেখা আছে। পৃথিবী বললেন - হে কাল স্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভু! আপনিই জগতের সৃষ্টি, সঞ্চালন ও সংহারের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র রূপ ধারণ করেন। আপনার যে রূপটি অবতার রূপে প্রকট হয়, দেবগণ তার পূজাই করে। আপনিই ওঁকার। অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫০ পৃষ্ঠা নং. ১৪ তে লেখা আছে - তারপর ঐ ভগবান হরি, রজোগুণ যুক্ত হয়ে চর্তুমুখ ধারী ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে সৃষ্টি রচনা করেন।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ঋষি পারাসর লোকমুখে শোনা জ্ঞান অর্থাৎ লোকবেদের আধারে শ্রী বিষ্ণু পুরাণের রচনা করেছেন। কারণ বাস্তবিক জ্ঞান, পূর্ণ পরমাত্মা প্রথম সত্যযুগে স্বয়ং প্রকট হয়ে ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। শ্রী ব্রহ্মা কিছুটা সত্য জ্ঞান ও কিছু নিজের মত অর্থাৎ স্বনির্মিত কাল্পনিক জ্ঞান নিজের বংশধরদের দেয়। একে অপরের কাছ থেকে শুনে-শুনিয়ে যথাক্রমে পরাসর ঋষি লোকবেদ প্রাপ্ত করে। শ্রী পরাসর ঋষি, শ্রী বিষ্ণুকে কখনো কাল বলেছে ও কখনো পরব্রহ্ম বলেছে। উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, বিষ্ণু অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ কাল, নিজেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে সৃষ্টি করে তারপর সমগ্র সৃষ্টি উৎপন্ন করে। ব্রহ্মই (কাল) ব্রহ্মলোকে তিন রূপে প্রকট হয়ে লীলা করে ছলনা করে। ওখানে স্বয়ংও মারা যায় (বিশেষ তথ্য জানার জন্য কৃপা পড়ুন পুস্তক "প্রলয় কি জানকারী" ও পুস্তক "গহরী নজর গীতা মে" -এর অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ এর ব্যাখ্যাটিতে) ঐ ব্রহ্মলোকে তিনটি স্থান তৈরি করে রেখেছে। এক হল রজোগুণ প্রধান স্থান, কাল রূপী ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মা রূপ ধারণ করে সেখানে থাকে এবং নিজ পত্নী দুর্গাকে সাথে রেখে রজোগুন প্রধান এক পুত্র উৎপন্ন করে। পুত্রের নাম ব্রহ্মা রাখে। এই রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মাকে দিয়েই এক ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকার উৎপত্তি করায়। এই প্রকার ঐ ব্রহ্মলোকে একটি সত্ত্বগুণ প্রধান স্থান তৈরি করে স্বয়ং নিজের বিষ্ণু রূপ ধারন করে এবং পত্নী দূর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রেখে এক সত্ত্বগুণ যুক্ত পুত্র উৎপন্ন করে, তার নাম বিষ্ণু রাখে। এই পুত্রকে দিয়ে এক ব্রহ্মাণ্ডের তিনলোকের (পৃথিবী, পাতাল ও স্বর্গ) স্থিতি বজায় রাখার কাজ করায়। (প্রমাণ, গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শিব পুরাণ, অনুবাদক হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিমন লাল গোস্বামী, রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬,৭ পৃষ্ঠা নং. ১০২-১০৩)

ব্রহ্মলোকে আরও এক স্থান (তৃতীয় স্থান) তমোগুণ প্রধান রচনা করে, সেখানে স্বয়ং শিব রূপ ধারণ করে পূর্বের মতোই পত্নী দুর্গাকে (প্রকৃতি) সাথে রেখে স্বামী - স্ত্রীর সংযোগে এক সন্তানের জন্ম দেয়। তার নাম শঙ্কর (শিব) রাখে। এই পুত্রকে (শিব) দিয়ে তিন লোকের প্রাণীদের সংহারের কার্য করায়।

বিষ্ণু পুরাণের অধ্যায় ৪ পর্যন্ত যে জ্ঞান আছে, তা কালরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের। অধ্যায় ৫-এর পর থেকে যে বিমিশ্রিত (ভেজাল) জ্ঞান রয়েছে তা হল কালের পুত্র সত্ত্বগুন শ্রীবিষ্ণুর লীলার ও তারই অবতার শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদির জ্ঞান আছে।

এখানে বিশেষ বিচার করার বিষয় হল এই যে, শ্রী বিষ্ণু পুরাণের বক্তা হলেন শ্রী পরাসর ঋষি। এই জ্ঞান দক্ষাদি ঋষিদের কাছ থেকে পুরুকুত্স শোনে, পুরুকুতসের কাছ থেকে সারস্বত শোনে এবং সারস্বতের থেকে পরাসর ঋষি শোনে। যে জ্ঞান শ্রী বিষ্ণু পুরাণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা আজ আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। এতে এমনকি এক ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও সম্পূর্ণ নেই। শ্রীদেবী পুরাণ, শ্রী শিব পুরাণ ইত্যাদি পুরাণের জ্ঞান শ্রী ব্রহ্মারই দেওয়া। শ্রী পরাসরের দেওয়া জ্ঞান, শ্রী ব্রহ্মার জ্ঞানের সমান হতে পারে না। তাই শ্রী বিষ্ণু পুরাণকে বোঝার জন্য দেবী পুরাণ ও শ্রী শিব পুরাণের সাহায্য (সহযোগ) নিতে হবে। কারণ এই জ্ঞান দক্ষাদি ঋষিগণের পিতা ব্রহ্মার দেওয়া। শ্রী দেবী পুরাণ ও শ্রী শিব পুরাণ বোঝার জন্য, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও চারবেদের সাহয্যে (সহযোগ) নিতে হবে। কারণ ঐ জ্ঞান স্বয়ং ভগবান কাল রূপী ব্রহ্মের দ্বারা দেওয়া হয়েছে। যিনি হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি কর্তা অর্থাৎ পিতা। পবিত্র বেদ ও শ্রীমদভগবদ্ গীতার জ্ঞান বোঝার জন্য স্বসমবেদ অর্থাৎ সূক্ষ্মবেদের সহযোগ নিতে হবে! যে বেদটি কালরূপী ব্রহ্মের উৎপত্তি কর্তা অর্থাৎ পিতা, পরম অক্ষর ব্রহ্ম (কর্বিদেব) দিয়েছেন। বেদটি তিনি (কবির্গীর্ভিঃ) স্বয়ং সত্পুরুষ রূপে প্রকট হয়ে কবিরবাণীর দ্বারা বলেন (ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত প্রমাণ আছে)।

“শ্রী ব্রহ্মা পুরাণ”

এই পুরাণের বক্তা শ্রী লোমহর্ষণ ঋষি। তিনি ব্যাস ঋষির শিষ্য ছিলন। তিনি “সুত” নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রী লোমহর্ষণ ঋষি (সুত জী) বলেছেন যে, এই জ্ঞান প্রথমে শ্রী ব্রহ্মা, দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ মুনিদের বলেছিলেন এবং সেই জ্ঞানই এখন আমি শোনাচ্ছি। এই পুরাণের সৃষ্টির বর্ণনা নামক অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা নং. ২৭৭ থেকে ২৯৭ পর্যন্ত) বলেছে যে, শ্রী বিষ্ণু সর্ব বিশ্বের আধার। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে জগতের উৎপত্তি তথা পালন ও সংহার করেন। ঐ ভগবান বিষ্ণুকে আমার নমস্কার।

যে নিত্য চির সত্য স্বরূপ ও কার্যকারণ রূপে অব্যক্ত প্রকৃতি আছে, তাকেই প্রধান বলাহয়। তাকে দিয়েই পুরুষ এই বিশ্বের নির্মাণ করায়। অমিত তেজস্বী ব্রহ্মাকে পুরুষ মনে করো। তিনি সর্ব প্রাণীর সৃষ্টি কর্তা এবং ভগবান নারায়ণের আশ্রিত আছেন।

স্বয়ম্ভু ভগবান নারায়ণ জলের সৃষ্টি করেন। নারায়ণের থেকে উৎপন্ন হওয়ার কারণে জলকে নার বলা হয়ে থাকে। ভগবান সর্ব প্রথম জলের ওপরে বিশ্রাম নেয়। এই জন্য ভগবানকে নারায়ণ বলা হয়। ভগবান, জলে নিজের শক্তি ছাড়ে এবং তার থেকে এক সুবর্ণময় ডিম প্রকট হয়। ঐ ডিমের থেকেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, সকলের কাছে এমনটাই শোনা যায়। এক বৎসর পর্যন্ত ডিমের ভিতর বাস করে শ্রী ব্রহ্মা ডিমকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়। একটি ভাগ থেকে ধূলোক ও দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভূলোক তৈরি হয়।

তারপর শ্রী ব্রহ্মা নিজের ক্রোধ থেকে রুদ্রকে প্রকট করে। উপরোক্ত জ্ঞান শ্রী লোমহর্ষন ঋষির (সুত-জীর)বলা জ্ঞান, যা লোকের মুখে শোনা (লোক বেদ) এটি সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়। কারণ এখানে বক্তা বলছেন যে, আমি এই রূপ শুনেছি। তাই সম্পূর্ণ জানার জন্য শ্রীদেবী মহাপুরাণ, শ্রী শিব মহাপুরাণ, শ্রীমদভগবদ গীতা ও চার বেদ আর পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা দেওয়া তত্ত্বজ্ঞান যা স্বসম বেদ অর্থাৎ কবির্বাণী (কবীর বাণী) বলা হয়েছে। তার জন্য পড়ুন ‘গহরী নজর গীতা মে’, ‘পরমেশ্বরের সার সন্দেশ’, ‘পরিভাষা প্রভু কি’ ও ‘যথার্থ জ্ঞান প্রকাশ’ পুস্তকে।

কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) কলিযুগে স্বয়ং প্রকট হয়ে নিজের প্রিয় সেবক শ্রী ধর্মদাস সাহেবকে (বান্ধবগড়ের) বস্তবিক জ্ঞান পুনরায় সঠিক ভাবে বলেন। যা এই

পুস্তকের সৃষ্টি রচনায় বর্ণিত আছে। অনুগ্রহ করে সৃষ্টি রচনা পড়ুন।)

শ্রী পরাসর, কাল ব্রহ্মকে পরব্রহ্মও বলেছেন, ব্রহ্ম এবং বিষ্ণুও বলেছেন, অমর এবং অনাদিও বলেছন। এই ব্রহ্ম অর্থাৎ কালের জন্ম-মৃত্যু হয় না। এতেই ঋষির বাল্যবুদ্ধির আচরণ প্রমাণিত হয়।

বিচার করুন :- বিষ্ণু পুরাণের জ্ঞান এক ঋষির দ্বারা বলা হয়েছে, যা লোক বেদের (লোকের মুখে শোনা কথা অর্থাৎ দন্তকথা) আধারে বলা এবং ব্রহ্মা পুরাণের জ্ঞান শ্রী লোমহর্ষন ঋষি দক্ষাদি ঋষিদের কাছ থেকে শুনেছিলেন, সেটিই লিখেছিলেন। এইজন্য উপরোক্ত দুই (বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মা পুরাণ) গ্রন্থকে বোঝার জন্য শ্রী দেবী পুরাণ ও শিব পুরাণের সাহায্য নিতে হবে। এই দুই পুরাণ, শ্রী ব্রহ্মা স্বয়ং নিজের পুত্র নারদকে শুনিয়েছিলেন এবং ব্যাস ঋষির দ্বারা তা গৃহীত হয় অর্থাৎ লেখা হয়। অন্যান্য পুরাণের জ্ঞান শ্রী ব্রহ্মার জ্ঞানের সমান হতে পারে না। তাই অন্যান্য পুরাণ গুলিকে বোঝার জন্য দেবী পুরাণ ও শ্রী শিবপুরাণের সহযোগিতা নিতে হবে। কারণ এই জ্ঞান দক্ষাদি ঋষিদের পিতা শ্রী ব্রহ্মার দেওয়া জ্ঞান। আবার শ্রী দেবীপুরাণ ও শিব পুরাণকে বোঝার জন্য শ্রীমদ্ভগবত গীতা ও চার বেদের সাহায্য নিতে হবে। কারণ এই জ্ঞান স্বয়ং ভগবান কাল রূপী ব্রহ্মর দ্বারা দেওয়া হয়েছে, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের সৃষ্টি কর্তা অর্থাৎ পিতা। পবিত্র বেদ ও পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান বোঝার জন্য স্বসম বেদ অর্থাৎ সুক্ষ্ম বেদের সহযোগিতা নিতে হবে, যা কাল রূপী ব্রহ্মের উৎপত্তি কর্তা অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের (কবির্দেব) দেওয়া জ্ঞান। যেই জ্ঞান সতপুরুষ স্বয়ং প্রকট হয়ে কবির্বাণীর (কবির্গীভিঃ) দ্বারা বলেছিলেন। (ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র নং. ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত প্রমাণ আছে।) শ্রীমদ্ভগবত গীতায় ভগবান কাল অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং নিজের স্থিতির বিষয়ে বলছেন যা সম্পূর্ণ সত্য।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং. ১৮ তে বলেছেন আমি, (কাল রূপী ব্রহ্ম) আমার একুশ ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাণী রয়েছে তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তারা স্থূল শরীরে নাশবান হোক বা আত্মা রূপে অবিনাশী হোক না কেন, তাই লোকবেদের (লোকের মুখে শোনা জ্ঞান) ভিত্তিতে আমাকেই পুরুষোত্তম মানে। কিন্তু বাস্তবে পুরুষোত্তম তো আমার থেকে (ক্ষরপুরুষ কাল) ও অক্ষর পুরুষ (পর ব্রহ্ম) থেকেও অন্য কেউ আছেন। তিনি আসলে পরমাত্মা অর্থাৎ তাকেই ভগবান বলা হয়। তিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ পোষণ করেন, বাস্তবে তিনিই অবিনাশী পরমেশ্বর (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭)। গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম স্বয়ং বলছেন হে অর্জুন! তোর ও আমার বহুবার জন্ম হয়েছে। তুই জানিস না, তা আমি জানি। শ্রীমদভগবত্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ তে প্রমাণ আছে এবং অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে নিজের সাধনাকেও কেউ (অনুত্তমাম্) অতি অশ্রেষ্ঠ বলেছেন। এইজন্য অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছেন হে অর্জুন! সর্ব ভাব দ্বারা ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা। যার কৃপায় তুই পরম শান্তি প্রাপ্তি করবি এবং কখনো নষ্ট না হওয়া লোক অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্তি করবি। অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছেন, যখন তোর তত্ত্বদর্শী সন্তের প্রাপ্তি হয়ে যাবে (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ ও অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ এ যার বর্ণনা আছে) তারপরে ঐ পরম পদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিত, যেখানে গেলে সাধক পুনরায় আর সংসারে ফিরে আসে না, অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি করে। যে পরমেশ্বরের থেকে এই সর্ব সংসারের উৎপত্তি হয়েছে, তিনিই সকলকে ধারন পোষণ করেন। আমিও (গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম রূপী কাল) ঐ আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি। পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাঁর ভক্তি সাধনা অর্থাৎ পুজা করার উচিত।

"শ্রী দেবী মহাপুরাণ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করি"

"শ্রী দেবী মহাপুরাণ থেকে অংশিক (কিছু অংশ) বিষয়বস্তু ও সারসংক্ষেপ বিচার"

(সংক্ষিপ্ত শ্রীমদদেবী ভাগবত, সচিত্র, মোটা টাইপ, শুধুমাত্র হিন্দী, সম্পাদক- হনুমান প্রসাদ পোদ্দার; চিম্মন লাল গোস্বামী, প্রকাশক - গোবিন্দভবন-কার্যালয়, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর)

॥ শ্রী জগদম্বিকায়ে নমঃ ॥ শ্রী দেবী মদ্‌ভাগবত (তৃতীয় স্কন্দ)

রাজা পরীক্ষিত শ্রী ব্যাস ঋষিকে ব্রহ্মাণ্ডের রচনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, শ্রী ব্যাস ঋষি বলেন, হে রাজন! আমি এই প্রশ্ন ঋষিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সেই বর্ণনাই এখন আপনাকে বলছি। আমি (শ্রী ব্যাস ঋষি) শ্রী নারদকে জিজ্ঞাসা করলাম এক ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা (সৃষ্টিকর্তা) কে? কেউ কেউ শ্রী শঙ্কর ভগবানকে এর রচয়িতা বলে মনে করে। কেউ শ্রী বিষ্ণুকে আবার কেউ শ্রী ব্রহ্মাকে এবং বহু সংখ্যক আচার্য, ভবাণীকে সর্ব মনস্কামনা পূর্ণকারী দেবী বলে। ভবাণী হলেন আদি মায়া মহাশক্তি এবং তিনি পরম পুরুষের সাথে থেকে সর্ব কার্য সম্পাদনকারী প্রকৃতি। ব্রহ্মের সাথে তার অভেদ সম্পর্ক আছে। (পৃষ্ঠা-১১৪)

শ্রী নারদ বললেন :- ব্যাস দেব! এ এক প্রাচীন সময়ের কথা - যখন একই সন্দেহ আমারও হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েছিল। তখন আমি আমার পিতা অমিত তেজস্বী ব্রহ্মা, যে স্থানে থাকেন, সেখানে গেলাম এবং তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যেই বিষয়ে তুমি এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করছো। আমি বললাম - পিতা! এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? এর রচনা কি আপনি করেছেন, নাকি শ্রী বিষ্ণু, না শ্রী শঙ্কর করেছেন? দয়া করে সব সত্য বলবেন।

শ্রী ব্রহ্মা বললেন :- (পৃষ্ঠা নং. ১১৫ থেকে ১২০ এবং ১২৩, ১২৫, ১২৮, ১২৯) পুত্র! আমি এই প্রশ্নের কি উত্তর দেব? এই প্রশ্ন বড়ই জটিল। পূর্বকালে সর্বত্র জল আর জল ছিল। তখন কমলের (পদ্মফুল) থেকে আমার উৎপত্তি হয়। আমি কমলের পাপড়ির উপর বসে চিন্তা করতে (বিচার) লাগলাম - 'এই অতল (অগাধ) জলে আমি কিভাবে উৎপন্ন হলাম? কে আমার রক্ষক? তখন আমি কমলের বৃন্ত ধরে জলে নামি। সেখানে শীষনাগের শয্যায় বিষ্ণুর দর্শন হয়। তিনি যোগনিদ্রার বশীভূত হয়ে শীষনাগের বিছনায় গভীর নিদ্রায় ছিলেন। এরই মধ্যে ভগবতীর যোগনিদ্রার কথা মনে পড়ে গেল। আমি তার স্তুতি করলাম। তখন সেই কল্যাণময়ী ভগবতী শ্রী বিষ্ণুর মূর্তি থেকে বের হয়ে অচিন্ত্য রূপ ধারণ করে আকাশে বিরাজমান হয়ে যান। দিব্য আভূষণ তাঁর রূপের শোভা বাড়াচ্ছিল। যখন যোগনিদ্রা ভগবান বিষ্ণুর শরীর থেকে পৃথক হয়ে আকাশে বিরাজমান হতে লাগলেন তখনই শ্রী হরি উঠে বসে পড়লেন। তখন ওখানে আমি আর বিষ্ণু দুইজন রইলাম। ওখানে রুদ্রও প্রকট হয়ে গেলেন। দেবী আমাদের তিন জনকে বললেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর! তোমরা ভালো করে সাবধান হয়ে নিজের নিজের কর্মে লিপ্ত হয়ে যাও। সৃষ্টি, স্থিতি আর সংহার করা তোমাদের কাজ। এতক্ষণে এক সুন্দর বিমান আকাশ থেকে নেমে এলো। তখন দেবী আমাদের আদেশ দেন 'দেবতাগণ! নির্ভিক হয়ে ইচ্ছাপূর্বক এই বিমানে প্রবেশ করো। ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর রুদ্র! আজ আমি তোমাদের এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাব।'

আমাদের তিনজন দেবতাকে ঐ বিমানে বসা দেখে দেবী নিজের শক্তিতে বিমানকে আকাশে উড়িয়।

এতক্ষণে আমাদের বিমান দ্রুত গতিতে চলতে লাগে। বিমানটি এক দিব্যধাম- ব্রহ্মলোকে পৌঁছায়। ওখানে এক দ্বিতীয় ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। তাকে দেখে ভগবান

শঙ্কর আর বিষ্ণু খুব আশ্চর্য হয়ে যায়। ভগবান শঙ্কর আর বিষ্ণু আমাকে জিজ্ঞাসা করে হে 'চতুরানন্! এই অবিনাশী ব্রহ্মা কে?' আমি উত্তর দিই 'আমি কিছু জানি না, সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা ইনি কে? হে ভগবান! আমি কে আর আমাদের উদ্দেশ্য কি? এই সকল প্রশ্ন আমার মনে ঘুরতে লাগে।'

ইতিমধ্যে মনের সমান তীব্র গতিতে বিমানটি সেখান থেকে উড়ে কৈলাস পর্বতের মনোরম শিখরে গিয়ে পৌঁছায়। ওখানে বিমান পৌঁছাতেই এক মনোরম ভবন থেকে ত্রিনেত্রধারী ভগবান শঙ্কর বের হয়। তিনি নন্দী-বৃষভের উপর বসে ছিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে ঐ বিমান কৈলাস শিখর থেকে পবনের সমান তীব্র গতিতে উড়ে বৈকুণ্ঠ লোকে পৌঁছায় যেখানে ভগবতী লক্ষ্মীর বিলাস ভবন ছিল। পুত্র নারদ! ওখানে আমি যে সম্পত্তি দেখেছি তার বর্ণনা করা আমার দ্বারা অসম্ভব। ঐ উত্তম পুরীকে দেখে বিষ্ণুর মন আশ্চর্য্যের সমুদ্রে ডুবে দিতে লাগলো। ওখানেও কমললোচন শ্রী হরি বিরাজমান ছিলেন। তাঁর চার হাত (ভুজা) ছিল।

ইতিমধ্যেই বাতাসের সাথে কথা বলতে বলতে ঐ বিমান শীঘ্র উড়ে গেলো। সামনেই অমৃতের সমান মিষ্টি জলের সমুদ্র পেলাম। সেখানে একটি মনোরম দ্বীপ ছিল। ঐ দ্বীপে এক মঙ্গলময়ী মনোহর পালঙ্ক বিছানো ছিলো। ঐ উত্তম পালঙ্কের উপর এক দিব্য রমণী বসেছিলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগি - কে এই সুন্দরী এবং এর নাম কি। আমরা এনার বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

নারদ! এই সন্দেহে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে আমরা ওখানে অনেকক্ষণ থাকি। তখন ভগবান বিষ্ণু ঐ চারু সাহিনী ভগবতীকে দেখে বিবেক পূর্বক নিশ্চয় করে নেয় যে, ইনি ভগবতী জগদাম্বিকা। তিনি বলেন ভগবতী হলেন আমাদের সকলের আদি কারণ। এই দেবীর নাম মহাবিদ্যা ও মহামায়া।

ইনি হলেন পূর্ণ প্রকৃতি। 'বিশ্বেশ্বরী', 'দেবগর্ভা' এবং এই দেবীকে 'শিবা' বলা হয়ে থাকে। ইনি সেই দিব্যঙ্গনা দেবী, প্রলয় কালের পর যার দর্শন হয়েছিল। ঐ সময় আমি বালক রূপে ছিলাম। তিনি আমাকে দোলনায় দোল দিচ্ছিলেন। বটবৃক্ষের পত্রের উপর এক সুদৃঢ় বিছানা ছিল। সেখানে শুয়ে আমি আমার পায়ের আঙুল আমার কমলের মত মুখের মধ্যে দিয়ে চুষছিলাম এবং খেলা করছিলাম। এই দেবী গান গাইতে গাইতে আমাকে দোল দিচ্ছিলেন। ইনি সেই দেবী, এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই দেবীকে দেখে আমার পূর্বের কথা মনে পড়ে গেছে। এই দেবী আমাদের সকলের জননী।

শ্রী বিষ্ণু সময় অনুসার ঐ ভগবতী ভুবনেশ্বরী দেবীর স্তুতি আরম্ভ করে দেয়। **ভগবান বিষ্ণু বললেন** :- প্রকৃতি দেবীকে নমস্কার। ভগবতী বিধাত্রীকে নিরন্তর নমস্কার। তুমি শুদ্ধ স্বরূপা, এই সমগ্র সংসার তোমার থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শঙ্কর আমরা সকলে তোমার কৃপায় বিদ্যমান। আমাদের আর্বিভাব ও তিরোভাব হয়ে থাকে। কেবল তুমিই নিত্য, জগত জননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।

ভগবান শঙ্কর বললেন :- হে দেবী! যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমার থেকে প্রকট হয়ে থাকে, তবে তার পরে উৎপন্ন হওয়া ব্রহ্মাও তোমারই পুত্র। তাহলে আমি তমোগুণী লীলাকারী শঙ্কর কি তোমার পুত্র নই। অর্থাৎ আমাকেও তুমিই উৎপন্ন করেছো। এই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি আর সংহার তোমার গুণে চিরকাল হতে থাকে। ঐ তিন গুণ থেকে উৎপন্ন আমরা ব্রহ্মা- বিষ্ণু এবং শঙ্কর নিয়মানুসার কার্যে তৎপর থাকি। আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা, আর শিব বিমানে চড়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় আমরা নতুন নতুন জগত দেখতে পাই। ভবাণী! সত্যি সত্যি বলুন তো এসব কে তৈরী করেছে?

এইজন্য এই প্রমাণ দেখুন, শ্রীমদদেবী ভাগবত মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণ দাস প্রকাশক মুম্বাই, ইহাতে সংস্কৃত সহিত হিন্দি অনুবাদ করা আছে। তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক নং. ৪২:-

ব্রহ্মা:- অহম্ ইশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাত্সর্বে বয়ং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ, কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা । (৪২)

বাংলা অনুবাদ :- হে মাতা! ব্রহ্মা, আমি ও শিব তোমার প্রভাবেই জন্মবান, নিত্য নই অর্থাৎ আমরা অবিনাশী নই। তাহলে ইন্দ্র প্রমুখ অন্যান্য দেবতারা কিভাবে নিত্য হতে পারে? তুমিই অবিনাশী প্রকৃতি তথা সনাতনী দেবী। (৪২)

পৃষ্ঠা ১১-১২, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৮ :- যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাঁংবিকে কথমহম্ বিহিতঃ চ তমোগুণঃ কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণোঁ হরিঃ। (৮)

অনুবাদ :- ভগবান শঙ্কর বললেন :- হে মাতা! যদি আপনি আমার উপর দয়াযুক্ত হন তবে আমাকে তমোগুণ কেন বানালেন, কমল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ কিসের জন্য বানিয়েছেন এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ যুক্ত কেন বানালেন? অর্থাৎ জীবেদের, জন্ম- মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মে কেন লাগিয়ে দিলেন?

শ্লোক ১২:- রময়সে স্বপতিম্ পুরুষং সদা তব গতিম্ ন হি বিহ বিদম শিবে (১২)

বাংলা :- নিজের পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা ভোগ বিলাস করতে থাকেন। আপনার গতি কেউ জানে না।

ব্রহ্মা বললেন :- আমিও মহামায়া জগদম্বিকার চরণে পড়ে যাই এবং আমি'ই তাঁকে বলি মাতা! বেদ বলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্ম', তবে সেই আত্মস্বরূপা কি তুমিই নাকি সে অন্য কোন পুরুষ?

দেবী বললেন :- আমি আর ব্রহ্ম দুজনেই এক। আমার আর ব্রহ্মের মধ্যে কিঞ্চিত মাত্র পার্থক্য নেই। গৌরী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, শিবা, বারুণী, কৌবেরী, নারসিংহী আর বাসবী, এই সকল আমারই রূপ। ব্রহ্মা! এই শক্তিকে তুমি তোমার স্ত্রী রূপে গ্রহন কর। 'মহাসরস্বতী' নামে খ্যাত ঐ সুন্দরী চিরকাল তোমার স্ত্রী হয়ে থাকবে। ভগবতী জগদম্বা ভগবান বিষ্ণুকে বললেন - "বিষ্ণু! এই মন মুগ্ধকারী 'মহালক্ষ্মীকে' নিয়ে এখন তুমিও প্রস্থান করো। সে চিরকাল তোমার বক্ষস্থলে বিরাজমান থাকবে।

দেবী বললেন, শঙ্কর! মন মুগ্ধকারী 'মহাকালি' গৌরী নামে খ্যাত। তুমি একে পত্নী রূপে স্বীকার করো।

এবার আমার কার্য সিদ্ধ করার জন্য তোমরা বিমানে বসে শীঘ্র প্রস্থান করো। কোন কঠিন কার্য উপস্থিত হলে, তোমরা যখনই আমাকে স্মরণ করবে, তখনই আমি সামনে চলে আসব। দেবতা গণ! আমার ও সনাতন পরমাত্মার ধ্যান তোমাদের সর্বদা করা উচিত। আমাদের দুই জনকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের কার্য সিদ্ধ হতে কিঞ্চিত মাত্র সন্দেহ থাকবে না।

ব্রহ্মা বলেন :- এই বলে ভগবতী জগদম্বিকা আমাদের বিদায় দিয়ে দেয়। উনি শুদ্ধ আচরণ যুক্ত শক্তিদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর জন্য মহালক্ষ্মীকে, শঙ্করের জন্য মহাকালীকে আর আমার জন্য মহা সরস্বতীকে পত্নী করার আদেশ দেন। তারপর ঐ স্থান থেকে আমরা চলে যাই।

সার বিচার :- এক ব্রহ্মাণ্ডের (বাস্তবিক) আসল স্থিতি সম্পর্কে মহর্ষি ব্যাস, মহর্ষি নারদ এবং শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শঙ্কর এনারাও অনভিজ্ঞ। এটাও স্পষ্ট হলো যে, শ্রী দুর্গাকে প্রকৃতিও বলা হয় এবং দুর্গা ও ব্রহ্মের (জ্যোতিনিরঞ্জন কাল) পতি পত্নীর সম্পর্কও রয়েছে। এইজন্য লিখেছেন যে, ব্রহ্মের সাথে প্রকৃতির অভেদ সম্পর্ক

আছে, যেমন পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। শ্রী ব্রহ্মা স্বয়ং জানতেন না যে, তিনি কিভাবে উৎপন্ন হয়েছেন। এক হাজার বছর ধরে জলের উপর ভূমির খোঁজ করে কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি। তখন আকাশবাণী অনুসারে হাজার বৎসর পর্যন্ত তপ করে। তারপর পদ্মের বৃন্ত ধরে নিচে নামলে সেখানে শীষনাগের উপর ভগবান বিষ্ণু অজ্ঞান হয়ে সেখানেই পড়েছিলেন। শ্রী বিষ্ণুর শরীর থেকে সুন্দর আভূষণ পড়ে এক দেবী প্রকট হয়ে (প্রেতনীর মত) আকাশে বিরাজমান হয়ে যায়। তখন শ্রী বিষ্ণু চেতনা ফিরে পান এবং এরই মধ্যে শঙ্করও সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিন ভগবানকে অচৈতন্য করে রাখা হয়েছিল। পরে তাদের চেতনা ফিরিয়ে দেয়। তারপর আকাশ থেকে বিমান আসে। দেবী, তিন দেবকে বিমানে বসার জন্য আদেশ দেয়। বিমানকে আকাশে উড়িয়ে দিল। উপরে ব্রহ্মালোকে আরও এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও এক শিবকে দেখতে পেলেন।

বিচার করুন:- ব্রহ্মালোকে অন্য আরও এক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেখা গিয়েছিল। এই সব জ্যোতি নিরাঞ্জনের (ব্রহ্ম) কলা বাজি। ইনি'ই (ব্রহ্ম) তিন রূপ ধারণ করে, ব্রহ্মালোকে তিনটি গুপ্ত স্থান (একটি রজোগুণ প্রধান ক্ষেত্র, একটি সত্ত্বগুণ প্রধান ক্ষেত্র ও একটি তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্র) তৈরি করে সেখানে থাকেন এবং দেবী প্রকৃতিকে (দুর্গা - অস্টাঙ্গী) পত্নী রূপে রাখে। এরা দুই জন যখন রজোগুণ প্রভাবিত ক্ষেত্রে থাকে, তখন এনারা মহাব্রহ্মা ও মহাসাবিত্রী নামে পরিচিত হয়। এদের দুজনের সংযোগে এই রজোগুণ প্রধান স্থানে যে পুত্রের উৎপত্তি হয়, সে রজোগুণ প্রধান হয়। তার নাম ব্রহ্মা রাখে। যুবক হওয়া পর্যন্ত তাকে অচেতন করে লালন পালন করতে থাকেন। তারপরে কমলের (পদ্মফুলের) উপর রেখে দেয় এবং চেতনা ফিরিয়ে দেয়। আবার এই দুইজন মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী (কাল-ব্রহ্ম এবং দুর্গা) রূপ ধরে সত্ত্বগুণ প্রধান ক্ষেত্রে থেকে পতি-পত্নীর ব্যবহারে যে পুত্রের উৎপন্ন করে, সে সত্ত্বগুণ প্রধান হয়। তার নাম বিষ্ণু রাখে। কিছুদিন ধরে ঐ পুত্রকেও অচেতন করে যুবক হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করেন। তারপর শীষনাগের শয্যায় শুইয়ে রেখে দেয়। পরে চেতনা ফিরিয়ে দেয়। এই প্রকার দুজন যখন তমোগুণ প্রধান স্থানে থাকে তখন দুর্গা ও মহাশিব অর্থাৎ সদাশিব, পতি-পত্নী ব্যবহার করে তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্রে যে পুত্র উৎপন্ন করে, সে তমোগুণ প্রধান হয়। তার নাম শিব রাখে। শিবকেও যুবক হওয়া পর্যন্ত তাকে অচেতন করে রাখে। পরে যুবক হওয়ার পর চেতনা ফিরিয়ে দেয়। তারপর তিন জনকে একত্রিত করে, বিমানে বসিয়ে উপরের লোক গুলির দৃশ্য দেখায়। এই দেবতারা যাতে পরে নিজেকে সর্বেসর্বা মনে না করে বসে! তিন গুণ প্রধান ক্ষেত্রকে বোঝার জন্য এক উদাহরণ :- মনে করুন কোন বাড়িতে তিনটি কামরা (Room) আছে। তার মধ্যে একটি রুমে দেশভক্ত শহীদদের চিত্র লাগানো আছে। যদি কোন ব্যক্তি ঐ রুমে যায় তাহলে ঐ ব্যক্তির বিচার দেশ ভক্তদের মত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কামরায় সাধু, সন্ত, ঋষি প্রমুখদের চিত্র লাগানো আছে। ঐ রুমে প্রবেশ করতেই মন শান্ত ও বিকার রহিত হয়ে প্রভু ভক্তির দিকে চলে যায়। তৃতীয় কামরায় অশ্লীল, অর্ধনগ্ন স্ত্রী- পুরুষের চিত্র লাগানো আছে। ওখানে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে তার মনে বিকার ও খারাপ মনোভাব চলে আসে। ঠিক এই রূপ কালব্রহ্ম, উপরের ব্রহ্মালোকে এক এক গুণের প্রধান তিনটি ভিন্ন স্থান তৈরি করে রেখেছে। তিন প্রভু (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুন শিব) নিজেদের গুণের প্রভাব অন্যের উপর কিভাবে বিস্তার করে? উদাহরণ :- যেমন রান্না ঘরে তরকারিতে লঙ্কা ফোড়ন দিলে লঙ্কার গুণের প্রভাবে আশেপাশের সবাই কাশী হাঁচি দিতে শুরু করে। যেমন সাকার বস্তু অর্থাৎ লঙ্কা রান্না ঘরে অছে কিন্তু তার নিরাকার গুন অর্থাৎ শক্তি, দূরে বসা ব্যক্তিকে ও প্রভাবিত

করছে। এইরূপ তিন প্রভু (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণুও তমোগুণ শিব) নিজ - নিজ লোকে থাকলেও তাদের নিরাকার গুনের প্রভাব, তিন লোকের (স্বর্গ লোক, মর্ত্য লোক ও পাতাল লোক) প্রাণীদের প্রভাবিত করে রাখে। যেমন মোবাইল ফোনের রেঞ্জ দ্বারা ফোন কাজ করে। এই প্রকার, অদৃশ্য শক্তি রূপী গুন দ্বারা তিন দেবতা নিজের পিতা কালের আহারের জন্য এই সৃষ্টিকে চালনা করছে। দুর্গার নিজেস্ব পৃথক লোকও আছে। সেখানে সে নিজের বাস্তবিক রূপে দর্শন দেয়। যখন এদের বিমান দূর্গার দ্বীপে পৌঁছায় তখন জ্যোতি নিরাঞ্জন অর্থাৎ কালরূপী ব্রহ্ম বিষ্ণুর ছোটবেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। তখন শ্রী বিষ্ণু বলে, এই দুর্গা আমাদের তিন জনের মাতা। আমি বালক রূপে দোলনায় শুয়ে ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে দোলনায় দোল দিচ্ছিলেন। তখন শ্রী বিষ্ণু বলেন, হে দুর্গা! আপনি আমাদের মাতা। আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শঙ্কর তো জন্মবান। আমাদের অবির্ভাব অর্থাৎ জন্ম ও তিরোভাব অর্থাৎ মৃত্যু হয়, আমরা অবিনাশী নই। আপনিই প্রকৃতি দেবী। এই কথা শ্রী শঙ্করও স্বীকার করেছে যে, আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর আপনারই পুত্র। শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী ব্রহ্মা আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

তারপর দুর্গা এই তিন দেবতাদের বিবাহ করায়। প্রকৃতি দেবী (দূর্গা) নিজ শব্দ শক্তি দ্বারা নিজেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। শ্রী ব্রহ্মার বিবাহ সাবিত্রীর সাথে, শ্রী বিষ্ণুর বিবাহ লক্ষীর সাথে এবং শ্রী শিবের বিবাহ উমা অর্থাৎ কালীর সাথে করিয়ে বিমানে বসিয়ে তাদেরকে নিজ নিজ দ্বীপে (লোকে) পাঠিয়ে দেয়।

জ্যোতিনিরঞ্জন (কাল-ব্রহ্ম) নিজের শ্বাস দ্বারা সমুদ্রের ভেতরে চার বেদকে লুকিয়ে রেখেছিল। পরে প্রথম সাগর মন্থনের সময় তা উপরে প্রকট করে। জ্যোতি নিরঞ্জন কালের আদেশে দূর্গা চারবেদ শ্রীব্রহ্মাকে দেয়। ব্রহ্মা দূর্গাকে (নিজের মাতা) জিজ্ঞাসা করে বেদে যে ব্রহ্মের (প্রভু) কথা বলা হয়েছে তিনি কি আপনি না অন্য কোন পুরুষ?

কালের ভয়ে দুর্গা আসল তথ্য লুকানোর জন্য বলেন যে, আমি ও ব্রহ্ম একই। আমাদের মধ্যে কোন ভেদ (পার্থক্য) নেই। কিন্তু আসল সত্য লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। দুর্গা পুনরায় বললেন, তোমরা তিন জন আমার ও ব্রহ্মের দুজনের স্মরণ সর্বদা করতে থাকবে। কোন কঠিন কাজের সময় আমাদের স্মরণ করলে আমি তোমাদের কাছে চলে আসব।

বিশেষ:- কারণ কাল দূর্গাকে বলে রেখেছিল যে, আমার ভেদ (পরিচয়) কাউকে কখনও দেবে না! এই ভয়ে দুর্গা সর্ব জগত্কে বাস্তবিকতা থেকে দূরে রাখে। এমনকি এনারা নিজেদের পুত্রদেরকেও ভ্রমিত করে রাখে। এর কারণ হল কালের অভিশাপ লেগে আছে, প্রতি দিন এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে নিত্য আহার করার। তাই নিজের তিন পুত্রকে দিয়ে নিজের খাবার তৈরি করায়। শ্রী ব্রহ্মার রজোগুণের প্রভাবে প্রভাবিত করে সর্ব প্রাণী দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করায়। শ্রী বিষ্ণুর সত্ত্বগুণকে দিয়ে একে অন্যের প্রতি মোহ উৎপন্ন করে কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। শ্রী শঙ্করের তমোগুণ দ্বারা সংহার করিয়ে নিজের আহার তৈরি করায়।

তারপর এই তিন প্রভুকেও মেরে খায় এবং আবার নতুন পূণ্য কর্মী প্রাণীদের মধ্যে থেকে তিন পুত্রের উৎপন্ন করে নিজের কার্য চালাতে থাকে। পূর্বের তিন পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব চুরাশি লাখ যোনী এবং স্বর্গ-নরকে কর্মের আধারে চক্র কাটতে থাকে। এই প্রমাণ শিব মহাপুরাণ, রুদ্র সংহিতার প্রথম (সৃষ্টি) খণ্ড, অধ্যায় ৬, ৭, ও ৮, ৯-এর মধ্যেও আছে।

"শ্রী শিব পুরাণের সার বিচার"

"শিব মহাপুরাণ"

"শ্রী শিব মহাপুরাণ (অনুবাদক : শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার। প্রকাশক : গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর।) মোটা টাইপ, অধ্যায় ৬ রুদ্রসংহিতা প্রথম খণ্ড (সৃষ্টি) থেকে নিষ্কর্ষ।"

শ্রী ব্রহ্মার পুত্র নারদ যখন তাকে শিব এবং শিবার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তখন শ্রী ব্রহ্মা বলেন, (পৃষ্ঠা নং. ১০০ থেকে ১০২) যে পরব্রহ্মের বিষয়ে জ্ঞান আর অজ্ঞানতায় পূর্ণ যুক্তির সাথে এইরূপ নির্বাচন করা হয়, যে নিরাকার পরব্রহ্ম রয়েছেন তিনিই সাকার রূপে সদাশিব রূপ ধারণ করে মনুষ্য রূপে প্রকট হলেন। সদা শিব নিজের শরীর থেকে এক স্ত্রীকে উৎপন্ন করে। যাকে প্রধান, প্রকৃতি, অম্বিকা, ত্রিদেব জননী (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মাতা) বলা হয়। তিনি আট ভূজা যুক্ত।

"শ্রী বিষ্ণুর উৎপত্তি"

যিনি সেই সদাশিব, তাঁকেই পরম পুরুষ, ঈশ্বর, শিব, শম্ভু, মহেশ্বর বলা হয়। তিনি নিজের সর্ব অঙ্গে ভস্ম মাখিয়ে রাখেন। এই কাল রূপী ব্রহ্ম এক শিবলোক নামক (ব্রহ্মলোকের তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্র) ধাম তৈরী করে রাখে, তাকে কাশী বলা হয়। শিব এবং শিবা সেখানে পতি-পত্নী রূপে থেকে এক পুত্রের উৎপত্তি করেন, তার নাম বিষ্ণু রাখেন। অধ্যায় ৭, রুদ্র সংহিতা, শিব মহাপুরাণ (পৃষ্ঠা নং. ১০৩, ১০৪)।

"শ্রী ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি"

অধ্যায় ৭, ৮, ৯ (পৃষ্ঠা নং. ১০৫-১১০) শ্রী ব্রহ্মা বলেন, শ্রী শিব ও শিবা (কাল রূপী ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি-দুর্গা-অষ্টাঙ্গী) পতি-পত্নী ব্যবহার করে আমাকেও সৃষ্টি করে এবং পরে আমাকে অজ্ঞান করে এক কমল ফুলের উপর রেখে দেয়। ঐ কাল মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করে নিজের নাভী থেকে একটি কমল উৎপন্ন করে নেয়। ব্রহ্মা আরো বলেন, পরে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আমি ঐ কমলের মূল খোঁজার চেষ্টা করি কিন্তু অসফল থাকি। তারপর তপ করার জন্য আকাশবাণী হয়, তখন আমি তপ করি। পরে আমার ও বিষ্ণুর তর্ক-বিতর্কে যুদ্ধ লেগে গেলো। (বিবরণ এই পুস্তকেরই পৃষ্ঠা নং. ২৫০ তে) তখন আমাদের মাঝখানে এক তেজোময় লিঙ্গ প্রকট হয় এবং ওম্-ওম্ নাদ প্রকট হয়। ঐ লিঙ্গের গায়ে অ-ও-ম তিন অক্ষর লেখা ছিল। তারপর পঞ্চমুখের রুদ্র রূপ ধারণ করে সদাশিব মানব শরীর রূপে প্রকট হয়। তাঁর সঙ্গে শিবাও (দুর্গা) ছিল।

তারপর শঙ্করকে হঠাৎ প্রকট করে (কারণ শঙ্কর আগে থেকে অচেতন ছিল, পরে চেতনা ফিরে দিয়ে তিন জনকে একত্রিত করে) এবং সবাইকে বলেন, তোমরা তিন জন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কার্য সামলাও।

রজোগুণ প্রধান ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ প্রধান বিষ্ণু ও তমোগুণ প্রধান হলেন শিব, এই প্রকার তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ আছে। কিন্তু শিবকে (কাল রূপী ব্রহ্ম) গুণাতীত বলা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ১১০-এ)

সার বিচার:- উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, কাল রূপী ব্রহ্ম অর্থাৎ সদাশিব ও দূর্গা (প্রকৃতি) হলেন শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রী শিবের মাতা-পিতা। দুর্গাকে প্রকৃতি বা প্রধান বলা হয়ে থাকে। তিনি আট ভুজা যুক্ত। দূর্গা, সদাশিব অর্থাৎ কালের শরীর অর্থাৎ পেট থেকে বের হয়েছে। ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল ও প্রকৃতি (দুর্গা) সর্ব প্রাণীদের ভ্রমিত করে রাখে। নিজের পুত্রদেরকেও আসল সত্য বলে না, কারণ একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীরা যাতে না জেনে যায় যে, কাল (ব্রহ্ম - জ্যোতি নিরঞ্জন) সবাইকে তপ্তশিলায়

ভেজে খায়। তাই জন্ম-মৃত্যু ও অনান্য দুঃখদায়ী জনিতে কষ্ট দেয় এবং রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব তিন পুত্রদের দিয়ে উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করিয়ে নিজের খাদ্য তৈরি করায়। কারণ কাল, এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে নিত্য আহার করার অভিশাপে অভিশপ্ত। কৃপা করে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে দেখুন, ‘কাল (ব্রহ্ম) ও প্রকৃতি (দূর্গা) পতি-পত্নী রূপ কর্ম করে রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের উৎপত্তি’ বিষয়টি।

“তিন গুণ কি? প্রমাণ সহিত”

“তিন গুণ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব। এই তিন গুণ ব্রহ্ম (কাল) এবং প্রকৃতি (দূর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তিন জনই নশ্বর”

প্রমাণ:- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪ থেকে ২৬ বিদ্ধেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা” এইভাবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ আছে। কিন্তু সদা শিব (ব্রহ্ম-কাল) কে গুণাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ :- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ দেবী ভাগবত্ পুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩:- ভগবান বিষ্ণু দূর্গার স্তুতি করে বলেছেন - আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা এবং শঙ্কর তোমার কৃপায় বিদ্যমান আমাদের তো আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য (অবিনাশী) জগৎ জননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।

ভগবান শঙ্কর বললেন, যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার পরে উৎপন্ন হওয়া আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান নই? অর্থাৎ তুমিই আমাকে উৎপন্ন করেছো। এই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি-সংহারে তোমার গুণ সর্বত্র বিদ্যমান। এই তিন গুণে উৎপন্ন আমরা, ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শংকর সর্বদা নিয়মানুসার কর্মে তৎপর থাকি।

উপরোক্ত এই বিবরণ একমাত্র হিন্দীতে অনুবাদিত শ্রীদেবী মহাপুরাণে বিদ্যমান আছে। এখানে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। সেই জন্য আপনারা প্রমাণ দেখুন শ্রীমদদেবী ভাগবত মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণদাস প্রকাশন মুম্বাই, এতে সংস্কৃত সহ হিন্দী অনুবাদ করা আছে। তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক ৪২:-

ব্রহ্মা - অহম্ ঈশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাস্তবে বয়ম্ জনি যুতা ন যদা তূ নিত্যাঃ কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা॥ (৪২)॥

হিন্দী থেকে বাংলা অনুবাদ :- হে মাতা! ব্রহ্মা, আমি এবং শিব তোমার প্রভাবে (শক্তিতে বা দয়ায়) জন্ম নিয়েছি। আমরা নিত্য নই। অর্থাৎ আমরা অবিনাশী নই। তাহলে অন্য দেবী দেবতা ইন্দ্রাদি কিভাবে নিত্য (অবিনাশী) হতে পারে? তুমিই অবিনাশী প্রকৃতি তথা সনাতনী দেবী।

পৃষ্ঠা ১১ - ১২, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৮ :- যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাঁৎবিকে কথমহং বিহিতঃ চ তমোগুণঃ কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্বগুণোঁ হরিঃ। (৮)

অনুবাদ:- ভগবান শঙ্কর বললেন, হে মাতা! যদি আমার উপর দয়া যুক্ত হও তা হলে আমাকে তমোগুণে কেন বানিয়েছেন? কমল থেকে (পদ্ম) উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণে কি জন্য বানিয়েছেন? এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণে কেন বানিয়েছেন? অর্থাৎ জীবের জন্ম-মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মে আমাদের কেন লাগিয়েছেন ?

শ্লোক-১২ :- রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদম্ শিবে (১২)

বাংলায় :- নিজের পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা (সর্বদা) ভোগ বিলাস করতে থাকো। তোমার গতি (ভেদ) কেউ জানে না।

"নিষ্কর্ষ"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞানও এই কাল রূপী ব্রহ্মাই শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মত প্রবেশ করে বলেছিল। উপরোক্ত পবিত্র পুরাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুর্গাকেই প্রকৃতি বলা হয় এবং সদাশিব অর্থাৎ কালরূপী ব্রহ্ম প্রকৃতির সাথে পতি-পত্নী ব্যবহার করে রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের উৎপত্তি করে। এরই সাক্ষী শ্রীমদ্ভগবদ গীতা। শ্রী গীতা হল সমস্ত শাস্ত্রের সারাংশ, তাই এখানে সমস্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকেতিক শব্দে (কোড ওয়ার্ড) দেওয়া আছে। ইহা একমাত্র তত্ত্বদর্শী সন্ত-ই বোঝাতে পারেন। এবার কৃপা করে 'পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা' তে প্রবেশ করা যাক।

অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫ -এ পবিত্র শ্রীমদভগবদ্ গীতা বলা কাল ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত প্রবেশ করে বলে, প্রকৃতি (দূর্গা) তো আমার পত্নী। আমি ব্রহ্ম, প্রকৃতির যোনীতে বীজ স্থাপন করি তাতে সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়। আমি সমস্ত প্রাণীর পিতা ও প্রকৃতি (দুর্গা) সমস্ত প্রাণীর মাতা। প্রকৃতি (দুর্গা) থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণই (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) জীব আত্মাকে কর্মের আধারে শরীরে বেঁধে রাখে অর্থাৎ এই তিন জনই সর্ব প্রাণীকে সংস্কারের আধারে উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করে, কাল জালে ফাঁসিয়ে রাখে।

অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২ -এ বলেছে, "আমি কাল, সবাইকে খাওয়ার জন্য প্রকট হয়েছি।" অধ্যায় ১১ শ্লোক ২১-এ অর্জুন বলছে, আপনি তো ঋষিদেরকেও খাচ্ছেন। দেবতা এবং সিদ্ধগণ আপনার কাছে মঙ্গল অর্থাৎ রক্ষার জন্য প্রার্থণা করছে এবং বেদ মন্ত্রের স্রোত দ্বারা আপনার স্তুতি করছে। কিন্তু আপনি তাদের সবাইকে খাচ্ছেন। কিছু সংখ্যক আপনার দাড়িতে ফেঁসে ঝুলছে। আর কিছু আপনার ভিতরে প্রবেশ করে যাচ্ছে।

"রজোগুণ শ্রী ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ শ্রী বিষ্ণু ও তমোগুণ শ্রী শিব, এই তিন দেবের পূজাকে ব্যর্থ বলা হয়েছে"

গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত) বলেছেন যে, তিন গুণের (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) পূজা করা ব্যক্তিদের জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছে, এরা এদের উপরে আমাকেও পূজা করেনা। যারা এই তিন প্রভু (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) পর্যন্তই সাধনা করে, তারা রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী, মনুষ্যের মধ্যে নীচ, দুষিত কর্ম করা মূর্খরা এই তিন দেবের উপরে ব্রহ্মের (আমার) পূজাও করে না। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে নিজের ভক্তিকে অনুত্তমম্ (অশ্রেষ্ঠ) বলেছেন।

এই জন্য অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এবং অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ ও ৬৬ তে, অন্য কোন পরমেশ্বরের শরণে যেতে বলেছে। যে সময়ে গীতার জ্ঞান বলা হয়েছিল, তার আগে আঠারো পুরাণ এগারো উপনিষদ ও ছয় শাস্ত্র এইগুলি কিছুই ছিল না। পরে ঋষিরা নিজের-নিজের মত বা অনুভব অনুসারে এই সব পুস্তক রচনা করে। ঐ সময় এক মাত্র চারবেদ প্রমাণিত শাস্ত্র রূপে ছিল। ঐ চার বেদের সারাংশ পবিত্র গীতায় বর্ণিত আছে।

❑❑❑

শাস্ত্রার্থের বিষয়

"শাস্ত্রার্থ পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানকে জটিল করে তোলে"

শাস্ত্রীয় বিতর্ক (শাস্ত্রার্থ) কিভাবে হত?

দুই পন্ডিতের (বিদ্বান) মধ্যে যখন প্রশ্ন-উত্তর হত, তখন বহু সংখ্যায় শ্রোতাগণ শাস্ত্রার্থ (প্রশ্ন উত্তর) শোনার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকতেন। জয় বা পরাজয়ের সিদ্ধান্ত ঐ শ্রোতাদের হাতেই থাকত। যারা নিজেরাই জানত না যে শাস্ত্রার্থে কি বলা হচ্ছে ? যে সবচেয়ে বেশি অনর্গল সংস্কৃত বলে যেত, শ্রোতাগণ হাততালি বাজিয়ে তাকে বিজয়ী ঘোষনা করে দিত। এই ভাবেই বিদ্বানদের জয়- পরাজয়ের সিদ্ধান্ত অবিদ্বানদের হাতেই থাকত।

প্রমাণ:- পুস্তক "শ্রীমদ দয়ানন্দ প্রকাশ" লেখক শ্রী সত্যানন্দজী মহারাজ।

প্রকাশক:- সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা ৩/৫ মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন, রাম লীলা ময়দান নয়া দিল্লী -২ 'গঙ্গা কান্ড' অষ্টম সর্গ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৯ থেকে যথাযথ লেখা:- তিন দিন ধরে প্রতি সন্ধ্যায়, কৃষ্ণনন্দ ও স্বামীজির মধ্যে শাস্ত্রার্থ হতে থাকে। একদিন শাস্ত্রার্থের সময় একজন কৃষ্ণানন্দ জীকে সাকারবাদ অবলম্বনের বিষয়ে শাস্ত্রার্থ করার প্রার্থণা করে। এটি স্বামীজির প্রিয় বিষয় ছিল। তিনি ধারাবাহিক ভাবে সংস্কৃত বলে নিরাকার সিদ্ধান্তের উপর বেদ ও উপনিষদের প্রমাণের ফুলঝুরি লাগিয়ে দিলেন এবং কৃষ্ণানন্দ জীকে সেগুলি অর্থ মানতে বাধ্য করলেন। কৃষ্ণানন্দ জী কোন প্রমাণ দিতে পারলেন না। পরিবর্তে গীতার একটি শ্লোক "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতী ভারত" লোকজনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পড়তে লাগলেন। স্বামীজি গর্জন করে বললেন, আপনি তর্ক আমার সাথে করছেন, তাই আমার দিকে তাকিয়ে বলুন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ জীর বিচার ধারণাই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, তিনি চৌপাইও ভুলে গিয়েছিলেন। থুতু গিলতে লাগলেন, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কোন প্রকারে যাতে সম্মান রক্ষা হয়, তার জন্য তিনি "তর্ক-শাস্ত্রের" শরণ নিয়েছিলেন এবং স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, লক্ষণের লক্ষণ গুলি বলুন? স্বামীজি উত্তর দিলেন, "যেমন কারণের কোনো কারণ নেই, তেমনি লক্ষণের কোনো লক্ষণ নেই।" শ্রোতারা হেঁসে কৃষ্ণানন্দের পরাজয় ঘোষনা করে দিল এবং তিনি ভয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

উপরোক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, পণ্ডিতদের (বিদ্বানদের) জয় বা পরাজয়ের নির্ণয় অশিক্ষিতরা করতো। স্বামী দয়ানন্দ অনর্গল সংস্কৃত বলায় শ্রোতারা হাসি দিয়ে মহর্ষি দয়ানন্দকে বিজয়ী ঘোষিত করে দিল এবং পরমাত্মা নিরাকার বলে মেনে নিল । অথচ যজুর্বেদ অধ্যায় ১ মন্ত্র নং. ১৫ এবং যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র নং.১ এ স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে, পরমাত্মা স্বশরীরে রয়েছেন অর্থাৎ তিনি সাকার।

স্বামী দয়ানন্দজী সংস্কৃত ভাষাতে প্রবচন করতেন, তার প্রমাণ:-

"সত্যার্থ প্রকাশ"- এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা নং ৮-এ স্বামী দয়ানন্দ জী বলেছেন যে, প্রথমবার যখন 'সত্যার্থ প্রকাশ' ছাপানো হয়েছিল। তখন আমি সঠিকভাবে হিন্দি বলতে পারতাম না। কারণ ছোটো বেলা থেকে সন ১৮৮২ (সংবত ১৯৩৯) পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাতেই বক্তৃতা দিতাম। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী দয়ানন্দ জী সংস্কৃত ভাষাতেই শাস্ত্রার্থ করতেন। ১৯৩৯ সংবত (সন ১৮৮২)-তে 'সত্যার্থ প্রকাশ' দ্বিতীয়বার ছাপানোর এক বৎসর পর সন্ ১৮৮৩ তে স্বামী জির মৃত্যু হয়ে যায়। এর

দ্বারা স্পষ্ট হল যে, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে স্বামী দয়ানন্দ জী হিন্দি ভাষা শিখেছিলেন। তার আগে তিনি সংস্কৃত ভাষাতে প্রবচন (বক্তৃতা) দিতেন। শ্রোতারা সংস্কৃত ভাষায় সাথে অপরিচিত ছিল অথচ তারাই পন্ডিতদের জয় পরাজয়ের বিচার করত। বর্তমানে এই দাসের ও দাস (আমি রামপাল দাস) চায় যে, সর্ব পবিত্র ধর্মের প্রভু প্রেমী পূণ্য আত্মাগণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরিচিত হয়ে লাল ও লালড়ীর (আসল হীরা ও নকল হীরা) পরখ নিজেরাই করে নিতে পারবে।

কাহিনী:- একজন শেঠের দুই পুত্র ছিল একজনের বয়স ১৬ বৎসর অপরজনের বয়স ১৮ বৎসর। পিতার মৃত্যু ঘটল। তাদের মাতা তাদেরকে একটি হীরা (লাল) একটি কাপড়ে মুড়ে দিয়ে দিল এবং বলল, "যাও তোমার জ্যাঠো মশাইকে গিয়ে বলবে, আমাদের কাছে টাকা পয়সা নেই। এই হীরাটি (লাল) নিয়ে নিন ও আমাদেরকে ব্যবসার যুক্ত করে নিন। আমরা এখন ছোটো বালক নিজেরা ব্যবসা করতে পারব না। তারা দু'জনেই মাতার দেওয়া হীরা গুলি নিয়ে জ্যাঠা মশাইয়ের কাছে গিয়ে মায়ের বলা কথা মত প্রার্থণা করল। এই শেঠ (তাদের জ্যাঠা) হীরাগুলিকে (লাল) দেখলেন এবং তাদের প্রার্থণা স্বীকার করে বললেন, পুত্র! আপাতত এই হীরা গুলি তোমাদের মাতার কাছেই রাখো, তিনি যত্ন করে রাখবেন। তোমরা আমার সাথে অন্য শহরে চলো। সেখানে অনেক মালপত্র ধার করে পাওয়া যায়। ফিরে এসে হীরা গুলি কাজে লাগাবো।

দুই জন বালক জ্যাঠা মশাইয়ের সাথে অন্য শহরে চলে গেল। একদিন জ্যাঠা মশাই একটি হীরা ছেলেদের হতে দিয়ে বললেন, "পুত্র! এই হীরাটি নিয়ে গিয়ে ঐ শেঠকে দিয়ে এসো। যার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মালপত্র ধার করে আনা হয়েছিল এবং বলবে এই হীরাটি রাখুন আমরা ফিরে এসে ঋণ-চুকিয়ে আমাদের হীরে ফেরত নিয়ে যাব।"

তারা দুই জনে শেঠের কাছে গিয়ে উপরোক্ত বিবরণটি বলল। তখন শেঠ একটি জহুরীকে ডাকল। জহুরী হীরে (লাল) পরখ করে বলে, এতো আসল হীরে নয়। আসল হীরের মূল্য প্রায় নয় লক্ষ টাকা হয়ে থাকে। শেঠ জী ভালো-মন্দ কথা শুনিয়ে ঐ নকল হীরেটিকে নিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। ছেলেরা তাদের হীরেটিকে তুলে তাদের জ্যাঠার কাছে আসল। চোখে জল নিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালো যে, এক ব্যক্তি বললো এটি লাল নয় লালড়ী অর্থাৎ এটি আসল নয় নকল হীরে।

জ্যাঠা মশাই বললেন, পুত্র! ঐ ব্যক্তি একজন জহুরী। সে ঠিকই বলেছিল, এটি নকল হীরা এর মূল্য একশো টাকাও হবে না। পুত্র আমি ভুল করে তোমাদের লালড়ী (নকল হীরে) দিয়ে ফেলেছি। আসল হীরে তো এইটা। নাও এবার এটা নিয়ে যাও। শেঠ জীকে বলবে, আমার জ্যাঠা মশাই প্রতারক নন। ভুল করে লালের বদলে লালড়ী (নকল হীরে) দিয়ে দিয়েছিলেন, এই নাও আসল হীরা (লাল)। জহুরী দেখে বলল এটি আসল হীরা (লাল), আগেরটি নকল হীরে (লালড়ী) ছিল।

তারপর জিনিসপত্র নিয়ে শহরে ফিরে এল। তখন জ্যাঠা মশাই বললেন, পুত্র! যাও তোমার মাতার কাছ থেকে হীরাগুলি নিয়ে এসো, ধার অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে। তারা দুইজনে মাতার কাছ থেকে হীরাগুলি নিয়ে কাপড় থেকে বের করে দেখল সেগুলি আসল হীরা (লাল) নয় নকল হীরে (লালড়ী) ছিল। সেগুলির মধ্যে একটিও আসল হীরে নয়। তারা দুইজনেই মাতাকে বলল মাতা, এইগুলি তো লাল (আসল হীরা) নয়, সব লালড়ী (নকল হীরা)। তারা দু'জনে জ্যাঠা মশাইয়ের কাছে এসে বলল,

আমার মা খুব সহজ সরল। সে আসল ও নকল হীরের ব্যাপারে জানে না। এগুলি লাল নয়, লালড়ী অর্থাৎ আসল নয়, সব নকল হীরে। এই কথা শুনে জ্যাঠা মশাই (শেঠ জী) বললেন, ঐ দিনও এগুলি লালড়ী ছিল যেদিন তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসেছিলে। আমি যদি নিজে বলে দিতাম যে, এগুলি আসল নয়, সব নকল হীরে তবে তোমাদের মাতা বলতেন যে, আমার স্বামী নেই বলে আপনি আমার আসল হীরেকে নকল বলছেন। পুত্র! আজ তোমাদের আমি আসল ও নকল হীরে চেনার (পরখ করার) যোগ্য বানিয়ে দিলাম। ফলে তোমরা নিজেরাই বেছে নিতে পারলে।

বিশেষ:- এই প্রকার আজ দাস (আমি রামপাল দাস) এটাই চায় যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে। যাতে শাস্ত্রের প্রমাণ দেখে আজ স্বয়ং পরখ করার যোগ্য হয়ে, সন্ত ও অসন্তের পরিচয় করে নিতে পারে। বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে শাস্ত্রার্থ হতো অথচ জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া অশিক্ষিতদের হাতেই ছিল। এই দাস (রামপাল দাস) চায় যে, প্রথমে প্রভু প্রেমী পূণ্য আত্মারা শাস্ত্রের ব্যাপারে বুঝুক। তারপর তারা নিজেরাই জেনে যাবে যে, এই সন্ত ও মহর্ষিরা আমাদের কি পাঠ পড়াচ্ছে।

“মহর্ষি সর্বানন্দ ও কবীর পরমেশ্বরের (কবিদেবের) মধ্যে শাস্ত্রার্থ

সর্বানন্দ নামের একজন মহর্ষি ছিলেন। তার পূজ্যমাতা শ্রীমতি সারদা দেবী, পাপ কর্মের ফল স্বরূপ পীড়িত ছিল। কষ্ট নিবারনের জন্য সে সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র বছরে পর বছর করে গেল। শারীরিক পীড়া নিবারণের জন্য বৈদ্যের দেওয়া ওষুধও খেল, কিন্তু সকল মহর্ষিগণ বলল, পুত্রী সারদা! এটি তোমার ভাগ্যে লেখা পাপ কর্মের দন্ড, এর কোনো ক্ষমা হয় না, ভোগ করতেই হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, বালিকে বধ করেন, সেই পাপ কর্মের দন্ড শ্রী রামের (বিষ্ণু) আত্মাকে শ্রী কৃষ্ণ রূপে ভোগ করতে হয়েছে। শ্রী বালীর আত্মাকে শিকারি হয়ে এসেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিষাক্ত তীর মেরে তাকে বধ করে। এই ভাবে গুরু-সন্ত বা ঋষি-মহন্তদের বিচার শুনে, দুঃখিত মনে সারদা দেবী নিজের ভাগ্যে লেখা পাপ কর্মের কষ্ট, চোখের জল ফেলে-ফেলে ভোগ করেছিল। একদিন সারদা দেবীর এক আত্মীয়র বলায় তিনি কাশীতে (স্বয়ম্ভু) স্বয়ং স্বশরীরে প্রকট হওয়া (কবির্দেব) কবির পরমেশ্বর অর্থাৎ কবির প্রভুর সহিত নাম উপদেশ প্রাপ্ত করে এবং ঐ দিনেই কষ্ট মুক্ত হয়। কারণ, পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র নং. ৩২ এ লেখা আছে “কবিরসংঘারিরসি” অর্থাৎ (কবির) কবির (অংঘারি) পাপের শত্রু (অসি) হন। আবার এই পবিত্র যজুর্বেদেরই অধ্যায় ৮ মন্ত্র নং ১৩ তে লেখা আছে পরমাত্মা (এনসঃ এনসঃ) অধর্মের অধর্ম অর্থাৎ পাপেরও পাপ, ঘোর পাপকেও সমাপ্ত করে দেন। প্রভু কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) বললেন, পুত্রী সারদা! এই সুখ তোমার ভাগ্যে ছিল না, আমি তোমাকে নিজ কোষাগার থেকে প্রদান করেছি এবং নিজেকে পাপ বিনাশক হওয়ার প্রমাণ করে দিয়েছি। তোমার পুত্র মহর্ষি সর্বানন্দ বলে যে, প্রভু পাপ নাশ (ক্ষমা) করতে পারেন না এবং তোমরা আমার কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করে আত্ম কল্যাণ করে নাও। ভক্তিমতি সারদা দাসী স্বয়ং এসে পরমেশ্বর কবির প্রভুর (কবির্দেব) কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যান করায়। ভক্তিমতি সারদার পুত্র সর্বানন্দের শাস্ত্রার্থের প্রতি খুব উৎসাহ ছিল। সে নিজের সমকালীন সর্ব বিদ্বান পুরুষদের শাস্ত্রীয় বিতর্কে (শাস্ত্রার্থে)পরাজিত করেছিল। পরে সে চিন্তা করল, আমাকে প্রত্যেক জনকেই এক কথা বলতে হয় যে, আমি সর্ব বিদ্বান পুরুষদের শাস্ত্রার্থে পরাজিত করে দিয়েছি। তাই যদি আমি, মাতাকে

ব'লে নিজের নাম পরিবর্তন করে সর্বাজিৎ করে নিই, তবে খুব ভালো হয়। এইভেবে সর্বানন্দ তার মাতা সারদা দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থণা করে বললো, মাতা! আমার নাম পরিবর্তন করে সর্বাজিৎ করে দিন। মাতা বললো, পুত্র! সর্বানন্দ নামটি কি খারাপ ? মহর্ষি সর্বানন্দ বললো মাতা! আমি সকল বিদ্বান পুরুষদের শাস্ত্রীয় বিতর্কে পরাজিত করে দিয়েছি। তাই আমার নাম সর্বাজিৎ করে দাও। মাতা বলল, পুত্র! আরও এক বিদ্বান আমার গুরু মহারাজ, কবিরদেবকে (কবির প্রভু) পরাজিত করে আয়। ওনাকে পরাজিত করে আসা মাত্রই আমি তোর নাম সর্বাজিৎ রেখে দেব। মায়ের এই বক্তব্য শুনে শ্রী সর্বানন্দ প্রথমে হাঁসলো। তারপর বললো, মাতা! আপনি খুব সরল। ঐ (ধানক) তাঁতি কবীর তো অশিক্ষিত, তাকে আর কি পরাজিত করব ? এই গেলাম আর এই এলাম!

মহর্ষি সর্বানন্দ সমস্ত শাস্ত্রগুলিকে একটি বলদের ওপর চাপিয়ে কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বর) কুঠিরের সামনে গিয়ে পৌঁছালেন। পরমেশ্বর কবীর জীর ধর্মীয় কন্যা কামালীর সাথে প্রথমে কুঁয়োর কাছে সর্বানন্দের দেখা হয়। তারপর কুঠিরের দ্বারের কাছে এসে বললেন, আসুন মহর্ষি! এটাই হল পরমপিতা কবীরের ঘর। শ্রী সর্বানন্দ কামালীর কাছ থেকে একটি ঘটি নিয়ে তাতে সম্পূর্ণ জলভর্তি করলেন। এতটাই জলে পূর্ণ করলেন যে, আর সামান্য জল দিলেই তা উপচে পড়বে। তারপর জলে পরিপূর্ণ ঘটি-টি কামালিকে দিয়ে বললেন, পুত্রী! এই ঘটি-টি ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়ে কবীরকে দিয়ে দে, এবং সে যা উত্তর দেবে তা এসে আমাকে বলবি। মেয়ে কামালি'র আনা ঘটিতে কবীর পরমেশ্বর কবির্দেব কাপড় সেলাইয়ের একটি বড়ো সুচ ফেলে দিলেন। তার ফলে কিছুটা জল ঘটির বাইরে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কবির্দেব বললেন, যাও পুত্রী! এই ঘটি সর্বানন্দকে ফিরিয়ে দাও। ঘটি হাতে নিয়ে ফরে আসা কামালীকে সর্বানন্দ জী জিজ্ঞাসা করলেন, কি উত্তর দিল কবীর? কামালী তাকে কবীর পরমেশ্বরের ঘটিতে সুচ ফেলে দেওয়ার সকল বৃত্তান্ত জানালো। তখন মহর্ষি সর্বানন্দ পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন? প্রভু কবীর জী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রশ্ন কি ছিল?

শ্রী সর্বানন্দ মহর্ষি বললেন, আমি সর্ব বিদ্বান পুরুষদের শাস্ত্রার্থে পরাজিত করে দিয়েছি। আমি আমার মাতার কাছে প্রার্থণা করেছিলাম, আমার নাম সর্বাজিৎ রেখে দাও। মাতা বলেছেন, আপনাকে পরাজিত করার পরই আমার নাম পরিবর্তন করবেন। আপনার কাছে জলে পরিপূর্ণ ঘটি পাঠানোর তাৎপর্য হলো, আমি জ্ঞান দ্বারা এতটা পরিপূর্ণ, যেমনটা ঘটি জলে পরিপূর্ণ। এতে আর জল ধরবে না, বাইরে উপচে পড়ে যাবে। তেমনই আমার সাথে জ্ঞান চর্চা করে কোন লাভ হবে না। আপনার জ্ঞান আমার মধ্যে আর প্রবেশ করবে না, বৃথা বাক্য ব্যয় হবে। সেই জন্য আপনি নিজের হার স্বীকার করে লিখে দিন। এতেই আপনার মঙ্গল। পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) বললেন, আপনার জল দ্বারা পরিপূর্ণ ঘটির মধ্যে, আমার লোহার সুচ ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, আমার জ্ঞান (তত্ত্ব জ্ঞান) এতটাই ভারী (সত্য) যে, যেমন ঘটির জল বাইরে উপচে ফেলে দিয়ে সুচটি ঘটির তলায় গিয়ে ঠেকেছে। তেমনই আমার তত্ত্বজ্ঞান আপনার মধ্যে থাকা অসত্য জ্ঞানকে (লোকবেদ) বের করে দিয়ে আপনার হৃদয়ে বসে যাবে।

মহর্ষি সর্বানন্দ বললো, প্রশ্ন করো! একজন চর্চিত বিদ্বান পুরুষকে তাঁতীদের

কলোনিতে আসতে দেখে আশে পাশের সহজ সরল অশিক্ষিত তাঁতীরা শাস্ত্রীয় বিতর্ক শুনতে সবাই একত্রিত হয়ে গেল।

পূজ্য কবির্দের প্রশ্ন করলেন :-

কৌন ব্রহ্মা কা পিতা হৈ, কৌন বিষ্ণু কী মাঁ। শঙ্কর কা দাদা কৌন হৈ, সর্বানন্দ দে বতায়॥

মহর্ষি সর্বানন্দের উত্তর:- শ্রী ব্রহ্মা হলেন রজোগুণ, শ্রী বিষ্ণু হলেন সত্ত্বগুন এবং শ্রী শিব হলেন তমোগুণ যুক্ত। এই তিন জনই অজর-অমর অর্থাৎ অবিনাশী, তিন দেবতা সর্বেশ্বর- মহেশ্বর– মৃত্যুঞ্জয়। এনাদের মাতা-পিতা কেউ না। আপনি অজ্ঞানি, আপনার শাস্ত্রের কোনো জ্ঞান নেই। শুধু শুধু উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন করছেন। সেখানে উপস্থিত সকল শ্রোতাগন হাততালি দিয়ে মহর্ষি সর্বানন্দকে সমর্থন জানালো।

পুজ্য কবীর প্রভু (কবির্দেব) বললেন, মহর্ষি! আপনি প্রভুকে সাক্ষী করে গীতার ওপর হাত রেখে, শ্রীমদ্ দেবী ভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্দ এবং শ্রী শিব পুরাণের ষষ্ঠম ও রুদ্র সংহিতার সপ্তম অধ্যায় পড়ে অনুবাদ করে শোনান। মহর্ষি সর্বানন্দ পবিত্র গীতার ওপর হাত রেখে শপথ করে বললেন, সঠিক সঠিক শোনাবো।

কবীর প্রভুর (কবির্দেব) বলার পর, পবিত্র পুরাণগুলি ধ্যানপূর্বক পড়লেন। শ্রী শিব পুরাণের (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, যার অনুবাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার)পৃষ্ঠা নম্বর ১০০ -১০৩ এ লেখা আছে যে, সদাশিব অর্থাৎ কাল রূপী ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির(দুর্গার) মিলনে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী সংযোগে সত্ত্বগুণ শ্রীবিষ্ণু, রজোগুণ শ্রী ব্রহ্মা ও তমোগুণ শ্রী শিবের জন্ম হয়। এই প্রকৃতি (দুর্গা) যাকে অষ্টাঙ্গীও বলা হয়, ত্রিদেব (ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব) জননী অর্থাৎ তিন দেবতার মাতা বলা হয়।

পবিত্র শ্রীমদ্ দেবী পুরাণের (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, অনুবাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও চিমন লাল গোস্বামী) তৃতীয় স্কন্দে পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু বলছেন, এই প্রকৃতি (দূর্গা) হলো আমাদের তিন দেবতার জননী। আমি এনাকে ওই সময় দেখেছিলাম, যখন আমি ছোট শিশু ছিলাম। মায়ের স্তুতি করে শ্রীবিষ্ণু বলছেন, হে মাতা! আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শিব তো নাশবান। আমাদের তো আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হয়। আপনি হলেন প্রকৃতি দেবী। ভগবান শঙ্কর বললেন, মাতা! যদি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আপনার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তবে আমি শংকরও আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছি অর্থাৎ আপনি আমারও মাতা।

মহর্ষি সর্বানন্দ প্রথমে শুনে রাখা অসম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ লোকবেদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তিন দেবতাকে (ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব) অবিনাশী ও অজন্মা বলছিলেন। পুরাণ গুলি পড়ার পরেও সে অজ্ঞানী ছিল, কারণ পবিত্র গীতায় ব্রহ্ম (কাল) বলেছেন, সর্ব প্রাণীদের (যারা আমার একুশ ব্রহ্মাণ্ডে আমার অধীনে রয়েছে) বুদ্ধি আমার হাতে। আমার যখন ইচ্ছা তখন জ্ঞান প্রদান করি এবং যখন ইচ্ছা অজ্ঞানতা ভরে দিই। কিন্তু ওই সময় পূর্ণ পরমাত্মার বলার পর কাল ব্রহ্মের প্রভাব সরে যায় এবং সর্বানন্দজী স্পষ্ট ভাবে জ্ঞান বুঝে যান। বাস্তবে পুরাণে তাই লেখা থাকলেও সম্মানহানির ভয়ে সে বললো, আমি সব কিছুই পড়েছি, এমনটা কোথাও লেখা নেই। কবির্দেবকে (কবীর পরমেশ্বর) বললো,"তুই মিথ্যা বলছিস। তুই শাস্ত্রের ব্যাপারে কি জানিস? আমরা প্রতিদিন শাস্ত্র পড়ি।" তারপর আর কি! সর্বানন্দ জী ধারাবাহিক ভাবে সংস্কৃত বলতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রায় ২০ মিনিট ধরে কণ্ঠস্থ করে রাখা অন্যান্য

বেদবাণী গুলি বলতে লাগলো অথচ পুরাণের কথা আর বলল না।

সেখানে উপস্থিত সকল সহজ সরল শ্রোতাগণ, যারা সংস্কৃত বুঝতেও পারতো না, তারা সবাই প্রভাবিত হয়ে সর্বানন্দ মহর্ষির সমর্থনে বাহ! বাহ! মহাজ্ঞানী বলতে লাগলো। ভাবার্থ হল এই যে, পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব)-কে পরাজিত ও মহর্ষি সর্বানন্দকে বিজয়ী ঘোষণা করে দিল। পরম পূজনীয় কবীর পরমেশ্বর বললেন, সর্বানন্দ জী আপনি পবিত্র গীতার উপর হাত রেখে শপথ গ্রহণ করে বলেছিলেন, সেটাও ভুলে গেলেন! আপনি যখন আপনার শাস্ত্রে লেখা সত্য, নিজের চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইছেন না, তখন আমি হারলাম আপনি জিতলেন।

এক জমিদারের পুত্র ছিল, সে সপ্তম শ্রেণীতে পড়তো এবং সে কিছু ইংরেজি ভাষা শিখে রেখেছিল। একদিন পিতা পুত্র দু'জনে গরুর গাড়ি নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। সামনে থেকে একজন ইংরেজ আসছিল। সে গরুর গাড়ির উপর বসা ব্যক্তিদেরকে ইংরেজি ভাষায় প্রশ্ন করে পথ জানতে চাইলো। পিতা বলল,"পুত্র! মনে হচ্ছে এই ইংরেজ ব্যক্তিটি নিজেকে অধিক শিক্ষিত প্রমাণিত করতে চাইছে। তুমিও তো ইংরেজি ভাষা জানো! বের করে দাও, ওর অহংকার! তুমিও ইংরেজি বলে শুনিয়ে দাও।" কৃষকের ছেলে ইংরেজিতে মুখস্ত করা অসুস্থতার জন্য ছুটি চেয়ে আবেদন পত্রটি সম্পূর্ণ তাকে শুনিয়ে দিল। ইংরেজটি ঐ বালকটিকে নির্বোধ মনে করে যে, আমি পথ জানতে চাইলাম সে আমাকে অসুস্থতার জন্য ছুটি চেয়ে আবেদন পত্র শুনিয়ে দিল। এই ভেবে নিজের কপাল চাপড়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। কৃষক নিজের বিজয়ী পুত্রের পিঠ চাপড়ে বলল, বাহ পুত্র! আজ তুই আমার জীবন সফল করে দিলি। ইংরেজদেরই ইংরাজি ভাষায় পরাজিত করে দিলি। তারপর পুত্র বলল, পিতা! "মাই বেস্ট ফ্রেন্ড" এটাও (আমার প্রিয় বন্ধু নামক প্রবন্ধ) মুখস্ত ছিল। ওটা শুনিয়ে দিলে তো ইংরেজি নিজের গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত। এই প্রকার কবির্দের এক বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন অথচ সর্বানন্দ তার অন্য উত্তর দিচ্ছিল; এই শাস্ত্রীয় বিতর্কই সবকিছুকে জটিল করে রেখেছে।

পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর কবির্দেব বললেন, সর্বানন্দ জী! আপনি জিতে গেলেন, আমি হারলাম। মহর্ষি সর্বানন্দ বললো, লিখিত দাও, আমি কাঁচা কাজ করি না। পরমাত্মা কবীর জী (কবির্দেব) বললেন, এই কৃপাও আপনি করে দিন, যা লেখার লিখে দিন। আমি আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে দিচ্ছি। মহর্ষি সর্বানন্দ লিখে দিলেন, "শাস্ত্রার্থে সর্বানন্দ বিজয়ী হল, আর কবীর সাহেব পরাজিত হলেন।" এই লেখার উপর কবীর পরমেশ্বরের আঙুলের ছাপ নিয়ে নিল। নিজের মাতার কাছে গিয়ে সর্বানন্দ বললো, মাতা! এই নাও তোমার গুরুদেবের পরাজয়ের প্রমাণ। ভক্তিমতি সারদা দাসী বললেন, পুত্র! পড়ে শোনাও। সর্বানন্দ যখন পড়লেন তাতে লেখা ছিল, "শাস্ত্রার্থে সর্বানন্দ পরাজিত হলো, আর কবীর পরমেশ্বর বিজয়ী হলেন।" সর্বানন্দের মাতা বললেন, পুত্র! তুমি তো বলেছিলে যে, তুমি বিজয়ী হয়েছো। এখন দেখছি তুমি তো পরাজিত হয়ে এসেছো। মহর্ষি বললো, মাতা! আমি কিছুদিন ধরে অনবরত শাস্ত্রর্থে ব্যস্ত ছিলাম, তাই নিদ্রাবশত আমার দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছে। আবার গিয়ে সঠিক করে আনছি। তার মাতা শর্ত রেখেছিল, যদি লিখিত প্রমাণ দিতে পারো তবেই মানবো, মৌখিক মানবো না। তাই মহর্ষি সর্বানন্দ আবার গেলেন এবং বললেন, কবীর সাহেব! আমার লেখার কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে পুনরায় লিখতে হবে। কবীর সাহেব জী বলেন, আবার লিখে নাও।

মহর্ষি সর্বানন্দ পুনরায় লিখে আঙুলের ছাপ লাগিয়ে নিয়ে মায়ের কাছে আসতেই, লেখা বিপরীত হয়ে যায়। বলল, মাতা! আমি আবার যাচ্ছি। তৃতীয়বার লিখে আনলো এবং ঘরে প্রবেশ করার আগে দেখল সব সঠিক লেখা ছিল, মহর্ষি এই লেখনীর উপর থেকে দৃষ্টি সরালেন না এবং হেঁটে নিজের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে করতেই বলতে লাগলো, মাতা! এবার শোনো, এই বলে পড়তে শুরু করল তার চোখের সামনে অক্ষরগুলি পরিবর্তন হয়ে গেল। তৃতীয়বারেও ঐ একই প্রামান্য লেখা দেখতে পেল। তখন তার মাতা বললেন, পুত্র! কিছু বলছিস না কেন? পড়ে শোনা, কি লেখা আছে। মাতা জানতো, নির্বোধ বালক পাহাড়ের সাথে টক্কর দিতে চলেছে। সর্বানন্দের মাতা তাকে বললেন, পুত্র! পরমেশ্বর এসেছেন, তাঁর চরণে পড়ে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থণা কর ও নাম উপদেশ নিয়ে নিজের জীবনকে সফল করে নে। মহর্ষি সর্বানন্দ মায়ের পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলো এবং বলল, মাতা! উনি স্বয়ং প্রভু এসেছেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন আমার লজ্জা করছে। সর্বানন্দের মাতা পুত্রকে সঙ্গে করে কবীর প্রভুর কাছে নিয়ে গেলেন, এবং সর্বানন্দকেও কবীর পরমেশ্বরের কাছে থেকে নাম উপদেশ দেওয়ালেন। যাকে মহর্ষি বলা হত, ঐ নির্বোধ সর্বানন্দের উদ্ধার পরমাত্মার চরণে আসার ফলেই হয়। পূর্ণব্রহ্ম কবীর পরমেশ্বর কবির্দেব বললেন, সর্বানন্দ নিজ অক্ষর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেও শাস্ত্রগুলিকে পড়লে কিন্তু বুঝলে না, কারণ আমার শরণে আসা ছাড়া কাল ব্রহ্ম কারোর বুদ্ধি পূর্ণ বিকশিত হতে দেয় না। এখন পবিত্র বেদ, পবিত্র গীতা ও পুরাণ গুলিকে পুনরায় পড়ো। এখন তোমরা নিজেরা ব্রাহ্মণ হয়ে গিয়েছো। "ব্রাহ্মণ সোঈ ব্রহ্ম পহচানে" বিদ্বান (পন্ডিত) একমাত্র সেই, যে পূর্ণ পরমাত্মাকে চিনে নিয়ে নিজের কল্যাণ করাবে।

বিশেষ:- আজ থেকে প্রায় ৫৫০ বছর পূর্বে এই পবিত্র বেদ, পবিত্র গীতা ও পবিত্র পুরাণে লিখিত জ্ঞান কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) নিজ সাধারণ বাণীর মাধ্যমে বলতেন। যে বাণীকে মহর্ষিগণ ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাকরণগত ত্রুটিপূর্ণ ভাষা বলে পড়ারও প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি, তারা বলতেন, কবীর তো অজ্ঞানী, ওর তো অক্ষর জ্ঞানই নেই। সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য, আমরা এই বিষয়ে বিদ্বান, আমরা যা বলি সেই সবই শাস্ত্রে লেখা আছে এবং শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের কোনো মাতা পিতা নেই, এনারা হলেন অজন্মা, অজর-অমর, অবিনাশী এবং সর্বেশ্বর, মহেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয়। এনারা সর্ব সৃষ্টির রচনহার এবং তিন জনই গুণযুক্ত ইত্যাদি এই সমস্ত ব্যাখ্যা দিয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের বলতে থাকে। আজ ঐ সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রগুলি আমাদের কাছে রয়েছে, যার মধ্যে তিন প্রভুর (শ্রী ব্রহ্মা রজোগুন, শ্রী বিষ্ণু সত্ত্বগুন ও শ্রী শিব তমোগুন) মাতা পিতার ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ আছে। সেই সময় আমাদের পূর্ব গুরুরা অশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষিত বর্গেরও শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। তবুও কবীর পরমেশ্বরের (কবির্দেব) দ্বারা বলা সত্য জ্ঞানকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে দিয়ে বলে যে, কবীর মিথ্যা বলছে! কোনো শাস্ত্রে এসব লেখা নেই যে, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের মাতা-পিতা আছেন। অথচ পবিত্র পুরাণ সাক্ষ্য দিচ্ছে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের জন্ম-মৃত্যু হয়। এনারা অবিনাশী নন। এই তিন দেবতার মাতা হলেন প্রকৃতি (দুর্গা) ও পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন কাল রূপী ব্রহ্ম।

বর্তমানে সর্ব মানব সমাজের সকল ভাই-বোন, যুবক-যুবতী, সন্তান-সন্তনি সবাই শিক্ষিত। আজ কেউ এই বলে ভ্রমিত করতে পারবে না যে, কবীর পরমেশ্বর

(কবির্দেব) সাহেবের অমৃত বাণীতে যা লেখা আছে সেই সব ভুল।

পরমেশ্বর নিজের অমৃত বাণীতে লিখেছেন:-

ধর্মদাস য়হ জগ বৌরানা। কোঈ ন জানে পদ নিরবানা॥
অব মৈ তুমসে কহু চিতাই। ত্রিদেবন কী উৎপত্তি ভাই॥
জ্ঞানী সুনে সো হৃরদৈ লগাই। মুর্খ সুনে সো গম্য না পাই॥
মাঁ অষ্টঙ্গী পিতা নিরঞ্জন। ওয় জম দারুণ বংশন অঞ্জন॥
পহলে কীন্হ নিরঞ্জন রাই। পীছে সে মায়া উপজাই॥
ধর্মরায় কিন্হা ভোগ বিলাসা। মায়া কো রহী তব আশা॥
তিন পুত্র অষ্টঙ্গী জায়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে॥
তিন দেব বিস্তার চলায়ে। ইনমে য়হ জগ ধোখা খায়ে॥
তিন লোক আপনে সুত দীনহা। সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লীনহা॥
অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা। তিন লোক জিব কীন্হ আহারা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহী বচায়ে। সকল খায় পুণ ধূর উড়ায়ে॥
তিন কে সুত হৈ তিনোঁ দেবা। আন্ধর জীব করত হৈ সেবা॥
তিন দেব ঔর ঔতারা। তাকো ভজে সকল সংসারা॥
তিনোঁ গুণ কা য়হ বিস্তারা। ধর্মদাস মৈঁ কহোঁ পুকারা॥
গুণ তিনোঁ কী ভক্তি মেঁ, ভুল পরো সংসার। কহৈ কবীর নিজ নাম বিন, কৈসে উতরে পার॥

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে কবীর সাহেব নিজ সেবক ধর্মদাস সাহেবকে বলেছেন, “ধর্মদাস এই সর্ব সংসার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিভ্রান্ত হয়ে আছে। পূর্ণ মোক্ষ মার্গ ও সৃষ্টি রচনার জ্ঞান কেউ জানেনা। এই কারণে, আমি তোমাকে আমার দ্বারা রচিত সৃষ্টির কাহিনী শোনাচ্ছি। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। যারা সর্বপ্রমাণ দেখেও বিশ্বাস করবে না, ওই নির্বোধ প্রাণীরা কালের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রয়েছে, তারা ভক্তি করার যোগ্য নয়। এবার আমি বলছি, তিন দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? এদের মাতা হলেন, অষ্টাঙ্গী (দেবী দুর্গা) ও পিতা হলেন জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল-ব্রহ্ম)। সর্ব প্রথম ডিম থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। তারপর দুর্গার উৎপত্তি হয়। দুর্গার রূপের উপর আসক্ত হয়ে কাল (ব্রহ্ম) ভুল (কুকর্ম) করে বসে। তখন দুর্গা (প্রকৃতি) ব্রহ্মের পেটে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন আমি (পরমেশ্বর কবীর সাহেব) ওই স্থানে গেলাম, যেখানে জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ছিল। তারপর ভবানীকে ব্রহ্মের উদর থেকে বের করে, তাকে ও ব্রহ্মকে অর্থাৎ কালের একুশ ব্রহ্মান্ড সহিত সেখান থেকে ১৬ শঙ্খ ক্রোশ দূরে পাঠিয়ে দিই। জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর (দুর্গা) সাথে ভোগ বিলাস করে। এই দু’জনের মিলনে তিন গুণের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রী শিব) উৎপত্তি হয়। এই তিনগুণের (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) সাধনা করেই সর্ব প্রাণী কালের জালে আটকে রয়েছে। বাস্তবিক মন্ত্র না পাওয়া পর্যন্ত মোক্ষ কি করে হবে?”

"বিপথে চলা পথিকের মার্গ দর্শন"

"সদগুরুদেবের অসীম কৃপায় ব্রেন টিউমার বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ সেরে গেছে"

আমি ভক্তমতি পূর্ণিমা সরকার, আমার স্বামীর নাম বরেন সরকার, আমি পশ্চিমবঙ্গের, জলপাইগুড়ি জেলার, আমবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। পরম্পরা অনুযায়ী পুরাতন রীতি অনুসারে আমি বিভিন্ন প্রকার দেবী দেবতাদের নিত্য পুজা, গীতা পাঠ, বিশেষ করে গোপাল সেবা তথা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতাম এবং তাঁকেই সর্বশক্তিমান পূর্ণ পরমাত্মা বলে মানতাম। সেটা ২০২০ সাল চলছিল, হঠাৎ করে একদিন দুপুরবেলা পূজার সময়ে আমার বমি হওয়া এবং মাথা ঘোরা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, তারপর আমার ছেলে এবং স্বামী দুজন মিলে আমাকে স্থানীয় ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়, সেখান থেকে আমাকে তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি সদর হসপিটালে পাঠানো হয়। সেখানকার ডাক্তাররা আমার সিটি স্ক্যান করায় এবং রিপোর্টে ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। যখন আমার জ্ঞান ফেরে তখন আমি দেখি আমি একটা নার্সিংহোমে ভর্তি আছি। এই ঘটনা গুলির কথা আমি জ্ঞান ফেরার পরে নিজের ছেলের মুখেই শুনি। কিছুদিন পর কিছু ওষুধপত্র দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পরে ঐ নার্সিংহোম থেকে আমাকে ব্রেন টিউমার অপারেশন করানোর জন্য ব্যাঙ্গালোরে রেফার করে দেওয়া হয় এবং অপারেশনের খরচও প্রায় ছয় লক্ষ টাকা হতে পারে বলে জানিয়ে দেয়, কারণ ব্রেন টিউমারটি খুবই সেনসিটিভ জায়গায় হয়েছিল, প্রাণঘাতের আশঙ্কা ছিল, তাই ওরা নিজেরা রিস্ক নিতে চায়নি।

এরপর আমার পরিবারের লোকজন আমাকে ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কিছুদিন এডমিট থাকার পরও চিকিৎসকরা আমার কেসটা ঠিকমতো ধ্যান দিচ্ছিলেনে না, অন্যান্য ইমারজেন্সি রোগীদের নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিলেন। যখন আমার অপারেশনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা বলে দেয় ছয় মাস পরে নিয়ে আসতে। ডাক্তারদের কথা মত আমাকে ওষুধপত্র দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়, আর ঠিক তার পরেই করোনার জন্য লকডাউন লেগে যায়। ছমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও লকডাউনের কারণে প্লেন বা ট্রেন কিছুই চলছিল না, আর যে কারণে চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালোরে যেতে পারছিলাম না, এদিকে প্রয়োজনীয় ওষুধও শেষ হয়ে গিয়েছিল, শরীর আরো বেশি খারাপ হতে লাগলো, হাঁটা চলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, তারপর অ্যাম্বুলেন্সে করে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতার এস.এস. কে.এম হসপিটালে আনা হল। এস.এস.কে.এম হসপিটালে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছুদিন ভর্তি রাখা হল। এমতাবস্থায় আমাকে যে মহিলা ওয়াটে রাখা হয়েছিল, সেখানকার তিন- চারজনের করোনা পজিটিভ হয়ে যায়। তারপর আমারও পরীক্ষা করা হয় এবং আমিও করোনা পজিটিভ হয়ে যাই। তখন আমাকে এস.এস.কে এম হসপিটাল থেকে রেফার করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে অর্থাৎ করোনা হসপিটালে পাঠানো হয়, সেখানে বিনা চিকিৎসায় একরকম মরণাপন্ন অবস্থায় হয়ে যায়, তখন আমি বাড়ির লোককে ফোন করে কান্না-কাটি করে বলি যে, হসপিটালে মরার থেকে নিজের বাড়িতে গিয়ে মরা অনেক ভালো কারণ, প্রিয় জনদের পাশে দেখতে পাবো। তোমরা আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। তারপর আমার পরিবারের লোকজন আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসে।

এভাবে কিছুদিন কাটার পর একদিন আমার স্বামী বাড়ির কাছে আম বাজারে চলতে থাকা পুস্তক প্রচার সেবাকেন্দ্র থেকে জ্ঞানগঙ্গা বই নিয়ে এসে আমাকে পড়তে

দেয়, ঐ বইটা আমি তিনদিনেই পড়ে কমপ্লিট করি, এবং বইটি পড়ার পরে নিজের মধ্যে নতুন করে বাঁচবার জন্য একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি এবং ছোটবেলা থেকে অজানা এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে পারি, বিশেষ করে মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে, তারপর জ্ঞান গঙ্গা পুস্তকে থাকা সন্ত রামপালজী মহারাজের ফটোটা আমি ল্যামিনেশন করে তার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজের মত করে ভক্তি করা শুরু করে দিই, আর তাতেই আমার বাম হাত যেটা অকেজো অচল হয়ে পড়েছিল, তা আবার আগের মতো সচল হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস তখন অনেক দৃঢ় হয়ে যায়, আর আমি পাগলের মত চেষ্টা করছিলাম কিভাবে সন্ত রামপালজী মহারাজের থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করা যায়। এরপর অনেক বাধা অতিক্রম করে পুস্তকে থাকা নম্বরে ফোন করে নিকটবর্তী শিলিগুড়ি নামদান সেন্টার থেকে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করি, তারপর গুরুদেবের বলা নিয়ম মর্যাদাতে থেকে ভক্তি করার প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমার ব্রেন টিউমার সম্পূর্ণ সেরে যায়, এবং আমি নিজে থেকে চলাফেরা করা, সৎসঙ্গে যাওয়া, পুস্তক সেবায় যাওয়া সবকিছুই করতে শুরু করে দিই। এগুলোর সাথে সাথে প্রতিদিন পরমাত্মার কৃপায় আমার সাথে আরো অনেক চমৎকার তো ঘটতেই থাকে, সর্বোপরি সদগুরুদেবজীর অসীম দয়ায় আমি শাস্ত্র নির্দেশিত সঠিক ভক্তিবিধি এবং মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তির মার্গ তো পেয়েই গেছি। জগতের সমস্ত ভাই বোনদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন, আপনারা কৃপা করে সন্ত রামপালজী মহারাজ এর দ্বারা লিখিত "জ্ঞান গঙ্গা" অথবা "জীবনের পথ" পুস্তক অর্ডার করে ডাকযোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা প্রচার সেবা থেকে স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত করে অবশ্যই পড়ুন এবং সন্ত রামপালজী মহারাজের কাছে থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে, নিজের মানব জীবনকে সফল করুন।

সত্ সাহেব

মুখের ক্যান্সার রোগ সম্পূর্ণ সেরে যাওয়া

আমি ভক্ত অশোক কুমার সিনহা, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার, রিষড়া এলাকায় থাকি, বাড়ির ঠিকানা - ২৪এ, এস.ডি. মুখার্জি লেন, পিন-৭১২২৪৮, রিষড়া।

কৈশোর অবস্থা থেকেই ভক্তির দিকে আমার একটা বিশেষ টান বরাবরই ছিল। পরম্পরা গত দুর্গা মাতার পূজা, হনুমান পূজা ছাড়াও বিশেষ করে সাঁই বাবার ভক্তি পূজাও করতাম। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র, ধাম যাত্রা এবং সঙ্গে অন্যান্য দান ধর্ম ক্রিয়াকর্ম গুলোও করতে থাকতাম।

তখন আমার বয়স ছিল ৫২ বছর, একদিন হঠাৎ করে সামান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে ভালো করে দেখে শুনে অনেকগুলো টেস্ট এবং চেক আপ করাতে বলেছিলেন। সেই সব রিপোর্টগুলো চেক করে ডাক্তাররা আমাকে বলেন যে, 'আমি ওরাল ক্যাভিটি ক্যান্সারে আক্রান্ত'। খবরটা শুনতেই আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, আর আমার জীবন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ভরে গেল। জীবনের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে, ভগবানের প্রতি আমার যে একটা বিশ্বাস ছিল সেটা হারিয়ে যেতে শুরু করলো।

যাইহোক, এরপর আমি চিকিৎসার জন্য মুম্বাইয়ে যাই, সেখানে এক হসপিটালে ১৮ দিন ভর্তি ছিলা। অপারেশনের জন্য আমাকে অপারেশনের পোশাক পরিয়ে রাখা হত এবং অত্যন্ত কম খাবার খেতে দেওয়া হত। এই সময়ে হঠাৎ একদিন সাঁই বাবা এক অন্য সাধুবেশে আমাকে স্বপ্নে দর্শন দেন, তখন আমি ওনার কাছে প্রার্থণা

করছিলাম আমার ক্যান্সার ঠিক করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু উনি আমাকে সুস্থ করার পরিবর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চান। তখন আমি টাকা না নিয়ে, একটাই কথা বলি যে, আমি টাকা চাই না কেবল আমি সুস্থ হতে চাই, আপনি আমাকে সুস্থ করে দিন। সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা বরং আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ি। ক্যান্সারের অপারেশনে ডাক্তারা আমার খাদ্যনালীর কিছু অংশ কেটে বাদ দেন, আর আমাকে বলে দেয় যে, তুমি জীবনে কখনো মুখ দিয়ে খাবার খেতে পারবে না। তাছাড়া লবণ, ঝাল, মসলা এগুলো কখনোই খেতে পারবে না। তখন আমাকে নাকের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নল ঢুকিয়ে কেবল জুস খাওয়ানো হতো। অসহ্য কষ্টের মধ্যে দিয়ে এইভাবে দিন গুলো কাটছিল। যাঁদের ভগবান বলে মনে করতাম তাঁরাও যখন কিছু করতে পারলেন না, তখন ভগবানের প্রতি আমার যে অল্প আস্থা ছিল সেটাও হারিয়ে গেলো। একদিন আমার এক নিকট পরিচিত বন্ধু (ভক্ত দিলীপ রজক দাস) আমার এই শোচনীয় অবস্থার কথা জানতে পারেন, এবং তিনি আমাকে পরম সন্ত রামপালজী মহারাজের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে বলেন। জ্ঞানটা আরো জানার জন্য আমি সর্বপ্রথম সন্ত রামপালজী মহারাজ দ্বারা লিখিত 'জ্ঞান গঙ্গা' পুস্তক কিছুদিন যাবৎ পড়তে থাকি, জ্ঞানটা বুঝতে পারার পর বরবালা গিয়ে আশ্রম থেকে ২০১৪ সালে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে আমি এবং আমার স্ত্রী নিয়মানুসারে ভক্তি করতে থাকি। নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করার এক মাসের মধ্যেই গুরুজীর আশীর্বাদে আমার ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। আমি পূর্বের ন্যায় চলাফেরা, খাওয়া- দাওয়া সবকিছুই করতে থাকি। সবচেয়ে বড় কথা যেখানে ডাক্তাররা আমাকে বলে দিয়েছিল যে, আমি কখনো মুখ দিয়ে খেতে পারব না এবং আমার খাদ্যনালীর অংশ কাটা ছিল, সেখানে গুরুজীর আশীর্বাদে আমার খাদ্যনালী পুনরায় জুড়ে পুরো হয়ে যায়। আজ আমি সমস্ত প্রকারের খাবার, লবণ ঝাল, মসলাদার খাবার নির্দ্বিধায় খেতে পারি। গুরুজী সৎসঙ্গে বলেন:-

সতগুরু জো চাহে সো করহী। চৌদো কোটি দূত জম ডরহী॥
উত ভূত যম ত্রাস নিবারে। চিত্রগুপ্ত কে কাগজ ফারে॥

অর্থাৎ সদগুরু যা চান তাই করতে পারেন, এমনকি চিত্রগুপ্তের কাগজও ছিঁড়ে ফেলে নিজের ভক্তের আয়ু বাড়িয়ে নতুন করে লিখতে পারেন।

এছাড়াও আমার আর্থিক স্থিতি আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একবার আমার স্ত্রী চলন্ত বাইক থেকে পড়ে যায় এবং মাথায় গভীর ভাবে চোট এসে যায়, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওনাকে ব্রেনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে, ডাক্তার বাবু বলেন, ইনি বেঁচে আছেন কি ভাবে। "আমি এই পেশেন্ট-কে দেখবো না, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইনি মারা যাবেন। আমি সদগুরুজীর কাছে প্রার্থণা করি, আর স্ত্রী-কে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসি। ডাক্তার যা ওষুধ দিয়েছিল, তা সব আমি ড্রেনে ফেলে দিই, আর গুরুজীর বলা মত দৃঢ় ভাবে ভক্তি করতে থাকি। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার স্ত্রী এবং আমাকে কখনো রোগের কারণে ওষুধ খেতে হয় নি এবং আমার ঘর পরিবার নিয়ে আমি খুব সুখে শান্তিতে পরমাত্মার ভক্তি, সেবা করে জীবন যাপন করছি। তাই যে সকল পাঠকগণ পরমাত্মার এই সব লীলা, মহিমা শুনছেন, তাদের সকলের কাছে আমার সবিনয়ে নিবেদন, আপনারা অবশ্যই সন্ত রামপালজী মহারাজের লেখা অদ্ভুত অদ্বিতীয় জ্ঞান গঙ্গা পুস্তক পড়ুন এবং সত্য জ্ঞান বুঝে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে নিজের কল্যাণ সাধন করান।

সত্ সাহেব

দুঃখ পরম সুখে বদল

আমি ভক্ত মতি পুতুলি দাসী, স্বামী নিশি দাস। আমার বাড়ি মালদা জেলার ভগবানপুর গ্রামে। সদগুরুদেব রামপালজী মহারাজের শরণে আসার আগে, আমার জীবনে দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। সেই দুঃখের কাহিনী, এখানে সংক্ষেপে কিছুটা বলার চেষ্টা করবো মাত্র। যখন আমি আমার বয়স ছিল মাত্র আট বছর, আমার বাবা হঠাৎ করে মারা যান। তখন স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি, বাবার এই হঠাৎ চলে যাওয়াতে আমাদের পরিবারে বিশাল একটা শূন্যস্থান তৈরী হয়। মানসিক, আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, মায়ের অবস্থা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে আমরা তিনজন বোন ভাই, আমার ছোট ভাই আর এক বড় দিদি মিলে, সবাই তখনও বেশ ছোটই ছিলাম। ভাই আর দিদি তো প্রায় সময় কাঁদতেই থাকতো, দুবেলা খাবারটাও আমাদের ঠিক মতো করে জুটতো না। এই অবস্থায় কাউকে না কাউকে তো পরিবারের হালটা ধরতেই হতো। সেই সময় একদিন আমার স্কুলের এক ম্যাডাম নিজের বাড়ির এক রুগীর দেখাশোনার জন্য কাজের আয়া খুঁজছিলো। আর আমি তখন সেই কাজ করবো বলে ম্যাডাম কে অনুরোধ করি, উনি আমাকে বলেছিলেন, যে তুমি এতো ছোট্ট আছো, তুমি কি কাজ করতে পারবে? আমি নির্দ্বিধায় হ্যাঁ বলে দিই। তখন আমার গায়ে পড়ার মতো পোশাক টুকুও ঠিক ছিল ছিল না, ম্যাডাম আমাকে আগে ভালো জামা কাপড় কিনে পরিয়ে দেন, তারপর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং আমাকে আমার কাজ বুঝিয়ে দেন। আর সেই তখন থেকেই আমি কাজ করে বাড়িতে টাকা পাঠাতে শুরু করি।

এইভাবে বছর চার পার হয়ে যায়, তখন আমার বয়স মাত্র ১২ বছর, আমার কাকা, জ্যাঠারা মিলে আমাকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। আমার স্বামীর মারাত্মক মদের নেশা ছিল। বিয়ের পর থেকে এমন একটা দিনও কাটেনি, যেদিন আমার স্বামী নেশা করেনি, তার জন্য অভাব, দুঃখ কষ্ট আর প্রতিদিন ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকতো। এরপর এক এক করে আমার দুই মেয়ের জন্ম হয়। এইভাবে যখন আমাদের সংসার ডামাডোলে চলছিল, ধীরে ধীরে আমার স্বামীর মধ্যে এক অজানা রোগ শুরু হল, যাতে শরীরের চামড়া ফেটে ফেটে রক্ত বার হতে থাকে, উনি অত্যন্ত দুঃখী ও পীড়িত হয়ে পড়েন। রোগের জ্বালায় হঠাৎ একদিন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। আমার স্বামীর এই ভাবে মৃত্যুতে, তার পরিবার আর পাড়া প্রতিবেশীরা আমাকে অপবাদ দিতে থাকলো যে, আমিই আমার স্বামীকে খেয়েছি। এই জ্বালায় আমাকে, দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ত্যাগ করতে হয়। কোলে ছ-মাসের মেয়ে সহ দুই সন্তানকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে আসি। এদিকে মায়ের অবস্থাও, বাবার মৃত্যুর পর থেকেই সেখানে খুবই খারাপ পরিস্থিতি চলছিল। তাই সেখানেও আমার বেশিদিন ঠাঁই হয় নি। মৃত্যুই একমাত্র পথ বলে মনে হয়েছিল। তবুও দুই সন্তানের কথা মাথায় রেখে, অন্য কোন রাস্তা চোখের সামনে না দেখতে পেয়ে আবার সেই পুরোনো স্কুলের ম্যাডামকে ফোন করি। যেখানে আমি আগে কাজ করতাম। নিজের সমস্ত ঘটনাটাকে ম্যাডাককে জানাই এবং তারপর বলি যে, আপনি আমাকে না সামলালে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় থাকবে না। তখন ম্যাডাম বললেন তুমি অটো ধরে আমার বাড়িতে চলে এসো। সেইমতো আমি আবার পুরোনো ম্যাডামের বাড়িতে কাজ করা আরম্ভ করি, আর বড় মেয়েকে দিদির কাছে রেখে তার খরচ খরচা পাঠিয়ে দিতে থাকি।

যা রোজগার করতাম তার বেশির ভাগটাই দিদিকে পাঠিয়ে দিতাম। আর দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকার জন্য ছোট মেয়েটাকে ঠিক মতো দেখতে পারতাম

না, যার কারণে একদিন ছোট মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ঠিকমত চিকিৎসা না করালেও নয়, একদিকে ভয় আমার মেয়ের রোগটা যেন বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়! আরও একটা ব্যাপার মাথায় ছিল যে, যদি সেরকম কিছু হয়ে যায় তো আবার শ্বশুড় বাড়ির লোকজন বলবে আগে স্বামীকে খেয়েছে, এখন মেয়েটাকেও খেয়ে ফেলেছে। তাই ম্যাডামের কাছে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াতে থাকি। অনেক ওষুধ পত্র করে বহু চিকিৎসার পর মেয়ে সুস্থ হয়। ইতিমধ্যে অন্য আর এক ম্যাডামের সাথে আমার পরিচয় হয়, তিনি আমাকে দুঃখী দেখে বলেন, তুমি বোম্বাই চলে যাও, সেখানে গিয়ে ভালো কাজ করে বাড়িতে পয়সা পাঠাও এবং নিজেও সুখে থাকো। সেইমতো আমি বাড়িতে না জানিয়ে দুই মেয়েকে এখানে মায়ের কাছে ছেড়ে বোম্বাই চলে যাই। সেখানে এক ম্যাডামের বাড়িতে ঘরের কাজকর্ম করতে থাকি। প্রথম মাসের বেতন ৯০০০ টাকা পাই, প্রায় পুরোটাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। এত টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছি বলে নিজের মা আমাকে বলে, যে তুই ওখানে নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করছিস। মায়ের কথায় কষ্ট পেয়ে সেদিন আমি অনেক কেঁদেছিলাম। তারপর থেকে বাড়িতে টাকা পাঠানো একটু কম করে দিই, তখন আবার মা বলে এত কম টাকা পাঠাচ্ছিস কেন, বেশি করে টাকা পাঠা। যাই হোক এই হল সংসারের রীতি। এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ করে একদিন আমার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, আমি জানি না তখন আমি কি করবো, কোথায় যাব। বাড়িতে ছোট ছোট দুটো মেয়ে আছে, মায়ের কিছু হয়ে গেলে ওদের কে দেখবে। আমি অত্যন্ত দুঃখী আর হয়রান হয়ে যাই। ছোটবেলা থেকেই গোপালকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নিজের ইষ্ট বলে, ভক্তি পূজা করে আসছি, তবুও আমার জীবনে দুঃখের পর দুঃখ আসতেই থাকছে। কিছুতেই কিছু বুঝতে পারছিলাম না যে, কেনো এমন হয়? আর যদি ভগবান তুমি সত্যিই থাকো, আর যদি তোমার এত ভক্তি পূজোও করি, তবুও কেন আমার এত কষ্ট? আমার সাথে এগুলো কি হচ্ছে ভগবান? প্রতিটা রাত আমাকে কেঁদে কেঁদে কাটাতে হতো, যে কেউ আমাকে দেখতো, সে প্রশ্ন করত আমি কেন এত দুঃখে থাকি? আমি নিজে তখন এর উত্তর পাইনি আর ভগবানও আমাকে সাড়া দেয়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ সকাল বেলাতে আমি রুটি বানাচ্ছিলাম, পাশে মোবাইলটা রাখা ছিল, হঠাৎ করে একটা অদ্ভুত চমৎকার হয়, আমার ফোনে অটোমেটিক ভাবে সন্ত রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ চালু হয়ে যায়। প্রথমে গিয়ে আমি বন্ধ করে দিই, কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়বার আবার ঐ সৎসঙ্গ চালু হয়। এবার আমি তাড়াতাড়ি রুটি বানানো সেরে নিয়ে, সৎসঙ্গে গুরুজী কি বলছেন, সেটা শুনতে লাগলাম আর বুঝতে পারলাম কে সেই পরম ভগবান। সেই ভিডিওতে সন্ত রামপালজী মহারাজ সংসাররূপী উল্টো ভাবে থাকা অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা করছিলেন। আর বলছিলেন, "যে এই বৃক্ষের প্রতিটা বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন তিনি হলেন প্রকৃত গুরু অর্থাৎ গোবিন্দও তিনিই।"

ওনার এই কথাগুলো আমার মনে গভীর দাগ কেটে যায় এবং মহারাজের স্বরূপ দেখেই আমি আকৃষ্ট হয়ে যাই আর ওনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ি। যেহেতু এই ঘটনাটি লকডাউন চলাকালীন সময়ে হয়েছিল সেই কারণে, আমি বাইরে বার হতে পারছিলাম না। তাই কোন উপায় না দেখে আমার মোবাইলে যত কন্টাক্ট নম্বর ছিল সবাইকে আমি এক এক করে কল করে, সন্ত রামপালজী মহারাজ এর বিষয়ে জানার চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু কেউই গুরুজীর বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি। অবশেষে আমার মোবাইলে যখন শেষ একটা মাত্র কন্টাক্ট নম্বর আর কল

করতে বাকি রয়ে গেছে, যাকে ফোন করতেও দ্বিধা করছিলাম কারণ সেই ব্যক্তির বিষয়ে আমি কর্মসূত্রে তাকে জানতাম যে, তিনি দেবী দেবতার ভক্তি করেন না, কোন প্রসাদ খান না, এবং আমি তাঁকে ঠিক এই কারণেই পছন্দ করতাম না, যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ কে পূর্ণ পরমাত্মা বলে মানতেন না। যাই হোক কোন উপায় না দেখে তাকেই যখন ফোন করলাম, এবং আমার সাথে ঘটা অদ্ভুত চমৎকারের বিষয়ে ওনাকে বললাম সেই সাথে গুরুজীর ভিডিও ক্লিপের বিষয়ে যখন বলি। তখন সেই ব্যক্তি আমাকে বলেন যে আপনি এখন কি করতে চান। আমি তাঁকে বলি যে, আমি এই গুরুজীর কাছে যেতে চাই, ওনাকে দেখতে চাই। আমার কথা শুনে সেই ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, আপনি তো আমার গুরুজীর কথা বলছেন। ওনার মুখে এই আমার গুরুজী কথাটা শুনে আমি এতটা খুশি হয়ে যাই এবং চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করি, যেন আমি ভগবানের খোঁজ পেয়ে গেছি। তারপর সেই ব্যক্তির থেকে “মালদা নামদান” সেন্টারের নম্বর নিয়ে সেন্টারে কল করি, এবং যথারীতি ঐ দিনই দুপুর বেলা একটার সময় অনলাইনে আমার নাম দীক্ষা সম্পন্ন হয়। নাম দীক্ষা নেওয়ার পর আমি প্রদীপ জ্বালাতে পারতাম না, কেননা আমি অন্য ব্যক্তির বাড়িতে কাজের জন্য থাকি তাই। তখন সদগুরুদেবজীর কাছে অনেক কাঁদতাম। নাম দীক্ষা নেওয়ার তিনদিন পর সদ গুরুদেব রামপালজী মহারাজ আমাকে দর্শন দেন, এবং আমার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। তারপর পরমাত্মার দয়ায় আমি প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করি, কিছুদিন ভক্তি করার পর আমার দীর্ঘদিনের এলার্জি রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। বাড়িতে আমার অসুস্থ মা অনেকটা সুস্থ হয়ে যায়। আমি জীবনে বাঁচার একটা নতুন রাস্তা খুঁজে পাই। আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম, সেখান থেকে আমার ভক্তি করতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল, কারণ একদিন আমি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলে দেখি তার মধ্যে মদের বোতল রাখা ছিল, তাই দেখে আমি ম্যাডামকে বলি যে, ম্যাডাম আমি তো ভক্তি করি আর এইভাবে ফ্রিজে নেশার জিনিস থাকলে আমি খাবার কিভাবে খাব? সেই কথা শুনে ম্যাডাম অত্যন্ত রেগে যায় এবং আমাকে একপ্রকার সেখান থেকে তাড়িয়েই দেয়, হঠাৎ করে কাজটা চলে যাওয়াতে আমার অনেকটা দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মার এত দয়া হল, যে কাজ চলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এক ভক্ত ভাইয়ের বাড়িতে আমি নতুন করে কাজ পেয়ে যাই। বর্তমানে আমি সেখানেই থাকি, পরমাত্মা নিজ দাসী কে খুব সুখে রেখেছেন। যে বাড়িতে আমি কাজ করি, তাদের সাথেই আমি প্রতি রবিবার সৎসঙ্গে যাই, পুস্তক সেবায় যাই এবং ভক্তি, সেবা, নামজপে আমার কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। আজ পূর্ণ পরমাত্মা স্বরূপ আমার গুরুজী আমাকে সর্ব সুখ এবং মোক্ষ প্রাপ্তির সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন।

আমি জানি আমার মত দুঃখী মানুষ এই সংসারে অনেক আছে, তাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা একবার সন্ত রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ শুনুন অথবা “জ্ঞান গঙ্গা” “জীবনের পথ” পুস্তক পড়ুন। আজ পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীতে অবতার রূপে এসেছেন, ওনাকে চিনুন এবং সদ্ ভক্তি করে সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত করুন। গুরুজী একটি বাণী বলেন :-

ঈস সন্সার সামাঝদা নাহী, ক্যাহেন্দা শাম দো পেহেরু নু।
গরীব দাস, ইয়ে বক্ত জাত হ্যাঁয় রোবোগে ঈস পেহেরু নু॥

আজ এই সংসার বুঝতে পারছে না যে, অসংখ্য যুগ ধরে জন্ম মৃত্যুর মাধ্যমে এই দুঃখ কষ্টে ভরা জীবন ব্যতীত করার পর সদগুরু প্রাপ্তির আর তার সঙ্গ সমীপে থেকে সদভক্তি করে মোক্ষ লাভ করার এই সুযোগ ঘটেছে। আর এই ভয়ঙ্কর কালের লোকে

মানব জীবনের এই অমূল্য সময়টা সদভক্তি বিনা কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর এই সময় সুযোগের কথা চিন্তা করে, কান্না ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আপনারা সদগুরু রামপালজী মহারাজের শরণে আসুন এবং নিজের আত্মকল্যাণ করান।

সত্ সাহেব

"কিডনী ভাল করেন ও শয়তানকে মানুষ বানান"

আমি ভক্ত জগদীশ দাস, পিতা - শ্রী প্রভুরাম, গ্রাম-পাঞ্জাবখেড়া, দিল্লী ৮১, ডী.টী. সী (দিল্লী, ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন) -এর ম্যাকানিক। মদ আমাকে রাক্ষস প্রবৃত্তির মানুষ বানিয়েদিয়েছিল। মদমাংস, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা পান আমার কাছে সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমি চাকরি থেকে সন্ধ্যা প্রায় ৭/৮ টার সময় বাড়ি ফিরতাম। মদ বেশি খাওয়ার কারণ অনেক সময় ৯/১০টাও বেজে যেত। নেশায় পাগল হয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে টলটে-টলতে বাড়ি ফিরতাম। ঘরে ঢুকতেই পত্নী ও বাচ্চাদের মারপিঠ শুরু করতাম। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঝগড়া ঝামেলা করতাম। যে বাচ্চাদের আদর করে বুকে লাগানো দরকার ছিল, সেই অবলা অবুঝ বাচ্চারা আমাকে দেখে খাটের নিচে লুকাতো। ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কখন আমার বাবা খাবার জিনিস নিয়ে বাড়ি আসবে। কিন্তু আমি খাবার জিনিসের জায়গায় মদ খেয়ে চোখ লাল করে নেশায় পাগল হয়ে ঐ মাসুমদের (অবুঝ বাচ্চাদের) মারতাম। অন্যদিকে আমার স্ত্রী সুমিত্রা দেবী দুঃখী জীবনে ভয়ঙ্কর রোগের সাথে লড়াই করে শ্বাস পুরা করিতেছিল। তার দুটো কিডনিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলে ওযুধ খেতে থাকলে ৬ মাস পর্যন্ত বাঁচতে পার। অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল, আর ৫১৯ রাম মনোহর লোহিয়া হসপিটাল দিল্লী থেকে রিপোর্ট দেয় কিডনী খারাপ হয়ে গিয়েছে ৬ মাস বাঁচতে পারে, যদি ঠিক মত ওযুধ খায়! তখন ঐ বাচ্চাদের কি অবস্থা হয়? যার পিতা এক নম্বরের মাতাল আর মা মৃত্যুশয্যায়! কোন ভারী কাজ করতে পারে না। যখন বাচ্চারা জানতে পারে, তোমাদের মা আর মাত্র ৬ মাস বাঁচবে। তখন ঐ বাচ্চাদের চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ত। এদিকে পিতা মাতাল অন্যদিকে মা মৃত্যু শয্যায়। আমাদের কি হবে? তিন ছেলে এক মেয়ে নিজের মায়ের কাছে বসে কান্না করত আর বলতো, হে ভগবান আমাদেরও মায়ের সাথে তোমার কাছে ডেকে নিও। এখানে কার ভরসায় থাকবো?

পরমাত্মা বাচ্চাদের ডাক শোনে আর আমারও শুভ কর্মের উদয় হয়। আমাদের প্রতিবেশী ভক্তমতি নিহালী দেবী নিজের গুরুদেব সন্ত রামপালজী মহারাজের আদেশ অনুসার জানুয়ারী ১৯৯৭-এ সদগুরু গরীবদাস মহারাজের অমৃত বাণীর তিন দিনের অখণ্ড পাঠ করান। আমাদের বাড়ির সবাই ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এ রাত ৯টা থেকে ১১ পর্যন্ত সন্ত রামপালজী মহারাজের সত্সঙ্গ শুনতে যায়। কিছুক্ষণ পরে আমি চাকরি থেকে বাড়ি এসে বাচ্চাদের কাছে জানতে পারি, আমার স্ত্রী নিহালী দেবীর বাড়িতে সত্সঙ্গ শুনতে গিয়েছে। আমি খুব রেগে যাই। আর বলি কোন পাখণ্ডির কাছে চলে গেছে? আমি ওকে মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে আসব। এই ভবনায় আমি নিহালী দেবীর বাড়িতে যাই, আমি মদ খেয়েছিলাম। যখন আমি নিহালী দেবীর বাড়ি যাই, তখন সন্ত রামপালজী মহারাজ সতসঙ্গ করিতেছিলেন। অনেক ভক্তজন সত্সঙ্গ শুনছিল। এতো লোক জন দেখে আমি কিছু না বলে, চুপচাপ সবার পিছনে বসে পড়ি। আমি ও সতসঙ্গ শুনি। সত্সঙ্গে মহারাজ বলেন-

শরাব পীবৈ কড়বা পানী, সত্তর জন্ম শ্বানকে জানি।
গরীব, সো নারী জারী করে, সুরাপান সো বার।

এক চিলম হুক্কা ভরৈ, ডুবৈ কালি ধার॥
কবীর, মানুষ জন্ম পায় কর, নহি ভজৈ হরি নাম।
জৈসে কুয়া জল বিনা, খুদবায়া কিস কাম।

মহারাজ সত্সঙ্গে-বলেন, যে বাচ্চাদের আদর করে পিতাকে বুকে লাগানো উচিত। কিন্তু ঐ মাতাল ব্যক্তিকে দেখে বাচ্চারা খাটের নিচে লুকায়। মদ্যপ ব্যক্তি নিজেও দুঃখী এবং পাড়া প্রতিবেশিদেরও দুঃখী করে। মাতাল ব্যক্তিদের ধনহানী, মানহানী হয়, সমাজে ঐ মাতালদের কোন সম্মান নেই। পরিবার, প্রতিবেশীদের এবং আত্মীয়দের দুঃখী করে অভিশাপ প্রাপ্ত করে। যেমন মাতাল ব্যক্তির স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা অত্যাচারের শিকার হয়। পত্নীর মা-বাবা ভাই-বোন দিন রাত চিন্তায় থাকে। এই সব পাপের ভার ঐ নির্বোধ মাতালের মাথায় পড়বে। পরমাত্মা মনুষ্য জন্ম দিয়েছে প্রভু ভক্তি করে আত্মা কল্যাণের জন্য। এই জীবনকে মদ খেয়ে নষ্ট করা উচিত নয়। যেমন বাচ্চারা যদি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ না করে, এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে, তাহলে সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে। পরে সারা জীবন মজুরের কাজ করে জীবন নির্বাহ করতে হবে। তখন তার মনে পড়ে ঐ সময় যদি আবারাগদী না করতাম তাহলে আজ সহপাঠিদের মত বড় অফিসার হতাম। কিন্তু এখন চিন্ত করে কি লাভ। এই চিন্তা তো ছাত্র জীবনে করা দরকার ছিল। কবীর সাহেব বলেন-

আচ্ছা দিন পিছে গয়ে, গুরু সে কিয়া ন হেত।
আব পছতাবা ক্যা করে, জব চিড়িয়া চুগ গই খেত॥

যদি কোনো প্রাণী মানব জন্মে প্রভু ভক্তি না করে, তাহলে সে পশু পাখীর যোনী প্রাপ্ত করে। যে ব্যক্তি মদ খায় সে মদের নেশায় খাবার থালায় লাথি মারে। ভক্তি না করে বিভিন্ন প্রাণীর যোনীতে কষ্ট করে। কখনো কুকুরের যোনী ধারণ করে। কুকুর সারা রাত ঠান্ডায় রাস্তায় পড়ে থাকে, উপর থেকে বর্ষাকালে তাকে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। সকালে ক্ষুধার যন্ত্রণা। কারো রান্না ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে লাঠি বা ডেলা মারে। কুকুর অনেক সময় পর্যন্ত চিল্লাতে থাকে। পরে অন্য ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, না জানি ওখানে খাবার মিলবে না লাঠি। যদি ওখানেও লাঠি মারে তখন ক্ষুধায় ব্যাকুল কুকুর মানুষের পায়খানা খায়। যদি এই মূর্খ প্রাণী মানুষের শরীরে থাকা কালীন সত্সঙ্গে এসে ভাল কথা শুনতো আর খারাপ কর্ম ত্যাগ করে সদগুরুর থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজের কল্যাণ করতো এবং বাচ্চাদের ভালো শিক্ষাও প্রভুর দীক্ষা প্রদান করাতো, তাহলে সর্বদা সুখী থাকতো। মদের নেশায় বুঁদ্ হয়ে থাকার আনন্দ কিছুক্ষণ মাত্র থাকে, আর পরমাত্মার নামে ভজনের সুখ-আনন্দ সর্বদাই সাথে থাকে।

উপরোক্ত সতসঙ্গে সন্ত রামপালজী মহারাজের কথা শুনে আমার মদের নেশা ছু-মন্ত্রর হয়ে যায়। দু'চোখে অশ্রু জলে ভরে যায়। বাড়ি চলে যাই। রাত্রে ঘুম আসে নাই। ১ জানুয়ারি ১৯৯৭-এর দুপুরে ১-৩০ এ আমার পত্নীকে সাথে নিয়ে সন্ত রামপালজী মহারাজের কাছে যাই এবং আত্মকল্যাণের জন্য নাম উপদেশ প্রাপ্ত করি। ঐ দিন থেকে আজ (২০০৫) পর্যন্ত মদ, তামাক ও মাছ-মাংস ছুঁই না। আমার পত্নীও যে দিন উপদেশ নেয় সেই দিন থেকে সুস্থ। ডাক্তারের চিকিৎসা এবং এক্সরে ইত্যাদি রিপোর্ট আজও আমার ঘরে রাখা আছে সবাইকে দেখাই।

সর্ব আত্মাদের কাছে আমার প্রার্থণা আপনারাও প্রভুর চরণে আসুন। সন্ত রূপে পরমেশ্বরের বার্তা বাহক সন্ত রামপালজী মহারাজকে চিনুন এবং জানুন। বিনামূল্যে (ফ্রি) নাম উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যাণ করান।

সত্ সাহেব। -ভক্ত জগদীশ।

"ভূত-প্রেতের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করেন"

ভক্তমতী অপলেশ- স্বামী শ্রী রামেশ্বর, পুত্র শ্রী মাঙ্গেরাম, গ্রাম-মিরচ, জেলা-ভিবাণী হরিয়াণা) আমি অপলেশ দেবী, আমার দুঃখী জীবনের এক ঝলক আপনাদের শোনাচ্ছি। আমি আর আমার ছেলে রাহুল আর মেয়ে জ্যোতির ফেলে আসা অতীত সময়ের করুণ অবস্থার কথা মনে পড়লে শিউরে উঠি। সেই কথা বর্ণনা করার সময় হৃতপিন্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৫ রাত্রে গুণ্ডারা আমার স্বামীকে ডিউটির সময় জীবনে মেরে দেয়। কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মা (কবীর সাহেব) আমার পতিকে জীবন দান দেন। তাই আজ আমরা সপরিবারে বন্দি ছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের শ্রীচরণের শরণে আছি। আমার স্বামী পরিস্কার কাপড় পরত কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোমরের চারিপাশের কাপড় রক্তে লাল হয়ে যেত। বাচ্চাদেরও কফের সঙ্গে রক্ত পড়তো। আর আমিও এক বৎসর যাবৎ হার্টের অসুখে খুব দুঃখী ছিলাম। আমার স্বামী দিল্লী পুলিশে চাকরি করে। আমার সর্ব শরীরে ফোড়া-ফুসকুড়ির মতো চর্ম রোগ হতো। ঘরের খারাপ স্থিতির জন্য আমার স্বামীর মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। এই সকল দুঃখ দুর্দশার জন্য ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ডজনেরও বেশি লোভী, লালচী গুরুদের কাছে যাই। ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থানে যেমন গঙ্গা, যমুনা, হরিদ্বার, জবালা, চমুণ্ডা, চিন্তপুরন্দী, নগর কোট, বালাজী, মেহন্দীপুর, গুড়গাওয়ের মাই, গোরখ টীলা প্রত্যেক স্থানে বাচ্চা সহিত কয়েক চক্কর লাগাই। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আমাদের পরিবারের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে হোলি ও দীপাবলীর সময় আমরা কোন মসজিদে বসে থাকতাম।

আমার কপাল ভালো যে শ্রী রামপালজী মহারাজ দ্বারা পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শরণে এসেছি। এখন কোথায় গেল সেই কালের দূত, আর আমার অসুখ, যার চিকিৎসা অল ইণ্ডিয়া হসপিটালে চলতো। সদগুরুদেবের চরণের ধূলায় সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ কাল-এর পূজা করা এক তান্ত্রিক ফোন করে জিজ্ঞাসা করে অপলেশ তোমার নাম? আমি বলি হ্যাঁ। আপনার নাম কি? তখন ঐ তান্ত্রিক বলে আমার নাম জিজ্ঞাসা করবেন না আর আমি বলতেও চাই না। আমি হাঁসী থেকে বলছি। এখানে বলরাম আর একটি লোক এসেছিল। ঐ দুইজন আমাকে ৩৭০০ টাকা তোমাদের মারার জন্য দিয়েছে, আমি তোমার ফোন নম্বরও ঐ বলরামের থেকে নিয়েছিলাম। কারণ তোমাদের দুর্গতি হচ্ছে কিনা তাহা জানার জন্য। আমি রাত্রে তোমার ক্ষতির জন্য খারাপ কাজ করে, যখন শুয়ে পড়ি তখন তুমি যে গুরুর পূজা করে তিনি আমাকে দেখা দেন। এবং বলে এই কর্মের পরিণাম তুমি নিজে ভুগবে। ঐ পরিবার সর্ব শক্তিমান সর্ব কষ্ট হরণকারী পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শরণে আছে। তোমার কি ক্ষমতা আছে? এই লোকের ধর্ম রাজও ঐ পরিবারের কোন ক্ষতি করতে পারবে না!

গরীব, যম জৌরা জাসে ডরৈ, মিটে কর্মকে লেখ।
অদলী অদল কবীর হে, কুলকে সদগুরু এক॥

পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরকে যম (কাল তথা কালের দূত) তথা মৃত্যু ও ভয় পায়। এই পূর্ণ প্রভু, 'পাপ কর্ম দণ্ড' সমাপ্ত করে দেয়। পরে ঐ তান্ত্রিক বলে তুমি আমার মেয়ের মতো, তাই একটা কথা বলছি। তুমি যে পুরুষোত্তমের পূজা কর তিনি প্রবল শক্তি যুক্ত। আমি ২৫ বৎসর ধরে এই খারাপ কাজ করিতেছি। না-জানি কত পরিবারকে বর্বাদ করে দিয়েছি। কিন্তু আজ প্রথমবার হেরে গেলাম। তাই পুত্রী এই শক্তিকে ছাড়িও না। তোমার বিনাশের জন্য বলরামরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বলি, আমি পূর্ণ পরমাত্মার পূজা করি। বলরাম আমার পতির বড় ভাই। আমাদের মহা শত্রু। আমরা আজ এতোটা

ভাগ্যবান যে, আমাদের মনে কোন কার্য বা জিনিসের প্রয়োজন হলে তা সদগুরুদেব সত কবীর সাহেব পূর্ণ করে দেন। আজ গুরু গোবিন্দ দোনো খড়ে, কিসকে লাগে পায়। বলিহারী সদগুরুদেব রামপালজীর চরণে জিনহে পরমেশ্বর দিয়া মিলায়।

হে ভাই ও বোনেরা! আমরা পুরা পরিবার আপনাদের এই খবর দিচ্ছি। যদি সতলোকের মার্গ, পূর্ণ মোক্ষ ও সর্ব সুখ প্রাপ্ত করতে চান এবং সাংসারিক দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে বন্দীছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের থেকে নামদীক্ষা প্রাপ্ত করুন। আর নিজের অমূল্য মানব জীবন সফল করুন।

সত সাহেব।

ভক্ত মতি অপলেশ

"ভক্ত সতীশের আত্মকথা"

আমি ভক্ত সীতশ দাস ১৯৩ সেক্টর ৭ আর.কে.পুরম, নয়াদিল্লীর নিবাসী। আমার এক বন্ধুর কথা মতো, ১৯৯৭-সালের ডিসেম্বর মাসে প্রীতমপুরা দিল্লীতে শ্রী রামপালজী মহারাজের সত্সঙ্গ শুনতে যাই। কিন্তু পারম্পরিক পূজা ছাড়ার কথা শোনার পরে সত্সঙ্গ মন লাগে না। সদগুরুজী শাস্ত্র পড়ে আমাদের বুঝাচ্ছিলেন, মনে ভাবি ধর্ম পুস্তক তো বাড়িতেই পড়তে পাড়ি। এই ভাবে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) আমার বুদ্ধি স্থির করে দেয়। আর আমার ভক্তি চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায়। সদগুরু আমাদের বলেন-

গুরু বিন কিনহে না পায় জ্ঞানা, জ্যো থোতা ভুস ছড়ে কিসানা।
গুরু বিন ভরম না ছুটে ভাই, কোটি উপায় করো চতুরাই॥

আমার বুদ্ধি স্থির হওয়ার কারণ অন্যান্য কথা বলতে বলতে বাড়ি চলে আসি। সন ১৯৯৯-এ আমার স্ত্রী শ্রীমতি মঞ্জুর ব্রেন টিউমার ধরা পরে। দিল্লী সফদারগঞ্জ হসপিটালে চিকিৎসা ও নিরীক্ষণের পরে জানতে পারি। পরে আমি পন্থ হসপিটাল তথা এ.আই.আই.এম.এস এবং অ্যাপোলো হসপিটাল নয়া দিল্লীতে ডাক্তারকে দেখাই। সব ডাক্তারা তাড়াতাড়ি অপারেশনের পরামর্শ দেন এবং বলেন অপারেশনের পরে এক হাতে প্যারালাইজড় হতে পারে। অ্যাপোলো হসপিটালের ডাক্তার রিপোর্ট দেখার পরে বলে এর চোখ দুটো এখনো কি করে ঠিক আছে? চোখের স্পেশালিস্টকে দেখাতে বলে, আমি তখনই চেক আপ করাই। আই স্পেশালিস্ট আর নিউরো সার্জন পরামর্শ দেন প্রত্যেক ১৫ দিন একবার চোখের পরীক্ষা করাতে থাকবে। কারণ ব্রেন টিউমার এমন জায়গায় আছে যে কোন সময় চোখ খারাপ হতে পারে। আমার এবং আমার স্ত্রীর পা আগের থেকে খারাপ ছিল (বিকলাঙ্গ) । আর এখন হাত ও চোখ খারাপ হওয়ার কথা শুনে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন উপায় না দেখে অবশেষে "পন্থ হসপিটাল" নয়া দিল্লীতে অপারেশন করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করি। ডাক্তারের কথায় আই.এন. এম.এ.এস হসপিটাল তিমাপুরা দিল্লী থেকে এম.আর.আই ও অন্যান্য টেস্ট করাই। শুধু আপারেশনের তারিখ নেওয়া বাকি ছিল। পূর্ণ পরমাত্মা তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজের পূর্বের শোনা সত্সঙ্গ এক শব্দ মনে আসে-

জিন মিলতে সুখউপজে, মিটে কোটি উপাধ।
ভুবন চতুর্দশ টুন্ডিয়ো পরম স্নেহী সাধ॥

আমার ভক্তি চ্যানেল পরমেশ্বর অন করে দেন। মনে ভাবতে লাগি অপারেশন করার আগে নাম উপদেশ নিয়ে দেখি। তখন আমার বন্ধুর সাথে প্রীতমপুর দিল্লী গিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ পূর্ণ পরমাত্মা তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ থেকে নাম দান

গ্রহন করি। এবং পূর্বের সর্ব পূজা ছেড়ে দিই। সদ্ গুরুজী অখণ্ড পাঠ করাতে বলেন আর বলেন পরমেশ্বর চাইলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে অপারেশনের প্রয়োজন হবে না। আমি সদগুরুর আজ্ঞায় বাড়িতে তিন দিনের অখণ্ড পাঠ করাই। এবং পরে ডাক্তারের কাছে অপারেশনের তারিখ আনতে যাই। যে ডাক্তার অপারেশনের কথা বলেছিল। সেই ডাক্তার দ্বিতীয় এম.আর.আই দেখে বলে অপারেশনের প্রয়োজন নেই। তখন সদগুরুর বাণী মনে পড়ে।

সতগুরু দাতা তা হৈঁ কলি মাহিঁ, প্রাণ উধারন উতরে সাঁই।
সতগুরু দাতা দীন দয়ালম্, যম কিংকর কে তোড়ে জালম্॥

আমি সদগুরু কে মনে করে কাঁদতে লাগি। হে পরমেশ্বর! আমি আপনার মহিমা কোন শব্দে ব্যাখ্যা করবো? এই ভাবে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের অবতার তত্ত্বদর্শী সন্ত শ্রী রামপালজী মহারাজের কৃপায় আমার অপারেশন হয় না। আর এক পয়সারও ওষুধ খাওয়া লাগে না। তখন থেকে আমি সুখময় জীবন-যাপন করছি।

২০ নভেম্বর ২০০৪ কালের ছোবলের কারণে আমার স্ত্রী মরার মত হয়ে যায়। তখন নিতান্তই গুরুজীর অমৃত জল পান করালে সব ঠিক হয়ে যায়। তখন আমি আমার স্ত্রী-কে সদগুরুর কাছে নিয়ে যাই। সদগুরুজী বলেন, আজ এর মৃত্যু ছিল কবীর পরমেশ্বর-এর আয়ু ভক্তি করার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

আবার ২২ নভেম্বর ২০০৪-এ আমার স্ত্রী সোনীপথ সত্সঙ্গ স্থলে প্যারালাইসিস্-এ পড়ে। হঠাৎ হাতের বলশক্তি সমাপ্ত হতে লাগে। ততক্ষণাৎ সদগুরুদেবের হাত নিজের হাতের উপর দেখতে পায়, প্রায় ৫ মিনিট পর্যন্ত এই রূপ দেখা যায়। যখন প্যারালাইসিস লক্ষণ সমাপ্ত হয়ে যায় তখন সদগুরুদেবের হাত অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ আমার স্ত্রী সুস্থ জীবন-যাপন করিতেছে। সদগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ কবীর পরমেশ্বরের অবতার এসেছেন। তা আমাকে প্রমাণ করে দিয়েছে।

গরীব, যম জৌরা জসৈ ডরৈঁ, মিটেঁ কর্মকে অঙ্ক।
কাগজ কীরেঁ দরগহ দঈ, চৌদহ কোটি ন চম্প॥

ভক্ত সতীশ মেহরা
রাজনগর-১১ পালম কালনী, নয়াদিল্লী-১,
মো: ০৯৭১৮১৮৪৭০৪
বন্দীছোড় সদগুরু রামপাল জী ভগবান কি জয় হো।

"মেডিক্যাল ফেরত দূরারোগ্য ব্যাধি এবং সর্বপ্রকার নেশা থেকে মুক্তির একমাত্র ঠিকানা"

আমার নাম যুধিষ্ঠীর (দাস) মন্ডল। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার, রঘুনাথ গঞ্জ থানার অন্তর্গত রানীনগর গ্রামের নিবাসী। সন্ত রামপাল জী মহারজের কাছ থেকে আমি ১৬-ই মার্চ ২০১৯ -এ নাম দীক্ষা নিয়েছিলাম। সন্ত রামপাল জী মহারাজের জ্ঞান শোনার আগে, আমি অনেক ভক্তি সাধনা করেছি। বিশেষ করে, আমি ভগবান শিবের পূজা অর্চনা করতাম। তাতে আমার বিশেষ কোনো লাভ হয়নি, বরং ক্ষতি হয়েছে। গাঁজাকে ভগবান শিবের প্রসাদ মনে করে খেতাম। এর সাথে সাথে অন্য আরো সব নেশা করতাম, কোনো নেশাই বাদ ছিল না আমার! আমার নেশা করা দেখে আমার বাবা-মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বাবা-মা রোজ বকাবকি করতেন। মা বলতেন, "নেশা করে করে তোর জীবনটা কি নষ্ট করে দিবি! নেশা ছেড়ে দে।" এই কথা শুনে খুব খারাপ লাগতো। রাতে

একা বসে ভাবতাম যে, আজ থেকে কোনো নেশা করবো না, বিড়ি গাঁজা সব ফেলে দিতাম। সকাল হলে আবারও সেই নেশা করার জন্য কারো কাছে চলে যেতাম। এভাবে আমি খুব দুঃখী হয়ে পড়েছিলাম এবং খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করছিলাম। আমার পরিবারের লোকেরা আত্মীয়-স্বজনরা হাজার বার বলেছিল, নেশা করিস না। তাদের কোনো কথা আমার কোনো কাজেও লাগেনি। অথচ সন্ত রামপাল জী মহারাজের জ্ঞান (সতসঙ্গ) শোনার পরে থেকে, ধীরে ধীরে আমার সমস্ত নেশা ছেড়ে গেলো। আমি এই ভেবে অবাক হয়ে গেলাম! যে, সন্ত রামপাল জী মহারাজের জ্ঞানে এত শক্তি! এত লাভ! তাহলে তাঁর কাছে দীক্ষা নিলে কত না লাভ পাওয়া যাবে! এই ভেবে আমি সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি শুরু করলাম। আমি H.I.V পজেটিভ ছিলাম! ডাক্তার বলে দিয়েছিল, এটা কখনো কোনদিনও ঠিক হবে না। সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। সন্ত রামপাল জী মহারাজের আশীর্বাদে এবং ওনার অসীম কৃপায় আমার সেই অসাধ্য রোগও এখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। যে সরকারি হাসপাতালে আমি আমার HIV চেকআপ করাতে প্রতি মাসে যেতাম, গুরুজীর শরণে আসার পর শেষবারের মতো সেখানে গিয়ে আমার চিকিৎসা করা নার্স ম্যাডামকে, আমি গুরুজীর লেখা 'জ্ঞান-গঙ্গা' পুস্তক দিয়ে বলে এসেছিলাম, "ম্যাডাম! আমি আর কখনো এখানে আসবো না, আমার গুরুজীর কৃপায় আমি এখন ভালো আছি।"

এছাড়াও আমার আরো একটা সমস্যা ছিল, আমার কোনো জীবিকা নির্বাহের পথ ছিলনা। সেটাও সদগুরু সন্ত রামপাল জী মহারাজ সমাধান করে দিয়েছেন। আমার সমস্ত বাজে অভ্যাস সন্ত রামপাল জী মহারাজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও আমি অনেক লাভ পেয়েছি, সেগুলো লিখতে গেলে অনেক লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে এই দাসের প্রার্থণা! সন্ত রামপাল জী মহারাজ বিশ্বের মধ্যে একমাত্র সন্ত! যার কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিলে আপনারা শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন। আর সব থেকে বড় লাভ হচ্ছে মুক্তি প্রাপ্তি। জন্ম ও মৃত্যু রূপী ভয়ংকর রোগ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই আপনারাও সন্ত রামপাল জী মহারাজের শরণে এসে নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের ও পরিবারের কল্যাণ করুন।

সত সাহেব।

"সদগুরুর কৃপার মহিমা"

আমি ত্রিলোক দাস বৈরাগী। গ্রাম তীমরখেড়া, জেলা- কাটনী, মধ্যপ্রদেশ-এর বাসিন্দা। আমি ২৭-০৬-২০১০ তারিখে নাম দান নিয়ে ছিলাম। আমার কথা আপনাদের কাছে গল্প মনে হবে। কিন্তু আমি গুরুদেবের শ্রীচরণের শপথ নিয়ে সত্যকথা বলছি। আমি যাহা অনুভব করেছি বা যে প্রমাণ পেয়েছি তা কোনদিনও কল্পনাও করি নাই যে, আমার সাথে এমন চমৎকার হবে। নাম দীক্ষা নেওয়ার ছয় মাস পরে আমার পুত্রের অসুখ হয়। পাঁচ মেয়ের পরে আমার এই একমাত্র পুত্র। আমি আমার ছেলের চিকিৎসা এক মাস পর্যন্ত এম.বি.বি.এস ডাক্তার দিয়ে করাই কিন্তু ভাল হয় না। হঠাৎ একদিন সকাল ৯টার সময় আমার ছেলে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি ওকে নিয়ে উমরিয়াপান যাই। ওখানকার ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য মানা করে দেয়। তখন আমি সিহোর যাই। কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখে সব ডাক্তররা চিকিৎসা করতে মানা করে। অর্থাৎ ডাক্তাররা বলতে চাইছে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। ছেলের বয়স মাত্র এক বৎসর ছিল। সাহস করে এক ডাক্তার

বলে যদি একে অক্সিজেন দেওয়া হয় তাহলে কিছু হতে পারে। তৎক্ষণাৎ আমি একটি গাড়ি রিজার্ভ করে জবলপুর বাচ্চাদের রিসার্চ সেন্টারে যাই। ওখানের ডাক্তাররা বাচ্চার অবস্থা দেখে বলে, এতে কিছু নেই, সুই ফুটালেও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ভর্তি করাও আমার রিস্ক। আমি বলি ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করুন। বাকি পরমেশ্বরের উপর ছেড়ে দেন। ডাক্তার বলে যদি ছয় ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে তোমার ছেলে বাঁচতে পারে। তা-না হলে কোনো আশা নেই। সকাল ৯টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত বাচ্চার কোন জ্ঞান ছিল না। ছেলের মা আর আমি কান্না শুরু করে দিই। তখন আমার ধ্যান হঠাৎ 'জ্ঞান গঙ্গা'য় লেখা চমৎকার এর দিকে যায়। যা ভক্তদের সাথে ঘটেছে। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রী সদগুরুর চরণে সমর্পিত করে দিই। আর বলি হে গুরুজী! আমার ছেলেকে রক্ষা করুন আর আমার যে বিশ্বাস গুরু মহিমার উপর আছে তা যেন অটুট থাকে। প্রায় ১২ টার সময় ডাক্তার এসে বলে বাচ্চার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে? আমি বলি সকালে যেমন ছিল তেমনই আছে। ডাক্তার ইনজেকশন আনতে বলে। আর বাচ্চার উরুতে ইজেকশন লাগাতেই বাচ্চা কাঁদতে শুরু করে। যেন গুরুদেব নিজে বাচ্চাকে ইনজেকশন দিচ্ছেন। তখন পুরো হলে খুশির তুফান উঠে। ডাক্তার আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, এই ধরনের রোগে খুব কম বাচ্চার বাঁচার আশা থাকে। ইনজেকশন তো ১০ - ২০ মিনিট পরে কাজ করে। ছেলে সুচের ব্যথাতেই কেঁদে উঠে। এতে প্রমাণিত হয়, এটাই সদগুরু পরমেশ্বর কবীর জীর চমৎকার।

"সদগুরু শরণ মেঁ আনে সে আঈ টলৈ বলা, জৈ ভাগ্য মেঁ মৃত্যু হো কাঁটে মেঁ টল জা" গুরুজী বলেন তন মন দিয়ে মন্ত্র জপ করাতে চমৎকার হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। হসপিটালে গুরুজীর চরণ বন্দনা করি আর ধন্যবাদ দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ি। ডাক্তারবাবু বলেন, এর লাগাতার আট দিন চিকিৎসা চলবে। ২৪ ঘন্টায় ৫০০০ টাকা করে খরচ হচ্ছিল। আমি ডাক্তারকে বলি আমাকে সকালে ছুটি দেবেন। ডাক্তার বলে যদি একে বাড়ি নিয়ে যাও, তা হলে মৃত্যু হতে পারে। কারণ এখনই তো জ্ঞান ফিরেছে। আমি বলি যা হবে দেখা যাবে এখন আমাকে ছুটি দেন। আজ ছয় মাসের উপর হতে চলছে বাচ্চার জ্বর পর্যন্ত হয় নাই। এমন চমৎকার দেখে আমি ধন্য হয়ে গেছি। আমার সাইকেল নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কারণ আমার পারিবারিক স্থিতি ঠিক ছিল না। হঠাৎ একদিন স্টেট ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বলেন, আপনি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে চান? আমি বলি যদি লোন পাওয়া যায়, তাহলে এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে। আমার পারিবারিক স্থিতি ভালো হবে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমাদের দেড় লক্ষ টাকা লোন দেয়। সাইকেল কেনার যোগ্যতা না থাকা ব্যক্তি হঠাৎ ৫৫০০০ টাকার হীরো হোন্ডা গাড়ি নিয়ে আসে। আজ আমি আনন্দের সাথে গাড়িতে ঘুরছি। আমি সরকারি স্কুলের পিয়ন পদে চাকরি করতাম। চাকরিতে আমার ১৬ বৎসর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার পারিবারিক স্থিতি ভালো হয় নাই। জবলপুর সম্ভাগ থেকে শুধু আমার (সিঙ্গল) প্রমোশন হয়। আমি চাপরাশি (দপ্তরী) থেকে বাবু হয়ে যাই। চেয়ার এদিক থেকে ওদিক নিয়ে যাওয়া চাকর আজ সদগুরুর কৃপায় সাহেব হয়ে চেয়ারে বসি। আমার বেতন এতো বেশি হবে, তা কখনো কল্পনাও করিনি। আমার ছোট ভাই বি.এড.-এর আশা ছেড়ে নিরাশ হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন কাউনসিলিং লেটার আসে। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, কারণ সে ২৯ নং (নম্বর) পেয়েছিল। আর বি.এড-এর জন্য ৩৩ নম্বরের উপর দরকার। কিন্তু এই প্রথমবার ২৮ নম্বর পাওয়া পরিক্ষার্থীদের সুযোগ দিয়েছে। যার কারণ সুযোগ পায়। এখন আমার ভাই বি.এড করছে। এই চার চমৎকার আমার জীবনে এমন ঘটেছে, যা কোন

দিন চিন্তাও করিনি। রামায়ণের লেখা ঐ শব্দ আমার মনে আছে, “মাতা-পিতা, গুরু কী বাণী বিচার করো শুভ জানী”। এই সকল চমৎকার এক বৎসরের ভিতর হয়। প্রমাণের জন্য:-

১) ভারত হসপিটাল সেন্টারের সমস্ত রিপোর্ট।

২) গাড়ির সমস্ত কাগজ।

৩) প্রমোশনের আদেশ।

৪) বি.এড-এর কাউনসিলিং চিঠি।

এই সকল চমৎকার নাম উপদেশ নেওয়ার ৬ মাস পরে হয়। শুধু নাম দীক্ষা নিলে লাভ হয় না। গুরুর আদেশে চলতে হবে।

“হরি রূঠে গুরু ঠৌর হৈ, গুরু রূঠে নহীঁ ঠৌর”

গুরুদেবের শ্রীচরণে শিষ্যের অনুভব সদা সমর্পিত।

ভক্ত ত্রিলোক দাস বৈরাগী।

সহ: গ্রেড- সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

টীমর খেড়া, জেলা কাটনী (M.P)

“১১০০০ ভোল্টেজ-এর বিদ্যুতের তার থেকে বাঁচান”

আমি ভক্ত সুরেশ দাস, পিতা শ্রী চাঁদ রাম, গ্রাম- ধনানা, জেলা সোনীপত। বর্তমান শাস্ত্রীনগর রোহতকে (হরিয়াণা) থাকি। সদগুরু দেবের থেকে নাম উপদেশ নেওয়ার পূর্বে আমার আর্থিক স্থিতি খুব খারাপ ছিল। পরিবারের সকল সদস্য প্রায়ই অসুখ-বিসুখে ভুগতে থাকত। আমার স্ত্রীকে ভূত প্রেত খুব বেশী দুঃখী করত। এতো কষ্টে থাকার পরেও আমরা দেবী দেবতার খুব পূজা পাঠ করতাম। হনুমানজীকে আমি খুব মানতাম। কিন্তু ঘরে সংঙ্কটের উপর সঙ্কট আসতে থাকে। পূর্ণ পরমাত্মা সদগুরু রামপালজী মহারাজ, আমার পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে, পূর্ণ পরমাত্মা মানতাম না। যার ফলে আমাকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত ভুগতে হয়। এক দিন গ্রাম সিংহপুরা নিবাসী ভক্ত বিকাশ আমাকে বলে আপনাদের ঘরে ‘পূর্ণ পরমাত্মা জগতগুরু রামপালজী মহারাজ’ এসেছেন। আর আপনি কোথায় ঘুমিয়ে আছেন। আমি বলি, কাল আমাকে এতো কষ্ট দিয়ে রেখেছে যে, ওখানে যাওয়ার সময়ই পাই না। ডাক্তাদের কাছে ঘুরতে ঘুরতে সময় চলে যায়। আর আর্থিক স্থিতিও খুব খারাপ। ঐ ভক্ত আমাকে অনেক বোঝায়। তখন পূর্ণ পরমাত্মার এমন দয়া হল যে, আমি সন্ত রামপালজীর কাছ থেকে উপদেশ নেওয়ার জন্য অক্টোবর ২০১০-এ সতলোক আশ্রম বরবালা চলে যাই। নাম উপদেশ নেওয়ার পরে সদগুরুজী দয়ার ভাণ্ডার খুলে দেয়। আর আমি ঐ সুখ-শান্তি অনুভব করিতে থাকি যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আমার স্ত্রীকে ভূত-প্রেত খুব দুঃখী করত। কিন্তু সদগুরুদেবের দয়ায় এখন পূর্ণরূপে ভালো আছে। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১-আমার ছেলে মহিতের বয়স ১২ বৎসর ছিল। আমার কথায় মিস্ত্রিকে ডাকতে গিয়ে ছেলে মিস্ত্রীর বাড়ির ছাদের উপর চলে যায়। ওখানে ১১০০০ ভোল্টেজের বিজলির তার ছিল। ছেলে আর তারের মাঝখানে মাত্র এক ফুট দূরত্ব ছিল। বিদ্যুতের তার ছেলেকে টেনে নেয় আর ছেলের মাথায় তার লেগে যায়। এক ইঞ্চি গভীরে ঢুকে যায়, মুখ জ্বলে যায় আর বিদ্যুৎ শরীরে প্রবেশ করে পায়ের বুড়ো আঙুলের হাড় ফুটে বের হইতে লাগে। ঐ সময় সদগুরু রামপালজী মহারাজ আকাশ মার্গ দিয়ে আসেন। আমার ছেলের খুব তেজ প্রকাশের চমকানো শরীর দেখে

যেন মনে হচ্ছে, হাজার হাজার টিউব লাইটের প্রকাশ বেরোচ্ছে। গুরুজী ছেলের হাত ধরে বিদ্যুতের তার থেকে ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন এবং ছেলের সাথে অনেক কথা হয়। যখন গুরুজী চলে যান তখন ছেলে জিজ্ঞাসা করে গুরুজী কোথায় যাচ্ছেন! গুরুজী বলে বেটে, (পুত্র) আমি তোমার সঙ্গে আছি। ভয় পেয়ো না। ঐ সময় মহিতের মা ওখানে যায়। সে খুব ভয় পায়, কারণ ছেলের শরীর দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানী (লেপট) বের হচ্ছিল। আমরা ছেলেকে পি.জি.আই. রোহতক নিয়ে যাই। ওখানে ও গুরুজী ছেলেকে দর্শন দেন। ছেলে বলছে, গুরুজী আমার সঙ্গে আছে। তোমরা ভয় পেয়ো না। যদি আজ আমরা গুরুজীর স্মরণে না থাকতাম তাহলে আমার ছেলে বাঁচত না। আর আমার স্ত্রীকেও প্রেতে মেরে দিত। আমি যে সুখী পরিবারে আছি, তা সদগুরু রামপালজী মহারাজের দয়ার দান।

সর্ব ভক্ত আত্মার কাছে প্রার্থণা আমার এই সত্য কথা পড়ুন আর আপনারাও সদগুরু রামপালজী মহারাজের শরণে এসে নিজের মানব জীবনের কল্যাণ করুণ কপালের লেখা বা কর্মের কারণ যে ঘটনা ঘটে তার থেকেও পূর্ণ রূপে বাঁচবেন। সদগুরু রামপালজী মহারাজের সত্সঙ্গে আমি শুনেছিলাম পূর্ণ পরমাত্মার কবীরজী বন্দিছোড় আমাদের সমস্ত পাপকে নাশ করে দেন। এই প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২-এ তথা মণ্ডল ৯ সুক্ত ৮০ মন্ত্র ২-এ লেখা আছে। যদি কোন রোগের কারণ প্রাণ শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলেও আমি তাঁর প্রাণ রক্ষা করি এবং ১০০ বৎসর আয়ু প্রদান করি। অর্থাৎ ভক্তি করার জন্য আয়ু বাড়িয়ে দিই, সর্বসুখ প্রদান করি। সদগুরু রামপালজী মহারাজ নিজের অমৃত বাণীতে বলেছেন, প্রত্যেক প্রাণী নিজের কর্ম অনুসার সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত করে। দুঃখ তো পাপ কর্মের ফল আর সুখ পূণ্য কর্মের ফল। এখন পর্যন্ত সর্ব সন্ত, আচার্য গুরু এটাই বলে আসছে প্রারব্ধ (পূর্ব কর্মের ফল) কর্মফল ভোগ করতেই হবে। শিক্ষিত পাঠক সমাজ! সদগুরু রামপালজী মহারাজ বলেন পাপ কর্মের জন্য দুঃখ হয়। যদি পাপকর্ম নাশ হয়ে যায় তাহা হলে দুঃখ ও সমাপ্ত হয়ে যাবে। যদি ভক্তি করতে করতে পাপ কর্মফল ভুগতে হয় তাহলে ভক্তি করার প্রয়োজনই হয় না। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ আমার বিধিলিপির কারণ অর্থাৎ প্রারব্ধের পাপের ফলের কারণ আমার পুত্র মোহিতের মৃত্যু ছিল। আমার সদগুরু রামপালজী মহারাজের কৃপায় পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরজী আমার পাপকে নাশ করে আমার ছেলে মোহিতের জীবন রক্ষা করে পরমায়ু বাড়িয়ে দেন। যদি ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তে প্রারব্ধ কর্মের (পূর্ব জন্মের কর্মফল) কারণ আমার ছেলে মারা যেত তাহলে আমরা সমস্ত পরিবার ভক্তি ছেড়ে নাস্তিক হয়ে যেতাম। কারণ ঐ সময় পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। এখন ভগবানের প্রতি অত্যাধিক বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে। এবং এটাও বিশ্বাস হয়েছে যে কবীর সাহেবই পূর্ণ পরমাত্মা পাপ নাশক এবং সর্ব সুখ দায়ক ও পূর্ণ মোক্ষদায়ক। সদগুরু রামপালজী মহারাজ কবীর পরমেশ্বরের পাঠানো অবতার। তাই আপনাদের কাছে পুণঃ প্রার্থণা অবিলম্বে আপনার জেলার নিকটবর্তী নামদান কেন্দ্রে এসে উপদেশ নিয়ে আত্মকল্যাণ করান। আমার উদ্দেশ্য আমার মত দুঃখী আত্মারা অনেক। তাই আমার উপরোক্ত আত্মকথা পড়ে এবং বিচার করে আমার মত সঙ্কট নিবারণ করুন।

য়হ সংসার সমঝদা নাহি, কহুন্দা শাম দোপহরে ঝুঁ।
গরিবদাস য়হ বক্ত জত হে, রোবেগে ইশ পহরে (সময়) নু।

কৃপাপ্রার্থী ভক্ত সুরেশ দাস
পুত্র শ্রী চাঁদ রাম।

শাস্ত্রীনগর হিসারবাইপাস রোহতক।
মো: ০৯৮২৯৫৮৮৬২৮

"ভক্ত মদন দাসের পরিবারের প্রতি সদগুরুর কৃপা"

আমার নাম মদন দাস, (প্রাক্তন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) গ্রাম:- ঝিকরা, পোঃ- দীঘলগ্রাম, জেলা:- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বাসিন্দা। আমি গত ২৩/১০/২০১৯ তারিখে অনলাইনে নাম দীক্ষা নিয়েছিলাম। আমার বর্তমান বয়স ৬৬ বছর। আমার গ্রামে বৈষ্ণব ধর্মীয়দের জন্য এক আশ্রম আছে, যা আমার পিতা, জ্যাঠামশাই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক কারণেই আমি ৭/৮ বছর বয়স থেকেই বৈষ্ণব ধর্মচর্চায় নিমজ্জিত ছিলাম। আমি ও আমার স্ত্রী, নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গন থেকে দীক্ষা নিয়েছিলাম ২০০০ সালে। প্রায় ১৬-১৭ বছর ধরে বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। নিয়মিত জপ ধ্যান করেছি। আমার স্ত্রী ভগাবত পাঠিকা ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে পূজা অর্চনা করতেন। তা সত্ত্বেও আমাদের কনিষ্ঠ কন্যার ছাদ থেকে পড়ে অকালে মৃত্যু হয়। আমি কেবলই ভাবতাম যদি একজন সঠিক গুরু পেতাম, তাহলে সংসারের প্রাণীদের অকাল মৃত্যু, শোক, দুরবস্থা প্রভৃতি দূঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেতাম। আমি ৩১/৮/২০১৭ তারিখে সরকারি ব্যাংকের আধিকারিক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করি। তারপর আমি সঠিক গুরুর সন্ধান করতে থাকি। আমার স্ত্রী নিয়মিত টিভিতে ধর্মীয় চ্যানেল দেখেন এবং ভাগবত পাঠ শিক্ষা করেন। এভাবে একদিন গুরুদেব রামপাল মহারাজের সৎসঙ্গ শোনেন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন অনেক রোগী রোগমুক্ত হচ্ছে। আমার স্ত্রী হেপাটাইটিসের রোগী ছিলেন এবং কোলকাতার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ডাক্তারবাবুরা বলে দিয়েছিলেন যে, এই রোগ কোনদিন সারবে না । তাই গুরুদেব রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ শোনার সময় শেষের দিকে পাঁচ/দশ মিনিটের বিভিন্ন রোগীদের ইন্টারভিউ দেখে খুবই উৎসাহিত হয়ে, এবং টিভিতে প্রচারিত ফোন নম্বরে আমি সরাসরি যোগাযোগ করি। পরিশেষে রিষড়া নামদান কেন্দ্র থেকে আমার স্ত্রী নাম দীক্ষা নেয়। গুরুজীর দেওয়া নিয়ম কানুন মেনে মর্যাদায় থেকে আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। আমি এমন চমৎকার দেখে তো অবাক হয়ে যাই। এবার আমার কথায় আসি । আমি অবসর গ্রহণ করার পর দুটি অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়ি। প্রথমটিতে আমি ইনকাম ট্যাক্স দপ্তর থেকে একটি নোটিশ পাই যে, ঐ দপ্তরে আমার এক লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বকেয়া আছে বলে দাবি করে। কিন্তু আমি যে দপ্তরের কাজ করেছি, সেখানে কোন গন্ডগোল হয় না এবং নিজে আধিকারিক হিসেবে ট্যাক্স জমা করতাম, যেখানে প্রতিবছর অডিট করা হতো। সুতরাং ভুল হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। আমি আমার ভক্তিমতীকে বলেছিলাম যে "তুমি তোমার গুরুদেবকে বলে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও"। আমার স্ত্রী আমাকে গুরুদেবের সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রার্থণা বা আবেদন জানাতে বলেন। আমি অত্যন্ত দুঃখে সজল নয়নে গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে আর্জি জানাই, যদিও আমি তখনও দীক্ষা গ্রহণ করিনি। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়ে কে একজন সাদা পোশাকের বৃদ্ধ আমাকে সমাধানের রাস্তা বলে দিলেন। আমি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের নির্দেশ মতো এক ইনকাম ট্যাক্স উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করি, যিনি আমার ঐ ট্যাক্সের টাকা মুকুব করিয়ে দেন এবং ৪০০০ টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ফলে গুরুজীর প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তারপর রিষড়ায় অনলাইনে গুরুজীর নিকট থেকে নামদীক্ষা গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় চমৎকার:- অবসরের পর আমি কলিকাতার দমদমে চল্লিশ লক্ষ (40

লাখ) টাকা খরচ করে একটি ফ্ল্যাট কিনি; কিন্তু প্রোমোটার ঐ ফ্ল্যাট দুজনের কাছে বিক্রি করেন। দুজনের কাছে থেকে টাকা নিয়ে তিনি নিখোঁজ বা লুকিয়ে পড়েন। ফ্ল্যাটে ডবল ডবল তালা ঝোলানো হয়। আমি রিষড়াতে ভগৎ দিলীপ দাসের সঙ্গে আমার সমস্যার কথা বলি। উনি বলেন যে যদি আইন আদালত ও নেতা-মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হন তবে প্রচুর টাকা খরচ হবে এবং দীর্ঘদিন সময় লাগবে। তিনি তখন আমার ফ্ল্যাটের বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুজীর কাছে প্রার্থণা জানাতে বলেন। গুরুজীর কৃপায় প্রার্থণা জানানোর ১৫ দিনের মধ্যে ফ্ল্যাট সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যায়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর আমার নামে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি হয় এবং গুরুজী আমাকে ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচান।

এছাড়া ছোট-বড় অনেক সমস্যা, বিপদ, আপদ থেকে মুক্তি পাই গুরুজীর দয়াতে। আমার এক বিবাহিত কন্যা গুরুজীর শরণে এসে নাম দীক্ষা নিয়েছে, সে আজ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরতা। আপাতত আমার পরিবারে কোন বড় রকমের সমস্যা নেই। গুরুজীর কৃপায় এবং আরো অনেক উপকার পেয়েছি। সকল বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে আমার প্রার্থণা এই যে সত্য জ্ঞানকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং সদগুরু শ্রী রামপালজি মহারাজের চরণে এসে নাম দীক্ষা নিয়ে মনুষ্য জীবন সফল করুন।

বন্দীছোড় সতপুরুষ সদগুরুদেব রামপালজী মহারাজ আমার মত ক্ষুদ্র জীবকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর চমৎকারিত্ব অনুভব করিয়েছেন। গুরুজীর আশীর্বাদ আমাদের জীবনে “চমৎকার হি চমৎকার”। বন্দীছোড় যে কৃপা করেছেন তা মুখে বর্ণনা করার ভাষা ও সামর্থ্য আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। গুরুজীর শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

জয় হো বন্দীছোড় কি।

ভক্ত মদন দাস (মোবাইল নং- ৯৯৩৩৫২১৯৫৭)
গ্রাম:- ঝিকরা, পোঃ- দীঘেলগ্রাম,
জেলা:- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৪১২৫৭,

“ভক্ত রামস্বরূপ দাসের আত্মকথা”

(বন্দীছোড় কবীর সাহেব কি জয়।)

আমি ভক্ত রামস্বরূপ পুত্র মঙ্গল রাম গ্রাম বড়ৌলী, জেলা অম্বালার নিবাসি। আমি ১৩ বৎসর পূর্বে ধন-ধন সদগুরু থেকে নাম উপদেশ নিয়ে ছিলাম। ৬ বৎসর পূর্বে আমার হাত ও পা অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং কোমরের নিচের অংশও মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। আমার দুই ছেলে আমাকে নিয়ে আম্বালা সরকারি হাসপাতালে যায়। পরে প্রাইভেট ডাক্তারও দেখায়। তারপর আমাকে ২ বৎসর পর্যন্ত এদিক-ওদিক দেখানোর পর পি.জি-আই চণ্ডীগড় নিয়ে যায়। ওখানে এক বৎসরে দুইবার টেস্ট করায়। কারণ যে মেশিনে আমার টেস্ট হইত তাতে আমার নম্বর এক মাস পরে আসত। এবং টেস্টের চার্জ ছয় হাজার টাকা ছিল। দুইবার টেস্টে কোন রোগ ধরা পরে না। মাথার অপারেশন করতে বলে। তাতে জীবনের ঝুঁকি ও পূর্ণ ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারপর রামদেবের আশ্রমে নিয়ে যায়। ওখানে কিছুদিন চিকিৎসা হয়। কিন্তু কোন পরিবর্তন না হওয়ায় আমকে বাড়িতে নিয়ে আসে। আর ঝার-ফুঁক- তন্ত্র-মন্ত্র করানোর জন্য পাঞ্জাব-হরিয়াণা সহ আরো অনেক স্থানে নিয়ে যায়। কিন্তু কোনো সুরাহা হয় না। তখন আমি বুঝতে পারি আমার জীবন আর বেশিদিন নেই। যখন সর্ব চেষ্টা ফেল হয়ে যায়, তখন আমার মেয়ে আমাকে ডেকে নেয়। আমার জামাই এক ভগতের কথা বলে, সে আমাকে

১৫ আগস্ট ২০০৮-এ বরবলা আশ্রমে সদগুরু বন্দীছোড় রামপালজী মহারাজের কাছে নিয়ে যায়। ১৬ আগস্ট ২০০৮-এ আমি নাম দীক্ষা নিই। তারপর থেকে আমি ভালো হতে থাকি। গুরুজীর কৃপায় আজ আমি নিজের জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে জমি চাষ করি। গুরু মহারাজের আশীর্বাদে পুনরায় জীবন দান পাই। মহারাজ বন্দীছোড় যে কৃপা করেছেন, তা মুখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। গুরুজী সতলোক থেকে আমার জীবন দান দেওয়ার জন্য এসেছেন। আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম।

জয় হো বন্দীছোড় কি!
আপনার দাস
ভক্ত রামস্বরূপ দাস
গ্রাম- বৌড়লী, জেলা-আম্বালা।

ভক্ত বহীদ খাঁ-র আত্মকথা
বন্দি ছোড় কবীর সাহেব কি জয়"
বন্দি ছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের শ্রী চরণে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম।

আমি বহীদ খাঁ পুত্র মুন্সী খাঁ, গ্রাম-ডাকখানা, মেহগাঁও, জেলা ভিণ্ড (মধ্যপ্রদেশ) এর নিবাসী। আমি ৩ বৎসর ধরে কঠিন অসুখে ভূগছিলাম। আমার দুই কিডনী খারাপ ছিল। মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়র-এর বড় বড় এম.বি.বি.এস ডাক্তার থেকে চিকিৎসা করাই। কিন্তু কোন লাভ হয় না। তখন গ্বালিয়রের ডাক্তার আমাকে দিল্লী এ.আই.এম.এস (অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল)-এ রেফার করে। ওখানে ডাক্তাররা সকল টেস্টের পরে বলেন আপনার রক্ত ফিল্টার করতে হবে তিন বোতল রক্ত লাগবে এবং আপনার পরিবারের কোন সদস্যের কিডনী বের করে অপারেশনের দ্বারা আপনার কিডনীতে লাগানো হবে। এই চিকিৎসায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এত টাকা দেওয়ার মত পরিস্থিতি আমার ছিল না। তাই দিল্লী থেকে বাড়ি চলে আসি। আর অসহায় হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কারণ খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা করতে পারতাম না। তখন এক ব্যক্তি দ্বারা জানতে পারি হরিয়ানায় বরবালা, জেলা হিসারে পরমাত্মার অবতার এসেছেন। তিনি অসাধ্য রোগ পরমাত্মার ভক্তি করিয়ে ঠিক করেন। এই কথা শুনে ২৪-৭-০৯-এ পরমাত্মার শ্রীচরণে পৌছে নাম উপদেশ নিই। নাম দান নেওয়ার পরে ধীরে ধীরে আমি ভালো হতে থাকি এবং এক মাসের ভিতর, সতগুরুর কৃপায় সুস্থ হয়ে যাই। প্রমাণের জন্য আমার অসুখের সর্ব টেস্টের ও চিকিৎসার কাগজ আমার কাছে এখনো আমার কাছে আছে। হে পরমপিতা পরমেশ্বর আপনি যে জীবন আমাকে দান করেছেন তাঁর ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। হে আমার সদগুরুদেব! আপনার দাসের উপর কৃপা করে শ্রীচরণের শরণে লাগিয়ে রেখো।

আপনার দাস
ভক্ত বহীদ খাঁ
পিতা- মুন্সী খাঁ, গ্রাম-ডাকখানা
তহশিল-মেহগাঁও জেলা ভিণ্ড (মধ্যপ্রদেশ)

ओ३म्

सच्चिदानन्दायेश्वराय नमो नमः

भूमिका

सत्यार्थप्रकाश को दूसरी वार शुद्ध करके छपवाया है क्योंकि जिस समय मैंने यह ग्रन्थ **'सत्यार्थप्रकाश'** बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृतभाषण करना, पठन–पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती थी, इत्यादि कारणों से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। अब इसको अच्छे प्रकार भाषा के व्याकरणानुसार जानकर अभ्यास भी कर लिया है, इस समय इसकी भाषा पूर्व से उत्तम हुई है। कहीं--कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, वह करना उचित था, क्योंकि उसके भेद किए विना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं–कहीं भूल रही थी, वह वह निकाल शोधकर ठीक–ठीक करदी गई है।

यह ग्रन्थ १४ समुल्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचित हुआ है। इसमें १० दश समुल्लास पूर्वार्द्ध और चार उत्तरार्द्ध में बने हैं, परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिये हैं।

१२ सत्यार्थप्रकाशः

यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान् लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे, इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता हूं और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मुझ वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य कर्म है।

सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे।

।। अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु।।

।। इति भूमिका।।

स्थान महाराणाजी का उदयपुर **(स्वामी) दयानन्द सरस्वती**

भाद्रपद सम्वत् १९३९

এই ফটোকপিতে সত্যার্থ প্রকাশের ভূমিকার বিবরণ।

শঙ্কা সমাধান :- (১) কিছু বিরোধী ব্যক্তি মহর্ষি দয়ানন্দের ব্যর্থ মহিমা শুনিয়ে তার লেখা সত্যার্থ প্রকাশ পুস্তক বিক্রি করে নির্বাহ করছিল। তারা বলে 'জ্ঞান গঙ্গা' পুস্তকে শাস্ত্রার্থ বিষয় লেখা আছে, মহর্ষি দয়ানন্দ ১৮৮২সাল (সম্বত ১৯৩৯) পর্যন্ত সংস্কৃতে ভাষণ দিতেন। এটা উচিত নয়, কেননা মহর্ষি দয়ানন্দ "সত্যার্থ প্রকাশের" ভূমিকাতে স্পষ্ট করে রেখেছেন যে, ১৮৭৪ সালে (সম্বত ১৯৩১) যে সময় "সত্যার্থ প্রকাশকে" প্রথমবার লিখেছিলেন, তার পূর্বে তিনি সংস্কৃতে ভাষণ দিতেন, পরে হিন্দি জেনে নিয়েছিলেন।

শঙ্কা সমাধান :-

উপরোক্ত ফটোকপি (সত্যার্থ প্রকাশের সম্বন্ধিত বিবরণে বলা হয়েছে। এর

মধ্যে মহর্ষি দয়ানন্দ স্পষ্ট করেছে, যে সময় সত্যার্থ প্রকাশ বানানো হয়েছিল, ঐ সময়ে আমার হিন্দি ভাষার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। আর এখন সংবৎ ১৯৩৯ (সন্ ১৮৮২) স্থান-উদয়পুর মহারাণা উদয়পুর ভাদ্র পদ (সম্বত ১৯৩৯ = সন ১৮৮২) -তে দ্বিতীয়বার ছাপিয়েছিল। তখন মহর্ষির হিন্দি ভাষার জ্ঞান বিশেষ ছিল না। সন্ ১৮৮২ তে বিশেষ জ্ঞান হওয়ার পরে সত্যার্থ প্রকাশকে শুদ্ধ করে ছাপানো হয়েছে, এতেও সিদ্ধ হয় যে, মহর্ষি দয়ানন্দ সন্ ১৮৮২ (সম্বত ১৯৩৯) পর্যন্ত ও সংস্কৃতিতে শাস্ত্রার্থ করত।

দ্বিতীয় কারণ, এই যে দুই বিদ্বান যখন নিজেদের মধ্যে চর্চা করতো, তারা সংস্কৃত ভাষাতেই চর্চা করতো। কারণ সর্ব শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল। তার হিন্দি অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দ করতেই পারেন না। কেননা যে স্বয়ংই স্বীকার করেছেন সন্ ১৮৮২ (সম্বত ১৯৩৯) পর্যন্ত আমার হিন্দি ভাষার কোন বিশেষ জ্ঞান ছিল না। সন্ ১৮৮৩ (সম্বত ১৯৪০) -তে মহর্ষি দয়ানন্দের মৃত্যু হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় মহর্ষি দয়ানন্দ সন্ ১৮৮২ (সম্বত -১৯৩৯) পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাতেই ভাষণ করতেন এবং তার হার জিতের নির্ণয় অজ্ঞানী শ্রোতাই করত, যারা সংস্কৃত জানত না। সেইজন্য দয়ানন্দের মত ব্যক্তিকে মহর্ষি বলা হয়েছে। মহর্ষি দয়ানন্দ ও কৃষ্ণানন্দের শাস্ত্রার্থতে কৃষ্ণানন্দের পক্ষ দৃঢ় ছিল। যেহেতু কৃষ্ণানন্দ শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৭-এর প্রমাণ দিয়ে সাকার পরমাত্মাকে প্রমাণ করেছিলেন। "যদা, যদা, হি, ধর্মস্য, গ্লানি, ভবতি, ভারত ...এর অর্থ গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদভাগবত গীতাতে এই প্রকার লেখা আছে:- হে ভারত! যখন যখন ধর্মের গ্লানি (হানি) এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমি আমার রূপকে রচনা করি, অর্থাৎ সাকার রূপে লোকের সম্মুখে প্রকট হই।

ধ্যান দেবেন, মহর্ষি দয়ানন্দের দ্বারা বিষয় বদল করে, সংস্কৃত বলার কারণ সংস্কৃত ভাষাতে, অপরিচিত ও অবুঝ শ্রোতারা নিজেরাই সমবেত করতালি ও বিদ্রুপ হাসির দ্বারা জ্ঞানহীন দয়ানন্দকে বিজয়ী ঘোষিত করে দিয়েছিল। মহর্ষি দয়ানন্দ এমন ভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন, যেমন এক জমিদারের পুত্র সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে....শেষ বর্ণনা কৃপা করে পড়ুন এই পুস্তকের 245 নং পৃষ্ঠাতে॥